ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি

আল্লামা আল বাহী আল খাওলী

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি

আল্লামা আল বাহী আল খাওলী

অনুবাদ ঃ **হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক এম. এ**

(সাপ্তাহিক জাহানে নও ও সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সাবেক
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক জনপদের সাবেক সহকারী সম্পাদক
এবং হাদীসের কিস্‌সা, মহানবীর নৈতিক বিপ্লব, আল জিহাদ,
সীরাতে ইবনে হিশাম, তাফসীরে ফী যিলালিল কুরআন ও
কবীরা গুনাহ সহ প্রায় অর্ধশত পুস্তকের লেখক ও অনুবাদক)

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২২৮

২য় প্রকাশ

সফর	১৪২৬
চৈত্র	১৪১১
এপ্রিল	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAM PROCHARAR REDAYGRAHY PADDOTY by Allahma Al-Bahe Al-Khawle. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 130.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনরুত্থানের আন্দোলনে মিসরের 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' সংস্থা যে অবদান রেখেছে, ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে তা যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই সংস্থার প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠিত মোনাফেক নেতৃত্বের চক্ষুশূল হয়ে লোমহর্ষক ও অমানুষিক নির্যাতন, তথা জেল-যুলুম ও শাহাদাত হাসিমুখে বরণ করে। এক দিকে যেমন প্রাথমিক যুগের সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী সময়কার ইমাম হোসেন (রা), ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখের দৃষ্টান্ত পুনরুজ্জীবিত করেছেন। অপর দিকে তেমনি ইকামাতে দ্বীনের উদাত্ত আহবান, আধুনিক মানবরচিত মতাদর্শের আগ্রাসন প্রতিরোধ, পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক গোলামীর শৃংখল থেকে বিশ্বমানবতার বিশেষত মুসলিম উম্মার মুক্তির পথনির্দেশ এবং কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী জীবন বিধানের হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণ সম্বলিত যে বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার রচনা করেছেন, তা ইমাম গাজ্জালী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়েম ও প্রথম যুগের অন্যান্য মুসলিম মনীষীর অবিস্মরণীয় অবদানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে শহীদ সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুব, শহীদ আবদুল কাদের আওদা প্রমুখের গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে স্মরণ করার দাবী রাখে।

বাংলা ভাষায় ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের এবং অন্যান্য আরব লেখকের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ এ যাবত অনূদিত হয়ে সমাদরের সাথে গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে সাইয়েদ কুতুবের 'ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার' ও 'ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা' এবং মুহাম্মাদ কুতুবের 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে দুঃখের বিষয় যে, আরব লেখকদের যে কয়টি গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছে, তার সবগুলো প্রত্যক্ষভাবে আরবী থেকে অনূদিত নয়। কিছু গ্রন্থ ইংরেজী অথবা উর্দু অনুবাদের তস্য অনুবাদ।

বিশিষ্ট ইখওয়ান নেতা ও লেখক আল্লামা আল-বাহী আল-খাওলীর গ্রন্থ "তাজকেরাতুদ্ দুয়াত" সরাসরি আরবী থেকে অনুবাদ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

কেননা মূল গ্রন্থের সরাসরি ভাষান্তরে লেখকের প্রকৃত বক্তব্যকে ভাষাগত ও ভাবগত উভয় দিক দিয়েই যতটা নিখুঁতভাবে পেশ করা যায়, তস্য অনুবাদে ততটা করা সম্ভব নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও অনুবাদের পুরোপুরি হক আদায় করা সম্ভব হয়েছে, এমন দাবী করা হয়তো ধৃষ্ঠতার শামিল হবে। বিজ্ঞ পাঠকের ওপরই এর বিচারের ভার অর্পণ করছি।

www.pathagar.com

অধম অনুবাদকের এই নগণ্য চেষ্টাকে আল্লাহ বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও ইকামাতে দ্বীনের মহান কাজের প্রতি আগ্রহ ও প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে কবুল করে নিন। একান্তভাবে এই মিনতিই জানাই। আমীন!

আকরাম ফারুক

টঙ্গী-গাজীপুর।

১৬-০৭-১৯৮৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

❑ ইমাম হাসানুল বান্না রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভূমিকা ১৭
❑ গ্রন্থকারের ভূমিকা ১৯
* ওয়াজের উদ্দেশ্যে লেখা বই নয় ১৯
* ওয়ায়েজ ও দাওয়াতদাতার মধ্যে পার্থক্য ২০
* আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল ২১
* আল্লাহর নিবেদিত বান্দা ২২
* ইখওয়ানের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য নয় ২৪
* গোঁড়ামীর অবকাশ নেই ২৫

প্রথম অধ্যায় ঃ দাওয়াত ও দাওয়াতকারী সম্পর্কে সঠিক বুঝ ২৭

❑ দুই রকমের বুঝ নিয়ে সমস্যা ২৯
* মতবিরোধের কেন্দ্রবিন্দু ৩০
* ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি ৩১
* বস্তুগত যুক্তি বনাম আধ্যাত্মিক যুক্তি ৩৫

❑ জীবনের দু' রকম লক্ষ্য ও তা নিয়ে দোদুল্যমানতা ৩৭
* ভাল কথা শুনেও উপেক্ষা করা ৪১
* মহৎ গুণাবলী সংক্রান্ত গালভরা বুলি ৪৩
* মেকি মানবিক গুণাবলী ৪৪
* হিংস্র জন্তুর খাসলত ৪৫
* দস্যুর দল ৪৬
* বাস্তবতার দৃষ্টিতে ৪৭
* পুনশ্চ ৪৮

❑ চিকিৎসার উপায় ৪৯
* দু'টো প্রধান মৌলনীতি ৫০
* প্রচার ও সংস্কার ৫৩
* দাওয়াত ও লেখালেখি ৫৪
* নিকৃষ্টতম দাস ৫৫
* দাওয়াত ও ওয়াজ ৫৬

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দাওয়াতকারী বা প্রচারকের মেজাজ ৫৯
❑ বাস্তবানুগ বুদ্ধিমত্তা বা কাণ্ডজ্ঞান ৬১
* তত্ত্বজ্ঞান তুলে ধরার কুরআনী পদ্ধতি ৬১
* মানুষের জন্মগত স্বভাব ৬২
* বাস্তব কর্মপদ্ধতির আবশ্যকতা ৬২
এক ঃ কিচ্ছা কাহিনী ৬৩
* কুরআনের কিচ্ছার একটি দৃষ্টান্ত ৬৪
১- শক্তি ও জ্ঞান ৬৫
২-উদ্দেশ্য ও ব্রত ৭০
৩-সর্বোচ্চ নেতার ঈমান ও ছোট-বড় সব জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা ৭৩
৪- রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি প্রত্যেক নাগরিকের আস্থা স্থাপন ৭৬
* নবী করীম (সা) বর্ণিত কাহিনী ৮৪
* হাদীসে বর্ণিত একটি কিচ্ছা ৮৫
* বক্তার স্বরচিত কিচ্ছা ৮৯
দুই ঃ উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্যের প্রয়োগ ৯৩
* প্রবাদ প্রয়োগ বাক্যে নতুনত্ব ও চমক সৃষ্টির উপকরণ ৯৪
* প্রবাদের শ্রেণী বিভাগ ৯৫
হকপন্থীদের দৃষ্টিতে বাতিল ১১০
বাতিলের প্রবণতা ও ফেনার বাষ্প ১১২
* মানব প্রকৃতিতে নিহিত ক্রুটিযুক্ত বৈশিষ্টসমূহ ১১৩
* মানসিক বা আত্মিক মৃত্যু ও তার তাৎপর্য ১১৪
* মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আকাংখা এবং কিভাবে তা ধ্বংসাত্মক লালসায় রূপান্তরিত হয় ১১৫
* চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞানের কাছে যা হতবুদ্ধিকর ১১৭
* ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন মানুষের স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ১১৯
* রসূলের বর্ণিত উদাহরণাবলী ১২১
তিন ঃ নিদর্শনাবলী নিরীক্ষণ ১৪২
চার ঃ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়গুলো এবং তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূত নিদর্শনসমূহ ও গুণাবলীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ১৫৬
পাঁচ ঃ দুনিয়ার বাস্তব অবস্থার সাথে অদৃশ্য বিষয়সমূহের তুলনা ১৫৯
ছয় ঃ বিশ্ব প্রকৃতিতে ছড়ানো আল্লাহর অসংখ্য ও বিচিত্র নিদর্শন ও মানুষকে দেয়া নেয়ামতসমূহ পর্যবেক্ষণ ১৮০
বিশ্ব প্রকৃতি থেকে আমরা কি বুঝেছি ? ১৮০

www.pathagar.com

মানুষের শৈশব	১৮১
মানবতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা	১৮২
একটা উৎকট ব্যাধি—যার নিরাময় প্রয়োজন	১৮৩
চিকিৎসা	১৮৬
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	১৮৭
পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপর্যয়	১৮৯
একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ	১৯১
রোগ ও ওষুধ	১৯২
চিকিৎসার পদ্ধতি	১৯৬
গুণের দিকে নজর দেয়া চাই—পরিমাণের দিকে নয়	১৯৯
চিকিৎসার ফল	২০২
বাস্তব উদাহরণ	২০৫
* নমুনা ও নির্দেশনা	২০৬
কতিপয় নমুনা	২০৬
❑ সামাজিক আধ্যাত্মিকতা	২১২
* ভূমিকা	২১২
* বস্তু ও রূহ	২১২
* মানুষের আসল সত্বা	২১৪
* মানুষ নিজের হকের ব্যাপারে কিভাবে ভুল করে	২১৬
* মন ও প্রবৃত্তির মাঝে আড়াল স্থাপন জরুরী	২২১
* ভুলের প্রতিকারের উপায় 'জোহদ'	২২১
* জোহদের বাস্তবায়নে জটিলতা	২২৭
* বিবেক ও মনের সম্পর্ক	২২৮
* একমুখী হওয়া অপরিহার্য	২৩২
* দৃঢ়সংকল্প হতে হবে	২৩৭
* স্বভাব ধর্মে প্রত্যাবতর্নই মনের রাহু মুক্তি নিশ্চিত করতে সক্ষম	২৩৮
* পদমর্যাদাধারী ও বিত্তশালীদের মনের পরিশুদ্ধির বাস্তব উদাহরণ	২৪২
* হযরত ইউসুফের উদাহরণ	২৪৫
* রসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টান্ত	২৪৭
* সামষ্টিক আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্য গুণাবলী	২৪৮
* আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহর স্মরণ	২৪৯
* সকল অবস্থায় আল্লাহর স্মরণের তাৎপর্য	২৫১
* রসূলের (সা) মনে স্মরণের প্রকৃতি	২৫২

www.pathagar.com

* রসূলের (সা) নীতির অনুসরণ	২৫২
* আল্লাহমুখী হওয়ার ডাক	২৫৫
* দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতদাতার কর্তব্য এটাই	২৫৫
* কতিপয় পথনির্দেশ	২৫৭
* সামষ্টিক আধ্যাত্মিকতা বনাম রূহানিয়াতের নিভৃত সাধনা	২৬৪
* দাওয়াতের কাজে ও দাওয়াতদাতার জীবনে এই রূহানিয়াতের অবদান	২৭০
❑ **বাস্তবায়নের সহজাত প্রেরণা**	**২৯২**
* ঈমানের কতিপয় বৈশিষ্ট	২৯২
১–উপলব্ধি	২৯২
২–আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষাকে ভালোবাসা বা আল্লাহর আদর্শ প্রীতি	২৯৪
৩–আল্লাহর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও সম্ভ্রমবোধ	২৯৫
* বাস্তবায়নের সহজাত প্রেরণার তাৎপর্য	২৯৬
* কিভাবে স্বাভাবিক বাস্তবায়ন প্রেরণা অর্জন করতে পারি ?	২৯৮
* আল্লাহ থেকে দূরত্ব পরিত্যাজ্য	২৯৮
* দাওয়াতদাতাকে আগে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে	২৯৯
* লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ	৩০০
* হৃদয়ের পুনরুজ্জীবন	৩০৩
প্রথম উপকরণ ঃ আল্লাহর স্মরণ	৩০৫
দ্বিতীয় উপকরণ ঃ মনকে বিবিধ ক্ষতিকর ও প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব থেকে রক্ষা করা	৩০৬
ক. অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার প্রভাব	৩০৬
খ. মনস্তাত্বিক প্রতিকূলতার প্রভাব	৩১৪
গ. সামাজিক প্রতিকূলতার প্রভাব	৩১৫
* সমস্যা সমাধানে নম্রতা অবলম্বনের আবশ্যকতা	৩১৮
* নম্রতার নীতির সাফল্যের দৃষ্টান্ত	৩১৯
* বাহ্যিক পরিমণ্ডলে দাওয়াতের সাফল্যের শর্তাবলী	৩২০
১–আন্দোলন	৩২০
২–দাওয়াতী কর্মসূচী নিয়ে মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করা	৩২১
৩–সংগঠন ও সংঘবদ্ধকরণ	৩২৪
* সংঘবদ্ধ করণের মূলনীতি	৩২৮
প্রথমতঃ শৃংখলা	৩২৯

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ পর্যাপ্ত সৌভ্রাতৃত্ব ৩৩০
প্রথমত, সমমর্মিতা ও সহানুভূতিশীলতা ৩৩১
দ্বিতীয়ত, বিবাদ ও বিতর্ক এড়িয়ে চলা ৩৩৩
* সবর তথা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ৩৩৫
* সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতার সুফল ৩৪৪

তৃতীয় অধ্যায় ঃ দাওয়াতকারীর প্রেরণার উৎস ও উপকরণ ৩৭৩
❑ ১–আল কুরআন ৩৭৫
* মোনাফেকদের ফ্রন্ট ৪০৭
* মোশরেকদের ফ্রন্ট ৪১৬
* কুরআনের অভিষ্ট সমাজের ভিত্তি ৪২৩
❑ ২–সুন্নাহ ৪৫২
❑ ৩–ইতিহাস ও মনীষীদের জীবনী ৪৬৬
❑ ৪-কর্মতৎপর মানব জীবনের বাস্তব ঘটনা ৪৭০

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বক্তব্য ও ভাষণ দেয়ায় দাওয়াতকারীর ভূমিকা ৪৭১
* ১–ভাষণ ৪৮৪
* ২–দারস তথা পাঠদান বা শিক্ষাদান ৪৯২
* ৩–খুতবা বা ক্ষুদ্র বক্তৃতা ৪৯৬
* ৪–প্রবন্ধ ৪৯৮
* ৫–সাধারণ কথাবার্তা ৫০১

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

انَّ هذه تَذكِرَةٌ ج فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ الى رَبِّه سَبِيلاً ○

"নিঃসন্দেহে এ এক স্মরণিকা। সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে (এর সাহায্যে) আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ ধরুক।"

-(সূরা আদ্ দাহর ঃ ২৯)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। আল্লাহর রসূল ও আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ ও সালাম। তিনি ছিলেন আল্লাহর দিকে যারা ডাকেন তাদের শিরোমনি। সচেতন আহবায়ক। অত্যন্ত নিখুতভাবে ও আন্তরিকভাবে যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরও শ্রেষ্ঠ। তাঁর পরিজন ও সহচরদের ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর অপার করুণা। আর কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে তাদের ওপরও তার অফুরন্ত কৃপা-করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমীন!

ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ও প্রচারকদের প্রস্তুত করার লক্ষ্যে লিখিত এই উপদেশগুলো—যাকে ভাষণ বলাই অধিকতর সঙ্গত—আমি পড়ে দেখেছি। এতে আমি অত্যধিক মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছি। আমি এতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার লক্ষণ পরিস্ফুট দেখতে পেয়েছি। মনে হয়েছে যে, লেখক এ কাজে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ও তওফীক লাভ করেছেন। আমি তৎক্ষণাত আল্লাহর কাছে দোয়াও করেছি, তিনি যেন এ গ্রন্থখানি দিয়ে তার বান্দাদের প্রভূত উপকার সাধন করেন। যারা তাঁর দ্বীনের প্রচারের কাজে নিয়োজিত এবং তাঁর দাওয়াতকে প্রসারের লক্ষ্যে সর্বদা উচ্চকণ্ঠ, তাঁদের মন ও মগজকে যেন তিনি এর কল্যাণে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এ ভাষণগুলো যিনি দিয়েছেন, যিনি এ উপদেশমালা লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই কীর্তিমান লেখক, আল্লাহর দ্বীনের সেই মহান সংগ্রামী প্রচারক অধ্যাপক আল বাহী আল খাওলীর পক্ষে এ কাজ দুঃসাধ্য ছিল না। কেননা আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি পরিচ্ছন্ন ও নির্মল মন, সূক্ষ্ম বোধশক্তি, আল্লাহর আলোয় উদ্ভাসিত অন্তর, দৃঢ় ঈমান ও গভীর প্রত্যয়ের অধিকারী। আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করুন, তাকে প্রচুর প্রতিদান দিন, তাঁকে ও আমাদের সবাইকে তাঁর সেই প্রিয়তম বান্দাদের বাসস্থানে স্থান দিন—যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, যারা আল্লাহর দল হিসেবে পরিগণিত এবং আল্লাহর দল হওয়ার কারণে কামিয়াব বলে ঘোষিত। আমীন! আল্লাহ আমাদের প্রিয় নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরিজন ও সহচরদের ওপর অফুরন্ত দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন। আমীন!

মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

হাসানুল বান্না

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কেন্দ্রীয় দপ্তর, কায়রো।

১লা রমযান, ১৩৬৩ হিজরী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। দরূদ ও সালাম তার রসূলের ওপর এবং যারা তার আনুগত্য ও অনুসরণ করে তাদের ওপর।

ইসলামের ভালো জ্ঞান রাখেন এমন কিছু সংখ্যক ভাই আমাকে একটা অনুরোধ করেছিলেন ঃ ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কর্মীদের মধ্যে তারা যাতে বিশিষ্ট প্রচারক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন, সে জন্য আমাকে উপযুক্ত উপকরণে সমৃদ্ধ কিছু আলোচনা তাদের সামনে পেশ করতে। তাঁরা নিজেদেরকে "দাওয়াতী বাহিনী" এই চমকপ্রদ নামে আখ্যায়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথমে তো আমি ভেবেছিলাম, অক্ষমতা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নেবো। কারণ অতবড় দায়িত্বের উপযুক্ত জ্ঞান ও প্রতিভা আমার ছিলই না। শেষে মত পাল্টালাম। ভাবলাম, তাঁরা যখন আমার সম্পর্কে এমন উঁচু ধারণা পোষণ করেন, তখন ঠিক আছে, আমি তাদের ধারণার মর্যাদা দেবো। আল্লাহর যতটা ইচ্ছা, আমাকে ও তাদেরকে সাহায্য করবেন। সে মতে আমি ঐ ভাইদের সামনে আলোচনা পেশ করতে লাগলাম। ঐ আলোচনার সমষ্টিই আজ পাঠকদের কাছে হাজির করছি। এমন কি, বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, এটা তাঁদেরই পরিবেশনা। কারণ তাঁরাই আমাকে এ সমষ্টিকে বই-এর আকারে ছাপতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এমনকি এজন্য তাঁরা নিজেদের টাকাকড়িও খরচ করেছেন। উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের হাতেও তা পৌঁছে যাক। আর ইখওয়ানের যে কর্মী ভাইরা আলোচনা পেশ করার সময় উপস্থিত থাকতে পারেননি, তাদের কাছেও তা পেশ করার ব্যবস্থা হোক। এ বক্তৃতামালায় এমন কিছু কথাও থাকতে পারে, যা কারো কারো ভালো লাগবে না। সে জন্য পাঠকের কাছে আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যদি দেখতে পান কোন ভুল কথা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে অথবা কোন দরকারী কথা বাদ পড়ে গেছে, তাহলে তা ভাই-এর অনুভূতি নিয়ে মার্জনা করবেন, এই অনুরোধ রইল।

ওয়াজের উদ্দেশ্যে লেখা বই নয়

আমি শুরুতেই বলে রাখছি, এটা প্রচারকদের ওয়াজে ব্যবহার করার বই নয়। ফলে, ওয়াজের বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও পদ্ধতি এতে নেই। আর সে নিয়ম-কানুনের প্রসঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি আলোচনা আসার কথা, তাও আসেনি। ওয়াজের যেসব কলা-কৌশল আলোচিত হওয়ার কথা, তাও আলোচিত হয়নি। এ পথে যারা নিজেদের স্পৃহা মেটাতে চান এবং মন ও মগজকে সমৃদ্ধ করতে চান, তাদের জন্য এতে কোন খোরাক নেই। এতে আমি যেসব আলোচনা

www.pathagar.com

পরিবেশন করেছি, তাতে বক্তৃতা ও ওয়াজ সংক্রান্ত বই-কিতাবও আমি অনুসরণ করিনি। আমি শুধু লক্ষ্য রেখেছি আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাহ এবং মহতী দাওয়াতী ময়দানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায় সে দিকে। আর আমাদের নেতা ও উস্তাদ (হাসানুল বান্না শহীদ) রহমাতুল্লাহি আলাইহির আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞাজাত কিছু কিছু কথাবার্তা থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছি, সে দিকেও আমি নজর রেখেছি। সুতরাং হে প্রিয় পাঠক, এই যা কিছু হাজির করেছি, তাই যদি পড়বার প্রবৃত্তি হয় তবে পড়ুন। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকুন, এগুলো ভালোভাবে বুঝবার জন্য তিনি যেন আপনার বক্ষকে খুলে দেন এবং এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে সৎ নিয়ত ও নেক ইচ্ছা ব্যপ্ত হয়ে আছে তার বরকতে আল্লাহ যেন আপনার যথার্থ উপকার ও কল্যাণ সাধন করেন।

ওয়ায়েজ ও দাওয়াতদাতার মধ্যে পার্থক্য

এ বইতে পরিবেশিত আলোচনাগুলোতে ওয়াজ বা বক্তৃতার শাস্ত্র ও তার মূলনীতি সন্নিবেশিত না হওয়ায় আমি মোটেই দুঃখিত নই। বরং আমি তাতে খুবই খুশী ও তৃপ্ত। কেননা আমি বক্তাদের বা বক্তৃতার কলাকৌশল শিখতে ইচ্ছুকদের উদ্দেশ্যে এ আলোচনা পেশ করতে চাইনি। আমি চেয়েছি শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে ইচ্ছুকদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে।

বস্তুত বক্তা এবং দাওয়াতদাতা এক নয়। বক্তা শুধু বক্তাই। বক্তৃতা দিতে পারাই তার জন্য যথেষ্ট। আর দাওয়াতদাতা একটা বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী। সেই মতাদর্শের দিকে তিনি অন্যদেরকে আহবান জানান। আহবান জানান লেখার মাধ্যমে। বক্তৃতার মাধ্যমে, সাধারণ কথাবার্তার মাধ্যমে, তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের প্রভাব বিস্তারকারী আচরণ ও কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং আরো যত রকমের প্রচারের পন্থা ও উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা তার পক্ষে সম্ভব তার মাধ্যমে। সুতরাং ইসলামের দাতওয়াতদাতা একাধারে লেখক, বক্তা, আলোচক ও অনুকরণীয় নেতা ও দিশারী। নিজের সমগ্র তৎপরতা ও ব্যক্তিত্ব দিয়েই তিনি জনগণকে প্রভাবিত করেন। আল্লাহর দিকে আহবানকারী সমাজের একজন চিকিৎসকও। তিনি মানুষের মনের ব্যাধির নিরাময়ের চেষ্টা করেন, সমাজের খারাপ অবস্থার তিনি সংস্কার ও সংশোধন করেন, তাই তিনি সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকও ; আল্লাহ যতক্ষণ তাঁকে অবকাশ দেন, তিনি কেবল সংস্কার ও সংশোধনের কাজেই জীবন অতিবাহিত করেন ; সেই সাথে তিনি মানুষের বন্ধু ও সুখ-দুঃখের সাথীও ; ধনী-গরীব ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের দরদী ভাইও। এসব গুণপনার কল্যাণে তার মন থাকে সকলের জন্য ভালোবাসা ও মমত্বে পরিপূর্ণ, তার চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ে করুণা ভরা

www.pathagar.com

চাহনি, মুখে লেগে থাকে সহানুভূতিপূর্ণ কথা আর হাত ব্যস্ত ও ব্যগ্র থাকে আদরের পরশ বুলাতে। এটা ইসলাম প্রচারকের অত্যন্ত জরুরী গুণ। আত্মা ও মনের এ এক অন্যতম যোগ্যতা। একে নিছক প্রিয়ভাষিতা ও বাকপটুতার গুণ বলে আখ্যায়িত করা চলে না। আল্লাহর পথে যিনি মানুষকে ডাকেন তিনি আপন পরিমণ্ডলে একজন নেতাও। আপন পরিবেশে একজন রাজনীতিকও। নিজের মতাদর্শের জন্য এবং তার অনুসারীদের জন্য তিনি একজন দিশারী এবং দিকপালও। যিনি শুধুই ওয়ায়েজ ও বক্তা তার মধ্যে এসব গুণপনার স্ফুরণ ঘটে না। মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও আধ্যাত্মিক আধিপত্য বিস্তার, আল্লাহর সাথে সংযোগ এবং মানুষের অবস্থান্তর ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বিবেক-বুদ্ধির শক্তি আহরণের ক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হয় দাওয়াতদাতা বা প্রচারকের মধ্যে। তাই বলে আমি বক্তৃতা বা ওয়াজের গুরুত্ব ও দাওয়াতের কাজে তার প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখতে চাইছি না। আমি শুধু দাওয়াতকারী বা প্রচারকের কয়েকটা গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে চাইছি—যাতে করে প্রচারকদের নিমিত্ত পেশ করা এ আলোচনাগুলোর প্রকৃতি ও ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতেই দেখা যাবে যে, এ আলোচনাগুলো দাওয়াতকারীদের জন্যই—বক্তাদের জন্য নয়।

আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল

পাঠকের অবগত হওয়া দরকার যে, এ আলোচনাগুলোতে আমি দাওয়াত, দাওয়াতকারী, বক্তৃতা ও বক্তা ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু বলেছি, তার দ্বারা আমি ইখওয়ানের দাওয়াতকেই বুঝিয়েছি—যার পতাকা উত্তোলন এবং পথ ও ঐতিহ্য সৃষ্টি ইখওয়ানের শহীদ ও নজিরহীন নেতা উস্তাদ হাসানুল বান্না রহমাতুল্লাহি আলাইহিরই কৃতিত্ব।

আর কথা যখন ইখওয়ানের ইসলামী দাওয়াতের মধ্যেই সীমিত রেখেছি, তখন নিসন্দেহে সবচেয়ে নিখুঁত, নির্ভুল ও মজবুত ইসলামী দাওয়াতের মধ্যেই আমি আলোচনা সীমিত রেখেছি। কেননা আকাশ ও পৃথিবী যে মহাসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ইখওয়ান সেই মহাসত্যেরই দাওয়াত দেয়। মহাবিশ্বের শাশ্বত রীতিই প্রতিফলিত ও পরিব্যপ্ত সে মহাসত্যে। এ দাওয়াত যে চিরসত্যের কেন্দ্রীয় সত্ত্বা আল্লাহরই দাওয়াত—যে সত্যের দাওয়াত দেয়া একমাত্র তারই নিরংকুশ অধিকার, সে সম্পর্কে আমাদের কোন দ্বিধা ও সংশয় থাকার কারণ নেই। এ জন্য এই গ্রন্থে পাঠক এমন কিছু অধ্যায় পাবেন যাতে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। সাধারণ প্রচারধর্মী ও ওয়াজ নছিহতের বইতে যে ধরনের বিষয়বস্তু পড়তে জনসাধারণ অভ্যস্ত ও উৎসুক থাকে, এ বই তার ধারে কাছেও ঘেষেনি। একজন বক্তা ও ওয়ায়েজ বক্তৃতার

www.pathagar.com

সময় যে ধরনের অঙ্গভঙ্গি করে থাকেন, এ বইতে তা নিয়ে কোন কথাই বলা হয়নি। ওয়ায়েজ ও বক্তার স্বর কেমন উঠানামা করা চাই, তার উচ্চারণের ভঙ্গী কেমন হওয়া চাই, তার শরীরের গঠন ও গুণাগুণ কেমন হওয়া চাই, সেসব এ বইয়ের আলোচ্যে স্থান পায়নি। কেননা আমার মতে ঐ ধরনের বই বা আলোচনা নাট্যমঞ্চের নায়ক ও মেঠো বক্তাদের জন্য হলেই মানায় ভালো। যারা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নামবেন, যাদের কাজ হবে একটা দেশ বা জাতিকে গড়ে তোলা কিংবা গড়ে তোলার কাজে সহযোগিতা করা, তাদের বেলায় এসব মানায় না। কেননা ইসলামের বাণী হলো একটা চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বাণী। হক ও বাতিলের মধ্যে ভেদরেখা টানা বাণী। এ কোন প্রহসন বা তামাসার বস্তু নয়। কথার খই ফুটিয়ে উদ্দাম আবেগ বা বিক্ষোভের জোয়ার সৃষ্টি করে আর যাই হোক—জাতি গড়া যায় না। কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক তৎপরতা দিয়ে জাতির উত্থান ঘটানো যায় না। এ গ্রন্থের কোন কোন অধ্যায়ে আমি পাঠককে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক জগতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করে তুলতে চেয়েছি। আমি চেয়েছি, এভাবে সে নিজের স্বভাব ও প্রকৃতিকে এবং নিজের ভেতরকার জন্মগত মেজাজ ও প্রবণতাকে ভালো করে জেনে নিক। সেটা জানা মোটেই কঠিন নয়। কারণ প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে তার স্বভাব ও প্রবণতা এক একটা খোলা বইয়ের পাতার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মানুষের সত্তায় আল্লাহ জন্মগতভাবে বহু মহৎ জিনিস জমা করে রেখেছেন। তাকে দিয়েছেন সবচেয়ে বড় ও মহৎ লক্ষ্য, দেখিয়েছেন সবচেয়ে নির্ভুল সোজা ও মজবুত পথ-পন্থা, শিখিয়েছেন সবচেয়ে দামী ও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব। এগুলো তাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর যোগ্য বানায়, তার মর্যাদা সমুন্নত করে।

আল্লাহর নিবেদিত বান্দা

প্রিয় ভাই, জেনে রাখুন, মানুষ মাত্রেরই সত্তায় তা সে যে ধরনের মানুষই হোক না কেন—আল্লাহর দেয়া বহু মহৎ গুণ ও প্রতিভার সমাবেশ ঘটে থাকে, বহু অমূল্য যোগ্যতা, দুর্লভ বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের উৎস তার ভেতরে সুপ্ত থাকে। সেগুলো তার মানবতাকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে দিতে ও তার ব্যক্তি সত্তায় নতুন জীবনী শক্তির সঞ্চার করতে সক্ষম। কিন্তু সেই লুকানো গুণগরিমা ও সুপ্ত প্রতিভাকে জাগাতে হলে প্রয়োজন সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর নামের জীয়নকাঠি। শুধুমাত্র আল্লাহর নামই ঐসব খোদায়ী গুণ ও প্রতিভার রুদ্ধদ্বার খোলার একমাত্র চাবিকাঠি। আর আল্লাহ সে চাবি শুধুমাত্র সেই বান্দার হাতে অর্পণ করেন—যিনি আল্লাহর পরম অনুগত, যিনি আল্লাহর পছন্দনীয় মহৎ গুণাবলীর অধিকারী, যিনি নিজের প্রবৃত্তির সাথে যথাযথভাবে সংগ্রাম করেন এবং প্রবৃত্তিকে কঠোর হাতে দমন করে আল্লাহর পসন্দসই বীরত্বের গৌরব অর্জন করেন ও তাঁর মনোনীত কাজের ক্ষমতা আয়ত্ব করেন।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

"যারা আমার জন্য সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো। বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই থাকেন।"
—(সূরা আল আনকাবূত ঃ ৬৯)

এ আয়াতের বাস্তব ও কার্যকর তফসীর পাওয়া যাবে সেই গৌরবান্বিত ও ভাগ্যবান মানুষদের জীবনে—যাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎকালীন সমাজ থেকে খুঁজে বের করে এনেছিলেন। তারপর তাদেরকে আল্লাহর স্বীকৃত বীর হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তারা সহজেই দুনিয়ার বহু দেশ জয় করতে পেরেছিলেন, কেননা তার আগে তারা মানুষের হৃদয় জগত জয় করে নিয়েছিলেন। তারা আগে মানুষের অন্তরাত্মায় সত্যের সূর্য উঠিয়ে আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন বলেই সমগ্র দুনিয়ায় সে আলো ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তারা দেশ থেকে দেশে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং সেবাবৃত্তির মত অমূল্য নেয়ামত পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছিলেন, কেননা তার আগে তারা বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে ঐ গুণাবলীর ঝর্ণার মুখ খুলে দিয়ে প্লাবিত করে ফেলেছিলেন। তারা কালজয়ী সৎকর্ম, মহৎ চরিত্র ও মহান আদশর্কে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী করে রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ফলে মানুষের মনোজগতে ও বস্তুজগতে তারা এমন সব দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, যার নজির স্থাপন করতে সমসাময়িক জগতের মহানায়কেরা পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল এবং যা রূপকথার মতই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছিল। এটা তারা করতে পেরেছিলেন শুধু এ জন্যই যে, তারা এত উচ্চ সংকল্প ও হিম্মতে উজ্জীবিত ছিলেন যে, যা আল্লাহর আরশ ছাড়া আর কোন কিছুর নীচে থেমে থাকতে রাজী ছিল না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উচ্চ সংকল্পের কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, ঈমান নামক বস্তুটি যদি সুরাইয়ার (সবচেয়ে দূরবর্তী নক্ষত্র) কাছেও অবস্থিত হতো তবে তাঁদের মধ্যকার কিছু লোক সেখান থেকেও তা পেড়ে এনে তবে ছাড়তো।

প্রিয় দ্বীনি ভাই ! ভেবে দেখুন তো, সেই মহামানবদের সাথে আজকের যুগের এসব বিকারগ্রস্ত, পথভ্রষ্ট ও আত্মপ্রতারিত লোকদের কী তুলনা হতে পারে ? এরা ইউরোপকে যেই দেখলো ভৌগলিক স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদ নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছে, অমনি তারা বানরের মত তার অন্ধ অনুকরণ শুরু করে দিল। আর অনুকরণ করতে গিয়ে তারা এমন সব

www.pathagar.com

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ রচনা করে নিল—যার ধ্বনি ও ধুয়ার আড়ালে কেবল বাতিল কামনা ও বাসনাই লুকিয়ে থাকে। ইউরোপের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে তারা এমন সব সমিতি ও সংগঠন গড়ে তুললো যার লক্ষ্য সম্পদ কুক্ষীগত করা আর ঘুষ ও দুর্নীতির আস্কারা দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এ কাজ করার সময় তাদেরকে সভা ও সম্মেলন করা ছাড়া আর কিছুই করতে দেখা যায় না। তাদের বোলচালে বাহ্যত ধোঁকাবাজী আর ধাপ্পাবাজীর চাকচিক্যময় খোলস থাকলেও ভেতর থেকে তা অন্তসারশূন্য। তাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক কিংবা বিবেকের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ কোন বক্তব্য নেই। ফলে তারা একেবারেই রিক্ত, দেউলে ও মূল্যহীন হয়ে যায়। না থাকে তাদের কাজের কোন দাম, না থাকে তাদের কথার কোন গুরুত্ব।

ইখওয়ানের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য নয়

আমি এ বই দ্বারা ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কৃতিত্ব জাহির করতে চাইছি না। কেননা নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করা যে অনুচিত, তা বুঝার মত বুদ্ধিমত্তা এ সংগঠনের লোকদের আছে। কেনই বা থাকবে না ? তারা তো কুরআনের এ আয়াত নিয়তই পড়ে থাকে ঃ

اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ط بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ

"তুমি কি তাদের কথা ভেবে দেখেছ, যারা নিজেদের কৃতিত্ব নিজেরাই জাহির করে বেড়ায় ? আসলে আল্লাহরই শুধু এ অধিকার রয়েছে যে, যার কৃতিত্ব ঘোষণা করা তিনি পছন্দ করেন, তারই কৃতিত্ব ঘোষণা করবেন।"
—(সূরা আন নিসা ঃ ৪৯)

কুরআনে আরো আছে ঃ

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ط هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ○

"অতএব তোমরা নিষ্পাপ হবার গর্ব করো না। আসলে কে গুনাহ এড়িয়ে চলে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।" —(সূরা আন নাজম ঃ ৩২)

ইখওয়ানীদের কর্মসূচীর পক্ষেও কোন সার্টিফিকেট দেয়া আমার অভিপ্রায় নয়। কেননা তারা কোন নতুন কর্মসূচী হাজির করেননি। সে কর্মসূচী বহু পুরনো। আল্লাহ নিজেই তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষকে সেই কর্মসূচীর দিকেই আহবান জানাতে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ قف عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ (يوسف : ١٠٨)

www.pathagar.com

"বল, এ হচ্ছে আমার পথ যে, আমি আল্লাহর দিকেই ডাকতে থাকবো। আমি ও আমার অনুসারীগণ খুব ভালো করে বুঝেসুজেই এ পথ গ্রহণ করেছি। আল্লাহ পবিত্র। আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না।"

—(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৮)

আর আল্লাহর এই পথের দিকে ডাকা তাদের কোন কৃতিত্ব নয় বরং এটা তাদের ওপর আল্লাহরই মেহেরবানী (যে এ পথে তারা আছেন ও অন্যদের ডাকতে পারছেন) আল্লাহ তার এ মেহেরবানী স্বীকার করতে শিক্ষা দিয়েছেন এই বলে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا ۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এই সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি না দেখালে আমরা এ পথ পেতাম না।"

—(সূরা আল আরাফ ঃ ৪৩)

আমি তাদের বক্তব্যের পক্ষেও সনদ দিতে চাই না। কেননা তাদের বক্তব্য এই দায়াতেরই প্রাপ্য আদায়ে এবং তারই উদ্দেশ্য পূরণে নিয়োজিত এবং শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর উৎস থেকেই তার উৎপত্তি। সে বক্তব্যের স্বপক্ষে আল্লাহ নিজেই সনদ ঘোষণা করেছেন এই বলে ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ (حم السجدة : ٣٣)

"সেই ব্যক্তির চেয়ে সুন্দর কথা আর কে বলবে যে আল্লাহর দিকে ডাকে, ভালো কাজ করে এবং ঘোষণা করে দেয় যে, "আমি আল্লাহর দ্বীনের কাছে নিজেকে যারা সপে দেয় তাদের দলভুক্ত।"

—(সূরা হা-মীম আস সিজদা ঃ ৩৩)

গোড়ামীর অবকাশ নেই

উপরে যা কিছু উল্লেখ করলাম তা থেকে আমাদের মত ও পথ এবং আমাদের বিরোধীদের মত ও পথ স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, আমাদের মত ও পথই সঠিক এবং আমাদের বিরোধীদের মত ও পথ বাতিল, অসার ও মূল্যহীন। একথা সুনিশ্চিত যে, হকের বাইরে বাতিল ছাড়া আর কিছু থাকে না। এ জন্য আমি বাতিলের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছি। সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত কোনভাবেই তা নিয়ে আলোচনা করিনি। এই আলোচনা না করাকে কোন যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো চাই না, আসলে বাতিলের কোন যুক্তিই থাকে না। এখানে সত্যের দাওয়াত ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করেছি, বিরোধীদের ভ্রান্ত মতাদর্শ খণ্ডন করার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

আমার আলোচনার মধ্যে কোথাও কোথাও এমন কিছু কথাবার্তা থাকবে যা বাহ্যত এই ধারণা দেবে যে, আমি ইখওয়ান সম্পর্কে গোড়ামীতে লিপ্ত। আসলে কিন্তু গোড়ামী নামক বস্তুটা আমার মনে আদৌ পাত্তা পায়নি যেমন সেটা আমাদের বিরোধীদের মনেও প্রশ্রয় পায় না। অবশ্য একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, একটা সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী দল হিসেবে ইখওয়ানের ব্যাপারে আমি যথার্থই গোঁড়া—একটা বিশেষ ছাপ ও রূপ কাঠামোর অধিকারী সংগঠন হিসেবে নয়। আসলে তো আমরা একটা আদর্শ ও চিন্তাধারারই প্রতিনিধি। আমরা নিছক একটা সংগঠন নই। যে আদর্শের আমরা প্রতিনিধি তা অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। তার ব্যাপকতা ও বিশালতা আসমান ও জমীনের সীমানা পেরিয়ে বিরাজমান। কেননা তা আল্লাহর নির্দেশে জন্ম নেয়া একটা প্রাণশক্তি বিশেষ। কাজেই তাকে কোন নির্দিষ্ট গণ্ডী কিংবা বিশেষ ছাপ ও রূপ কাঠামোর মধ্যে সীমিত রাখার কোন অবকাশ নেই। এ আদর্শের প্রতিনিধি হবার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে গোটা মানব জাতিকে এবং সেটাই আল্লাহর কাম্য। সুতরাং এর প্রতিনিধি যারা হবে তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা আমাদের নেই, আমরা কোন সীমাবদ্ধ সংস্থার কাঠামোর আওতাভুক্তও তাকে করতে পারি না। আল্লাহর শোকর যে, বাহ্যিক রূপ ও আকৃতি কিংবা সংকীর্ণ গণ্ডীর প্রতি অন্ধ গোড়ামীর দোষ থেকে আমরা মুক্ত। আমাকে যদি গোড়ামীতে লিপ্ত মনে করা হয় তবে সেটা এই অর্থেই ধরে নিতে হবে যে, সেটা অকাট্য সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু নয়। সেটা এমন এক ব্যক্তির অদম্য ও অটল বিশ্বাস যে নিজেকে নিশ্চিত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার বিরোধীকে নিশ্চিত বাতিলের অনুগামী মনে করে। শাশ্বত সত্যের এই দাওয়াতের মৌলিক উপাদানের বিপরীত যে কোন অভিমতকে সে মানবে না—তা সে যত যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তাকে হতভম্ব করে দেয়া হোক না কেন—একথা আগেভাগেই ব্যক্ত করে দেয় বলেই এটা তার গোড়ামী বা একগুয়েমী হিসেবে আখ্যায়িত। কেননা যে ব্যাপারে আল্লাহ তার সুস্পষ্ট বিধান ঘোষণা করে দিয়েছেন, সে ব্যাপারে কোন মানুষের মতামত গ্রহণ করতে সে প্রস্তুতই নয়। এটা হলো আসলে আমাদের আদর্শের প্রতি আমাদের ঈমানেরই লক্ষণ। অজ্ঞতার কারণেই কেউ কেউ একে গোঁড়ামী বলে থাকেন আর আমরাও তাদের সাথে তাল মিলিয়ে ও তর্কের খাতিরে একে গোঁড়ামী বলে নামকরণ করেছি। আল্লাহর কাছে এটাই আমাদের দোয়া যে, তিনি যেন আমাদের সবাইকে সত্যের ওপর অবিচল রাখেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। এবং আমাদেরকে তার কর্মী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি যথার্থই একান্ত ঘনিষ্ঠ সত্তা এবং দোয়া কবুলকারী।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

দাওয়াত ও দাওয়াতকারী সম্পর্কে সঠিক বুঝ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দুই রকমের বুঝ নিয়ে সমস্যা

সত্য দ্বীন ইসলাম হলো তাওহীদের সেই মহান দাওয়াতেরই আর এক নাম যা নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইসলামই হবে সমগ্র মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনের জন্য সর্বকালের এবং সকল স্থানের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বিধান বা ব্যবস্থা।

এ একটা সুস্পষ্ট ব্যাপার। সূর্যের মত একটা দিব্য সত্য। এর সামনে বা পেছনে বাতিলের গোজামিলের কোন অবকাশ নেই। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান দ্বারাই এর অকাট্যতা বুঝা যায়। এমনকি আমাদের সত্তায় এ সত্যের উপলব্ধি এতটা স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছে যে, তা কোন যুক্তি প্রমাণেরও অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও কিছু নামধারী মুসলমানের কাছে এটা একটা দুর্বোধ্য রহস্য হয়ে আছে। এ সত্যটা তাদের কাছে পুরনো বাসি ব্যবস্থা এবং জং ধরা ও অচল আদর্শ। তাদের নজরে এই ব্যবস্থা ও আদর্শকে আকড়ে ধরা লোকেরা চলমান বিশ্ব থেকে পিছিয়ে পড়া একটা গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত —যারা সভ্য রীতিনীতির সাথে তাল মিলিয়ে ও তার পরিবর্তনশীল অবস্থার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলতে পারে না। এ ধরনের কোন লোক সম্পর্কে তাদের কেউ যদি খুব বিশুদ্ধ মতও পোষণ করে তবে সেটা এই রকমই হবে যে, তাকে 'গোঁড়া ধার্মিক' বলে রায় দেবে। এভাবে কোন জিনিসের অতিরঞ্জিত মূল্যায়ণ করাটাই যেন তাদের কাছে একটা বাহাদুরীর কাজ এবং সে জন্য তাদের মধ্যে বেশ উৎসাহও দেখা যায়।

তাওহীদের তত্ত্ব সম্পর্কে এই হলো দু'টো বিপরীত উপলব্ধি। একটা উপলব্ধি একে গ্রহণ করে ও স্বীকৃতি দেয়। অপরটা তা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে। এই দুই উপলব্ধির মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয়, সেটাই এখন প্রশ্ন।

এক্ষুণি আমরা এর চূড়ান্ত জবাব দিতে চাই না। তবে একটা অকাট্য সত্যের ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত দিতে চাই। সেটা এই যে, ঐ সকল লোক আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান নয় এবং আমরা তাদের চেয়ে কম বুদ্ধিমান নই। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি তাদের চেয়ে বড় কিংবা তারা আমাদের চেয়ে বড় হয়ে থাকে তবে সেই বড়ত্বের পরিমাণ এত বেশী নয় যে, তা আমাদেরকে ও তাদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টো গোষ্ঠীতে পরিণত করতে পারে এবং দুই বিপরীত মেরুতে নিয়ে দাঁড় করাতে পারে। আরো একটা বাস্তব সত্য এই যে, আমরা

www.pathagar.com

আল্লাহর মেহেরবানীতে নিজেদের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও প্রতিভাগুলোকে জাগ্রত ও জীবন্ত অবস্থায় বহাল রাখার জন্য নিরন্তর চেষ্টা ও সাধনায় নিয়োজিত আছি। আমরা এমন দাবী করি না যে, আমরা সাফল্যের লক্ষ্য বিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছি। তবে আমরা অব্যাহত সাধনা চালিয়ে যাচ্ছি। বস্তুবাদের সর্বগ্রাসী ঢেউ যাতে আমাদের ঐ সব আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও প্রতিভাগুলোর ওপর হামলা চালিয়ে তার রুচি ও বোধশক্তিকে বিনষ্ট করে দিতে না পারে, সে জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচ লাভের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টায় তৎপর আছি। কিন্তু আমাদের নিন্দুকেরা এ ধরনের কোন চেষ্টা ও সাধনার দাবীদার নন। বরং তারা তামাদি হয়ে যাওয়া তথাকথিত সভ্যতার তিতো মিটে ও ভালো-মন্দ যাই থাক, তা-ই ভোগে মত্ত থাকাতেই ষোলআনা সন্তুষ্ট। এখন পাঠক নিজেই বুঝে নিতে পারেন আমাদের ও তাদের মধ্যে এই সত্যটার উপলব্ধিতে যে বিরোধ ও বৈপরিত্য দেখা দিয়েছে, তার প্রকৃত কারণটা কি?

মতবিরোধের কেন্দ্রবিন্দু

বস্তুত এই জিনিসটাই হলো বিরোধ ও বিভেদের কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামকে যারা সমগ্র জীবনের জন্য একটা পরিপূর্ণ বিধান হিসেবে মানে না ও বোঝে না, তারা আত্মা ও বিবেকের স্থবিরতায় ভুগছে। বাতিল সভ্যতার গড্ডালিকা প্রবাহের প্রচণ্ড তোড়ে তাদের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও প্রতিভা ঢাকা পড়ে গিয়ে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। তাদের এই নিষ্ক্রিয় বোধশক্তিকে সম্বোধন করে যত ওয়াজ ও নিছহত করা হোক না কেন, ইসলামের আকীদা, বিশ্বাস ও বিধি-ব্যবস্থা যে সঠিক, সে কথা তাদের কিছুতেই বুঝে আসবে না। ওয়াজ ও নিছহত তারা শুনলেও বুঝবে না, বক্তার দিকে চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকলেও অন্তর্চক্ষু দিয়ে তাকে দেখতে পাবে না। এদের এই অবস্থা সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন:

وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

"তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যারা তোমার কথা শুনবে, কিন্তু আমি তাদের মনের ওপর ঢাকনা চাপিয়ে দিয়েছি যেন তা বুঝতে না পারে এবং কানের ওপর ভারী বোঝা চাপিয়ে রেখেছি। (ফলে) সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখলেও তাদের ঈমান আসবে না। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁরা তোমার সাথে তর্কে লিপ্ত হয় তখন কুফরীর সিদ্ধান্ত যারা নিয়েছে তারা বলে যে, এতো প্রাচীন লোকদের কাহিনী।"-(সূরা আল আনআম: ২৫)

www.pathagar.com

আমরা একথা বলছি না যে, তাদের বিবেক আচ্ছন্ন বলে তারা কিছু বোঝে না বরং তাদের মন বিপরীত ধ্যান-ধারণায় নিয়োজিত ও বিভ্রান্ত হবার কারণে তার বুঝার ক্ষমতা রহিত বলেই তারা বোঝে না। কেননা এই মনই হলো বিশ্বাস ও ঈমানের কেন্দ্র।

বস্তুত আকীদা ও বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মতাদর্শ, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ—এ সবের বুঝ মানসিক অভিরুচী, অনুভূতি ও উপলব্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ বুঝ গণিতের বুঝ নয় যে, ধরাবাধা নিয়মের মানদণ্ডে অংক কষে দিলেই হলো। এটা সেই বুঝ নয় যা প্রাকৃতিক বোধশক্তি দিয়ে অর্জিত হয়, যা সৃষ্টির বিভিন্ন দ্রব্য, তার উপাদানসমূহ, তার শক্তি ও গুণাগুণ এবং তার ব্যবহার বিধি জানতে সাহায্য করে। বরং এখানে বুঝ বলতে স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া অথবা মানসিক অভিরুচিই বুঝায় অথবা এমন তীব্র প্রজ্ঞাকে বুঝায় যা হককে সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসে এবং বাতিলকে সবচেয়ে ঘৃণা করে।

ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি

মানুষের দু' রকম বুঝ বা উপলব্ধি রয়েছে। একটা হলো ইন্দ্রিয়জাত। অনুভূতি শক্তির সাহায্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই বুঝ সম্পন্ন করে। আমাদের আশ-পাশে আসমান ও জমীনের যত জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে বলে আমরা অনুভব করতে পারছি, সে সবের উপলব্ধিই হলো ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধি। আর অপরটা হলো চিন্তাজাত উপলব্ধি—যা বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার সাহায্যে অর্জিত হয়। একে এক কথায় 'চিন্তা'ও বলা হয়। সৃষ্টিজগতকে তদীয় স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বলে বুঝতে পারলেই এই বুঝটা অর্জিত হলো বলা যায়। অর্থাৎ সৃষ্টি-জগতের যে দিকটা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত ও নেহাৎ বস্তুগত, সে দিকটার উপলব্ধিই হলো ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধি। আর ঐ সৃষ্টিজগতের আভ্যন্তরীন দিক বা রূপ উপলব্ধি করার নাম হলো চিন্তাগত উপলব্ধি। সৃষ্টিজগতকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করার পর এটাও হৃদয়ঙ্গম করা চাই যে; এর পেছনে এক মহাগুণী ও মহাকুশলী স্রষ্টা রয়েছেন যার গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে সর্বশক্তিমানতা, সর্বজ্ঞতা, অসীম বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতা, অফুরন্ত দয়া, মহানুভবতা, প্রেম ভালোবাসা ও অন্যান্য অসংখ্য গুণাবলী। বুঝা চাই যে, এ সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বই সেই মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এক ঃ এই উভয় রকমের বুঝ অর্জিত হলেই মানুষের বুঝ পূর্ণাঙ্গ হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত ও চিন্তাজাত—উভয় রকমের যুক্তির সাহায্যে তা পূর্ণতা লাভ করে। ইন্দ্রিয়জাত যুক্তির উপাদান হলো সৃষ্টিজগতের সেই সকল বস্তু—যা ধরা-ছোয়ার আওতাভুক্ত, সেই সকল বস্তুর তৈরীর উপকরণসমূহ, তার বৈশিষ্ট্য

www.pathagar.com

বা স্বভাব, তার নিয়ম-কানুন, ব্যবহার বিধি এবং তার সাহায্যে আমাদের ইহকালীন জীবন ও অর্থনৈতিক জীবন গড়ার পন্থা সংক্রান্ত জ্ঞান।

আর সৃষ্টিজগতের সাহায্যে স্রষ্টাকে (আল্লাহকে) চেনার যুক্তি হলো এই যে, সৃষ্টিজগত আল্লাহর গুণবৈশিষ্ট্যের নিদশর্ন। চিন্তাশক্তি যখন ঐ নিদর্শনগুলোকে দেখে, তখন সে কোন বস্তু দেখে না, বস্তুর রং দেখে না কিংবা অনুরূপ কোন ধরাছোয়ার যোগ্য জিনিস দেখে না। সে দেখে একটা মানসিক বা আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রকে—যার মাধ্যমে তার মন কখনো স্রষ্টার বিশালত্ব ও মহত্বকে এবং তাঁর স্বরূপকে উপলব্ধি করে, কখনো উপলব্ধি করে স্রষ্টার অসীম ক্ষমতা ও শক্তিমত্তাকে কখনো তার দয়াশীলতা ও মমত্বকে এবং কখনো তার কল্যাণময়তা, বদান্যতা, ভালোবাসা, মহানুভবতা, সদাচার ও অন্যান্য উলুহিয়াতের গুণ ও তার তাৎপর্যকে। এ সময়ে তার মনে আধ্যাত্মিক স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের এক আলাদা সত্ত্বা গড়ে ওঠে—যা আল্লাহর গুণাবলীর নিদর্শনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিটি উলুহিয়াতের গুণের সাথে সংগতিশীল পবিত্র মানবীয় গুণেরও সমন্বয় ঘটে থাকে। উক্ত গুণাবলীর বুঝ সম্পন্ন এই সুমহান সত্ত্বা বা এই চমকপ্রদ আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আল্লাহকে আমরা কতখানি চিনলাম তার নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত। একেই আমরা ঈমান ও আকীদা নামে আখ্যায়িত করে থাকি। মানবিক মূল্যবোধ, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের এটাই মূল উৎস। মানুষের বিবেককে মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। কেননা বিবেকই তাকে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ তা বলে দেয়। ফলে সে হককে সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসে এবং সবচেয়ে ঘৃণা করে বাতিলকে। আল্লাহ সে কথাই বলেছেন সূরা হুজুরাতের সাত নং আয়াতেঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ط

“আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন, তোমাদের অন্তরে তাকে সুসজ্জিত করে তুলে ধরেছেন এবং কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন।” —(সূরা আল হুজুরাত ঃ ৭)

এই বিবেকই মানুষের মন থেকে পারস্পরিক বিদ্বেষ, হিংসা, লোভ, অহংকার ও দুর্নীতি দূর করে। এই বিবেক তাঁর ইচ্ছা শক্তির ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে আর তাকে হক, ন্যায়নীতি, কল্যাণকারিতা, পরোপকার এবং জীবে দয়া ও ভালোবাসার মনজিলে মকসুদে পরিচালিত করে। এই বিবেকের তাগিদেই আমাদের মনে আল্লাহর পরিচিতি ও ভক্তি জাগে। ফলে মন কখনো মরে না বা

www.pathagar.com

শিথিল হয় না। আল্লাহর ঐ পরিচয় মনে রেখে তার তাগিদ, দাবী ও যুক্তি অনুসারেই মানুষ কাজ করে। বস্তুত আধ্যাত্মিক যুক্তি প্রমাণ বলতে আমরা একথাই বুঝি।

এরপর ? এরপর মানুষের চিন্তাজাত বুঝ বা উপলব্ধি তার যাবতীয় অতিন্দ্রীয় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তথ্য ও উলুহিয়াতের গুণবৈশিষ্ট্য সহকারে ইন্দ্রিয়জাত বুঝ বা উপলব্ধি ও যুক্তির ওপর প্রবল ও পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আর পরাক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি ও উপলব্ধি তার সকল ক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে সাথে নিয়ে সেই সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হয় যাকে আধ্যাত্মিক যুক্তিতে ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য এবং কল্যাণ ও সুবিচারমূলক লক্ষ্য বলে আগেই চিহ্নিত করা হয়েছে। জগত ও জগত প্রভু আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম নমুনা। আর তার প্রতি যথার্থ ঈমান থাকলে সম্পর্কটা এ রকম না হয়ে পারে না।

দুই ঃ মানুষের চিন্তাজাত বুঝ ও ইন্দ্রিয়জাত বুঝ—দু'টোই যখন সুস্থ ও নিটোল থাকে তখনই উপরোক্ত অবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়জাত বুঝ যখন সক্রিয় ও তৎপর হয় এবং চিন্তাজাত বুঝ কোন কারণে নিষ্ক্রিয় হয় কিংবা পেছনে পড়ে যায়, তখন তার চোখে আধ্যাত্মিক যুক্তি ও প্রমাণ বুঝার মত অন্তর্দৃষ্টি থাকে না। নিছক বস্তুগত অনুভূতির আওতাধীন যুক্তি ছাড়া সে আর কোন যুক্তিই বোঝে না। বস্তুগত অনুভূতি তো অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া আর কোন ব্যাপার উপলব্ধি করেই না। অনুরূপভাবে, চিন্তাজাত বুঝ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে স্বভাবতই ইন্দ্রিয়জাত বুঝের ওপর তার কোন প্রভাব প্রতিপত্তিই বজায় থাকে না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্ট খায়েশ ও কামনা ছাড়া তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয়কারী আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এমতাবস্থায় সে কুরআনের এই আয়াতটার বাস্তব উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় ঃ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ط فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ط أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে স্বীয় প্রবৃত্তির কামনা ও বাসনাকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ তা জানেন বলেই তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, তার কান ও মনে সিল মেরে ও চোখে ঢাকনা রেখে দিয়েছেন ? আল্লাহই যখন তাকে হেদায়াত করলেন না তখন আর কে করবে ? তোমরা কি মোটেই বুঝ না।—(সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৩)

www.pathagar.com

বস্তুত এ ধরনের লোকেরা আধ্যাত্মিক ও অদৃশ্য বিষয়াবলীর অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না। এ জন্য বস্তুবাদী ও ইন্দ্রিয়বাদীরা নাস্তিকতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারা বলে ঃ ধর্ম একটা বাজে ধারণা বা কুসংস্কার।"

সুতরাং যারা ইসলামকে ও তার আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে স্বীকার করে না তারা এই শ্রেণীরই লোক। শুধু চোখে দেখা যায়, হাতে ধরা বা ছোঁয়া যায় এবং স্নায়ুমণ্ডলী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুভব করা যায়—এমন জড় পদার্থই তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। এর বাইরে যা কিছু, তাকে তারা অস্তিত্বহীন বলেই মনে করে। এ ধরনের জিনিসকে স্বীকার করা বা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ঝামেলা থেকে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে তারা মুক্ত রাখতে চায়। বিশ্বজগতের সাথে তাদের সম্পর্ক উপলব্ধির এটাই শেষ সীমানা। এর বেশী তাদের ধারণাতেই আসে না। আল্লাহ্ একথাই বলেছেন সূরা নাজমে ঃ

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ ذٰلِكَ
مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ط

"যারা আমার স্মরণ থেকে মুখ ফেরায় এবং দুনিয়াবী জীবনই যাদের একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য, তাদেরকে তুমিও এড়িয়ে চল। কেননা ঐ দুনিয়া পর্যন্তই তাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ।"—(সূরা আন নাজম ঃ ২৯-৩০)

এ জাতীয় লোকেরা কখনো ঐশী বাণী কানে তুলতে এগিয়ে আসবে না। সে যোগ্যতাই তাদের নেই। তাদের মনে ও মানসিকতায় এ ধরনের কোন দাওয়াত গ্রহণ করার অবকাশই নেই। যারা এ দাওয়াত দেন তারা এক জগতের লোক। আর এরা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের লোক। উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا
مَّسْتُوْرًا ۝ لا وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝

"তুমি যখন কুরআন পড় তখন আমি তোমার মধ্যে ও যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক গোপন পর্দা আড়াল করে দেই। তাদের অন্তরকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেই যেন তা বুঝতে না পারে আর তাদের কানে ভারী বোঝা চাপিয়ে দেই। তুমি যখন কুরআনে তোমার একমাত্র প্রভুর কথা উল্লেখ কর তখন তারা ঘৃণায় নাক সিটকাতে সিটকাতে দূরে পালিয়ে যায়।"—(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৫-৪৬)

www.pathagar.com

এটা ধারণা করা উচিত নয় যে, তারা কুরআনের অর্থ বুঝে না। হয়তো বুঝে কিন্তু সে বুঝ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সে বুঝ আন্তরিক নয়। কুরআনে যে 'মন দিয়ে বুঝা'র কথা বলা হয়েছে সেই বুঝ তারা বুঝে না।

যদি বলা হয় "আল্লাহ এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তিনিই আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন এবং সে জন্য তিনিই আমাদের শোকর, সম্মান ও প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী"—তাহলে হয়তো তা তারা মেনে নেবে। একথাও হয়তো মেনে নেবে যে, "মানুষের একটা দেহ ও একটা আত্মা আছে এবং শরীরের মত আত্মারও কিছু চাহিদা আছে। পূর্ণাঙ্গ মানুষ সে-ই যে এই উভয় দিকের চাহিদা ভারসাম্য সহকারে পূর্ণ করে, অধিকারগুলো যথার্থ পাওনাদারদের দিয়ে দেয় এবং একটাকে বঞ্চিত করে অন্যটাকে দেয় না।" আর একথাও হয়তো তারা স্বীকার করবে যে, এ ধরনের একটা পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য ঘোষিত হয় যে বাণীতে, সেটাই নির্ভুল বাণী এবং সেটাই বিশ্ব-জগতের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ও নিয়মের সাথে সংগতিশীল ঘোষণা। আর সেই বাণীই মানব জাতিকে গোমরাহী, বিভ্রান্তি এবং চিন্তাশক্তিকে নির্জিব ও বন্ধ্যাকারী মানসিক যাতনা ও বৈকল্য থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে।

বস্তুগত যুক্তি বনাম আধ্যাত্মিক যুক্তি

উপরোক্ত বাণী তারা বুঝতে পারে বটে তবে তা শুধু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিভিত্তিক নিছক। বস্তুতান্ত্রিক যুক্তির আলোকেই বুঝবে,—মনস্তাত্বিক ও আধ্যাত্মিক যুক্তির আলোকে নয়। প্রথমোক্ত যুক্তিটা হলো প্রাকৃতিক ও গাণিতিক যুক্তি। এর মাধ্যমে মানুষ যে বুঝ পায় সেটা মন্দা প্রকৃতির, নিস্তেজ ও নেতিবাচক বুঝ। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তিটা হলো মনস্তাত্বিক ও আধ্যাত্মিক। এ যুক্তি অনুসারে সে যা কিছু বুঝতে পারে তা পরম উদ্দীপনা, উৎসাহ, কৌতুহল ও ইতিবাচক গ্রহণের মনোভাব নিয়েই বুঝতে পারে। আসমানী বাণীগুলোকে বুঝতে এই শেষোক্ত যুক্তিরই আশ্রয় নেয়া দরকার। বস্তুত আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিই তার সামনে মনোজগতের দুয়ার খুলে দেয়। এ যুক্তি দিয়েই সে স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে। এর সাহায্যেই তার অন্তরের অন্তস্থলে স্থান পায় আল্লাহর হেদায়াত। স্নায়ুর তন্ত্রীতে তা বাজায় জাগরণ ও দৃপ্ততার সুর এবং রক্তের প্রতি কণিকায় তা ছড়িয়ে দেয় সজীবতা ও প্রাণোজ্জ্বলতার ঢেউ। এ কারণে আল্লাহর হেদায়াত তার বহিঃসত্তায় ও আভ্যন্তরীণ সত্তায় নিজের অক্ষয় ছাপ রেখে দেয়। ফলে আসমানী হেদায়াতের প্রতিফলন ও বাস্তব রূপায়ণ ঘটে তার কাজে, কথায়, চিন্তায়, সংকল্পে, ধ্যান-ধারণায় ও মনোভাবে, মানসিক প্রবণতায় ও খেয়াল খুশীতে।

www.pathagar.com

এভাবে আল্লাহর হেদায়াত মানুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়—মানুষ আল্লাহর হেদায়াতকে নিজের ইচ্ছাধীন করে নেয় না। আল্লাহর দ্বীন ও হেদায়াতের খাতিরে ও তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই সে বেঁচে থাকে। সে বেঁচে থাকে এই দ্বীনের মর্যাদা রক্ষার গৌরব অর্জন এবং একে সমুন্নত ও বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে। এই পথে নিজের সম্পদ, আরাম-আয়েশ, সময়, প্রতিভা ও যোগ্যতা, প্রাণ ও রক্ত—এক কথায় যথাসর্বস্ব বিসর্জন দেয়ার লক্ষ্যে। আর একে সে পরম সৌভাগ্য ও মহাসাফল্য বলে মনে করে ও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। এ ধরনের বুঝ লাভ করাকেই আকায়েদ বিশারদদের ভাষায় "মন দিয়ে বিশ্বাস করা" বলা হয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা তর্কশাস্ত্রীয় কূটতর্ক এমন গৌরবজনক সুফল এনে দিতে কখনো পারে না। মন ও বিবেকের ওপর এমন চূড়ান্ত আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতাই তার নেই। আসলে এ ক্ষেত্রে প্রশ্নটা বিবেক ও বুদ্ধির বুঝা না বুঝা এবং মানা না মানার নয়। প্রশ্নটা হলো আল্লাহর আহবানে মনের সাড়া দেয়া বা না দেয়া। সম্মতি প্রকাশ করা বা না করা এবং স্বীকার বা অস্বীকার করার। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ○

"আমি জানি, তাদের কথাবার্তা আপনাকে পীড়া দেয়। আসলে তারা তো আপনাকেই শুধু মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে না বরং তারা আল্লাহর বাণীকেই অস্বীকার করে।"—(সূরা আল আনআম ঃ ৩৩)

এবারে আমরা সেই প্রশ্নটায় ফিরে আসবো যা এ অধ্যায়ের শুরুতে পড়েছিলাম। তাহলো ঃ উল্লিখিত দুই রকমের বুঝের কোন্‌টা অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য ? সত্য যে স্পষ্ট হয়েই উঠেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে বলে আমাদের মনে হয় না। আর যারা আজ আমাদের দাওয়াতকে অস্বীকার করছে, তারা কোন রহস্যময় বা দুর্বোধ্য জিনিসকে অস্বীকার করছে না। আসলে যা তাদের মনের কাছেই অগ্রাহ্য—তাই তারা প্রত্যাখ্যান করছে। মানুষের এর চেয়ে খারাপ ধরনের স্ববিরোধিতায় ভোগা বোধ হয় আর সম্ভব নয়। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার এই যে, সে এহেন স্ববিরোধিতা নিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে। একে শোধরাবার কোন চেষ্টা করছে না।

---

www.pathagar.com

জীবনের দু' রকম লক্ষ্য ও তা নিয়ে দোদুল্যমানতা

আরবী সাহিত্যে একটা প্রসিদ্ধ গল্প আছে। হাতিয়াহ নামক এক কবি বিশিষ্ট সাহাবী জাবারকান বিন বদর (রা)-এর বিরুদ্ধে একটা কুৎসাপূর্ণ কবিতা রচনা ও প্রচার করেন। কবিতাটা এই ঃ

دَعِ المكارم لاترحل لبغيتها — واقعد فانك انت الطاعم الكاسى

"অর্থাৎ তুমি মহৎ গুণাবলী অর্জনের চিন্তা ছেড়ে দাও। ওসবের পেছনে ধাবিত না হয়ে চুপচাপ বসে থাক। কেননা তোমার খাওয়া পরার উপকরণের প্রাচুর্য আছে।"

একথাটা উক্ত সাহাবীকে এত ক্ষেপিয়ে তোলে যে, তিনি খলিফা হযরত ওমরের নিকট নালিশ করে তবে ছাড়েন। যদিও হযরত ওমর এ কবিতাটার মর্ম উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিলেন না, তথাপি তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয় কবি হাস্‌সান বিন ছাবেত (রা)-কে এই কুৎসার মূল্যায়ণ করতে বললেন। হাস্‌সান তার মতামত জানালেন। তার মতে ওটা ছিল অত্যন্ত জঘন্য ধরনের নিন্দাবাদ। যে কোন নোংরা সমালোচনাকে এ কবিতা হারমানায়। এর মাধ্যমে সাহাবীকে অত্যন্ত কদর্যভাবে ধিক্কার দেয়া হয়েছে এবং তার মান-মর্যাদাকে চূড়ান্তভাবে হেয় করা হয়েছে। অতপর হযরত ওমর কুৎসা রটনাকারী কবিকে কারাগারে আবদ্ধ করেন।

একজন পাঠক দেখবে যে, এতে বাপ মা তুলে কোন গালাগাল করা হয়নি, তাকে কোন অসুদুদ্দেশ্যের জন্য দায়ী করা হয়নি বা তার কোন গোপনীয় ব্যক্তিগত ব্যাপার ফাঁশ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও হাস্‌সানের বিচারে এটা ছিল নিকৃষ্টতম নিন্দাবাদ। হাতিয়াহ তো জাবারকানকে শুধু একথাই বলেছে যে, মহৎ ও উচ্চ লক্ষ্য অর্জনে খামাখা উনি যেন কষ্ট না করেন। কেননা ওসব করার হিম্মত বা শক্তি ও সাহস তার নেই। তাই এ জন্য নিজেকে কষ্ট দেয়া তার পক্ষে একটা অস্বাভাবিক কাজে কষ্ট করারই শামিল। খাওয়া পরার ভাবনা নিয়েই তার পড়ে থাকা উচিত। অন্য কিছুর ভাবনা করার যোগ্য তিনি নন এবং তাতে তার কোন লাভও নেই। আজকালকার ভাষায় বলা যেতে পারে ঃ "তোমার সর্বোচ্চ লক্ষ্য—যার জন্য তুমি বেঁচে থাকছো এবং যা তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—তাহলো, খাওয়া ও পরার ধান্দায় ডুবে থাকা।"

এ কেসসার দু'টো মর্মার্থ রয়েছে। প্রথমত এই যে, হাতিয়াহ জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জানতেন যে, জীবনের দু' রকম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

থাকে। একটা হলো নিকৃষ্ট লক্ষ্য–যাকে গ্রহণ করে নীচাশয় লোকেরা। অপরটা হলো উচ্চ বা পবিত্র লক্ষ্য—যার জন্য একমাত্র মহৎ লোকেরাই জীবন ধারণ করে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরা মজার মজার খাবার ও সুন্দর পোশাক পেলেই সুখী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর লোকেরা উচ্চাংগের নৈতিক গুণাবলী অর্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত হয় এবং সত্য ও ন্যায়ের সম্পদে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে যত্নবান হয়। হযরত ওমরের গৌরবদীপ্ত শাসনামলে সমাজের জীবনধারা এই শেষোক্ত মানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দ্বিতীয় যে তাৎপর্য এই আলোচনা থেকে ফুটে ওঠে তা হলো এই যে, উক্ত দু'টো লক্ষ্যের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, সাধারণ জনমত সে সম্পর্কে শুধু সচেতনই ছিল না, বরং এ ব্যাপারেই অত্যন্ত তীব্র অভিমানী এবং সংবেদনশীলও ছিল। সে সমাজের প্রতিটা সদস্যের এরূপ আভিজাত্যবোধ ছিল যে, সে শুধু খাওয়া-পরার চিন্তায় মগ্ন থাকাকে নিজের জন্য অত্যন্ত অপমান-জনক মনে করতো এবং পাছে লোকেরা তাকে নিছক ভোগবাদী ও আয়েশ প্রিয় মনে করে বসে, সেই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতো। সমাজে ভোগবাদী হিসেবে পরিচিত হওয়াকে প্রতিটা মানুষ মারাত্মক মনে করে এড়িয়ে চলতো ও নিজের মান তার উর্ধে রাখার চেষ্টা করতো। হাতিয়াহ তার ঘাতককে ঠিক এই দুর্বল জায়গাটাতেই নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করলো। অন্য কথায় বলা যায়, তার প্রতি মানহানিকর আচরণ করলো। হযরত হাস্‌সানের ব্যাখ্যা অনুসারে ঃ একদিকে ছিল দু'টো পরস্পর বিরোধী লক্ষ্য—একটা সহজলভ্য ও নিকৃষ্ট। অপরটা দুর্লভ ও সুদূরপ্রসারী।

অপর দিকে ছিল সুতীব্র অনুভূতি ও সম্ভ্রমবোধ—যা প্রথমোক্ত লক্ষ্য থেকে মানুষকে হটিয়ে দেয় এবং দ্বিতীয়টার জন্য প্রবল আকাংখা জাগিয়ে তোলে।

বস্তুত উক্ত দু'টোই হলো মহৎ জীবনের স্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভ হলো উক্ত দু' ধরনের লক্ষ্য (ও তার মধ্যকার পার্থক্য) এর স্বীকৃতি আর দ্বিতীয়টা হলো এমন তীব্র অনুভূতি—যা প্রথমটাকে তাচ্ছিল্য করতে ও দ্বিতীয়টাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের ভেতরে এ দু'টো স্তম্ভ যতক্ষণ ভালো থাকে ততক্ষণ সে নিজেও ভালো থাকে। সুস্থ বিবেক এবং বিকার ও বক্রতামুক্ত স্বভাব প্রকৃতি যাদের, তারা এ যুক্তিই অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু আজকের বস্তুবাদী সভ্যতায় আমরা কি দেখতে পাই? এ সভ্যতার জীবনধারা কি এই যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত?

সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে কোন্ ধরনের জিনিসকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে একবার যাচাই করে দেখুন তো। উচ্চতর ও মহত্তর জীবনের দাবী ও চাহিদার গুরুত্ব তাদের বেশী, না নয়নাভিরাম বেশভূষা, চাকচিক্যময় ঘর-বাড়ি

www.pathagar.com

ও মজাদার খাদ্য-পানীয়ের গুরুত্ব বেশী ? নিশ্চয়ই শেষোক্ত জিনিসগুলোর গুরুত্বই বেশী। এমনকি নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম লোকও লোকজনের সামনে বেরুবার সময় কোন না কোন প্রকারের সাজগোজ না করে ছাড়ে না। এমনকি যদি ক্ষমতায় একেবারেই না কুলোয় তাহলেও অগত্যা অন্যদের সাজগোজ ও জাকজমকের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতেও কসুর করে না।

আপনার চারপাশে ছোটবড় চাকুরে লোক অনেক রয়েছে। আবার বড় বড় ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদও আছে। এখন একটু ভাবুন তো, এই সব লোকের মন কোন্ মহৎ আকাংখায় উজ্জীবিত ? কোন্ উচ্চ খেয়াল তাদের কর্মস্থলে ও তার বাইরে তাদের বিবেক-বুদ্ধিতে ঘুরপাক খায় ? মহৎ জীবনের এমন কোন রীতি-পদ্ধতি আছে কি, যা নিয়ে তাদের চিন্তায় দিবারাত্র তোলপাড় হয় এবং সে কারণে তারা তার দিকে মানুষকে আহবান জানায় ও তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় ? অথবা কোন বড় বা ছোট শহরে চলে যান। সেখানে কোন বড় ময়দানে গিয়ে দাঁড়ান। অতপর আপনার কাছ দিয়ে যে নারী বা পুরুষ, যুবক বা যুবতী চলে যাচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য করুন। এবার নিজের কাছে জিজ্ঞেস করুন ঐ ব্যক্তিটি কোন্ চিন্তায় বিভোর আছে বলে মনে হয় ? কোন্ ধান্দায় সে নিমজ্জিত এবং কোন্ উদ্দেশ্যের দিকে তার কদম ধাবমান ? সেটা টাকা-কড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, নগণ্য ও তুচ্ছ ধ্যান ও চিন্তা, নীচু মানের আবেগ ও উচ্ছ্বাস ইত্যাদি ছাড়া আর কি হতে পারে ? সেটা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ঐন্দ্রিক ভোগের লালসা চরিতার্থ করার কোন না কোন উপকরণ নয় কি ? তা গোপন কিংবা প্রকাশ্য পাশবিক চাহিদা ও জৈব ক্ষুধা মেটানোর কোন না কোন বস্তু ছাড়া আর কি ?

এসব লোক কখনো কখনো হয়তো আপনার কাছে বসে গল্প করবে। আল্লাহ তাকে কত অঢেল নিয়ামত দিয়েছেন তার বিবরণ শোনাবে। বলবে ঃ "দুনিয়ায় আমার আর কোন সাধ অপূর্ণ নেই। আল্লাহর শোকর ! খুবই ভালো খাই, ভালো পরি, আরাম-আয়েশপূর্ণ বাড়িতে বাস করি। দুনিয়ার জীবনে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। এত সম্মান, এত আয়েশ, এত প্রাচুর্যের জীবন পেয়েও একজন আদম সন্তানের আর কিই বা পাওয়ার থাকতে পারে।" একটু ভাবুন তো, তাকে যদি আপনি বলতেন ঃ ছিঃ এসব কি বলছেন আপনি ? এসব কোন গর্বের জিনিস না কি ? এসব জিনিস আয়ত্ব হওয়া তো বরঞ্চ কলংকজনক ও লজ্জাজনক ! তাহলে সে কি সাহাবী জাবারকানের মত আপনার ওপর খাপ্পা হতো ? সে কি এ নিয়ে কাজীর দরবারে বিচার প্রার্থী হতো ? এগুলো নিয়ে এত গর্ব, আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করা সত্ত্বেও সে কি আপনার ওপর এতটা ক্ষেপে যেত ? নিশ্চয়ই নয়। কারণ সে দিনরাতই তো দেখছে, বেশীর ভাগ

www.pathagar.com

মানুষই তার নৈতিক গুণপনা, সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার মানদণ্ডে নয় বরং বাহ্যিক চাকচিক্য ও আর্থিক প্রাচুর্যের মানদণ্ডেই প্রত্যেককে পরিমাপ করে। সুতরাং সে এতে রাগ করতে পারে না। হ্যাঁ, রাগ যদি করেই তবে তা এই জন্যই করবে যে, আপনি তার মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং সে যে নীতিকে ভালো মনে করে তাকে আপনি খারাপ মনে করেছেন। হয়তো সে একজন দার্শনিক অধ্যাপকের রূপ ধারণ করে আপনার অভিমতকে বোকামী ঠাওরাবে। আপনি জীবনের বাস্তবতা বোঝেন না, আপনি অবাস্তব কল্পনাবিলাসী ইত্যাদি বলে আপনাকে অভিযুক্ত করবে। অর্থাৎ তার মতকে মেনে না নেয়া এবং তার অঢেল প্রাচুর্যের কদর না করাতেই আপনার ওপর তার যত রাগ। অন্যদিকে ঐ দার্শনিকের ভেকধারী ভদ্রলোক যদি এমন লোক হয়ে থাকেন যার মনে এখনো ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। তাহলে তিনি কুরআনেরই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে তা থেকে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়ে আপনাকে তর্কে হারিয়ে দিতে চাইবেন। এ জন্য কুরআনের নিম্নোক্ত ধরনের আয়াতকেই হয়তো তিনি সম্বল করবেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط

"(হে নবী !) আপনি বলুন ! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং যে পবিত্র হালাল জীবিকা দিয়েছেন তা কে হারাম করলো ?" —(সূরা আল আরাফ ঃ ৩২)

এভাবে তিনি তার ভুয়ো দর্শন, মূর্খতা এবং কুরআনের আয়াতের উদ্দেশ্য ও বক্তব্যকে ভুল বুঝার প্রবণতা শেষ পর্যন্ত কাজে লাগিয়ে যেতে পারেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যে মুহূর্তে হালাল রুজীর জন্য তার এত আগ্রহ ও উৎসাহ, সে মুহূর্তে কুরআন যেসব মহৎ লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে বলেছে তার জন্য তার বিন্দুমাত্রও উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায় না।

পূর্ববর্তী আলোচনায় স্থীর হয়েছে যে, মহৎ জীবনে দু'টো স্তম্ভ এবং দু'টো লক্ষ্যের স্বীকৃতি রয়েছে যার একটাকে অবজ্ঞা করা ও অপরটাকে সসম্মানে গ্রহণ করার মত প্রখর চেতনা ও অনুভূতি থাকা আবশ্যক। সাধারণ মানুষের বিবেকে, মনের সজীবতায় ও দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণে ঐ দু'টো স্তম্ভের অবস্থান কোথায়, তা আমাদের খুঁজে দেখতে হবে।

আমি একথা ব্যক্ত করতে দ্বিধা করবো না যে, বেশীর ভাগ মানুষকেই উক্ত দু'টো লক্ষ্যকে স্বীকার করতে দেখেছি। এই স্বীকৃতি আমাদের পূর্বের বক্তব্যের বিরোধিতার শামিল নয়। আপনার যে বন্ধু বা দার্শনিক আপনার সাথে তর্ক করে ঐ লক্ষ্য দু'টোর একটাকে অগ্রাহ্য ও খণ্ডন করতে চায়, আসলে সে তর্ক

www.pathagar.com

তার অপূর্ণ চিন্তার ফসল। আপনি তার কোন ত্রুটি ধরার কারণে তার মধ্যে যে অন্যায় আত্মশ্রদ্ধা জন্মেছে, তা থেকেই ওটার উৎপত্তি। যাদের কোন সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী আকীদা-বিশ্বাস থাকে না, তাদের মধ্যে স্বভাবতই এ আপদের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। তারা রকমারি ধ্যান-ধারণার মধ্যে সবসময়ই দোদুল্যমান থাকে।

ভাল কথা শুনেও উপেক্ষা করা

মানুষের কাছে সেইসব মহামানবের কাহিনী বর্ণনা করে দেখুন যারা স্বয়ং বঞ্চিত থেকেও অন্যকে আগে ভোগ করার সুযোগ দিতেন, সেইসব লোকের আদর্শ তুলে ধরুন ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন—যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং শুধু ঈমান আনা নয় আল্লাহকেই তাদের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাদের কাছে তাদের মাতৃভূমি, সম্পত্তি, পরিবার, প্রিয়জন এবং সন্তান-সন্ততির চেয়েও প্রিয় হয়ে ওঠে। তাই এক পর্যায়ে তারা আল্লাহর জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। এভাবে ছেলেমেয়ে ও আপনজনদের ছেড়ে তারা দেশত্যাগী হন নিছক আল্লাহরই সন্তুষ্টির খাতিরে। অকাতরে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করেন। কেননা আল্লাহর কাছে তারা অধিকতর মূল্যবান বদলা পাবার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ হকের জন্য সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কামনায় তার সমগ্র সম্পদ দান করে দিতেন, নিজের সন্তানদের জন্য একটা কানাকড়িও রেখে যেতেন না। আর এভাবে দান করে তারা সুখী ও তৃপ্তিবোধ করতেন এবং মনে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতেন। "সবকিছু আল্লাহর পথে দিয়ে নিজের সন্তানদের কি উপায় করে গেলেন" একথা কেউ জিজ্ঞেস করলে তারা বলতেন ঃ "সব সম্পদের চেয়ে যা দুর্লভ ও মূল্যবান সে সম্পদই তাদের জন্য রেখে গেলাম। তাদেরকে আল্লাহ ও তার রসূলের হাতে সপে দিয়ে গেলাম—যিনি সর্বদাই সৎকর্মশীলদের অভিভাবক ও বন্ধু।"

আল্লাহর সেইসব সৈনিকের কথা জনগণকে শুনিয়ে দিন—যারা মহৎ জীবনের পতাকা উড়িয়েছে চূড়ান্ত ও অনমনীয় ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বের আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে, সত্য ও ন্যায় যেখানেই থাক—তার জন্য ত্যাগ ও উৎসর্গের মাধ্যমে, বাতিল ও অন্যায় যেখানেই থাক —তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও তার উচ্ছেদ সাধনের মাধ্যমে, জীবন ও অধিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং এই সাম্যের পর আল্লাহ-ভীরুতার মানদন্ডের ভিত্তিতে মর্যাদা ও সম্মানের পার্থক্য নিরূপনের বিহিত করার মাধ্যমে। এসব সৈনিকের ইতিবৃত্ত বেশী বেশী করে বর্ণনা করা চাই এ জন্য যে, তারা উক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে শুধু কেতাবি বুলি হিসেবে মুখে আউড়িয়েই ক্ষ্যান্ত থাকেনি, বরং তাকে বাস্তব কর্মের রূপও দিয়েছে। পৃথিবীতে

www.pathagar.com

একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা বাস্তব সত্যের আকারে চালু থেকেছে এবং তা মানবজাতির জীবনের জন্য মহা গৌরবময় এক আলোকবর্তিকা হয়ে চিন্তা ও দৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করেছে। এসব গৌরবগাথা সার্বিকভাবে কিংবা আংশিকভাবে যখনই আলোচনা করবেন, দেখবেন তারা মনোযোগ দিয়ে শুনছে এবং আপনার মতই চমৎকৃত ও মুগ্ধ হচ্ছে ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা শুনে। শুধু মুগ্ধই হচ্ছে না বরং যারা এই গৌরবময় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, আল্লাহর সন্তোষ-ভাজন সেই মহজ্জনদের ওপর অজস্র প্রশংসার ফুলও বর্ষণ করছে। অর্থাৎ আপনি যদি আলোচনার সময়ে বিতর্কমূলক বক্তব্যগুলো এড়িয়ে চলতে সমর্থ হন তাহলে জীবনের মহৎ লক্ষ্য ও নিকৃষ্ট লক্ষ্য—এ দু'টো লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের স্বীকৃতি নিশ্চয়ই পাবেন। প্রথমটাকে যথারীতি শ্রদ্ধা দেখাবে এবং দ্বিতীয়টার নিন্দা করবে। কিন্তু তারপর?

এ স্বীকৃতি কি তাদের অন্তরে স্থান পায়? না কি এগুলো শুধুমাত্র ঐন্দ্রিক অনুভূতিতে ভালো বলে উপলব্ধি করা ও মুখ দিয়ে প্রতিধ্বনিত হওয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ? তাদের হৃদয়ে কি এই উচ্চ দৃষ্টান্তগুলোর উত্তম বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও কোন আকর্ষণ আছে, আছে এমন কোন প্রেমাবেগ? কোন দুর্নিবার আবেগ ও আকর্ষণ?—যা মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধের মত টেনে নিয়ে যায় ঐ উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের লক্ষ্যে যে কোন দুর্গম প্রান্তরে, চাই তাতে যতই ক্ষুধা, পিপাসা, দুঃখ ভোগ এবং ছোট কিংবা বড় আর্থিক ত্যাগ যতই স্বীকার করতে হোক না কেন? কেননা এগুলোর প্রতি মনের প্রবল আবেগ ও ঐকান্তিক টান আর মন ও ইন্দ্রিয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার ইচ্ছার সামনে ঐ দুঃখভোগ ও ত্যাগ স্বীকার নিতান্তই তুচ্ছ।[১]

আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আজকের সমাজ মানসে এ ধরনের উচ্চতর লক্ষ্য ও মহৎ গুণাবলীর প্রতি আদৌ কোন আগ্রহ আছে কিনা। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে যে, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী লালসার উন্মত্ত তাণ্ডব হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ঐ মহৎ গুণাবলীর উৎসকে বন্ধ করে দিয়ে যায়নি তো? হৃদয়ে ঐ লালসা ছাড়া আর সব কিছুর পথ রুদ্ধ করে দিয়ে যায়নি তো?

---

১. ইন্দ্রিয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা বলতে আমি খাদ্য ও পোশাকের বিলাসিতা বুঝাইনি। আমি যা বলতে চেয়েছি তাহলো এই যে, যে চারিত্রিক মহত্ত্বকে ভালোবাসে সে যে কোন একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা শুনেই তৃপ্ত হতে পারে না। সে অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে বাস্তব জগতে তার উপস্থিতি ও অবস্থান দেখতে চাইবে। সে ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে বাস্তব ও ইতিবাচক চেষ্টাও না হয়ে পারে না। এই চেষ্টার ফলে তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটলে তার চোখ তা দেখে এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার সূক্ষ্ম অনুভব করে প্রকাশ্য ও বাস্তব তৃপ্তি লাভ করবে যেমন তার মন ঐ আদর্শ চরিত্র দেখে আগেই তৃপ্তি লাভ করেছিল।—গ্রন্থকার

www.pathagar.com

মহৎ গুণাবলী সংক্রান্ত গালভরা বুলি

আমি উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে ভোগবাদী জীবন দর্শনের উৎপত্তিস্থল পাশ্চাত্য উচ্চতর ও মহত্তর মানবিক গুণাবলীর উপস্থিতি সম্পর্কে যে গালভরা দাবী করা হয়ে থাকে, সেই দাবীর দিকে একটু দৃষ্টি দিতে চাই। একথা সত্য যে, সেখানে ভালো কাজ করার মনোবৃত্তি আছে এবং লোকও আছে, নিজের ওপরে অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়ার গুণপনা আছে এবং অগ্রাধিকার দাতাও অনেক আছে। সেখানে সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার আছে, মানুষের মধ্যে সাহস ও বীরত্ব আছে, ঝুঁকি নেয়ার হিম্মত ও বাধা ডিংগিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দৃপ্ততা আছে, রক্ত ঝরানো ও প্রাণ বিসর্জনের এবং শ্রম, সময় এমনকি গোটা জীবন অন্যের স্বার্থে বিলিয়ে দেয়ার দৃষ্টান্ত আছে। শুধু তাই নয়, মহৎ মানবীয় গুণ ও মানবতার অতি উচ্চ ও উৎকৃষ্ট সম্পদ বলে আমরা জানি —এমন আরো বহু কিছু সেখানে মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাহলে আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার অপকীর্তির নিন্দায় আমরা কিভাবে বাড়াবাড়ি করতে পারি? বস্তুত আজকালকার বস্তুবাদী ও ভোগবাদী উন্মাদনার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ মুখর, তাদের এই বিষয়টা গভীরভাবে ভাবা উচিত। তারা যদি কেবল চোখ বুজে নিন্দাই করে যেতে থাকেন এবং তার মধ্যে যেটুকু ভালো বৈশিষ্ট্য আছে বলে দাবী করা হচ্ছে, সেটা বিবেচনাই করতে না চান, তবে সেটা তেমন ভালো কথা হবে না।

তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আজকের এই উগ্র বস্তুবাদী জোয়ার এবং এই নকল সভ্যতা এতটা বন্ধ্যা হয়ে গেছে যে, এ ধরনের উন্নত ও মহৎ মানবীয় গুণাবলীর জন্ম দিতে তা সম্পূর্ণ অক্ষম। কেননা একটা খারাপ জিনিস থেকে একই রকমের খারাপ জিনিস ছাড়া আর কিছু উৎপন্ন হতে পারে না। একটা বাতিল আর একটা বাতিলেরই জন্ম দিতে পারে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ط

"পবিত্র ভূমি থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় উদ্ভিদ জন্মে। আর নিকৃষ্ট ভূমি থেকে পীড়াদায়ক ফসলই জন্মে।"—(সূরা আল আরাফ ঃ ৫৮)

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ○

"এটা হলো আল্লাহর নিয়ম—যা আগে থেকেই চলে আসছে। এতে তুমি কখনো কোন পরিবর্তন দেখবে না।"—(সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৩)

সুতরাং পাশ্চাত্যবাসীর মধ্যে যে, মহৎ মানবীয় গুণাবলীর দাবী করা হয়, তা আসলে ঐ নোংরা ভূমিতে উৎপন্ন নিকৃষ্ট উদ্ভিদেরই বিষাক্ত ফুল। এগুলো

www.pathagar.com

এমন ফুল যার মধ্যে নয়নাভিরাম আকৃতি ও রং ছাড়া ফুলের আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সে ফুলের ঘ্রাণ, নির্যাস এবং প্রকৃতি—সবই ঘৃণ্য, নোংরা ও বিষময়। বস্তুত পাশ্চাত্যের মানুষের মধ্যে যে মহৎ গুণাবলী দেখা যায়, তাতে যথার্থ মাহাত্ম্য কিছু নেই—আছে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ বাতিল। অত্যন্ত হীন ও অসার উৎস থেকে তার উৎপত্তি। তা কোন গভীর ও নিখাদ সারবান জিনিস নয়।

মেকি মানবিক গুণাবলী

মহত্ত্ব নিসন্দেহে একটা খাঁটি জিনিস। যা খাঁটি ও ভাল, তা সর্বকালে সর্বত্রই ভাল। তাঁর মূল সত্তার ঘাটতি বা বৃদ্ধিতে তার খাঁটিত্বের কিছু যায় আসে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এক জায়গায় সত্য ও ন্যায়ের সেবক ও সাধক হয় এবং অন্য জায়গায় একই সত্যের বিরোধিতা করে ও বাধা দেয়, তাহলে তাকে কেউ মহৎ আদর্শের প্রেমিক বলে অভিহিত করবে না। এ ধরনের লোক যে স্থানে সত্যের প্রেমিক বলে নিজেকে জাহির করেছে সেখানে তার সেই ভূমিকা খাঁটি না মেকি তা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পাশ্চাত্যবাসী সম্পর্কে লোকে ধারণা করে যে, তারা নিজেদের দেশে স্বাধীনতাকে পরম পবিত্র জিনিস বলে বিশ্বাস করে। স্বাধীনতা একটা সত্য। এ সত্যকে তারা যদি সম্মান করে ও মানে, তবে সর্বত্রই একই রকম সম্মান করা উচিত। দেশের ভিতরে ও বাইরে এ সত্যকে একই রকম পবিত্র জ্ঞান করা চাই। পৃথিবীর যেখানেই কোন দুর্বল মানুষ পাওয়া যাবে, তাকে সাহায্য করতে হবে, প্রত্যেক নিরাপত্তাহীন মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হবে, প্রত্যেক লাঞ্ছিতের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, প্রত্যেক অধিকার হারা মানুষের অধিকার পুনর্বহাল করতে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাদেরকে দেখা যায়, নিজেদের দেশে এই স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কে তারা খুবই সজাগ ও আগ্রহী। অথচ বিদেশে গিয়ে তারা দুর্বল জাতিগুলোর স্বাধীনতার ওপর হামলা চালায়, স্বাধীনতাকামী ও মুক্তি সংগ্রামীদের ওপর লাঞ্ছনা ও নির্যাতন চালায়, তাদেরকে কারারুদ্ধ, দেশান্তরিত ও হত্যা করে। এটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত জঘন্য চরিত্র। একে কোন মতেই মহৎ মানবীয় গুণাবলীর আওতায় ফেলা যায় না।

আগেই বলেছি, মহৎ গুণাবলীকে যে ভালোবাসে, সে তাকে নিজের মন ও অনুভূতির জন্য তৃপ্তিদায়ক ও সৌন্দর্যবর্ধক বলে মনে করে। তাই সে শুধু এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই ক্ষ্যান্ত থাকে না, বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতে তার কার্যকর বাস্তবায়নও দেখতে চায়। এরূপ একজন সত্য প্রেমিকের জন্য এটা কি বেখাপ্পা নয় যে, সে ঐ সত্যেরই প্রতিরোধ করবে, তার ঝাণ্ডাবাহীদের রুখে দাঁড়াবে, তার কণ্ঠ স্তব্ধ এবং ঝাণ্ডা ধরাশায়ী করবে?

নিজেদের কল্যাণ কামনায় নিষ্ঠাবান হলে আমাদের অন্তত এতটুকু সৎ সাহস থাকা চাই যে, যা বিশ্বাস করবো তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করবো। সত্যকে

www.pathagar.com

সত্য এবং বাতিলকে বাতিল বলবো—চাই তাতে সমগ্র মানব সমাজ আমাদের বিরোধী হয়ে যাক। আমাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা যেন সত্যাশ্রয়ী হয়, আমরা যেন নিজেদেরকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারি এবং হীনমন্যতায় না ভুগি, যা সত্য বলে জানি তা যেন উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি। আমাদের আত্মগৌরবের জন্য এতটুকুই যেন যথেষ্ঠ হয় যে, আমরা কারো প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী না হই, আবার এতটা খুঁতখুঁতেও না হই যে, জাজ্জ্বল্যমান সত্যকে শুধুমাত্র অন্যেরা মানছে না বলেই আমরাও তা মানতে পারার মত দৃঢ়তার অধিকারী হবো না। এতটা হীন মনোবল কেবল তাদেরই হতে পারে, যারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ের আবর্জনার মত নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য হয়ে থাকাতেই সন্তুষ্ট।

সুতরাং আমরা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলবো ঃ পাশ্চাত্যবাসীর এসব চোখ ধাঁধানো মানবিক গুণপনা একেবারেই নকল ও মেকি—চাই দুনিয়ার মানুষ ঐ মেকিপনার ধাঁধায় পড়ে তার গুণগান ও স্তুতিতে যতই পঞ্চমুখ হোক না কেন। কেননা যে মুহূর্তে এই গুণগান শোনা যাবে ঠিক তখনই আকাশ বাতাস মথিত করে এসে কানের পর্দায় আঘাত হানবে তাদেরই উৎপিড়িতের আর্তকান্নার রোল—অপমানিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত মানবতার সকরুণ ফরিয়াদ।

তাদের ন্যায়বিচারের কথা ভাবছেন? তাদের সাধ্যের কথা? তথাকথিত এসব মহৎ গুণের আড়ালে যে কুৎসিত চরিত্র লুকিয়ে আছে, তা জানার পর আর ওসবের কথা ভাববার দরকারই হবে না।

হিংস্র জন্তুর খাসলত

সুতরাং একথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন যে, ওগুলো কোন মহৎ মানবীয় গুণ নয়—কেবল মানবীয় গুণের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ লোক দেখানো রীতি ও প্রথা মাত্র। পাশ্চাত্যবাসী তাদের সামাজিক জীবন সচল রাখার উপায় হিসেবে এগুলোকে পারস্পরিক আচরণের রীতি বানিয়ে নিয়েছে—যাতে করে পারস্পরিক সহযোগিতা চালু থাকে। কিসের জন্য সহযোগিতা? নিজেদের সীমাহীন অহংকার ও গর্বের খায়েশ মেটানো এবং ইন্দ্রিয়ের সীমাহীন ভোগের লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য সহযোগিতা, সততা ও ন্যায়ের জন্য নয়—পাপ, অন্যায় ও অত্যাচারের ব্যাপারে সহযোগিতা। তারা যদি পরস্পরের মধ্যে এইটুকু ন্যায় বিচার চালু না রাখতো এবং নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম চালাতো, তাহলে তাদের সামাজিক বন্ধন কবেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। যে অহংকার ও গর্ববোধ দিয়ে তারা আজ অন্যান্য জাতির ওপর শোষণ-নিপীড়ন চালাচ্ছে, সেটা তাদের নিজেদের ওপরই আবর্তিত হতো এবং নিজেরাই নিজেদের লোক দ্বারা

www.pathagar.com

শোষিত ও নিষ্পেষিত হতো। তাদের সমাজে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়তো এবং ঐক্য ভেঙ্গে পড়তো। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তাদের ন্যায়বিচার মূলত একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা—কোন মৌলিক ও আসল চরিত্র নয়। তাদের সমাজে ন্যায়বিচারের মতই সাম্য ও সততার মূলেও একই জিনিস সক্রিয়। তা হচ্ছে, পারস্পরিক সহযোগিতাকে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী করার আগ্রহ। এ সহযোগিতাই তাদের দুর্বলের ওপর আধিপত্য বিস্তারের একমাত্র উপায় এবং অসহায় মানুষকে নিষ্ঠুর শোষণের শিকারে পরিণত করার প্রধান হাতিয়ার। পারস্পরিক সহযোগিতাকে দৃঢ়তর করার মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারের ঐ আগ্রহ তাদের এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, তাদের আত্মম্ভরিতা ও গর্ববোধকেও অধিকতর ব্যপ্ত ও বিস্তৃত করে দেয়। ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতাকে সামগ্রিক আত্মম্ভরিতায় পরিণত করে। এ জন্যই দেখা যায়, এক ব্যক্তি তার গোষ্ঠী, সম্প্রদায় কিংবা জাতিকে সব ধরনের সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদান করে এবং তা করে শুধু এ জন্য যে, এক সময় সেটা তার কাছেই ফিরে আসবে। তার সুফল ও কল্যাণ দ্বারা সে নিজেই উপকৃত হবে। সে যখন নিজের সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, তখন আসলে সে নিজেকেই ভালোবাসে, নিজের কল্যাণ, নিজের ভালাই এবং জনগণের ওপর তার প্রাধান্য আধিপত্য লাভকেই ভালবাসে, তার স্বাজাত্যবোধ ও স্বজাতি প্রেম আসলে তার আত্মপ্রেমেরই সম্প্রসারিত রূপ। কাজেই তারা যে দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতা কিংবা স্বাজাত্যবোধ বা জাতীয়তাবাদের বুলি আওড়ায় কিংবা বিপুল আর্থিক ত্যাগ স্বীকার বা বড় বড় ঝুঁকি গ্রহণ কিংবা আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের যেসব খবর তাদের সম্পর্কে প্রচারিত হয়, সেগুলো আসলে ইতিপূর্বে আমরা "তাদের কল্পিত উচ্চ মানবিক গুণাবলীর" পর্যায়ে যেগুলোর উল্লেখ করেছি তারই অন্তর্ভুক্ত।

দস্যুর দল

পাশ্চাত্যের ঐ দস্যুদের পাশবিক পাগলামীর চমকপ্রদ বাহ্যিক রূপ বৈশিষ্ট্যে প্রতারিত হবেন না। সাধারণ আত্মপ্রতারিত না হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন ; পাশ্চাত্যের মানুষটি কি উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণকে পর্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে ফেলে ? সন্দেহ নেই, স্বজাতির সুখ ও সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই তা করে। কিন্তু তারপর ? পরবর্তী প্রশ্নও নিজেকেই করুন ঃ ভিন্ন জাতির দুর্বল লোকদের শোষণ ও লুণ্ঠন করা ছাড়া আর কি উপায়ে সে নিজের জাতিকে সুখী করতে পারে ? আমরা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত খুবই সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছি যে, এর আর কোন উপায় আছে কিনা। থাকলে সে উপায়টা বা উপায়গুলোর নাম কি, জানা প্রয়োজন। আমি কথাটা আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই। আচ্ছা, ধরুন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওপর হামলা চালিয়ে বসলো, তার ওপর জুলুম করলো

www.pathagar.com

এবং শান্তির সাথে স্বাধীনভাবে তার বাঁচার অধিকার কেড়ে নিল। এটা কি আপনি সমর্থন করবেন এবং মেনে নেবেন ? যদি তা না মানেন তাহলে সেই কাজই যদি এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে করে, তাহলে তা মেনে নিতে কি আপনার মন খুঁতখুঁত করবে না ? অর্থাৎ এক ব্যক্তির পরিচালিত ছোট আকারের আধিপত্য ও স্বৈরাচার যখন আপনি পছন্দ করেন না, তখন আরো বড় ধরনের আধিপত্য ও স্বৈরাচারকে আপনি আরো কঠোরভাবেই অপছন্দ ও প্রত্যাখ্যান করবেন। আপনার মতামত ব্যক্ত করুন তো দেখি ; যে দস্যুর দল নিরীহ পথচারী কিংবা ঘুমন্ত লোকদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের শান্তি ও সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং যে জাতি একই কায়দায় অন্য দুর্বল জাতির ওপর হামলা চালিয়ে তাদের শান্তি ও সম্পদ কেড়ে নেয়—এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য কি ? কিছু কিছু উপায় ও উপকরণের প্রভেদ ছাড়া উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য আছে কি ? বস্তুত ব্যাপারটা এছাড়া আর কিছু নয় যে, এক জায়গায় যে স্বৈরাচার ক্ষুদ্র আকারে বিরাজমান, সেটাই ক্রমবিকাশ লাভ করে অন্যত্র বৃহত্তর ও ব্যাপকতর আকারে দেখা দেয়, এক জায়গায় যে অপরাধ ব্যক্তিগত ও গোপনীয়ভাবে দেখা দেয়, সেটাই অন্যত্র গিয়ে প্রকাশ্য রীতি ও প্রথার রূপ নিয়ে সমস্ত পাপবোধের জড়তা ও সংকোচ কাটিয়ে উঠে রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক ধৃষ্টতা হয়ে মাথা তোলে।

সুতরাং তারা (পাশ্চাত্যবাসী) যেসব জিনিসকে কুরবানী, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, বীরত্ব ও নির্ভিকতা বলে অভিহিত করে, তা কেবল হিংস্র মাতলামীরই বিভিন্ন রূপ। ব্যক্তি যখন তার স্বজাতি ও স্বদেশভূমির স্বার্থ উদ্ধারে সক্রিয় হয় অথবা বিশুদ্ধতর ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, যখন সে নিজের বৃহত্তর স্বৈরাচারকে তথা নিজের খোদায়ী প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়, তখনই তার এই হিংস্র মাতলামী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাস্তবতার দৃষ্টিতে

আমাদের দেশে আমরা ব্যক্তিগত স্বৈরাচারের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাতে করে আপনি সামষ্টিক স্বৈরাচার পছন্দ করবেন বা আশা করবেন, এটা আমরা ভাবতে পারি না। কেননা যা খারাপ, তার পুরোটাই খারাপ। কোন অবস্থাতেই তাতে ভালাই ও কল্যাণ থাকতে পারে না। ব্যাপারটাকে আরো একটু উচ্চ স্তরের বাস্তববাদী দৃষ্টি নিয়ে যদি দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, ব্যক্তিগতভাবে যে দুষ্কর্মে রত, সামষ্টিক দুষ্কর্মে লিপ্তদের সাথে তার কোনই পার্থক্য নেই। বরঞ্চ আপনার একদিক দিয়ে এটাই মনে হবে যে, ব্যক্তিগত স্বৈরাচার সামষ্টিক স্বৈরাচারের চেয়ে অনেক কম ধিক্কারযোগ্য।

আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে যে প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে হয় তা হলো এই যে, বৃহত্তর স্বৈরাচার তথা সামষ্টিক স্বৈরাচার কি জাতিতে জাতিতে ও

www.pathagar.com

দেশে দেশে চিরস্থায়ী রেষারেষী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ও তীব্র শত্রুতার সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে? আগে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষী হতো। এখন সেই অপকর্মের পরিধি ও মাত্রা বেড়েছে। এখন বড় বড় জাতি ভিন্ন জাতির শহর, বন্দর, দুর্গ ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা এবং কোটি কোটি মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান চালাচ্ছে। এখন আপনি কি মনে করেন প্রাচ্যেরও এ ধরনের স্বৈরাচার চাই? অদূরদর্শীরা নিশ্চয়ই বলবে, হ্যাঁ। আমরা বলি, না। আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয়ের জন্যই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা জিনিস চাই। অচিরেই আমরা সেটা বিশ্লেষণ করবো। ইখওয়ানুল মুসলিমুন সেই জিনিসের দিকেই মানবজাতিকে আহ্বান জানায় এবং তার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টায় নিয়োজিত।

পুনশ্চ

আমরা অনেক আগে থেকেই একথা বলে আসছি এবং সাম্প্রতিককাল থেকেও বলে চলেছি যে, মহৎ জীবনের দু'টো স্তম্ভ:

(১) জীবনের দু' রকমের লক্ষ্যের স্বীকৃতি ও

(২) তার ব্যাপারে এমন তীব্র চেতনা ও অনুভূতি—যা নিম্নতর লক্ষ্যকে অবজ্ঞা করেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং উচ্চতর লক্ষ্যকে শ্রদ্ধা করে ও তার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট ও আকাংখী করে তোলে। আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারটাকে তাত্ত্বিকভাবে গ্রহণ করে ও মানে। অতপর আমরা প্রশ্ন রেখেছি যে, এ তত্ত্বটা কি হৃদয়ের কোন তন্ত্রীর সাথে বাধা? আর সে তন্ত্রী থেকে কি মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কোন সংকল্প ঝংকৃত হয়? আমি মনে করি, পাঠকরা এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবেন যে, উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্য অভিসারী এবং দৃঢ় সংকল্প উচ্চ অভিলাস পোষণকারী হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো শিথিল ও বন্ধনহীন। এই মহত্তর লক্ষ্য হয়তো অচিরেই এমন নিষ্ক্রীয় হয়ে থেকে যাবে যে মানুষের কাছ থেকে কেবল নেতিবাচক সাড়াই পাবে। তখন উক্ত উঁচু ও নীচু—উভয় রকমের লক্ষ্যের মধ্যে মানুষের সত্তা বিভক্ত ও দোদুল্যমান হয়ে পড়বে। বিবেক দিয়ে উচ্চতর লক্ষ্যকে উপলব্ধি করলেও তার মন বাঁধা থাকবে নিম্নতর লক্ষ্যের সাথে। এভাবে চলতে চলতেই একদিন আল্লাহ তার জীবনের যবনিকাপাত করবেন।

www.pathagar.com

চিকিৎসার উপায়

আমরা এ অধ্যায়টার শিরোনাম দিয়েছিলাম ঃ "প্রচার ও প্রচারককে সঠিকভাবে বুঝা।" তাই বলে প্রচার কি জিনিস এবং প্রচারক কি ধরনের মানুষ, তা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম এ অধ্যায়ে। আমাদের বক্তব্য ছিল দু'টো বড় বড় ব্যাধি নিয়ে।

প্রথমটা হলো বস্তুবাদ। এটা এমন এক ব্যাধি যা থেকে সমাজের অন্য সমস্ত ব্যাধি জন্ম নেয়। বস্তুবাদ যত রকমের ও আকারের হতে পারে তার সবটাই আমাদের আলোচ্য। বিশেষত যে বস্তুবাদ মনের গভীরে ঢোকে এবং মনকে সম্পদের মোহ, ভোগের স্পৃহা এবং রকমারি কামনা ও বাসনার গোলাম বানিয়ে ছাড়ে। এটা এমন ভয়ংকর ব্যাধি যার দরুন মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অশান্তির আগুন জ্বলছে। প্রত্যেকের মন পারস্পরিক দুশমনী ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। আর ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের অব্যাহত ও অন্তহীন পাঁয়তারা মানুষকে করে তুলছে উৎকণ্ঠিত। অথচ তবুও তারা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। আর যদি বা করে তবে তা থেকে মুক্তিলাভের সংকল্প ও সাহস তার নেই।

প্রচারক মুসলিম কিংবা অমুলিম যাই হোক না কেন—সে যদি মানবতার মুক্তি চায় ও তাকে সুখী করতে কৃত সংকল্প হয়ে থাকে তাহলে তাকে উল্লিখিত সত্য সম্পর্কে অবগত হতেই হবে। প্রচারকের এমন একটা সমস্যার প্রতিকারে ব্রতী হওয়া চাই না যার সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই। যে কোন সমস্যার সমাধানে যদি একথা মনে রাখা না হয় তবে তার সফলতার আশা করা বাতুলতা মাত্র। এমতাবস্থায় এর সমাধানের জন্য যেটুকু চেষ্টা-সাধনা করা হবে সেটা কেবল ঐ রোগকে স্থায়ী করারই সহায়ক হবে এবং তার নিরাময়কে বিলম্বিতই করবে। এজন্য একজন ইসলাম প্রচারক মুসলমান কিংবা অমুসলমানদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও দুর্নীতি দেখতে পাবে, তা এই বৃহত্তম কারণ থেকেই উদ্ভূত, সে কথা তাকে উপলব্ধি করতে হবে। অতপর অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে আল্লাহর কিতাবের আলোকে তার চিকিৎসা করতে হবে।

এর পরে আসে অমুসলিম প্রচারকের কথা। অমুসলিম প্রচারককে আমরা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন পড়ার আহবান জানাই। হ্যাঁ, তার কুরআনও পড়া উচিত এবং তা থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। মানবতার মুক্তিই যদি তার সংকল্প হয়ে থাকে এবং সে সংকল্পে সে আন্তরিক হয়ে থাকে তবে তার বিবেক কুরআনের যে জিনিসকে ভালো বলে রায় দেবে তা নেয়া উচিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে কুরআনের সবটাই ভালো ও উপকারী পাবে। এ জন্য কেবল

www.pathagar.com

একটা কাজ তাকে পূর্বাহ্নে সম্পন্ন করতে হবে। সেটা হলো এই যে, জাতিগত বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতামূলক ধ্যান-ধারণার ঊর্ধে ওঠা চাই। বস্তুত বিদ্বেষ থেকে মুক্ত ও সভ্যতার আলোকে দীপ্ত বুদ্ধি ও বিবেক য্যার রয়েছে, তার পক্ষে এটা মোটেই শোভনীয় নয় যে, সে তার প্রতিবেশীর দেয়া ধন্বন্তরি ঔষধ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে নিজের রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে শুধু এই জন্য যে, এতে করে অন্যের ঔষুধের কৃতিত্ব স্বীকার করা হয়ে যাবে—যা কিনা তার জন্য বিরক্তিকর ও অসহ্য।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন মতাদর্শের টিকে থাকা নির্ভর করে আবেগের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া বুদ্ধি দ্বারা তা উপলব্ধি করা এবং তার বাস্তব প্রয়োগের ওপর। শুধু আল্লাহর আদর্শ নয়, পার্থিব মতাদর্শের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। কেননা এই বুদ্ধি ও বিবেককে কাজে না লাগালে আদর্শ কেবল কেতাবী আদর্শ হয়েই থেকে যায়। শুধুমাত্র মন-মগজের মধ্যে সীমিত একথা দর্শনের আকারেই তা বেঁচে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নাৎসীবাদ একটা দর্শন হিসেবে বইতেই লিপিবদ্ধ ছিল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তা পড়ানো হতো। একদিন হিটলার তাকে লুফে নিলেন। তা পেয়ে তিনি উদ্দীপিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং প্রচন্ড শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও আবেগ নিয়ে তিনি তার দিকে আহবান জানাতে থাকলেন। ক্রমান্বয়ে জনগণের মন নতুন নেতার আহবানে সাড়া দিতে প্রস্তুত হতে লাগলো এবং তার ইঙ্গিত লক্ষ্যের দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। পরিস্থিতি ও পরিবেশ ক্রমান্বয়ে তার অনুকূল হয়ে উঠলো। অবশেষে নাৎসিবাদ একটা প্রতিষ্ঠিত আদর্শে পরিণত হলো এবং তার জন্য সমগ্র জাতি লড়াই করতে তৈরী হলো—যদিও তা ছিল চরম নির্বুদ্ধিতা ও আহম্মকীসুলভ মতবাদ।

দু'টো প্রধান মৌলনীতি

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দু'টো প্রধান মৌলনীতির সন্ধান পাই। প্রথমত প্রচারকের অবস্থা এমন হওয়া চাই যে, তিনি যে আদর্শের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন তাকে তিনি নিজের স্নায়ুমন্ডলে জীবন্ত, নিজের বিবেকের অভ্যন্তরে প্রদীপ্ত এবং নিজের রক্তের ধারায় কল্লোলিত অনুভব করবেন। এ অনুভূতি তার মধ্যে এত শক্তিমান হবে যে, শান্তি ও স্বস্তির ভেতর থেকে টেনে বের করে তাকে কর্মে ও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাকে তার নিজের স্বত্তা, সম্পদ ও সন্তানাদির চেয়েও ঐ কর্ম ও আন্দোলনকেই অগ্রগণ্য মনে করতে শেখাবে। এমন প্রচারকই সত্যিকার প্রচারক। স্বীয় আদর্শের প্রতি তার ঈমান কেমন, সেটা তার দৃষ্টি, তার তৎপরতা, তার সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি তার আত্মসম্মান নির্দেশক চরিত্র বৈশিষ্ট্য

www.pathagar.com

থেকেই ফুটে উঠবে। এ রকম প্রচারকই যথার্থ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে এবং নিজ আদর্শের স্বপক্ষে তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করতে পারে। তাই বলে একথা মনে করা চাই না যে, প্রচারককে অতিমাত্রায় ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত নিছক হৈচৈকারী হতে হবে । ক্ষুদ্র ও নগণ্য ব্যাপারকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিজে ভাবাবেগে উত্তেজিত হয়ে জনগণকেও আবেগে উদ্দীপ্ত করা এবং কৃত্রিমভাবে তাদের জজবা সৃষ্টি করে দেয়া সত্যিকার ইসলামী আন্দোলন-কারীর কাজ হতে পারে না। কেননা সেটা আসলে ইসলামের বহির্ভূত লোকদের ইসলাম প্রীতির ভান ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা চাই এমন শ্রেণীর মানুষ যারা জন্মগতভাবেই সচেতন প্রকৃতির—যাদের কথা বলার সময় তাদের প্রতিটি শব্দে ও তার উচ্চারণের ভঙ্গীতে দাওয়াতের ভাবধারা ফুটে ওঠে। যে কথাটাই সে বলে তা দিয়ে সে কোন বাতিলের দিকে জনগণকে ঠেলে দেয় না বরং মানুষের সহজাত বিবেক ও প্রকৃতি যাকে অত্যন্ত আপন ও পরিচিত বলে মনে করে সেই পরম সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করে। যে কোন পার্থিব আদর্শের প্রচারকের জন্যও এটা জরুরী যে উক্ত আদর্শ তার একেবারে মজ্জাগত ও স্নায়ূতন্ত্রীতে পর্যন্ত ঝংকৃত ও রক্তের ধারায় পর্যন্ত কল্লোলিত হওয়া চাই—এক কথায় তার প্রতি সর্বতোভাবে নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত হওয়া চাই। আর পার্থিব আদর্শের বেলায় যখন এমন তখন ইসলামের বেলায় তো এটা আরো বেশী জরুরী হওয়ারই কথা। কেননা ইসলাম হলো নির্ভেজাল সত্যের আদর্শ। সত্য ও মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তার কারণ এই যে, আল্লাহর দেয়া রূহ বা আত্মা এই দু'টোরই উৎস। তাই কোন ব্যক্তির উদ্দীপ্ত মন যখন এই আদর্শের সংস্পর্শে আসে ও তার সাথে পরিচিত হয়, তখন দেখা যায় যে, তার সহজাত প্রকৃতি তার ব্যাপারে কোন সংকোচ বা অসম্মতি তো দেখায়ই না, বরং এমন প্রচন্ড বেগে তার দিকে ছুটে যায় যেন, তাদের মধ্যে কতকালের সখ্যতা বিরাজমান। অত্যন্ত চেনা, জানা ও বিশ্বস্ত হিসেবে পরম আগ্রহ-প্রীতি ও ঔৎসুক্য নিয়ে তার দিকে ধাবিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ

مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ۝

"রসূলের কাছে নাযিল হওয়া বাণী শুনতেই সত্য উপলব্ধি করণে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আর তারা বলে ঃ হে রব ! আমরা ঈমান আনলাম। কাজেই আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে শামিল করুন।"

-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৩)

www.pathagar.com

এরূপ ত্বরিত উপলব্ধির রহস্য এই যে, প্রতিটা মানুষের বিবেকে আল্লাহর কলম দ্বারা পরম সত্য উৎকীর্ণ হয়ে আছে। স্বচ্ছ ও মরিচাহীন বিবেক যে কোন ব্যক্তির মুখ দিয়ে সত্য উচ্চারিত হতে শুনলেই তাকে নিজের যথার্থ মনের কথা বলে অনুভব করে এবং তার হৃদয়পটে উৎকীর্ণ সত্যেরই প্রতিধ্বনি মনে করে। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ○

"আসলে তা হচ্ছে জ্ঞানী লোকদের হৃদয়ের মধ্যে রক্ষিত সুস্পষ্ট নিদর্শন। বস্তুত আমার নিদর্শনমালাকে জালেমরা ছাড়া আর কেউ অগ্রাহ্য করে না।"–(সূরা আল আনকাবূত ঃ ৪৯)

অতএব আপনি যখন দেখবেন যে, আপনার চেতনা ও অনুভূতি স্থবির হয়ে গেছে এবং নিজের আদর্শের প্রতি তেমন উদ্দীপনা নেই, অথবা যখন আপনার মনে হবে যে, আপনি শুধুমাত্র অলংকার সমৃদ্ধ বাকপটুতার দ্বারা জনগণকে মোহিত করতেই জনগণের সামনে বক্তার বেশে হাজির হয়ে থাকেন, তখন আপনি বুঝে নেবেন যে, উভয় অবস্থাতেই নিজের দ্বীন তথা ইসলামকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই নতুন বুঝটা হলো, আবেগ উদ্দীপ্ত বুঝ। নতুন করে একনিষ্ঠ বিশ্বাস অর্জনকেও এ ক্ষেত্রে জরুরী মনে করতে হবে। এই একনিষ্ঠ বিশ্বাস হলো সেই শক্তিমান ঈমান যা আপনার বিবেককে আপনার দাওয়াতের ব্যাপারে প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় করে রাখে। ফলে আপনার শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে, পরিবার-পরিজনে, স্বদেশে-বিদেশে, আলোচনার টেবিলে—মোটকথা সর্বত্র যখনই কোন মানুষের সাথে দেখা করতে যাবেন, তখন দ্বীনের দাওয়াতকে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়েই তা করবেন। কারো সাথে শত্রুতা কিংবা বন্ধুত্ব যাই হোক না কেন, এবং যখনই আনন্দিত কিংবা মনোক্ষুণ্ন হবেন তখন তাও ঐ উদ্দেশ্যেই হওয়া চাই। এক কথায় বলা যায় যে, আপনার জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে দ্বীনের দাওয়াতই হবে প্রধানতম বিবেচ্য বিষয়। ওটাই হবে জীবনের সারবস্তু ও কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য। জীবনের অন্যান্য আরাম-আয়েশের উপাদান যতই থাক, তা থাকবে গৌণ বিষয় হিসেবে, একথাটুকুকে বাড়াবাড়ি বলে মনে করবেন না। কেননা আপনি একজন আহবায়ক—আহূত ব্যক্তি নন। এই উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য তা আপনাকে খুলে বলা নিষ্প্রয়োজন।

এভাবে নিজের দাওয়াতের কাজে এগিয়ে যান। গুরুত্বের সাথে তা ছড়িয়ে দিন। এর জন্য নিজেকে সঠিকভাবে উৎসর্গ করুন এবং আন্দোলনের নেতা ও কর্মীর সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ বৃদ্ধি করুন। এভাবে করতে করতে তরবারীতে

www.pathagar.com

ধার দিলে যেমন মরিচা দূর হয়ে যায়, আপনারও এক সময় সেই অবস্থা হবে এবং ইনশাআল্লাহ আপনি হবেন অজেয় ও অদম্য।

এ হলো প্রথম মূলনীতি—যা প্রচারকের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় মূলনীতিটার সম্পর্ক হলো স্বয়ং প্রচার বা দাওয়াতের সাথে। প্রচলিত পারিভাষিক ও টেকনিক্যাল সংজ্ঞা বাদ দিলে দাওয়াত হলো, একটি জাতিকে এক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে নিয়ে যাওয়া। এটাই তার প্রধান কাজ। আর এ থেকেই তার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত কর্মপদ্ধতিরও সন্ধান পাওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু ভাবে সে নিজেকে এবং আন্দোলনকে মোটেই জানে না।

প্রচার ও সংস্কার

কিছু লোক এমনও আছেন যারা 'সংস্কার' কথাটার অর্থ শুধু নতুন নতুন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকেই বোঝেন অথবা নতুন নতুন খাল খনন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, অর্থ লগ্নি প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং দেশের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম কল-কারখানা প্রতিষ্ঠাকে বোঝেন। তারা তাদের কথা-বার্তায় পত্র-পত্রিকায় ও সম্মেলনাদিতে প্রদত্ত ভাষণে এ ধরনের আরো অনেক কিছুর স্বপক্ষেই মুখে খই ফোটান এবং সংস্কার কর্ম বলে অভিহিত করেন। অথচ আসলে এসব ব্যাপারের সাথে সংস্কারের কোন সম্পর্কই নেই। এগুলো তো হলো জৈবিক প্রয়োজন পূরণের উপাদান।

সমাজের জন্য এসব জিনিস অপরিহার্য। নিছক এ যুক্তি দেখিয়েও ঐসব জিনিস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে। নিছক এগুলোকেই সংস্কার ও ত্রাণকার্য বলে অভিহিত করার কোন যুক্তি বা বৈধতা নেই। একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে যদি কেউ পানিতে ডুবন্ত প্রায় দেখতে পায় এবং তাকে উদ্ধার না করে তার জন্য খাবার সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে তার সে আহম্মকীর ফলাফল কি দাঁড়াবে ? কিংবা কেউ যদি একজন মুমূর্ষু রোগীকে দেখেও তার রোগ চিকিৎসার জন্য কোন ডাক্তার না ডেকে তার জন্য অংক শেখাবার শিক্ষক রেখে দেয় অথবা এমনি ধরনেরই অন্য কোন কাজ করে—তাহলে সে বোকামীর খেসারতই বা কেমন দাঁড়াতে পারে ? বড় বড় নদী-খাল, পুল, বিদ্যাপীঠ, কলকারখানা, থিয়েটার, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপে কি লাভটা হয়েছে ? মানুষের আত্মার রোগ এবং মনের খারাপ অভিরুচী দূর করার বাহ্যত এসব জিনিসের গুরুত্ব বেশী দিয়ে শুধু নৈরাজ্য, অস্থিরতা, গোলযোগ আজ প্রতিষ্ঠিত ও কাল উৎখাত হওয়া নিত্যনতুন মতবাদ এবং আজ নিভে আবার কাল জ্বলে ওঠা যুদ্ধের আগুন ছাড়া আর কিছুই তারা পায়নি।

হে আল্লাহর পথে দাওয়াতকারী ! আপনার জানা থাকা দরকার যে, শুধু একটা জাতির দায়িত্ব নিয়ে আপনি দুনিয়ায় আসেননি, বরং পুঁতিগন্ধময় নোংরা

www.pathagar.com

শ্বাসরোধক পরিবেশে বসবাসকারী একটি মানব গোষ্ঠীকে উদ্ধারের ব্যাপারেও আপনার ওপর কঠিন দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এই নোংরা পরিবেশ থেকে পরিচ্ছন্ন সুন্দর রুচিকর ও প্রশস্ত ঝলমলে পরিবেশে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া আপনার কাজ, বস্তুবাদ সর্বস্ব জগত থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের জগতে, এক ধরনের মানসিক পরিবেশ থেকে আর এক ধরনের মানসিক পরিবেশে নিয়ে যেতে হবে তাদেরকে। এরপর সেই নয়া পরিবেশে তাদের নতুন জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে যা যা দরকার নির্মাণ করা যেতে পারে। সুতরাং আপনার কর্তব্য হলো সর্বশক্তি নিয়োগ করে এগিয়ে যাওয়া, সংকল্পে অবিচল হওয়া। সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে কাজ করা এবং নিজে যে আদর্শের দিকে দাওয়াত দেবেন তার চাহিদা অনুসারে কাজ করা। তার চাহিদা যদি হয় বই কিতাব ছাপানো কিংবা বিদ্যাপিঠ খোলা, তাহলে তাই করুন। মনে করবেন না যে, ইতিপূর্বে আমরা যে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছি এটা তার উল্টো। না, তা নয়। কারণ আপনি এসব কাজে নিয়োজিত হবেন শুধুমাত্র শিক্ষার আলো ছড়ানো এবং মানসিকতার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে।

দাওয়াত ও লেখালেখি

কিছু লেখক আছেন যারা মনে করেন প্রবন্ধ ও বই লেখা দ্বারাই সমাজ সংস্কারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। এতে করে আমরা পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান, নীতি ও আদর্শ, প্রশাসন ও স্বাধীনতা—সর্বোপরি পার্থিব আয়েশের উপকরণাদি ভোগের বিশেষ স্টাইল জানতে পারি। তাই তারা কিছু প্রবন্ধ বা বই ছেপে প্রকাশ করলেই মনে করেন, একটা আদর্শ তারা সমাজকে দিলেন এবং দেশ ও জাতির এক মস্ত খিদমত করে ফেললেন। এ জাতীয় লেখায় পাশ্চাত্যবাসীর বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে তা সবাইকে মুগ্ধ করে। তাই বলে তাতে লেখকের নিজ দেশের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কোন আবেদন আছে এমন কথা বলা চলে না।

ধরুন একটা প্রবন্ধ বা বই পড়ার পর মনে হচ্ছে যে, তা পাঠককে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশে নিয়ে গেছে, তার মনের দুয়ারের সামনে নতুন আধ্যাত্মিক দীগন্ত খুলে দিয়েছে। আর সে দিকে পাঠকের মনকে পুরোপুরি কিংবা আংশিকভাবে চালিত করেছে। আর পাঠককে তা প্রবলভাবে ও গভীর ঈমানী জজবা সহকারে সেই সামগ্রিক আল্লাহর আদর্শের দিকে আহবান জানিয়েছে। যা তাকে সৎ ও সুখী জীবন যাপনে সক্ষম করে এবং এতটা সুখী জীবন—যা হৃদয়কে দেয় আল্লাহর জ্ঞান লাভের যথার্থ অধিকার এবং দেহকেও দেয় তার পূর্ণ অধিকার। এ রকম প্রবন্ধ বা বইয়ের লেখক নিসন্দেহে একজন সুদক্ষ ও

www.pathagar.com

বুদ্ধিমান প্রচারক। পক্ষান্তরে যে লেখা পড়লে মনে হয় নিছক সান্ত্বনা দেয়া, সিনেমা কিংবা সচিত্র পত্রিকায় দেখবার মত কোন জিনিস কলম দিয়ে লিখে দেখানো অথবা লেখকের পসন্দসই এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও তথ্যাবলী পরিবেশন করা ছাড়া তাতে আর কিছুই নেই, তাহলে বুঝতে হবে ঐ লেখক বিকারগ্রস্ত তোতা পাখী ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, তার জ্ঞান পাঠককে কোন প্রজ্ঞা দিতে পারেনি, দিতে পারেনি সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে প্রয়োজনীয় কোন নিখুঁত তত্ত্বজ্ঞান। সে লেখক শুধু এটুকু মনে করেই শান্ত হয়ে বসে আছে যে, পাশ্চাত্যবাসীর কাছে যা কিছু বাস্তব ও তাত্ত্বিক সম্পদ রয়েছে, মানব জাতির কাংখিত সভ্যতার জন্য তার চেয়ে মহৎ আদর্শ আর কিছু হতে পারে না। অথচ এ ধারণা নিরেট মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। পাশ্চাত্যবাসীর সংগৃহীত তত্ত্বজ্ঞান এবং তাদের জীবনধারার অনুশীলন ও অনুকরণ যত বেশী করা হোক, তাতে ঐ মূর্খতা কমা তো দূরের কথা, আরো বেড়ে যাবে। এটা তাদের গোমরাহী ও বিভ্রান্তিকে আরো গভীর করবে।

নিকৃষ্টতম দাস

পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান যারা আহরণ করে তারা যদি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হতো, আত্মবিশ্বাসী হতো এবং আহরিত জ্ঞানের মধ্য থেকে ভালো-মন্দ বাছ-বিচার করে গ্রহণ ও বর্জনের উদ্যোগ নিত, তাহলে তাদের কাছে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হতো এবং স্বজাতির প্রভূত কল্যাণ তারা সাধন করতে পারতো। কিন্তু তারা সে কষ্টটুকু স্বীকার করতে রাজী হয়নি এবং নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব ও সংকল্পকে বৃথা-নিরর্থক প্রমাণিত করেছে। তারা নিজেদের মনিবদের কাছে নিজেদের মন ও বিবেককে বিকিয়ে দিয়েছে। মনিবরা তাদের মনে যা ঢোকান তাই ঢোকে এবং তাদের বিবেককে যা বুঝান বিবেক তাই বোঝে।......বস্তুত গোলামীর যত প্রকার আছে, তার মধ্যে এটাই জঘন্যতম। কেননা এতে ব্যক্তিত্বকে একেবারেই বিলীন ও নিশেষ করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই দেখা যাবে, একজন জার্মান তার জার্মানত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট। আর এক ফরাসী তার ফরাসী জাতীয়তা নিয়েই গর্বিত। আর যে ব্যক্তি বৃটেনে শিক্ষা লাভ করেছে, তাঁর কাছে বৃটিশ জাতিই সর্বোচ্চ অনুকরণীয় আদর্শ। অন্যান্যদের ব্যাপারও তেমনি। এসব লেখক ও পন্ডিতদের বিভ্রান্তি ও মূর্খতা—বরং সত্যি বলতে কি, তাদের অন্ধত্ব ও বেকুফীর প্রমাণ হিসেবে এটুকুই যথেষ্ট যে, তাদের কেউই তাদের নেতা ও শাসকদের দুর্বল জাতিকে শোষণ ও তাদের দেশ ও সম্পদ জবর দখলের সমালোচনা করে একটা কথাও লিখতে পারেনি। সমালোচনা দূরে থাক, এমন ঘৃণ্য অপরাধ করার সময়েও তাদের কল্পিত মহৎ গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা কীর্তন করতেও কোন লেখক কসূর করেনি। উদাহরণ স্বরূপ

www.pathagar.com

বলা যায় যে, কোন ফরাসী বুদ্ধিজীবী লেখককে আমরা দেখলাম না তিউনিস, আলজিরিয়া, মরক্কো, সেনেগাল ও সোমালিয়াকে জবর দখল করার জন্য তার বিরুদ্ধে কোন বিবৃতির বাণ নিক্ষেপ করেছে। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব দেশের মানুষের ওপর এমন সব বর্বর হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে—যা যে কোন রুচীশীল ভদ্র ও স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের বিবেকের কাছে অসহনীয়—সেখানেও দেখা যায় না তাদের টু শব্দটিও করতে। কোন ফরাসী পন্ডিত কি তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে একটি আবেগময় ডাক কিংবা ক্রুদ্ধ গর্জন ছুড়ে দিতে পেরেছে ঐসব নিষ্ঠুর স্বৈরাচারীর কানে ? না, তারা এসব দেখেও না দেখার ভান করেছে। তাদের নেতা, শাসক ও উস্তাদদের কেবল গুণই তাদের চোখে পড়েছে। তাদের দেশের ভেতরে যে অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতার সয়লাব বয়ে চলেছে, সেটাই তাদের নজরে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি তো বলবো, যে কোন বিচক্ষণ পাঠক ঐসব পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবীর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও মানবতাবোধের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দিহান না হয়ে পারে না। কেননা নিজের মানুষ হয়ে জন্ম নেয়ার উদ্দেশ্য কি, তা যে না বুঝে, তাকে কোন মতেই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে মেনে নেয়া যায় না। আর যে ব্যক্তি কল্যাণের পথকে পরিত্যাগ করে সে কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না। "বস্তুত যে ব্যক্তি সত্য প্রকাশ না করে চুপ থাকে সে হলো বোবা শয়তান।" (হাদীস)

এ ধরনের যে রচনা মানুষের চিন্তার রাজ্যে পরিবর্তন ও আলোড়ন সৃষ্টি করে না বরং মানুষকে চলমান যান্ত্রিক সভ্যতার গভীরতম প্রদেশে ঠাঁই করে দেয়, কোন সুস্থমনা লেখকের রচনা সে ধরনের হওয়া উচিত নয়। এ জাতীয় লেখকের মেকি পান্ডিত্য ও মূর্খতার প্রকৃত স্বরূপ সকলেরই এখন থেকে জেনে নেয়া উচিত এবং তাদের খ্যাতি ও উপাধির ছড়াছড়ি দেখে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়। একজন মুসলিম লেখকের পয়লা ভাবনা এই হওয়া দরকার যে, তার লেখনি দিয়ে কিভাবে একটি ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলা যায়, কিভাবে একটি নিস্তেজ প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করা যায় এবং প্রচলিত লেখকরা বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব দিক শিক্ষা দেয় না, তা কিভাবে শিক্ষা দেয়া যায়। সবসময় তাকে মনে রাখতে হবে যে, সে একজন নেতা ও চিকিৎসক এবং তার সবচেয়ে বড় কাজ হলো বিবেককে পুনরুজ্জীবিত করা ও মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্তের অনুকরণে উৎসাহ দান।

দাওয়াত ও ওয়াজ

একজন প্রচারকের এটা জানা দরকার যে, তার ওয়াজ তথা উপদেশদানের যে ধরন ও পদ্ধতি থাকবে, সেটাই তার লেখার ধরন হওয়া চাই। আর উভয় অবস্থাতেই তার কাজ হুবহু নবীদের কাজ। মানুষের মন ও ব্যক্তিত্বকে এতটা

www.pathagar.com

শুধরে দেয়া তার কর্তব্য যেন আল্লাহ্ তার সমস্ত বক্রতা ও বিচ্যুতি দূর করে দেন। যে ওয়াজ বা নছিহত এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ, সে ওয়াজ সম্পূর্ণ পন্ডশ্রম এবং বৃথা চেষ্টা।

ওয়াজ ও নছিহতে নতুনত্বের চমক সৃষ্টির নামে অতিমাত্রায় রসিকতা পরিত্যাজ্য। জনসাধারণের মন ভোলানোর জন্য উদ্দেশ্যহীন গালগল্প করে সময় কাটানোও অনুচিত। এক ধরনের ওয়ায়েজ আছে যারা মানুষের সাথে নিতান্ত হালকাভাবে এবং ভাসা ভাসাভাবে মেশে। তাই লোকেরা তাড়াতাড়ি মাহফিলে ভঙ্গ দিয়ে চলে যেতে পারে এই আশংকায় তারা ঐতিহাসিক কাহিনী, পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের কিস্সা এবং আয়াত নাযিলের পটভূমি অত্যন্ত খাপছাড়া ও এলোমেলোভাবে আলোচনা করে। এসব আলোচনার সামষ্টিকভাবে কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে না। শুধুমাত্র লোকজনকে কিছু সময় বসিয়ে রেখে সময় কাটানোর সুযোগ দেয়া এবং নির্দোষ ধরনের একটা উপভোগ্য সঙ্গদান ছাড়া এর কোন স্বার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। একে নেতিবাচক ওয়াজ বলা চলে। আমাদের কর্মসূচীতে এর কোন স্থান নেই এবং আমাদের প্রচারকদেরও এর সাথে কোন সংস্রব রাখার দরকার নেই। যে কর্মসূচী আমরা আপনাকে দিয়েছি তার দাবী হলো এই যে, অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে আপনাকে জনগণের আবেগ ও অনুভূতিতে ঠাঁই করে নিতে হবে, তাদের বিবেক ও প্রজ্ঞাকে আলোড়িত করতে হবে এবং মনের সমস্ত আবেগ ও আকর্ষণকে আল্লাহমুখী করতে হবে। এটা যখন করা সম্ভব হবে এবং জনতার মন বক্তার কথা শুনতে উদগ্রীব হয়ে উঠবে তখন বক্তা তাদেরকে যে রকম খুশী চালিত করতে পারবে এবং তাদের মনকে যে কোন বিষয় মানিয়ে নিতে পারবে। সে ক্ষেত্রে জনগণ তাঁর কথা শুনবে ও মানবে।

নিরস, নির্জীব ও লক্ষ্যহীন ওয়াজ বর্জন করা উচিত। যে কোন ক্ষেত্রেই এমন নীতিভঙ্গী অবলম্বন করতে হবে যে, ঐ কর্মক্ষেত্র থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার সময় যেন কিছু না কিছু শিকার ধরে নিয়ে যাওয়া যায়। বক্তাকে খুবই দক্ষ ও বিচক্ষণ শিকারী হতে হবে, সতর্কতার সাথে জাল ফেলতে হবে এবং দেখতে হবে ঐ জালে কি কি আটকা পড়লো। যারা আটকা পড়লো তাদেরকে ইখওয়ানুল মুসলিমুনে (পরিপূর্ণ ইসলামের দিকে আহবান জানায় এবং ইসলামের আলোকে কর্মীদের সমগ্র জীবন গড়ে ও পরিশুদ্ধ করে এমন ইসলামী সংগঠনে) সংগঠিত করুন—যা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলেরই সংগঠন।

একথা অস্বীকার করি না যে, নেতিবাচক ওয়াজ ও বক্তৃতা কখনো কখনো দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে যখন ইসলামের সামগ্রিক পুনপ্রতিষ্ঠার সময় আসে এবং সর্বব্যাপী বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে সমাজকে মুক্ত করার

www.pathagar.com

চেষ্টা শুরু হয়, তখন তা ক্ষতিকর। ইসলামের পুনপ্রতিষ্ঠার কাজ যখন সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং জাতি যখন সর্বব্যাপী বিকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে তখন হুমকি ধমকি ও তিরস্কারে পরিপূর্ণ নেতিবাচক ওয়াজের উপযুক্ত সময় আসে। এ সময় বিপ্লবাত্মক ও আমূল পরিবর্তনকামী ওয়াজের দরকার হয় না। এ সময়ে প্রচারকের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় সেই ডাক্তারের মত, যিনি একটি সুস্থ দেহের সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন এবং "চিকিৎসার চেয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা উত্তম" এই মূল্যবান বহুল প্রচলিত হীতোপদেশ মেনে চলেন।

প্রিয় দ্বীনি ভাই ! আশা করি এ আলোচনা থেকে দাওয়াত ও দায়ী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বুঝ আপনার এসেছে। আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করুন এবং আমাদের সকলকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন। আমীন !

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
দাওয়াতকারী বা প্রচারকের মেজাজ

ভূমিকা

প্রচারকের মেজাজ বা স্বভাব বলতে তার অপরিহার্য তিনটে উপকরণ বুঝায় ঃ একটা হলো তার বুদ্ধিবৃত্তিক উপকরণ, দ্বিতীয়টা আধ্যাত্মিক উপকরণ এবং তৃতীয়টা মনস্তাত্ত্বিক উপকরণ, অর্থাৎ প্রথমত, তার বাস্তব বুদ্ধিমত্তা চাই নিরেট তাত্ত্বিক হওয়া যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, তার আধ্যাত্মিক জীবনবোধ থাকা চাই। বস্তুবাদের ঊর্ধে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি দরকার। অবশ্য সেটা হতে হবে সামাজিক আধ্যাত্মিকতা যা সংসার ও লোকালয় থেকে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন করে না এবং বস্তুগত উপায় উপকরণের সাহায্য নিতে তাকে নিবৃত্ত করে না। কেননা সংসার ও বস্তুগত উপায় উপকরণ বর্জন আল্লাহর আইন-বিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই সম্ভব। তৃতীয়ত, ইতিবাচক গঠনমূলক ও প্রয়োগিক স্বভাব ও মনোবৃত্তির প্রয়োজন নেতিবাচক মনোবৃত্তি নয়।

কখনো কখনো প্রচারকের ব্যক্তিত্ব ও উপকরণসমূহ খুবই মজবুতভাবে বিদ্যমান থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে এ জাতীয় স্বভাব আল্লাহর বিশেষ দান। কখনো এ রকম নাও থাকতে পারে। যার ব্যক্তিত্বে এটা জন্মগতভাবে নেই তার কর্তব্য, এ গুণাবলী অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করে নেয়া। এতে করে আল্লাহ্ চাহেতো তাকে আর যাই হোক তার চেষ্টার ফসল থেকে বঞ্চিত হতে হবে না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাস্তবানুগ বুদ্ধিমত্তা বা কাণ্ডজ্ঞান

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, নিজের জাতির সার্বিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনই একজন ইসলাম প্রচারকের যথার্থ কর্তব্য। অথচ মানুষই হলো সেই প্রাণী যাকে নাগালের মধ্যে আনা সবচেয়ে কঠিন। তার অতিমাত্রায় তর্কপ্রিয়তা, সহসা বিদ্রোহ করার প্রবণতা এবং অত্যধিক স্বেচ্ছাচারিতার কারণে তার প্রতি যথোচিত কর্তব্য পালন করা ইসলাম প্রচারকের পক্ষে একটা খুবই দুরূহ কাজ। এমনকি সময় সময় এও মনে হয় যে, একজন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক কদমও সামনে এগুতে বলার চেয়ে একটা পাহাড়কে স্থানান্তরিত করাও যেন সহজ। তবে মনের প্রতি মানুষের আনুগত্য খুবই বিস্ময়কর চাই তাকে ভালো বা মন্দ যে দিকেই ডাকুক না কেন। আর এই মনের ডাকে কাজ করতে গিয়ে যে কষ্ট ও অর্থ ব্যয় হয়, তা সহ্য করার ক্ষমতাও তার আশ্চার্যজনক। সত্যি বলতে কি, এই ত্যাগ তখন তার কাছে অতীব সুস্বাদু ও সুন্দর বলেই অনুভূত হয়। একজন দুর্ধর্ষ পাপিষ্ঠকে আয়ত্বে আনার ব্যাপারে মনের ক্ষমতা সত্যিই বিস্ময়কর। আসলে এটা মানুষের সৌভাগ্যই বলতে হবে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে একজন মননশীল ও প্রাজ্ঞ প্রচারক মনকে জয় করার জন্য নিজের সমগ্র চেষ্টা-সাধনাকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে। এভাবে তাকে আয়ত্বে আনার পর তাকে সানন্দে ও সোৎসাহে ইপ্সিত সংশোধন ও পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত করতে পারে।

তত্ত্বজ্ঞান তুলে ধরার কুরআনী পদ্ধতি

এখন প্রশ্ন হলো, মানুষের মনকে কিভাবে সম্বোধন করবো? কি পন্থায় তার সামনে আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান তুলে ধরবো? কেউ কেউ আছেন নিরেট কেতাবী ও তাত্ত্বিকভাবে তত্ত্বজ্ঞান পরিবেশনের পক্ষপাতী। নিছক যুক্তি ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তা, মূলনীতি ও তার শাখা-প্রশাখা এবং বিবিধ রকমের তথ্য ও আনুমানিক বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর ধার তারা ধারেন না। মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে এ ধরনের অবাস্তব তাত্ত্বিকতা ও কেতাবী পন্থা পরিহার করা উচিত। এ পন্থায় জনসাধারণকে আলোড়িত করা যায় না। এতে করে কোন আন্দোলন বা অভ্যুত্থানও গড়ে তোলা যায় না। সত্যিকার দায়ী তিনি—যিনি বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করার সাহস রাখেন ও মোকাবিলা করেন এবং অকৃত্রিম সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত জীবনধারাকে শুধরে দেন।

আল্লাহ স্বয়ং যখন আমাদের কাছে মহাবিশ্বের যাবতীয় নিগূঢ় তত্ত্ব, তথ্য ও দর্শন তুলে ধরেন, তখন তা কেতাবী ও তাত্ত্বিক কায়দায় পরিবেশন না করে

www.pathagar.com

কত বাস্তব ও ইন্দ্রিয়ানুভূত করে পরিবেশন করেন, তা লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা ভালো বুঝে আসবে। যেমন তাঁর অপার শক্তি ও মহিমার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তার গভীর দার্শনিক তত্ত্ব, তথ্য ও গোপন রহস্য উন্মোচন করেননি। বরং তা এমনভাবে পেশ করেছেন যে, আশপাশের সৃষ্টিজগতের ভেতরেই তার পরিচয় মেলে। চোখ মেলে তাকালেই যে কেউ সমুদ্রে ও পাহাড়ে, ফুলে ও বৃক্ষে, চাঁদে ও সূর্যে এবং আসমান ও জমীনের আরো বহু বস্তুতে তা দেখতে পাবে। এ রকম বাস্তবভিত্তিক পরিবেশনা ঐসব নিগূঢ়তম তত্ত্ব উদঘাটন ও উপলব্ধিতে যথার্থই সহায়ক। জীবন ও মৃত্যু নিয়ে তিনি কোন দার্শনিক তত্ত্বের কচকচানি উপহার দেননি। বরং প্রতিদিন আমরা যেসব জন্ম ও মৃত্যু দেখি, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করি, তার বাস্তব আলোচনা করার ভেতর দিয়েই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এরপর শুধু দেখা, চিন্তা করা, ভাবা ও শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করণীয় থাকে না। আল্লাহর নির্ভুল বিবেচনা অনুসারে এটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এর বেশী কিছু করা যেমন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিরও ক্ষমতার বাইরে, তেমনি তাতে আমাদের কোন বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক ফায়দাও নেই।

মানুষের জন্মগত স্বভাব

বেঁচে থাকার আকাংখা, উচ্চতর পদমর্যাদা ও অগ্রগণ্যতা লাভের বাসনা, স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি টান ইত্যাকার কতিপয় গুণ বা শক্তি মানুষের সহজাত। এসব গুণ বা শক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব ও বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করে এমন কোন গ্রন্থ আল্লাহ নাযিল করেছন কি ? হ্যাঁ, গ্রন্থ একটা নাযিল করেছেন ঠিকই, তবে সেটা হলো নৈসর্গিক গ্রন্থ—জীবন নামক গ্রন্থ—যা প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টা ও প্রতি মিনিটেই মানুষের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করে চলেছে। মানুষের প্রতিটা কাজ তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সহজাত গুণেরই বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু নয়।

বাস্তব কর্মপদ্ধতির আবশ্যকতা

যারা নিছক অনুমান সিদ্ধ মতবাদসমূহের সাথেই শুধু পরিচিত, তারা যখন জীবনের বাস্তব রীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন না, তখন কার্যত নিজেদের জীবনকেই তারা বিকৃত ও বিনষ্ট করে ফেলেন। অতপর নিজেদের মেজাজ-মর্জির সাথে সংগতিশীল সহজ (অথচ বিকৃত) পন্থাটাও জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের জীবনকেও বিকৃত ও বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হন। এমতাবস্থায় একজন বিদগ্ধ প্রচারক খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা, দুর্নীতি-দুষ্ট সভ্যতাকে প্রতিহত করা, ভালো কাজের দিকে ডাকা এবং ন্যায়নিষ্ঠ সভ্যতার পথে মানুষকে পরিচালিত করার মহৎ কাজে যতই আগ্রহী ও ইচ্ছুক থাক না কেন, তাতে কিছুই যায় আসে না। কাজেই তত্ত্বকথা পেশ করার ব্যাপারে আল্লাহর রীতি মেনে চলুন। বাস্তব পন্থায় দাওয়াত দিন। দু' পায়ে হেটে চলুন,

www.pathagar.com

জমীনে সক্রিয়ভাবে কাজ করুন। তাহলেই মানুষের মধ্যে আপনার দাওয়াতের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। হৃদয়ে সজীবতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে গতিময়তা সঞ্চার করতে হলে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। আর যে মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ে সজীবতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে গতি সঞ্চার হবে, সে মুহূর্তেই বুঝতে হবে যে, আপনি তার জন্য যে ধরনের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার আশা করেছিলেন, ঠিক সে ধরনের জীবনই সে লাভ করেছে। অবশ্য সর্বাবস্থায়ই নিছক তত্ত্বাগিশদের মতবাদ এড়িয়ে চলতে হবে। কেননা ওটা মানুষকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে দেয় এবং ইসলামের দাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

যেসব বাস্তব কর্মপন্থা মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে আপনার দাওয়াতকে পৌঁছে দিতে সক্ষম, এবারে আমি তার কয়েকটা উল্লেখ করবো ঃ

এক ঃ কিস্সা কাহিনী

পয়লা নম্বর হলো কিস্সা কাহিনী। এর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে জীবনের বিভিন্ন দিক ও অংশের ছবি ফুটে ওঠে। বিভিন্ন ব্যক্তি, তাদের চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র, ধ্যান-ধারণা, মানসিক ঝোঁক ও আবেগ এবং তাদের স্বাভাবিক ও সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি—সবই গল্পের শ্রোতা বা পাঠকের সামনে তুলে ধরে। তাদের কার্যকলাপ, আচরণ ও সংলাপ তুলে ধরার মাধ্যমেই তাদের সঠিক পরিচয় সে ব্যক্ত করে। তাদের কার্যকলাপ ও আচরণ দেখার পর এবং তাদের সংলাপ শোনার পর মানুষের ভেতরকার বদ্ধমূল স্বভাব ও চিন্তার ধরন সম্পর্কে সে অবগত হয়। আর এতে করে যারা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ তাদের চিনতে পেরে তার মন উৎফুল্ল হয় এবং যারা তিমিরাচ্ছন্ন মন ও বিকারগ্রস্ত উপকরণের অধিকারী, তাদের চিনতে পেরে তার মন বিক্ষুব্ধ ও বিসন্ন হয়। গল্পের পাঠক বা শ্রোতার মনে হতে থাকে যেন তাদেরকে সে স্বচোক্ষেই দেখছে, স্বকর্ণেই তাদের কথা শুনছে এবং তাদের সাথেই বসবাস করছে!

গল্প বা কিস্সার আরো একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকের মনেই তার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ বিদ্যমান। একজন দক্ষ গল্পকার শ্রোতাকে এমনভাবে মজিয়ে রাখতে পারে যে, গল্পের পরবর্তী অজানা অংশকে জানার সুতীব্র কৌতূহলের বশে তার চোখ, কান ও সমগ্র স্নায়ুমন্ডলী গল্পের বর্ণনা ধারার প্রতি গভীরভাবে নিবদ্ধ থাকে।

এই দু'টো বৈশিষ্ট্যের কারণেই গল্প ইসলামের দাওয়াতদাতার জন্য একটা অনুপম উপকরণ—যার দ্বারা সে মানুষের হৃদয়ের গভীরতম প্রকোষ্ঠে আপন বক্তব্যকে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম। প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যের দরুন তা ইসলামের শিক্ষাকে এতটা বাস্তব ও জীবন্ত করে পেশ করে যে, তা শ্রোতা বা পাঠকের সমগ্র চেতনা ও অনুভূতিকে প্রবলভাবে আলোড়িত ও আন্দোলিত করে। আর

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য জাগৃতি ও গ্রহণের স্পৃহা জন্মায়। এটা মানুষের মনকে উন্মুক্ত পাত্র বানিয়ে দাওয়াতদাতার সামনে তুলে ধরে—যাতে তিনি তার মধ্যে যা খুশী ঢালতে পারেন এবং ঢালার পর তা স্থীর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সুতরাং প্রত্যেক দাওয়াতদাতাকে আহ্বান জানাই, এ উপকরণটা কাজে লাগাবেন। কেননা কিস্‌সা-কাহিনী বলা আল্লাহ্‌রও পসন্দনীয় রীতি। কুরআনে তিনি কিস্‌সা-কাহিনী বর্ণনা করার রীতি চালু করেছেন ব্যাপকভাবে। তাঁর রসূলকে তিনি শুনিয়েছেন সর্বোত্তম কাহিনী। সে কাহিনীতে রসূল ও তাঁর উম্মতের সত্যের ওপর অবিচল থাকার সহায়ক হিসেবে সর্বোত্তম নছিহত ও উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَانُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ج وَجَاءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ(هود : ١٢٠)

"(হে নবী !) নবীদের যার যার কিস্‌সাই আমি তোমাকে শুনাই, তা তোমার মনকে শক্ত করার জন্যই শুনাই। এতে তোমার জন্য এসেছে মহাসত্য এবং মুমিনদের জন্য নছিহত ও জাগরণের উপরকণ।"

বস্তুত কুরআনের কিস্‌সা শ্রেষ্ঠতম কিস্‌সা। আল্লাহ্ এর দ্বারা সকলের মনের সংকীর্ণতা দূর করেন এবং দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেন। এসব কিস্‌সার দ্বারা আকীদা-বিশ্বাসকে পরিপক্কতা নৈতিক ব্যবস্থাকে পূর্ণতা এবং ইসলামী সভ্যতার স্তম্ভগুলোকে দৃঢ়তা দান করা হয়েছে। ফলে ইসলামী সভ্যতা পরিণত হয়েছে পূর্ণতম, নিখুঁত ও নিষ্কলুষ সভ্যতায়।

কুরআনের কিস্সার একটি দৃষ্টান্ত

উদাহরণ স্বরূপ আমি হযরত সোলায়মান ও সাবার রাণীর কিস্‌সা পেশ করছি। এ কিস্‌সার সবক'টা মূল্যবান শিক্ষা যদি আমি বর্ণনা করতে না পারি তবে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিস্‌সাটা এই ঃ হুদহুদ পাখী হযরত সোলায়মান (আ)-কে জানালো যে, সমগ্র সাবা সাম্রাজ্যে শিরক ও গোমরাহী চালু রয়েছে। হযরত সোলায়মান দূত পাঠিয়ে তাদেরকে হুকুম দিলেন, তারা যেন অবিলম্বে বিশ্ব প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ তথা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে কিছু অর্থকড়ি পাঠিয়ে দিয়ে হযরত সোলায়মানকে খুশী করার চেষ্টা চালালো। বলা বাহুল্য, সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তিনি টাকাকড়ি প্রত্যাখ্যান তো করলেনই অধিকন্তু তাদেরকে এক অপরাজেয় সেনাবাহিনী দিয়ে শায়েস্তা করার হুমকী দিলেন। এ হুমকীর পর তারা সোলায়মান (আ)-এর হুকুম মেনে নিল এবং ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর কাছে হাজির হলো।

www.pathagar.com

এই কিস্‌সাটার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা একটি উৎকৃষ্ট মানের আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যে ক'টি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক মৌল উপকরণ প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে উপকরণগুলো এই ঃ

১—শক্তি ও জ্ঞান

এ দু'টো হলো একটা সুবৃহত রাষ্ট্রের ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়ীত্বের প্রধান ও মৌল উপাদান। শক্তি বলতে বুঝায়, দৈহিক বল, প্রশিক্ষিত সেনাদলের প্রাবল্য এবং যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য। আর জ্ঞান হলো মন ও বিবেকের পথপ্রদর্শক। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম এবং তার ভেতরকার যেসব জিনিস মানুষের বাধ্য ও অনুগত সেগুলোকে রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে কিভাবে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায় তা জানার নামই জ্ঞান। এটাই যথার্থ ফলপ্রসূ জ্ঞান। এক কথায় বলা চলে, মহান আল্লাহকে জানা ও চেনাকেই জ্ঞান বলা যায়।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পর্যায়ে একে একটা উত্তম মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের বহু জায়গায়। যেমন সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেন ঃ

قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

"জনতা বললো ঃ সে (তালুত) কিভাবে আমাদের রাজা হতে পারে? আমরাই তো তার চেয়ে রাজা হবার বেশী হকদার। তাঁর তো তেমন সম্পদের প্রাচুর্য নেই। নবী বললেন ঃ আল্লাহ তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং (সম্পদের তেমন প্রাচুর্য না থাকলেও) জ্ঞান ও দেহের দিক দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তার রাজত্ব যাকেই চান দেন। তিনি উদার, মহাজ্ঞানী।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৭)

কিন্তু আল্লাহ রাজত্বের উপাদানগুলোর নিছক তাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়ে ও সীমা চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি সেই সাথে আমাদের কাছে একটা বাস্তব ও আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা দিয়েছেন যাতে করে এই গুণগুলোকে বাস্তব সত্য হিসেবে তাঁর সুমহান রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পারি। আর তা দেখে নিজেদেরকে ঐ সত্যের যথার্থ অনুসারী রূপে গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু তা যদি নাও হতে পারি হয়তো পুরোপুরিভাবে কখনো তা পারবোও না—তাহলে তা থেকে যতটা সম্ভব আমাদের বাস্তবায়িত করতেই হবে।

হযরত সোলায়মানের কাহিনীতে শক্তির ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা চান মুসলমানদের অধিকারে একটা বাস্তব রাষ্ট্রীয় শক্তি থাকুক। আর তা চান বলেই প্রথমে ঐ রাষ্ট্রীয় শক্তি অর্জন ও পরিচালনার জন্য

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় গুণাবলী আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। অতপর হযরত সোলায়মানের পরিচালিত রাজ্যে তার যে বাস্তব রূপ লাভ করেছে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যেন নিরেট আদর্শবাদী অথবা নিছক বাক্যবাগিশ হয়ে থেকে না যাই। এ রাষ্ট্রে বস্তুগত শক্তি ও সামরিক শক্তি কোন্ পর্যায়ের ছিল, সেটা জানা যাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝

"সোলায়মানের বাহিনীতে সেনা সংগ্রহ ও সমাবেশ করা হয়েছিল জিন, মানুষ ও পাখী থেকে। অতপর তাদেরকে দলে দলে ভাগ করে দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়।"–(সূরা আন নামল ঃ ১৭)

অর্থাৎ সৈনিকের সংখ্যা এতবেশী ছিল যে, শৃংখলা রক্ষার খাতিরে তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করতে হয়েছিল। ফলে অগ্রবর্তী পশ্চাতে কিংবা পশ্চাতবর্তী সামনে যাবে—এমন জো-টি ছিল না। এহেন বিশাল বাহিনী যার বহু-জাতিকতার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। সমগ্র সৃষ্টিজগতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। অন্যান্য সৃষ্টি তো দূরের কথা, ক্ষুদ্র পিঁপড়ের মনে কি ধরনের ভীতির সঞ্চার হয়েছিল তা দেখুন ঃ

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا

مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

"(সোলায়মানের বাহিনী) যখন পিঁপড়ের উপত্যকায় এল, তখন একটা পিঁপড়ে বললো ঃ হে পিঁপড়ের দল ! তোমরা নিজ নিজ ঘরে ঢোক যেন সোলায়মান ও তার সৈন্যসামন্ত না দেখে শুনে তোমাদের পিষ্ঠ করে মেরে ফেলতে না পারে। আর তারা ইহা টেরও পাবে না।"–(সূরা নামল ঃ ১৮)

সোলায়মান জানতেন, তার সৈন্য সামন্ত এত বিরাট ও শক্তিশালী যে পৃথিবীর কোন শক্তি তার গতিরোধ করতে পারে না। এজন্য সাবার রাণীর উপঢৌকন তিনি ফেরত দিলেন এই বলে ঃ

اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً

وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝ (النمل : ٣٧)

"(হে দূত,) তুমি তাদের কাছে (রাণী ও তাঁর রাজকীয় সভাসদ) ফিরে যাও। আমরা এক অজেয় বাহিনী নিয়ে তাদের কাছে আসবো এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ঐ রাজ্য থেকে বহিষ্কার করবো।"

www.pathagar.com

অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে বাহিনীটার কত সুন্দর ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বাহিনীর সৈনিকের আধিক্য, শৃংখলা, বহুজাতিকতা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীসহ সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর তার প্রভাব এবং সকল শত্রুকে পরাভূত করার অভাবনীয় ক্ষমতা—এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এ কাহিনীতে জ্ঞানের অবস্থান

এ কাহিনীতে জ্ঞানের ভূমিকা কিভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তার অবদান কিভাবে বিবৃত হয়েছে, তা বুঝতে হলে কুরআনের নিম্নোক্ত অংশ পড়ুন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ ـ(النمل : ١٥ـ ١٦)

"আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দিয়েছিলাম। অনন্তর তাঁরা উভয়ে বলে, আল্লাহরই সকল প্রশংসা যিনি আমাদের দু'জনকে তাঁর বহু মু'মিন বান্দাহর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অনন্তর সোলায়মান দাউদের (জ্ঞান ও নবুয়াতের) উত্তরাধিকারী হলেন।"–(সূরা আন নামল ঃ ১৫-১৬)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ যে জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন, হযরত সোলায়মান তাকে ভাষার জ্ঞান ও অন্য সকল বিষয়ের জ্ঞান বলে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ○ (النمل : ١٦)

"হে জনমণ্ডলী ! আমরা পাখীর ভাষা শিখেছি এবং সকল ব্যাপারেই কিছু কিছু জ্ঞান অর্জন করেছি। এটা যে নিশ্চয়ই অনুগ্রহ স্বরূপ তা সুস্পষ্ট।"

পাখীর ভাষা ও অন্যান্য ব্যাপারে যে তিনি জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা হুদহুদ পাখীর সাথে তার কথাবার্তা থেকেই বুঝা যায়। সে বর্ণনা একটু পরেই আসছে। তা ছাড়া একটা পিঁপড়ে তার অধীন পিঁপড়েদেরকে সোলায়মানের বাহিনীর পায়ের তলে পিষ্ঠ হওয়া সম্পর্কে যে সাবধানবানী উচ্চারণ করেছিল, হযরত সোলায়মান তা তৎক্ষণাত বুঝে ফেলেছিলেন এ থেকেও বুঝা যায় যে, পাখীর ভাষা তিনি সত্যিই জানতেন।

"সকল ব্যাপারেই কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করেছি" একথা দ্বারা বুঝা গেল যে, ভাষার জ্ঞান ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক ব্যাপারেই তিনি জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছিলেন।

আমি আশা করবো, পাঠক আল্লাহর এ উক্তিটা নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করবেন যে, "এটা স্পষ্টতই অনুগ্রহ"। পরেই এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে

www.pathagar.com

করা হয়েছে যে, এই অনুগ্রহ জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়। পরম কৃতজ্ঞ নবী সোলায়মানের (আ) মুখ দিয়ে এর স্বীকৃতি আদায় করাই এর উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে এ জ্ঞানের কার্যকর ও বাস্তব স্বার্থকতা কি ? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ম-রীতি ও তার বিভিন্ন শক্তিকে করায়ত্ব করার পর রাষ্ট্রের কল্যাণে তাকে নিয়োজিত করাতেই এর স্বার্থকতা। হযরত সোলায়মান ও রাণী বিলকিসের ঘটনার পরবর্তী অংশেই এ বক্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা ঃ

সাবা রাণী ও অধিবাসীরা নিশ্চিতভাবে বুঝে নিল যে, হযরত সোলায়মান (আ) অর্থের প্রলোভনে পড়ার মত লোকই নন এবং তারা বশ্যতা স্বীকার না করলে তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তিনি তাদেরকে খতম না করে ছাড়বেন না। একথা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই রাণী বড় একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে হযরত সোলায়মানের কাছে রওনা হলেন। তারা কিছু পথ অতিক্রম করলে হযরত সোলায়মান সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাতে হবে যা তাদেরকে হতচকিত করে দেয় এবং তাদের মনকে ঈমানের জন্য উপযোগী ও কোমল করে দেয়। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি তার জ্ঞানীগুণী ও অসাধারণ শক্তিমান বীরপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ "হে আমার আমাত্যবর্গ ! সাবার রাণী ও তার সফরসঙ্গীরা ইসলাম গ্রহণপূর্বক আমার কাছে পৌছার আগে তোমাদের মধ্যে কে রাণীর সিংহাসনটা আমার কাছে এনে দিতে পারে ? জ্বিন বংশোদ্ভূত এক দানব বললো ঃ আপনি নিজের আসন থেকে যতক্ষণে উঠবেন, তারও আগে আমি ওটা এনে দেব। এ কাজে আমি খুবই নির্ভরযোগ্য, ক্ষমতাবান। (বাহিনীর মধ্যে) যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বললো ঃ আপনার চোখের পলক পড়বার আগেই আমি সিংহাসনটা এনে দেবো।...... (পর মুহূর্তেই) যখন সিংহাসন তাঁর কাছেই হাজির দেখলেন তখন বললেন, এ হলো আমার প্রতিপালকের মেহেরবানী। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ, সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই তিনি এটা ঘটিয়েছেন। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা দ্বারা নিজেরই উপকার করে। আর যে না-শুকরী করে সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অতীব মহৎ ও নিরাসক্ত।" এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে সে তার জ্ঞানকে কিভাবে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা, মহান নেতা ও পূণ্যবান নবীর ইচ্ছার অনুগত ও অনুসারী বানিয়ে নিল। আর এই কিতাবের জ্ঞানধারী ব্যক্তি হযরত সোলায়মানের সরকারের সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্য খোদ আল্লাহ যেসব লোক সরবরাহ করেছিলেন তাদেরই একজন। এই আসমানী জ্ঞান কার্যত নবীর আয়ত্বাধীন হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর অপার অনুগ্রহের প্রমাণ যখন হাতে হাতে পাওয়া গেল, তখন নবী সোলায়মান (আ) অবনত মস্তকে সে অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করলেন।

পাঠক স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছেন যে, এখানে আল্লাহর অনুগ্রহ বলতে জ্ঞানগত শক্তিকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এই সূরাতেই অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ (النمل : ١٥)

"নিশ্চয়ই আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছি।"

অন্য সূরাতে আছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝

"আমি দাউদকে নিজের তরফ থেকে বিপুল অনুগ্রহ দান করেছিলাম। (বলেছিলাম) হে পাহাড়, তাঁর সাথে সহযোগিতা কর। পাখীদেরকেও (বলেছিলাম) আমি তার জন্য লোহাকে নরম করেছিলাম।"-(সাবা ঃ ১০)

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তার সেইসব অনুগত বান্দাদের জন্য বিশ্বের গোপন রহস্যসমূহ আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন যারা পৃথিবীতে তার নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বকে সমর্থন করে।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ۝

"আর জবুর কিতাবে উপদেশদানের পর আমি লিখে দিয়েছি যে, আমার নেক বান্দারাই জমীনের উত্তরাধীকারী হবে।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৫)

প্রাকৃতিক শক্তি ও জ্ঞানকে যে মানুষের আয়ত্বাধীন করে দেয়া হয়েছে, তার সাক্ষী হিসেবে এখানে হযরত সোলায়মানের এই ঘটনাটাই যথেষ্ট। কেননা এটা একাই বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পেরেছে। অন্যথায় প্রকৃতিকে যে হযরত সোলায়মানের রাজশক্তির অধীন করা হয়েছিল সে কথা অন্যান্য আয়াতেও রয়েছে। যেমন ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۖ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۖ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ ۝ (سبا : ١٢-١٣)

www.pathagar.com

"সোলায়মানের জন্য আমি বাতাসকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছিলাম যে, সকাল বেলা তার সাহায্যে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যাকালে তার সাহায্যে এক মাসের পথ চলা যেত। আমি তার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি এবং এমনসব জ্বিন তার অনুগত করে দিয়েছি যারা তাদের রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো। তাদের মধ্যে যে আমার হুকুম অমান্য করতো তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাতাম।' সোলায়মান যা চাইত তারা তাঁর জন্য তাই বানাতো। যথা : উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি ও প্রতিকৃতি, থালার মত বড় বড় হাউজ এবং শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ডেগ। হে দাউদের বংশধর! কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ লোক খুবই কম।"

-(সূরা সাবা : ১২-১৩)

এই হচ্ছে এ ঘটনায় জ্ঞান ও শক্তির যথার্থ স্বরূপ।

২—উদ্দেশ্য ও ব্রত

রাষ্ট্রের একটা মহৎ উদ্দেশ্য ও ব্রত থাকতে হয়—যার বাস্তবায়নে রাষ্ট্র সদাসচেষ্ট থাকবে এবং সকল জ্ঞান ও শক্তি নিয়োজিত করবে। এই উদ্দেশ্য ও ব্রত কি? তা কি রাজ্য সম্প্রসারণ? উপনিবেশের সংখ্যা বৃদ্ধি? অথবা দুর্বলদের দেশ দখল? পৃথিবীতে এ ধরনের ডাকাতি, দস্যুপনা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকে মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করতে কি আপনার বিবেক সায় দেবে? না। এ ধরনের ন্যক্কারজনক ও বিভৎস ঘটনাদি ঘটানোর মত নীচু কাজে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান ব্যবহৃত হতে পারে না। এ ধরনের পাপাচারমূলক কাজ করাকে নিজের প্রিয়তম বান্দাদের উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করার মত হীনতা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধে। যে উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত এবং যার জন্য রাষ্ট্রের টিকে থাকা ও বেঁচে থাকা —তাহলো আল্লাহর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, মানবজাতিকে একমাত্র তাঁর ওপর ঈমান আনতে ঐক্যবদ্ধ করা এবং পৃথিবীকে যে কোন পৌত্তলিকতা ও শিরক থেকে পবিত্র করার মাধ্যমে আল্লাহর বিধান ও কর্তৃত্বকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বরূপে প্রতিষ্ঠা। সকল সম্ভাব্য উপায় ও উপকরণ কাজে লাগিয়ে এ লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। এ লক্ষ্যের আওতাধীন মানুষের জীবনযাপনের স্থীতি নিশ্চিত করতে পারে এমন রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও বাস্তব ব্যবস্থাদি প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী। এ স্থিতি যদি উত্তম তথা শান্তিপূর্ণ পন্থায় অর্জিত হয় তাহলে খুবই ভালো কথা। কিন্তু যদি এ কাজ শান্তিপূর্ণ পন্থায় অর্জন করা সম্ভব না হয় তাহলে সে অবস্থায় অস্ত্রের শক্তি প্রয়োগও উত্তম পন্থা। এ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এ পন্থা অবলম্বনে যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের আনুগত্য মেনে নেবে সে

www.pathagar.com

আমাদের সহযোগী বলে গণ্য হবে। তার অধিকার ও দায়-দায়িত্ব আমাদের অধিকার ও দায়-দায়িত্বের মতই হবে। অন্যথায় আমরা আল্লাহর জমীনকে আল্লাহর দুশমনদের নাপাক আধিপত্য থেকে মুক্ত না করে কখনো ক্ষ্যান্ত হব না।

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ○

"তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও—যাবত ফেতনা খতম না হয় এবং একমাত্র আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। (লড়াই এর ফলে) যদি তারা (ফেতনা সৃষ্টি থেকে) বিরত হয় তাহলে আর বাড়াবাড়ি হবে না। তবে অত্যাচারীদের কথা আলাদা।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

"ফেতনা খতম না হওয়া ও আল্লাহর দীন পুরোপুরি কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই চালিয় যাও। (লড়াই এর ফলে) যদি তারা বিরত হয় তাহলে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপের ওপর তো নজর রেখেই যাচ্ছেন।"-(সূরা আল আনফাল ঃ ৩৯)

এই সুমহান লক্ষ্যই ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য। আল্লাহ মুসলমানদের প্রশংসা করেছেন ও তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন এই বলে যে, ঐ লক্ষ্য হাসিল করা তথা পংকিলতা দূর করা ও ঈমানের ভিত্তি পত্তনের জন্যই তাদের সৃষ্টি। তিনি বলেন ঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ

"তোমরা সেই শ্রেষ্ঠ জাতি—যাকে আবির্ভূত করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য। (তোমাদের কাজ এই যে,) তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী থাকবে।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

আল্লাহ সূরা কাহাফের কিস্‌সার সেই নায়ক, সেই শক্তিধর ন্যায়পরায়ণ নেতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যাকে তিনি সব রকমের উপায়-উপকরণের অধিকারী করেছিলেন। তাঁর প্রশংসা করেছেন এই জন্য যে, তিনি দুষ্কৃতি-

www.pathagar.com

কারীদের শাস্তিদানের জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন এবং মু'মিনদেরকে সাহায্য করা ও উৎসাহদানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আমি বললাম, হে জুলকারনায়েন ওদেরকে তুমি শাস্তি দিতে চাও তো দিতে পার, আর ওদের সাথে ভালো আচরণ করতে চাও তো তাও করতে পার।" এ উক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ জুলকারনায়েনের শক্তি ব্যবহারের একটা সুনির্দিষ্ট বিধি তৈরী করে দিলেন ঃ শাস্তি দেয়া কিংবা পুরস্কৃত করা।

"জুলকারনায়েন বললেন ঃ অবশ্য যে জুলুম করেছে, তাকে আমরা শাস্তি দেবো। অতপর সে তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে এবং তখন তিনি তাকে অত্যন্ত কঠিন আযাব দেবেন। তবে যে ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান। তাকে আমরা অত্যন্ত সহজ নির্দেশ দেবো।"

এখানে কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী খুবই চমৎকার। আল্লাহ এখানে শুধু রাষ্ট্রের মহৎ উদ্দেশ্যটা বর্ণনা করেই ক্ষ্যান্ত থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু যেখানে এ মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছেন সেখানে কিন্তু সর্বোচ্চ পরিমাণে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অলংকার সমৃদ্ধ করে তা পেশ করেছেন। যেমন হুদহুদ পাখীর কথা উদ্ধৃত করে আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি এক মহিলাকে তাদের (সাবা জাতির) রাণী হিসেবে দেখে এসেছি। তাঁর সবকিছুই আছে তাঁর আরো আছে এক বিরাট সিংহাসন। দেখলাম, সেই রাণী ও তাঁর প্রজারা আল্লাহ্ ছাড়া সূর্যের সামনেও সিজদা করে। শয়তান তাদের কাজকে সুন্দর করে সাজিয়ে তাদের সামনে তুলে ধরেছে এবং তার দ্বারা তাদেরকে এমন বিপথগামী করেছে যে, তারা আর সঠিক পথ পাচ্ছেই না।"-(সূরা আন নাম্‌ল)

বস্তুত এ হলো আকীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির একটা নমুনা। এ বিভ্রান্তি রাষ্ট্রের মহৎ লক্ষ্যকে বিনষ্ট করে ও তাকে নিকৃষ্টতম পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। সঠিক আকীদা ও নেক আমল ছাড়া জীবন কি বিশুদ্ধ হতে পারে? কিছুতেই নয়।

সাবা রাষ্ট্রের আকীদা ও আমল যে নষ্ট ও বিকৃত হয়ে গেছে সে কথা বলার পর নির্ভুল ও সঠিক আকীদা কি—যার ওপর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানবজাতির টিকে থাকা ও বহাল থাকা উচিত—সেই কথা বলছে হুদহুদ পরবর্তী অংশে ঃ

اَلاَّ يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ
مَاتُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ○ اَللّٰهُ لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ○

www.pathagar.com

"(শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিয়েছে) যেন তারা সেই আল্লাহকে সিজদা না করে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সকল গুপ্ত জিনিসকে বের করেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন বা প্রকাশ কর, তা তিনি জানেন। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া আর কোনই মাবুদ নেই।"-(সূরা নামল ঃ ২৫-২৬)

আমরা এরপর দেখতে পাই, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনায়ক হযরত সোলায়মান (আ) এ উদ্দেশ্যেই কাজ করেছেন। আল্লাহ হুদহুদের কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে যা বলেছেন ঠিক তারই অনুরূপ কাজ করেছেন তিনি। ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য তিনি সাবার রাণীকে আহবান জানান ঃ

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ۝

এটি (চিঠিটি) সোলায়মানের পক্ষ থেকে এবং পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে—এই মর্মে যে, তোমরা আমার সাথে হঠকারিতা দেখিও না বরং ইসলাম গ্রহণ করে আমার কাছে চলে এস।"

-(সূরা আন নামল ঃ ৩০-৩১)

এখানে হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম সাবাবাসীকে ইসলামী শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রবল চাপ প্রয়োগ করেন এবং পরাক্রান্ত সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেন। ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের রাণী এই বলে ইসলাম গ্রহণ করেন যে,

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝

"হে আমার প্রতিপালক ! আমি নিজের ওপর খুবই জুলুম করে এসেছি। (এক্ষণে) আমি সোলায়মানের সাথে বিশ্বপ্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।"-(সূরা আন নামল ঃ ৪৪)

স্পষ্টতই দেখা যায় যে, এই মহতী উদ্দেশ্য সফল করার জন্য হযরত সোলায়মানের বিশাল সাম্রাজ্য যতদিন দুনিয়ায় টিকেছিল কাজ করেছিল। আর আল্লাহ তায়ালা এখানে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে ঐ উদ্দেশ্যটা অতি সুন্দরভাবেই বিশ্লেষিত ও চিত্রিত হয়েছে।

৩-সর্বোচ্চ নেতার ঈমান ও ছোট বড় সব জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা

তৃতীয় যে তথ্যটি এই কিস্সা থেকে জানা যাচ্ছে তাহলো এই যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পূর্ণতালাভের উপায় হলো রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনায়কের

www.pathagar.com

অবহিত থাকা, তার প্রতি বিশ্বাসী থাকা এবং তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা করা। এ হলো এর একটা দিক। অন্য দিকটা হলো, রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে সদা সর্তকাবস্থা ও জাগ্রত অবস্থা বিরাজমান থাকা চাই এবং নগণ্য কিংবা মর্যাদাবান—সব ধরনের প্রজার ভালোমন্দ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা চাই। সেই সাথে তাকে সকল কর্মচারীর কাজ তদারক ও তার হিসেব গ্রহণ করতে হবে। এসব না হলে রাষ্ট্রের শক্তি শিথিল এবং তার বাঁধন ঢিলে হয়ে যাবে। আমাদের একথাটা এতই স্পষ্ট যে, এর প্রমাণ দর্শাতে কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে আমাদের শেষোক্ত কথাটা (অর্থাৎ কর্মচারীদের কাজের তদারকী) কুরআনের ঐ কিস্‌সা বর্ণনা প্রসঙ্গে কি চমৎকারভাবে বিবৃত করা হয়েছে তা একবার দেখে নেয়া যাক ঃ

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ز أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ○

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْلَآ أَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

"পাখীটা উধাও হয়েছে দেখে তিনি বললেন ঃ ব্যাপার কি ? হুদহুদকে দেখ্‌ছি না যে ! তবে কি সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে ? সুস্পষ্ট কোন দলীল প্রমাণ নিয়ে হাজির না হলে আমি নিশ্চয়ই তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা তাকে জবাই করবো।"-(সূরা আন নাম্‌ল ঃ ২০-২১)

পাঠক দেখলেন তো, হযরত সোলায়মান (আ) স্বীয় প্রজার প্রতি কতখানি লক্ষ্য রাখতেন যে, কেউ নিখোঁজ হয়েছে বলে তিনি নির্বিকার বসে থাকেননি ? আর যিনি সামান্য একটা পাখীর কথা ভোলেন না, তিনি তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের কথা তো ভুলতেই পারেন না। বস্তুত রাষ্ট্রের সকল দিকের তত্ত্বাবধান ও তার প্রশাসনের তদারকীর এমন পরিপূর্ণ ব্যবস্থা আর হতে পারে না। তাছাড়া কোটি কোটি প্রাণীর মধ্য থেকে শুধুমাত্র হুদহুদ পাখীর অনুপস্থিতি টের পাওয়ার মধ্য দিয়ে হযরত সোলায়মানের বিস্ময়কর সর্তকতা ও বিচক্ষণ মনীষার প্রকাশ ঘটেছে। এটা অনুভূতির তীব্রতার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই মানের অনুভূতি ও উপলব্ধি আয়ত্ব করা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আল্লাহর একজন নবীর জন্য এ কাজকে বিশেষভাবে সহজ করে দেয়া হয়েছে। কেননা তিনি তো আর শুধু চর্মচক্ষু দিয়ে দেখেন না, বরং আল্লাহর দেয়া অন্তর্দৃষ্টির আলো দিয়েও দেখেন। সর্বাবস্থায়ই তিনি জাগ্রত মানুষদের মধ্যে একটি উচ্চাংগের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন শুধু এ জন্য যে, দায়িত্বশীল মানুষ মাত্রেই যেন তার হুবহু অনুকরণ করতে পারে। হযরত সোলায়মানের ব্যাপারটা লক্ষ্য করুন। হুদহুদের অনুপস্থিতিতে কিভাবে অভিযোগ মুখর হয়ে ওঠেন, তার

www.pathagar.com

সন্ধান নিতে থাকেন এবং তাকে মারাত্মক পরিণতির ভীতিও প্রদর্শন করেন। অথচ তার এতবড় বিশাল সেনাবাহিনীতে হুদহুদ পাখীর কি গুরুত্ব থাকতে পারে ? হুদহুদ থাকলে বা কি লাভ, না থাকলেই বা কি ক্ষতি ? আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ নেতা। তিনি বুঝেছিলেন যে, ছোট হোক বড় হোক সব জিনিসেরই একটা ভূমিকা বা অবদান থাকে। প্রত্যেক সৈনিকেরই এমন কিছু করণীয় কাজ থাকে যা অন্যরা করতে পারে না, তাই সে যখনই অনুপস্থিত বা উপেক্ষিত থাকবে, তখনই সমগ্র কাজের শৃংখলা ও সমন্বয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বেই। তাই অনুপস্থিতি বা অনুরূপ ত্রুটি সংবেদশীল নেতার কাছে গুরুতর মনে হয়েছে। তাই তিনি উক্ত ত্রুটিকারীকে কঠিন শাস্তি দিয়ে—যা মৃত্যুদণ্ড হওয়াও বিচিত্র নয়—শাসন করতে কৃত সংকল্প হন। যদিও এ প্রসঙ্গে অনেকের অনেক রকম বক্তব্য ও মন্তব্য এসেছে। তবে আমি শুধু এইটুকু বলেই ক্ষ্যান্ত হবো যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত সোলায়মান (আ)-এর সুতীব্র সচেতনতার এ দৃষ্টান্তটুকু তুলে ধরেছেন আমাদেরকে শুধু একথাই শেখানোর জন্য যে, যে ব্যক্তি নগণ্য ও মামুলী বিষয়কে এতটা গুরুত্ব দিতে পারে সে বড় বড় বিষয়কে আরো বেশী গুরুত্ব দিতে পারবে। তুচ্ছ অপরাধকেও যিনি কঠোরভাবে পাকড়াও ও দমন করেন তিনি বৃহত্তর অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চয়ই উদাসীনতা বা গড়িমসি করবেন না। এখানে এতটুকুও লক্ষণীয় যে, হুদহুদের পেশ করা ওজরকে তিনি সহজে মেনে নেননি, বরং তা সত্য না মিথ্যে তা পরখ করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন ঃ

سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

"তুমি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী, তা আমি অচিরেই দেখবো।"

—(সূরা আন নাম্‌ল ঃ ২৭)

তবে আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি হযরত সোলায়মানের অবিচল ঈমান, তার জন্য সদাসক্রিয় থাকা এবং তাকে বাদ দিয়ে ধন-সম্পদ বা অন্য কিছুর প্রতি ঝুঁকে না পড়া—এটা এই কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দৃশ্যমান। স্পষ্টতই দেখা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া তাঁর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, আল্লাহর জন্যই সবকিছুকেই অনুগত ও অবনমিত করা ছাড়া তার আর কোন লক্ষ্য নেই। উপঢৌকনাদি নিয়ে সাবার রাণীর দূতেরা তাঁর দরবারে এলে তাদেরকে যেভাবে তিনি ফিরিয়ে দেন, তা থেকেই নিসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই তার কাম্য ছিল না। বেশ খানিকটা বিরক্তি ও অনীহার সাথেই তিনি বলেন ঃ

اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ زفَمَآ اٰتٰنِ ۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ

www.pathagar.com

تَفْرَحُوْنَ ○ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

"তোমরা আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে ? আসলে তো আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছেন তার চেয়ে আমাকে ভালো দিয়েছেন। তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই খুশী থাক গে। তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। আমি তাদের কাছে এক অপরাজেয় সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি এবং তাদেরকে (সাবা ও তার দলবলকে) চরম অসহায়ভাবে ও অবমাননাকর পন্থায় ওখান থেকে বিতাড়িত করবোই।"

—(সূরা আন নাম্‌ল ঃ ৩৬-৩৭)

আল্লাহ্ সূরা কাহাফে পরাক্রমশালী অপর এক ইসলামী শাসকের একই ধরনের মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ○ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ○

"তারা বললো ঃ হে জুলকারনায়েন ! ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ায়। তাই তাদের ও আমাদের মধ্যে একটা বাঁধ তৈরীর জন্য আপনাকে কি আমরা কিছু কর দেবো ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন। তোমরা বরং আমাকে কিছু জনশক্তি দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে প্রাচীর বানিয়ে দেই।" —(সূরা আল কাহাফ ঃ ৯৪-৯৫)

৪-রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি প্রত্যেক নাগরিকের আস্থা স্থাপন

চতুর্থ যে জিনিসটা আমরা এই কাহিনী থেকে পাই তাহলো এই যে, প্রত্যেক নাগরিককে তার রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী হওয়া চাই এবং নিজেকে তার রক্ষক সৈনিকে পরিণত করা চাই। নতুবা নাগরিকরা যদি এই আদর্শ ত্যাগ করে ভিন্ন আদর্শের অনুসারী হয় তাহলে ইতিপূর্বে যেসব মহৎ শিক্ষার কথা আলোচনা করেছি, তা সবই নিষ্ফল হবে। এখানে দেখা গেল, একটি হুদহুদ পাখী নিজের কর্তব্য পালনকে নিজের জন্য গর্ব ও সম্মানের বিষয় মনে করছে আর নিজের সর্বোচ্চ জীবন লক্ষ্যের স্বার্থে কাজ করার দরুন যে

www.pathagar.com

মু'মিনসুলভ আত্মবিশ্বাস জন্মেছে, তার ভিত্তিতে জ্বিন ও মানুষের শাসক হযরত সোলায়মানকে উদ্দেশ্য করে বলছে ঃ

أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ○ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ○

"আমি সেই খবর সংগ্রহ করেছি, যা আপনি করেননি। আমি সাবা জাতির কাছ থেকে একটা নিশ্চিত তথ্য নিয়ে এসেছি। আমি দেখলাম, এক মহিলা তাদের রাজা হয়ে বসেছে।"-(সূরা আন নাম্‌ল ঃ ২২-২৩)

এখানে হুদহুদের কথা বলার ভঙ্গী আমাদের গভীর চিন্তা ও ভাবনার দাবী রাখে। চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এটা একজন অনুতপ্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অপরাধীর উক্তি নয় বরং নিজের কতর্ব্যপরায়ণতায় উদ্দীপ্ত একজন আত্মসচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিকের উক্তি—যার সত্য প্রীতি জ্বিন ও মানবজাতির শাসক হযরত সোলায়মানের সামনে সত্য কথা বলতে তাকে নির্ভিক ও বেপরোয়া করে তুলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশ্রেণীর মানুষকে বিশেষত যুবক সম্প্রদায়কে আহবান জানাই ঃ আপনারা দায়িত্ব সচেতন হোন এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলে আন্তরিকভাবে তৎপর হোন। কেননা যে জাতির লোকেরা একটা হুদহুদ পাখীর সমানও দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নয়, সে জাতির বেঁচে থাকার কোনই স্বার্থকতা নেই। আর যে জাতির একটি পাখীও মানুষের চেয়ে উত্তম হয়, সে জাতির আসন উর্ধ আকাশে মঙ্গল গ্রহেরও উচ্চে।

এ কাহিনীতে আরো কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন ঃ আকিদা ও বিশ্বাসের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি একমাত্র নির্বোধ ও আত্মমর্যাদাবোধহীন জাতিরই জন্ম দিতে সক্ষম। সাবা সাম্রাজ্যের বেলায়ও একথার বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। বিলকিস তাদেরকে ডেকে পরামর্শ চাইলে তারা এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলো না যে ঃ

وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ○

"অর্থাৎ ব্যাপারটা পুরোপুরি আপনারই আওতাধীন। এখন আপনিই ভেবে দেখুন আমাদের কি নির্দেশ দেবেন।"-(সূরা আন নাম্‌ল ঃ ৩৩)

বিলকিস কিন্তু তাদেরকে এ উক্তি শুনতে ডাকেননি। তিনি তাদের ডেকেছেন একথা বলার জন্য ঃ

فِي أَمْرِي ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ○

"তোমরা আমাকে পরামর্শ না দেয়া পর্যন্ত আমি তো কোন বিষয়ে ফায়সালা করতে পারি না।"-(সূরা আন নাম্‌ল ঃ ৩২)

www.pathagar.com

তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে কোন মতামত দিয়ে সাহায্য করতে পারলো না। বস্তুত এ এক ধরনের মানুষ যাদের দ্বারা কোন রাষ্ট্র টিকতে পারে না। একমাত্র দুর্বল ও বিকৃত আকিদা বিশ্বাস একটা নিকৃষ্ট সমাজব্যবস্থা থেকেই এ জাতীয় মানুষের উদ্ভব ঘটে থাকে। অতপর আকিদা ও বিশ্বাস শুধরে নেয়াকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

* * * * * * * * *

আমরা এ কিসসা পড়তে গিয়ে চারটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পেয়েছি —যার কোন একটিরও অভাব থাকলে রাষ্ট্র চলতে পারে না। সে তথ্যগুলো হলো : (১) জ্ঞান ও শক্তি (২) মহান ও উচ্চতর জীবন লক্ষ্য (৩) সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনায়কের ঈমান ও সচেতনতা (৪) নাগরিকদের সকলের আপন জীবন লক্ষ্যে এবং আপন কর্তব্য পালনে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, এবার ভাবুনতো, একজন অতি দক্ষ ঔপন্যাসিক বা গল্পকার যদি গল্প বা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এ চারটি তথ্য ফুটিয়ে তুলতে চাইতো, তাহলে তা কি এমন প্রচন্ড শক্তি সহকারে এমন সূর্যের মত স্পষ্ট করে দিয়ে এবং এত চমৎকার ও সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করতে পারতো ? আমি কুরআনের সেই অলৌকিক বর্ণনা শৈলী ও অনুপম অলংকার সমৃদ্ধ বাকরীতির কথা বলছি না—যার সমকক্ষতা কোন মানবীয় রচনায় অকল্পনীয় এবং যার ব্যাপারে স্বয়ং কুরআন চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ

لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ○

"বলুন ; সমগ্র জ্বিন ও মানবজাতি যদি সমবেত হয়ে এই কুরআনের মত কিছু তৈরী করে আনতে সচেষ্ট হয় তাহলেও তা আনতে পারবে না —যদিও তারা পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।"

—(সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৮)

বস্তুত আমরা কুরআনের অলৌকিক বাকভঙ্গীর কথা বলছি না আমরা বলছি শুধু এই কিস্সার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে। কিস্সাটিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে বাস্তব ঘটনার আকারে চিত্রিত করা হয়েছে খুবই স্বার্থকভাবে। এদিক থেকে আমরা এ কাহিনীর একটা মোটামুটি সফল বিশ্লেষণ দিতে পেরেছি বলেই মনে করি। এবারে আমরা পুরো কিস্সাটাকে কুরআন সূরা নামলে যে অলৌকিক প্রক্রিয়ায় বর্ণনা করেছে, তা হুবহু তুলে ধরছি :

www.pathagar.com

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى
كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ
عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ۖ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ
وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝
حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا
مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ
اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ
فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِىَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ
كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ۝ لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاۡاَذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَيَاْتِيَنِّىْ
بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ
وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ ۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ۝ اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ
كُلِّ شَىْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۝ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ
لَا يَهْتَدُوْنَ ۝ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ ۝ قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ
هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ۝ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا
الْمَلَؤُا اِنِّىْۤ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ۝ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ۝ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا

www.pathagar.com

الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْٓ اَمْرِىْ ج مَاكُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ○
قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ لا وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا
تَاْمُرِيْنَ ○ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ
اَهْلِهَا اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○ وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ
بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ○ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ز فَمَآ
اٰتٰنِ ىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ ج بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ○ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ
فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ
صٰغِرُوْنَ ○ قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ
مُسْلِمِيْنَ ○ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ
مَّقَامِكَ ج وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ ○ قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ
اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ط فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ
هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ قف لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَ اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ○ قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا
عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ○ فَلَمَّا جَآءَتْ
قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ط قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ج وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا
مُسْلِمِيْنَ ○ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ
قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ○ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ج فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً
وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ط قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ط قَالَتْ رَبِّ
اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

"আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছি। তারা বলেছে, সেই আল্লাহর শোকর--যিনি তাঁর বহু সংখ্যক বান্দার ওপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব

www.pathagar.com

দান করেছেন। আর দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছে সোলায়মান। সে বললো ঃ হে জনগণ ! আমাদেরকে পাখীর ভাষা শিখানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সবরকমের জিনিসই দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

সোলায়মানের জন্য জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলের সেনাবাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং সেই সবকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো। (একবার) যখন তারা সকলে পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌঁছলো, তখন একটি পিঁপড়ে বললো ঃ হে পিঁপড়ের দল ! নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়। এমন যেন না হয় যে, সোলায়মান ও তার সৈন্য সামন্ত তোমাদেরকে পিষে মেরে ফেলবে। অথচ তারা তা টেরও পাবে না। সোলায়মান একথা শুনে মৃদু হেসে বললেন ঃ হে আমার প্রভু ! আমাকে ক্ষমতা দাও যেন আমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দেয়া তোমার নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, তুমি সন্তুষ্ট হও এমন নেক কাজ করতে পারি এবং মেহেরবানী করে তোমার নেক ও সৎ বান্দাদের মধ্যে আমাকে শামিল কর। আর (এক সময়) তাঁর পাখীটা উধাও হলো, তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন ? সেকি নিরুদ্দেশ হলো ? সুস্পষ্ট কোন কারণ দেখাতে না পারলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা জবাই করবো। একটু পরেই সে (হাজির হয়ে) বললো ঃ আপনি যে খবর সংগ্রহ করতে পারেননি আমি তা সংগ্রহ করেছি। সাবা রাজ্য থেকে নির্ভুল খবর নিয়ে এসেছি। সেখানে এক মহিলা জনগণের শাসনকর্ত্রী হয়ে বসে আছে দেখলাম। তার সবই আছে এবং এক বিরাট সিংহাসনও আছে। দেখলাম, সে ও তার প্রজারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের সামনে মাথা নত করছে এবং শয়তান তাদের কাজকে নির্দোষ বলে দেখিয়েছে। এভাবে সে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ফলে তারা আর সুপথের অনুগামী হচ্ছে না। (শয়তানের উদ্দেশ্য হলো) তারা যেন আকাশ ও পৃথিবীর গুপ্ত রহস্য উদঘাটনকারী এবং মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে অবগত মহান আল্লাহর কাছে মাথানত না করে যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং যিনি মহান আরশের অধিপতি। (সোলায়মান) বললেন ঃ তুমি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী—তা অচিরেই আমরা পরখ করবো।" এখন যাও আমার এই চিঠি নিয়ে (সাবার অধিবাসীদের তথা রাণী ও প্রজাদের) দাও, তারপর তুমি ফিরে এসো। দেখ, তারা কি জবাব দেয়। রাণী বললো ঃ হে সভাসদ বৃন্দ ! আমি একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা সোলায়মানের কাছ থেকে এসেছে এবং তা পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে লেখা। (চিঠির বক্তব্য এই যে) তোমরা আমাকে

www.pathagar.com

ডিঙ্গাতে চেষ্টা করো না। বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো। রাণী বললেন ঃ হে সভাসদ বৃন্দ ! তোমরা আমার উদ্ভূত সমস্যার ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও। তোমরা আমার সাথে আলোচনা না করা পর্যন্ত আমি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। তারা বললো ঃ আমরা তো শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। ফায়সালা তো আপনার হাতেই। আমাদের কি নির্দেশ দেবেন ভেবে দেখুন। রাণী বললেন ঃ রাজারা কোন জনপদে ঢুকলে তাকে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদেরকে নিকৃষ্ট বানিয়ে ছাড়ে। অতপর জনপদবাসীও ঐ রকমই করে থাকে। আমি সোলায়মান ও তার লোকজনের কাছে উপঢৌকন পাঠাবো এবং দেখবো, দূত কি নিয়ে ফিরে আসে। দূত যখন সোলায়মানের কাছে এলো তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও ? (তার দরকার হবে না।) আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তার চেয়ে ঢের ভালো সম্পদ আমাকে দিয়েছেন। তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই ফূর্তি কর গিয়ে। তুমি সাবাবাসীর কাছে ফিরে যাও। আমরা এমন এক বাহিনী নিয়ে আসছি। যার থেকে তাদের আর রেহাই নেই। আমরা তাদেরকে ওখান থেকে অপমান করে তাড়াবো। সোলায়মান বললো ঃ হে সভাসদবৃন্দ ! তোমাদের মধ্যে কে আছ যে আমার কাছে রাণীর সিংহাসনটা রাণী ও তার দলবল বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে আসার আগেই এনে দিতে পারে ? জ্বিনদের মধ্য থেকে এক দৈত্য বললো ঃ আপনার বর্তমান অবস্থান থেকে উঠে দাঁড়ানোর আগেই আমি তা এনে দিতে পারি। এ কাজে আমি যথেষ্ট সক্ষম ও নির্ভরযোগ্য। অন্য একজন—যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল—বললো ঃ আপনার চোখের পলক পড়ার আগেই তা আমি এনে দিতে পারি। সোলায়মান (আ) যখন সিংহাসনটা তাঁর সামনেই উপস্থিত দেখলেন, অমনি বললেন ঃ এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। তিনি এর দ্বারা পরীক্ষা করতে চান আমি তার শোকর করি, না না-শোকর করি। যে ব্যক্তি শোকর করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই শোকর করে। আর যে ব্যক্তি না-শোকরী করে, তার জানা উচিত যে, আমার প্রতিপালক অভাবহীন, উদার। তিনি [সোলায়মান (আ)] বললেন ঃ তোমরা রাণীর সিংহাসনকে তাঁর সামনে এমনভাবে রেখে দাও যেন চিনতে না পারে, আমরা দেখবো সে সিংহাসনের সঠিক সন্ধান পায় কিনা। পরে যখন রাণী এলো তখন তাকে বলা হলো, তোমার সিংহাসনটা কি এ রকম ? সে বললো ঃ মনে হচ্ছে, ওটা (আমার) সেইটাই। আমরা তো আগে থেকেই এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি এবং আমরা তদনুসারে বশ্যতা স্বীকার করেছি। সে আল্লাহকে ছাড়া অন্য যেসব

www.pathagar.com

জিনিসের ইবাদাত করতো, সে সবই তাকে (ঈমান আনা থেকে) ফিরিয়ে রেখেছিল। আসলে সে তো ছিল একটি কাফের জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাকে (রাণীকে) বলা হলো, প্রাসাদে প্রবেশ কর। সে যখন প্রাসাদের দিকে তাকালো তখন ভাবলো ওটা যেন পানির হাউজ এবং সে পায়ের গোড়ালীর দিকের কাপড় উঁচু করলো। সোলায়মান বললেন ঃ এতো কাঁচের স্বচ্ছ মেঝে। একথা শুনে সে বলে উঠলো ঃ হে আমার প্রতিপালক ! (এ যাবত) আমি নিজের ওপর খুবই জুলুম করেছি। এখন সোলায়মানের সাথে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

–(সূরা আন নামল ঃ ১৫-৪৪)

পুরো কাহিনীটা পড়ার পর পাঠক দেখতে পাবেন যে, এতে আমরা ইতিপূর্বে যেসব শিক্ষার উল্লেখ করেছি, তা ছাড়াও বহু সূক্ষ্ম তত্ত্ব রয়েছে। যেমন সাম্রাজ্যবাদ কেমন জিনিস এবং সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা আক্রান্ত লোকদের কি পরিণতি হয় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই রাজারা যখন কোন জনপদে ঢোকে তখন তাকে বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত করে ছাড়ে এবং তার সম্মানিত অধিবাসীদেরকে অপমানিত করে। কুরআন এও ঘোষণা করেছে যে, এটা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস যা তারা কখনো বর্জন করতে পারে না। বলা হয়েছে ঃ তারা এ রকমই করে থাকে।

এ কাহিনীতে রাণী বিলকিসের বিচক্ষণতা ও তিক্ষ্ণ বুদ্ধিরও ইংগীত রয়েছে। বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া গেছে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র নিরূপণেও। হযরত সোলায়মানের কাছে সদলবলে আসা বিলম্বিত করে তিনি কেমন লোক, তাও সুচতুরভাবে পরীক্ষা করে নেন রাণী বিলকিস। রাণী তাকে টাকা-কড়ি ঘুষ দিতে চেষ্টা করেননি। তা যদি করতেন তাহলে বেকুফ বলেই সাব্যস্ত হতেন। তিনি শুধু উপহার পাঠিয়ে তাঁর নৈতিক দৃঢ়তা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। তিনি জানতেন যে, সোলায়মান যদি সম্পদের লোভী হন তাহলে ঐ উপহার তাকে চুপ করিয়ে দেবে এবং কর-খাজনা পেয়েই তুষ্ট হবেন। আর যদি আদর্শবাদী লোক হন এবং চিঠিতে যে আদর্শের দাওয়াত দিয়েছেন তার প্রতি ঈমান আনাই তাঁর কাম্য হয় তাহলে তিনি উপঢৌকন ফেরত দিয়ে তরবারী হাতে তুলে নেবেন। শেষ পর্যন্ত সেই ধুরন্দর মহিলা যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি [নবী সোলায়মান (আ)] নিশ্চিতভাবেই শেষোক্ত ধরনের লোক, তখন তাঁর শিষ্য হয়ে যাওয়াটাই তিনি সমিচীন মনে করলেন। কেননা ওটাই ছিল বিজ্ঞজনোচিত কাজ। পরিশেষে হয়েছিলও তাই। বিলকিস যে আসলেই পরীক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা তার এ উক্তি থেকেই পরিস্ফুট ঃ

www.pathagar.com

"আমি সোলায়মান ও তাঁর লোকজনের কাছে উপঢৌকন পাঠাবো অতপর দেখবো দূতেরা কি জবাব নিয়ে ফিরে আসে।"

পরবর্তী সময়ে যখন তাঁর সিংহাসনকে—তার বিভিন্ন চিহ্ন পরিবর্তন করে তাঁর সামনে পেশ করা হয় এবং বলা হয় যে, দেখুন তো আপনার সিংহাসনটা এ রকম নাকি ? তখন এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিলকিসই স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেননি যে, হ্যাঁ, ওটাই আমার সিংহাসন। কেননা তিনি অনেক দূরে নিজ দেশে সিংহাসনকে রেখে এসেছেন। তবে "না, ওটা আমার সিংহাসন নয়" এমন কথাও বলেননি। কেননা তিনি তাতে নিজের সিংহাসনের অনেকগুলো চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছিলেন। আবার "জানিনা" বলেও জবাব দেননি। কেননা এ ধরনের জবাবে নিরেট মূর্খতা ও অজ্ঞতাই ফুটে ওঠে। তাই মহিলা এই উভয় সংকট থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত চতুরভাবে পরিস্থিতির সাথে সংগতিপূর্ণ কথাটাই বললেন যে, "সম্ভবত ওটাই।"

হযরত সোলায়মানের এ কাহিনীতে এ ছাড়া আরও অনেক এমন নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু দুঃখের সাথে হলেও আমি তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি এজন্য যে, আলোচনা অনেক লম্বা ও বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে।

মোদ্দাকথা, কুরআনের কাহিনী মালাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে অধ্যয়ন করা এবং তার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে তত্ত্বানুসন্ধানী হওয়া উচিত। কুরআনের কাহিনীগুলোকে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা যায়। এসব কাহিনী থেকে যতটা ফায়দা পাওয়া যাবে ততটা আর কোন কিছু থেকেই পাওয়া যাবে না।

নবী করীম (সা) বর্ণিত কাহিনী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাস্তব ও জীবন্ত উদাহরণ পেশ করার প্রয়োজনে অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস থেকে বিভিন্ন কাহিনী নির্বাচন করতেন ও বর্ণনা করতেন। পবিত্র কুরআনের কাহিনীর পরেই এসব কাহিনীর স্থান ও মর্যাদা। সুতরাং এগুলোর সাহায্য নেয়া খুবই জরুরী। এখানে আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা কিস্সার উল্লেখ করবো। তার আগে জানা দরকার যে, একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান —যা কিনা এক মহৎ আকিদা হিসেবে গণ্য— নিম্নলিখিত উপায়ে পুনরুজ্জীবিত হয় ও ব্যাপকতা লাভ করে ঃ

১ ॥ এই আকিদা বা আদর্শের ওপর অবিচল থাকা এবং এর জন্য কষ্ট সহ্য করা।

www.pathagar.com

২ ॥ এ আকিদার খাতিরে মানুষের সম্পদ, পদমর্যাদা ও সম্মান পর্যন্ত বিসর্জন দেয়া অথবা এর কোনটার জন্য প্রলোভন এলে তা প্রত্যাখ্যান করা।

৩ ॥ উক্ত আদর্শের ধারক যেন জীবনকে বাজি রেখে বা বিসর্জন দিয়ে হলেও তাঁর আকিদা ও আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার খাতিরে সর্বাপেক্ষা কার্যকর কৌশল স্বার্থক কর্মপন্থা অবলম্বন করে। এটা একটা অতি সুন্দর তত্ত্ব। অথবা বলা যায় ঃ এটা জীবনের সেসব পরম সত্যের অন্যতম যার সত্যতায় কোনই সন্দেহ নেই। এটাও একটা বাস্তব ব্যাপার যে, আল্লাহর প্রিয়জনদের কেউ তার প্রতি পরম নিষ্ঠার সাথে ঈমান রাখে বলে তাঁর কাছে যখন প্রমাণিত হয়, তখন তিনি তাদেরকে এমন সব রহস্যময় জিনিস দান করেন—যার ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় বিভিন্ন কারামত তথা অলৌকিক কর্মকান্ড সংঘটিত হয়। এই দু'টো শুধু যে বাস্তব সত্য তাই নয় বরং বিশুদ্ধ জীবনের অব্যাহত শৃংখলা ও সমন্বয় বিধানের নিশ্চয়তা দানকারী দু'টো আইনও। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলী বা প্রিয়বন্ধু হবার যোগ্যতা লাভ করবে আল্লাহর শাশ্বত বিধি ও রীতি অনুসারেই তার প্রতিষ্ঠা লাভ হবে। তার বাণী ও মিশনকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে সাফল্য মন্ডিত করার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহই করে রেখেছেন। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। এই বাণী কি মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে শুধুমাত্র এই জন্য প্রবেশ করে যে, তাকে এভাবে চিত্তাকর্ষক করে পেশ করা হয়েছে? না, এখানে তার চেয়েও বেশী কিছুর প্রয়োজন ছিল। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা ছবির মত এঁকে দেয়ার দরকার ছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের এ প্রয়োজনটি পূর্ণ করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত একটি কিস্‌সা

'সহীহ মুসলিম' হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"তোমাদের পূর্বতন একটি জাতির মধ্যে এক রাজা ছিলেন। ঐ রাজার ছিল এক যাদুকর। সে যখন বুড়ো হলো, তখন রাজাকে বললো ঃ আমি তো এখন বুড়ো হয়ে গেছি, আমাকে একটি বালক জোগাড় করে দিন। তাকে আমি যাদুবিদ্যা শিখিয়ে দেবো। রাজা তার আবেদন অনুসারে তার কাছে এমন একটি বালক পাঠালেন—যাকে যাদু শেখানো সম্ভব। বালকটি যাদুকরের কাছে যাওয়ার পথে জনৈক দরবেশের সাথে সাক্ষাত ঘটলো। সে তার কাছে বসলো এবং তার কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হলো। অতপর প্রতিনিয়ত সাক্ষাত চলতে লাগলো। যাদুকরের কাছে দরবেশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে তার কাছে বসতো এবং যাদুকর তাকে দেরী হওয়ার কারণে পিটাতো। দরবেশকে সে

www.pathagar.com

ব্যাপারটা জানালো। দরবেশ বললেন ঃ যখন যাদুকরের কাছে যাবে এবং বিলম্বের কারণে মার খাওয়ার আশংকা দেখবে তখন তুমি বলবে ঃ আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আটকে রেখে বিলম্ব ঘটিয়েছে। আর বাড়িতে ফিরবার সময় দেরী হলে বলবে ঃ যাদুকরের ওখানে দেরী হয়ে গেছে। এভাবেই চলতে লাগলো। সহসা একদিন সে পথে একটা ভয়াবহ হিংস্র জন্তুর সাক্ষাত পেল। জন্তুটা জনসাধারণের চলাচলের রাস্তাই বন্ধ করে ফেলেছিল। বালক মনে মনে বললো ঃ আজ আমি দেখবো, দরবেশ ও যাদুকরের মধ্যে কার বুজুর্গী বেশী। সে একটা পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে বললো ঃ ইয়া আল্লাহ ! দরবেশ আমাকে যা শিখায়, তা যদি তোমার কাছে যাদুকরের যাদু বিদ্যার চাইতে পছন্দনীয় হয়ে থাকে তাহলে এই জন্তুটাকে হত্যা করে মানুষের চলাচলের পথ খুলে দাও। এই বলেই সে পাথর ছুড়ে মারতেই জন্তুটা মারা পড়লো এবং লোকজন মুক্ত পথ পেয়ে নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে পাড়ি জমালো। অতপর সে দরবেশের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানালো। দরবেশ বললেন ঃ বৎস্য ! আজ তুমি আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছ। তোমার বিদ্যা শেখার আর দরকার নেই। তবে তুমি শীগগীরই কঠিন নির্যাতনের সম্মুখীন হবে। তবে নির্যাতনের সম্মুখীন হলে আমার কথা ফাঁস করে দিও না। ইতিমধ্যে বালক এত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেল যে, টাকপড়া ও কুষ্ঠ রোগসহ সবরকমের রোগ সে নিরাময় করতে লাগলো। ক্রমে ব্যাপারটা রাজ দরবারের এক অন্ধ সদস্যের কানে গেল। তিনি প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে হাজির হলেন। তিনি বললেন ঃ "হে বালক ! তুমি যদি আমাকে রোগমুক্ত করে দাও, তাহলে এখানে যা কিছু আছে তার সবই তোমার।" বালক বললো ঃ আমি কাউকে রোগমুক্ত করতে পারি না। একমাত্র আল্লাহই রোগমুক্ত করতে পারেন। এখানে বালকটি নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিল। আসলে এটা আল্লাহর প্রতি ঈমানেরও অনিবার্য দাবী। অর্থ ও সম্পদের প্রতি তার লেশমাত্রও মোহ ছিল না। তাই সে বললো ঃ আপনি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন তাহলে আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য দোয়া করবো এবং তিনি আপনাকে রোগমুক্ত করে দেবেন। তিনি ঈমান আনলেন। আল্লাহ তৎক্ষণাত তাকে আরোগ্য করে দিলেন। এরপর তিনি যথারীতি রাজদরবারে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল ? তিনি বললেন ঃ আমার প্রভু। রাজা বললেন ঃ বল কি ? আমি ছাড়া আবার অন্য কোন প্রভু আছে নাকি তোমার ! তিনি বললেন ঃ আমার এবং আপনার প্রভু আল্লাহ। রাজা তাকে গ্রেফতার করলেন এবং নির্যাতন করে তার কাছ থেকে তাঁর হেদায়েতকারী বালকের সন্ধান আদায় করে ছাড়লেন। বালকটিকে ধরে আনা হলো। অতপর রাজা তাকে বললেন ঃ বৎস ! তুমি এমন

www.pathagar.com

যাদু রপ্ত করে ফেলেছ যে, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে পর্যন্ত ভালো করতে পারছ এবং আরো অনেক কিছু করছ ? বালক বললো ঃ না, আমি কোন রোগ ভালো করতে পারি না। একমাত্র আল্লাহই পারেন।" অতপর বালককেও নির্যাতন শুরু করা হলো। শেষ পর্যন্ত বালক ঐ দরবেশের সন্ধান বলে দিতে বাধ্য হলো। অতপর দরবেশকে ডাকা হলো। তাকে বলা হলো ঃ তোমার ধর্ম ত্যাগ কর। দরবেশ রাজী হলেন না। তাকে করাত দিয়ে চিরে লম্বা লম্বিভাবে দ্বিখণ্ডিত করা হলো। আপন বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকা এবং এ পথে কঠিনতম যন্ত্রণা সহ্য করা একেই বলে। অতপর রাজার সেই দরবারীকে হাজির করে তাকেও সত্য দ্বীন ত্যাগ করতে বলা হলো। সে অস্বীকার করলে তাকেও আপাদমস্তক করাত দিয়ে চেরাই করে দুই খণ্ড করা হলো। দরবারী তাঁর আকিদা ও ঈমানকে রক্ষা করতে গিয়ে অতিরিক্ত একটা জিনিসেরও কুরবানী দিলেন। সে জিনিসটা হলো ঃ রাজার সভাসদগিরীর সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ পদ এবং সেই পদের সুবাদে অঢেল টাকা ও সুযোগ-সুবিধা লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা। এরপর ধরে আনা হলো বালককে। তাকেও একইভাবে ইসলাম ত্যাগ করতে বলা হলো। সেও অস্বীকার করলো। রাজা তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের একটা দল জড় করে তাদের কাছে বালককে সোপর্দ করলেন এবং বললেন ঃ ওকে নিয়ে তোমরা অমুক পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ কর। অতপর বালককে বল তার নতুন ধর্ম ত্যাগ করতে। যদি ত্যাগ না করে তাহলে তাকে নীচে ফেলে দিও। রাজার দলটি বালককে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলে বালক বললো ঃ اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ "হে আল্লাহ ! তুমি যেভাবে ভাল মনে কর, ওদের হাত থেকে আমাকে রেহাই দেয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট হয়ে যাও।" একথা বলা মাত্রই পাহাড়টা কেঁপে উঠলো এবং সকলে পাহাড় থেকে পড়ে গেল। এটা ছিল আল্লাহর বন্ধুদের প্রতি আল্লাহর সম্মান প্রদর্শনের নমুনা। (একেই বলা হয় আল্লাহর ওলীদের কারামত।) অতপর বালকটি হাটতে হাটতে রাজার কাছে উপনীত হলো। রাজা বললো ঃ তোমার সাথীদের খবর কি ? বালক বললো ঃ তাদের মোকাবিলায় আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছেন। এবার রাজা তার অনুচরদের আর একটি দল নিয়োগ করলো। তাদেরকে বললো ঃ তোমরা একটা ক্ষুদ্র নৌকায় করে ওকে নিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে চলে যাও। সেখানেও বালক যদি ধর্ম ত্যাগে রাজী না হয় তাহলে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। তারা নির্দেশ পালন করলো। মাঝ দরিয়ায় গিয়ে বালক বললো ঃ اَللّٰهُمَّ اَكْفِنَاهُمْ بِمَا شِئْتَ "হে আল্লাহ ! এদের মোকাবিলায় আমার জন্য তুমিই যথেষ্ট হয়ে যাও।" সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ডুবে গেল এবং বালক ছাড়া সকলে নিমজ্জিত হলো। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এটাও কারামতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর বালক আবার রাজ দরবারে এসে হাজির হলো। এবারও রাজা যখন তার সঙ্গীদের খবর

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করলো তখন সে একই উত্তর দিল যে, আমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করতে আল্লাহই যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে এসে আল্লাহ্ ঐ কিশোরের মাথায় চমৎকার এক কৌশলের উদ্ভব ঘটালেন—যার দ্বারা সমগ্র দেশবাসীর কাছে ঈমানের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদেরকে তাদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস ও শির্‌ক থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। এ কৌশলটা ছিল এমন ধরনের যে, তাতে তার নিজের মৃত্যু ছিল অবধারিত। কিন্তু তথাপি সে মনে করছিল যে, যেমন করেই হোক একটা কার্যকর পন্থায় স্বীয় আদর্শ প্রচার করাতেই তার কল্যাণ নিহিত। সে মনে করছিল যে, স্বেচ্ছায় নিজেকে হত্যার যুবাকাষ্ঠে ঠেলে দেয়াতেই তার প্রকৃত জীবন ও পরিপূর্ণ শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত হবে। কেননা তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এতে করে তার আকিদা ও আদর্শের টিকে থাকার পথ সুগম হবে। তাই সে রাজাকে বললো ঃ আমি যা বলবো তা না করলে আমাকে তুমি হত্যা করতে পারবে না। রাজা বললো ঃ সেটা কি ? সে বললো ঃ দেশবাসীকে এক ময়দানে সমবেত করবে। সেখানে একটা কাষ্ঠ খণ্ডের ওপর আমাকে চড়াবে। তারপর আমার শরাধার থেকে একটা শর নিয়ে ধনুকে জুড়বে। অতপর "কিশোরের প্রভু আল্লাহর নামে" এই কথা বলে আমাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করবে। এরূপ করলে তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে। এই ছিল সেই অদ্ভুদ কৌশল। কিশোরের উদ্দেশ্য ছিল যে, এভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমানের এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতার একটা অকাট্য দৃষ্টান্ত সে পেশ করতে পারবে। কেননা একমাত্র আল্লাহর নাম নিয়েই তাকে হত্যা করা সম্ভব হবে। অথচ তার আগে অন্য সকল চেষ্টা ও কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যাবে। লোকেরা এই আশ্চার্য কুদরত দেখে বুঝবে যে, কিশোরটি যাকে রব হিসেবে মেনে নিয়ে তার ওপর ঈমান এনেছে আসলে তিনিই একমাত্র 'রব'। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। বস্তুত কিশোরটি মনে মনে যা ভেবেছিল সেটাই সফল হয়েছিল। নির্বোধ হিংসুটে রাজা বুঝতেই পারেননি যে, কিশোরের হত্যা করার দৃশ্য দেখাতে প্রজাদের সমবেত করাটা তার স্বার্থের অনুকূল হবে না। তাই সে লোকজনকে এক ময়দানে জড় করলো। কিশোরকে কাষ্ঠখণ্ডে চড়ালো। অতপর তার কথামত তীর নিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলো। এতে বালক মারা গেল। এ দৃশ্য দেখামাত্র সমবেত জনতা সমস্বরে বলে উঠলো ঃ বালক যে রবের ওপর ঈমান এনেছে আমরাও তার ওপর ঈমান আনলাম। তৎক্ষণাত রাজা ময়দানে এলো। তাকে বলা হলো ঃ দেখলেন তো ? আপনি যা এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন সেটাই ঘটে গেল আপনার ওপর। লোকেরা ঈমান এনেছে।.......তখন রাজা প্রত্যেক রাজপথের প্রবেশ দ্বারে পরীখা খননের নির্দেশ দিলো। পরীখা খনন করা হলো

www.pathagar.com

এবং তাতে আগুন জ্বালানো হলো। রাজা বললো ঃ যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করবে না তাকে জ্বলন্ত আগুনে ঠেলে ফেলে দাও। অথবা প্রত্যেককে বলা হলোঃ প্রবেশ কর সে মতে সকলেই আগুনে প্রবেশ করলো। এক সময়ে ছোট শিশু কোলে করা এক মহিলার পালা এল। মহিলা পরীখায় ঢুকতে ইতস্তত করছিল। শিশুটি তা দেখে বললো ঃ মা, ছবর কর। তুমি সত্যের ওপর আছ।

তাহলে পাঠক দেখলেন তো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক শক্তিশালী কিস্‌সা নির্বাচন করেছেন যা আমাদের ইপ্সিত মহৎ গুণাবলীর অপূর্ব চিত্র এঁকে দিয়েছে এবং যা বিবেকের ওপর সবেচেয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এ থেকে বুঝা গেল যে, কিস্‌সা দাওয়াতেরই একটি পন্থা বা কৌশল হিসেবে গৃহিত হওয়া চাই। একজন প্রচারক যা শিক্ষা দেন, কিস্‌সা হবে তারই ব্যাখ্যাতা। শুধু তাই নয়, কিস্‌সা মানুষকে ঐ শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রেরণাও জোগায়—এমন হওয়া চাই। বস্তুত কিস্‌সা বলার মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া কুরআনে আল্লাহর অনুসৃত নীতি এবং রসূলের রীতি ও আদর্শেরই প্রতিফলন।

বক্তার স্বরচিত কিস্‌সা

কিস্‌সা কাহিনীর মাধ্যমে দাওয়াত ও ওয়াজ নছিহত করার এই রীতিকে প্রাচীন প্রচারকগণ খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তারা কুরআনের কিস্‌সা ও হাদীসের কিস্‌সা তো ওয়াজ ও নছিহতে পুরোমাত্রায় ব্যবহার করেছেনই। তদুপরি নিজেরা অনেক কিস্‌সা কাহিনী রচনাও করেছেন। আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই তারা ঐসব কাহিনী রচনা করতেন। নমুনা স্বরূপ এ ধরনের একটা কাহিনী এখানে পেশ করছি। পাঠক যদি কিস্‌সা রচনায় দক্ষতার অধিকারী হন তাহলে এ নমুনা তার কাজে লাগবে।

এখানে যে কিস্‌সাটা আমরা পেশ করতে যাচ্ছি তার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এই যে, মানুষ যখন কোন কাজ খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে, তখন আল্লাহ তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু যখন কেউ কোন কাজ লোক দেখানো, কিংবা সম্পদ লাভ, কিংবা অন্য কোন বস্তুগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য করে তখন আল্লাহ তাকে কোন সাহায্য করেন না। তিনি তার দায়িত্ব ত্যাগ করেন এবং তাকে তার নিজের ওপর সোপর্দ করেন। ফলে সে সফল না হয়ে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হয়—এ আল্লাহর এক শাশ্বত বিধি। আল্লাহর অনুগত কোন দল যদি এ বিধি অনুসারে কাজ করে তাহলে তারা অবশ্যই জয়লাভ করবে—যদিও পৃথিবীর সকল শক্তি তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু বিবেক ও বুদ্ধিকে কিভাবে একথা বুঝানো যাবে? মানুষের বাস্তব জীবনে যখন এ

www.pathagar.com

বিধির কোন বাস্তব অবস্থান নজরে পড়ে না এবং নজরে পড়ার উপযুক্ত কোন চিত্র নেই, তখন কিভাবে এর পক্ষে হৃদয় আলোড়িত হবে ? বস্তুত এ কারণেই একটা কিচ্ছার অবতারণা করা হয়েছে।

"বনী ইসরাঈলের লোকেরা যে অঞ্চলের অধিবাসী ছিল, তার একটি গ্রামে একজন সৎ ও খোদানুগত যুবক বাস করতো। ঐ গ্রামে একটা প্রাচীন গাছ ছিল। শয়তানের প্ররোচনার কারণে জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, গাছটি অতি পুণ্যময় ও পবিত্র এবং তার অনেক আশ্চার্য ও রহস্যময় ক্ষমতা আছে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা এক ধরনের ধোঁকায় পড়েছিল এবং গাছের নৈকট্য লাভের জন্য সচেষ্ট ছিল। গাছকে তারা এতবেশী ভক্তি ও সম্মান জানাতো, যা শুধুমাত্র স্বয়ং আল্লাহ তায়ালারই প্রাপ্য। যুবকটি এই শির্কী কার্যকলাপ দেখে ভীষণ ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হলো। সে প্রতিজ্ঞা করলো যে, গাছটিকে কেটে ফেলবে। এতে করে শয়তান ঐ এলাকার লোকদেরকে জাহান্নামে নেয়ার যে আয়োজন করেছিল তা থেকে তাদেরকে বাঁচানো সম্ভব হবে বলে সে মনে করলো। অতপর সে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে রওনা হলো। পথিমধ্যে তার সাথে শয়তানের দেখা হলো। শয়তান বললো ঃ কি হে যুবক ! কোথায় চলেছ ? সে বললো ঃ ঐ গাছটার কাছে যাচ্ছি।

শয়তান বললো ঃ কি দরকার ?

যুবক বললো ঃ গাছটা আমি কেটে ফেলতে চাই।

শয়তান বললো ঃ কেন ?

যুবক বললো ঃ কারণ জনসাধারণ ধোঁকায় পড়ে গেছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঐ গাছের উপাসনা করছে।

যুবক সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত বিশুদ্ধ নিয়তে কাজে লিপ্ত ছিল।

শয়তান বললো ঃ না, তুমি কখনো ঐ গাছের নাগাল পাবে না। আমি তোমাকে এ কাজ করতে দেব না।

এই বলে সে যুবকের কাপড় টেনে ধরলো। যুবক ভীষণ রেগে গেল। সে শয়তানকে উঁচু করে মাটিতে ফেলে দিল এবং তার গলা টিপে ধরলো। শয়তানের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হলো। এবার সে যুবকের সাথে নরম আচরণ শুরু করলো। তার কাছে দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করলো। যুবকের মন দয়ায় বিগলিত হলো। সে তাকে ছেড়ে দিল। এবার শয়তান আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে যুবকের সাথে খাতির পাতানো আরম্ভ করলো। তাকে বললো ঃ হে সরদার ! আসলে আমি আপনাকেও গাছ কাটা থেকে চিরতরে বিরত

www.pathagar.com

রাখতে চাইনি। চেয়েছিলাম শুধু একদিন কিংবা দুই দিনের জন্য বিরত রাখতে। কেননা তাতে আমার একটা ফায়দা ছিল। কিন্তু সে ফায়দা যখন আপনার দ্বারা অর্জিত হয়েছে, তখন আর আমার গাছ কাটা বা না কাটায় কিছু এসে যায় না। এখন আপনি ইচ্ছা হয় গাছ কাটুন, নতুবা রাখুন। ....আপনি আমাকে ক্ষমা করে ও জীবন ভিক্ষা দিয়ে আমার মহা উপকার করেছেন। অবশ্য এখন আরো বড় উপকার হবে—যদি গাছটা দুই এক দিনের জন্য না কাটেন। এতে আমার অবশিষ্ট প্রয়োজন পূরণ হবে এবং প্রতিদিনের বিনিময়ে আমি আপনাকে এক দিনার করে দেব। এভাবে নরম নরম কথা বলে শয়তান তাকে গাছ না কাটার ব্যাপারে সম্মত করে ফেললো। যুবক এক সময় মনে মনে বললো ঃ "মাত্র কয়েকদিন বিরত থাকলেই যদি কয়েক দিনার কামিয়ে নেয়া যায়, তাহলে ক্ষতি কি ? কয়েকদিন গাছটা থাকুক। পরে কাটা যাবে।" অতপর যুবক প্রতিদিনের বিনিময়ে এক দিনার দেয়ার শর্তে গাছটা কয়েকদিন রেখে দেয়ার ব্যাপারে নিজের সম্মতি শয়তানকে জানিয়ে দিল। তারপর উভয়ে নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত হলো।........পরের দিনই শয়তানের দূত এসে দরজার কড়া নাড়লো এবং দরিদ্র যুবককে এক দিনার দিতেই সে খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেল। ঐ দিনারটি সে নিজের ও তার মার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস যথা গোশত, ঘি, রুটী ও ফলমূল কেনা বাবদ খরচ করলো। পরবর্তী দিন আবারও শয়তানের দূত এসে আর একটা দিনার দিল। তা দিয়ে সে নিজের ও তার মার জন্য কাপড়-চোপড় কিনলো। ক্রমান্বয়ে দিনের পর দিন গড়িয়ে চললো। যুবকের ঘরে দিনারের স্তুপ হতে লাগলো। সে ক্রমেই পার্থিব সম্পদের মোহে বিভোর হয়ে গেল এবং মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে নিক্ষেপকারী ঐ গাছের প্রতি তার আর কোন ক্ষোভ থাকলো না।

একদিন হঠাৎ দূত আসা বন্ধ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য দিনারও বন্ধ হয়ে গেল সেই সাথে। যুবক সারা দিন অপেক্ষা করতে লাগলো। মনে মনে ভাবলো ঃ লোকটা (শয়তান) বুঝি বিদেশে গিয়েছে কিংবা নিদারুণ কোন কর্মব্যস্ততায় সে ভুলে গেছে। পরের দিনও নিষ্ফল অপেক্ষায় কেটে গেল। তৃতীয়....চতুর্থ দিনও। যুবক নিজ মনে মনে যতসব ফালতু ওজর বাহানা গড়তে লাগলো শয়তানের জন্য। শেষ পর্যন্ত তাকে হতাশ হতে হলো।

এবারে তার মনে পড়লো গাছের কথা। যে ব্যক্তি এতদিন দিনার সরবরাহ করার পর এখন তা বন্ধ করে দিয়েছে, তার ওপর রাগে ক্ষোভে ও অভিমানে অধীর হয়ে গাছ কাটতে হন হন করে ছুটলো। পথেই দেখা সেই শয়তানের সাথে। সে বললো ঃ কোথায় চলেছ হে যুবক ? সে বললো ঃ "ঐ গাছটি কাটতে যাচ্ছি। লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওর পূঁজা করছে। কাটবো না

www.pathagar.com

কেন ? তুমি আমাকে দৈনিক এক দিনার করে দিচ্ছিলে। তা বন্ধ করে দিয়েছ।" পাঠক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, এ পর্যায়ে এসে যুবকের নিয়ত ও মনোভাব কিরূপ পাল্টে গেছে। সে এখন আর আল্লাহর জন্য রাগান্বিত নয় বরং দিনারের জন্য রাগান্বিত হয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেছে।

শয়তান বললো ঃ "অসম্ভব ! অসম্ভব !! তুমি গাছের ধারেও যেতে পারবে না। আমি তোমাকে যেতে দেব না।"এই বলে শয়তান যুবকের কাপড় চোপড় ধরে ফেললো। যুবকও ধরলো শয়তানকে। আগের দিন যে রকম সহজে সে শয়তানকে শূন্যে উঁচু করে ফেলেছিল, আজও তেমনি করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু আগের দিন হালকা মনে হলেও আজ তার কাছে পাহাড়ের চেয়েও ভারী মনে হলো শয়তানের দেহ। বরং শয়তানই তাকে একটা বেলচার মত উঁচু করে ধরলো এবং মাটিতে দড়াশ করে ফেলে দিল। সে যুবকের বুকের ওপর চড়াও হয়ে বসলো এবং গলা টিপে মেরে ফেলার উপক্রম করলো। এবারে যুবক শয়তানের কাছে দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলো এবং কাকুতি মিনতি করে অঙ্গীকার করলো যে, সে আর কখনো ঐ গাছ কাটতে যাবে না। শয়তান তার এ অঙ্গীকার মেনে নিল বটে। তবে সে আরো একটা শর্ত আরোপ করলো। যুবককেও অন্য লোকদের মত ঐ গাছের উপাসনা করতে হবে। এই অঙ্গীকার না করলে তাকে ছাড়তে রাজী হলো না শয়তান। অনন্যোপায় হয়ে যুবক সেচ্ছায় এই কুফরীর প্রস্তাবও মেনে নিল। অতপর শয়তান তাকে ছেড়ে দিল। যুবক তার প্রতি এই বলে কৃতজ্ঞতা জানালো যে, সে তার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। অতপর যুবক তাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আগের দিন তুমি আমার কাছে একটা বেলচার মত হালকা মনে হয়েছিলে। ফলে আমি তোমার ওপর জয় লাভ করেছিলাম। কিন্তু আজ তোমাকে পাহাড়ের চেয়েও ভারী মনে হলো। আর আমিই তোমার কাছে বেলচার মত হালকা মনে হলাম। এই আশ্চার্য ঘটনার রহস্য কি বলতে পার ?

শয়তান বললো ঃ আগের দিন তুমি একমাত্র আল্লাহর জন্য রাগান্বিত ছিলে। ফলে আল্লাহ তোমাকে অজেয় শক্তিতে বলিয়ান করেছিলেন এবং সেই শক্তিবলেই তুমি আমাকে পরাজিত করেছিলে। যদিও শক্তিমানদের পরাভূত করার ক্ষমতা আমার ছিল কিন্তু তথাপি তোমার শক্তির সাথে আমি পেরে উঠিনি। আর আজ তুমি রাগান্বিত দিনারের জন্য। ফলে আল্লাহ তার দেয়া শক্তি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তোমাকে জয়ী করার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি তোমাকে দিনারের হাতে সোপর্দ করেছেন। অথচ দিনারের এমন ক্ষমতা নেই যে, তোমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি তোমার ওপর জয়ী হয়েছি। একথা শুনে যুবক লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল।

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম, কিভাবে কুরআন কিস্‌সা কাহিনীর মাধ্যমে তার দাওয়াত প্রসারিত করে, কিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিস্‌সার মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহবান জানান এবং কিভাবে আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণ ইসলামের শিক্ষাকে কাহিনীর মাধ্যমে ছবির আকারে ফুটিয়ে তোলেন। আমাদেরকেও এই পথ অবলম্বন করতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ সাফল্যের একটা উপকরণ আমাদের হাতে অবশ্যই আসবে।

দুই ঃ উদাহরণ ও প্রবাদ বাক্যের প্রয়োগ

প্রবাদ বাক্য একটা জনপ্রিয় সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানদীপ্ত ভাষণ পদ্ধতি। যুক্তি ও বিবেকের কাছে এর যথার্থতা হেতু এর প্রতি সাধারণ মানুষের প্রবল ঝোঁক ও আকষর্ণ থাকায় জনগণের মধ্যে এর প্রচলন অত্যধিক। প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই আকৃষ্ট। একটা বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার বর্ণনা দিতে বা শুনতে গিয়ে অনুরূপ অর্থবোধক একটা প্রবচন অনেকের মনে পড়ে যায়। এটা এ জন্য নয় যে, এতে করে মূল বক্তব্যকে আরো খানিকটা সত্য ও নির্ভুল প্রমাণিত করা হয় বরং এটা শুধু এই জন্য যে, এতে করে শ্রোতার মন বক্তার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ও মোহিত হয়। এতে কথাটা খানিকটা খোলাসাও হয় এবং যৌক্তিকতা ও বিজ্ঞতার সৌন্দর্যমন্ডিত হয়।

আমি অবশ্যই প্রত্যেক ইসলাম প্রচারককে আহবান জানাবো, আপন দাওয়াত ও আন্দোলনের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রবাদ বাক্যের ব্যবহারে অধিকতর গুরুত্ব দিতে এবং বেশী বেশী করে বহুল প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করতে। এতে করে মনে হবে মানুষের মন-মগজের জটিল থেকে জটিলতর গ্রন্থিগুলো খুলবার চাবি আপনার হাতে এসে গেছে। মনে করুন, আপনি জনগণকে বলতে চান যে, আল্লাহর দিকে অগ্রসর হবার ব্যাপারে কঠোর পন্থার চেয়ে নম্র পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়। আপনি বলতে চান, বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিততার দ্বারা নিজেদের দেহ ও মনকে কষ্টকর অবস্থায় না ফেলে সাধ্যমত আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের কাজে তৎপর থাকা উচিত। এটাই লক্ষ্যে পৌছার সবচেয়ে নিরাপদ ও স্বাভাবিক পথ। যেমন, মাত্রাতিরিক্ত নফল রোযা রাখা, হালাল জিনিস ও সুযোগ-সুবিধা বর্জন, অতিমাত্রায় রাত জেগে নামায পড়া, কান্নাকাটি করা ও ইস্তিগফার করা ইত্যাদি মানুষের দেহ ও মনকে অবসাদগ্রস্থ ও দুর্বল করে দিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। এসব কঠোরতার কারণে শরীর মারাত্মক রোগ-ব্যধিতেও আক্রান্ত হতে পারে এবং পরিণামে তার ইবাদাত চালু রাখা ও তাতে স্বাদ পাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলে ও

www.pathagar.com

ভারসাম্য সহকারে ইবাদাত চালিয়ে গেলে কোন অবসাদ বা ক্লান্তি আসার সম্ভাবনা যেমন থাকে না, তেমনি তা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ারও আশংকা থাকে না। একবার ভাবুন তো, এ কথাগুলো বলার জন্য যদি আপনি এ ধরনের কোন প্রবাদের সাহায্য নেন, যেমন ঃ "নিয়মিত ভূষিওয়ালা আটার রুটী খাওয়াও ভালো, অনিয়মিত উৎকৃষ্ট আটার রুটী খাওয়া ভালো নয় অর্থাৎ নিয়মিত অল্প ও মামুলী জিনিস অনিয়মিত উৎকৃষ্ট জিনিসের চেয়েও অগ্রগণ্য।" এ প্রবাদটি ব্যবহার করার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, আপনার দৃষ্টিতে অব্যাহত ও নিয়মিতভাবে যদি সামান্য ইবাদাতও চালু রাখা হয় তবে তা অনিয়মিত প্রচুর ও কষ্টকর ইবাদাতের তুলনায় ঠিক তেমনি উত্তম, যেমন অনিয়মিত ভালো খাবারের তুলনায় নিয়মিত নগণ্য ও মন্দ খাবার উত্তম।

প্রবাদ প্রয়োগ বাক্যে নতুনত্ব ও চমক সৃষ্টির উপকরণ

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, প্রবাদের প্রয়োগ কোন অবস্থাকে তার নিকটতম সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থা বা জিনিসের সাথে উপমিত করার পর্যায়ভুক্ত। এই উপমা মানুষের মনে ক্ষণিকের জন্য এক অপূর্ব চমক লাগিয়ে বক্ষমান বক্তব্য থেকে একটা পরিচিত ও আকর্ষণীয় বিষয়ের দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। এর ফলে ঐ অবস্থা ও বক্তব্যের মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য ও মিলের সন্ধান পাওয়া যায়। আর এতে করে বক্তব্য বিষয়টি আরো বেশী উপভোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। আর এই সমগ্র প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় মাত্র এক নিমেষেরও কম সময়ে। এই চমকপ্রদ মানসিক প্রক্রিয়াটার মধ্যে সাড়া জাগানো ও উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষমতা বিদ্যমান যেমন অন্য যে কোন চেষ্টায় তা উপস্থিত। এছাড়া প্রবাদবাক্য শ্রোতার মনে অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার ও বৈচিত্রময় নতুনত্বের আমেজ সৃষ্টি করে। এ আমেজ শ্রোতার মুখমন্ডলে চকিতে বিজলির মত চমকে ওঠে। তার ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা দীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রখ্যাত ভাষা তাত্ত্বিক ইবনুল মুকাফ্‌ফা বলেন ঃ কথা যখন উপমা ও প্রবাদে পরিণত হয় তখন তা যুক্তির ক্ষেত্রে আধিকতর স্পষ্ট ও শাণিত, অধিকতর শ্রুতিমধুর এবং ব্যাপকতর তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। ইবরাহীম নাজ্জাম বলেন ঃ প্রবাদে ৪টা উপকরণ আছে যা অন্য কোন ধরনের বাক্যে পাওয়া যায় না ঃ ভাষার সংক্ষিপ্ততা, অর্থের নির্ভুলতা, উপমার চমৎকারিত্ব ও ইংগীতের অনুপমত্ব।

উদাহারণ ও প্রবাদের এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা আছে বলেই আমরা ইসলামের সেইসব প্রচারকের জন্য এর ব্যবহার খুবই বাঞ্ছিত ও জরুরী মনে করি—যারা যথার্থই আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান। যারা চান ইসলামের দাওয়াত মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে যাক এবং তা পৌঁছানোর পথটা সুগম ও সহজ হোক।

www.pathagar.com

প্রবাদের শ্রেণী বিভাগ

(১)

ইকদুল ফারিদ গ্রন্থের লেখক, আকসাম বিন সায়ফী (জাহেলী যুগের একজন খ্যাতনামা মনীষী) থেকে বর্ণিত প্রবাদমালার মধ্যে একটা প্রবাদ উল্লেখ করেছেন যা হুবহু কুরআনের আয়াত সদৃশ। সেটা হলো ঃ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ অর্থাৎ "প্রত্যেক খবরেরই একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে।" এটা যদি যথার্থই আরবদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, কুরআনে এই প্রবাদই উদ্বৃত হয়েছে। জনৈক ইখওয়ান সদস্য তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "জাহেলী সাহিত্য কি কুরআনের অঙ্গীভূত হতে পারে? বন্ধু বললেন ঃ এটা আসলে একটা প্রবাদ। প্রবাদ হলো জ্ঞানোদ্দীপক কথা। এটা যেখানেই পাওয়া যাক, মু'মিনের কাছেই তার কদর সবচেয়ে বেশী হওয়ার কথা। কোন জ্ঞানী লোক ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে তাই বলে তার মুখ দিয়ে আল্লাহ একটা জ্ঞানের কথাও বের করবেন না—এমন কোন কথা নেই।

এটা বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ যেসব কথা তাঁর কোন নবীকে বলবেন বলে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সে কথা অন্য কোন বান্দাকেও বলেছেন। আবার সেই কথা পরবর্তী সময়ে ওহীর আকারে আসতে পারে। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও লোকদের সাথে কথাবার্তার সময়ে ব্যবহার করতেন এবং তাকে তিনি মোটেই দূষণীয় মনে করতেন না।

(২)

কুরআন ও হাদীসের বাকধারায় প্রবাদের সকল বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। ফলে কিছু কিছু আয়াত ও হাদীস প্রবাদের আকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। এতে প্রবাদ সাহিত্যও সমৃদ্ধ ও সম্মানিত হয়েছে। যেমন এ আয়াত কয়টি লক্ষণীয় ঃ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (নিজের যা আছে তা নিয়ে প্রত্যেকেই খুশী।) بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا (আমাদের পুঁজি আমাদের কাছেই ফেরত দেয়া হয়েছে।) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (যে ভালো কাজ করবে তার সুফল সে নিজেই পাবে।)

আল্লামা সয়ূতী স্বীয় গ্রন্থ আল ইতকানে কুরআনের অনেকগুলো আয়াতকে জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উৎসুক পাঠক ঐ গ্রন্থে তা খুঁজে দেখতে পারেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে উক্তিগুলো প্রবাদে পরিণত হয়েছে, তার দু'টো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

www.pathagar.com

"মু'মিন এক গর্তে দু'বার কামড় খায় না।" (নেড়ে বারবার বেলতলা যায় না।)

اِنَّ الْمُنْبَتَّ لَاَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا اَبْقَى

অর্থাৎ যে মুসাফির তার বাহক জন্তুকে অতিমাত্রায় হাঁকাহাঁকি করে দ্রুত গতিতে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তার জানোয়ার হঠাৎ মারা গিয়ে তাকে পথিমধ্যে দিশেহারা করে দিতে পারে। ফলে তার রাস্তা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছা যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি জানোয়ারের পিঠের ওপর সে টিকেও থাকতে পারবে না। মাত্রাতিরিক্ত ইবাদাত করে এক ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে হযরত রসূলুল্লাহ (সা) তাকে একথা বলেছিলেন।

(৩)

পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে আর এক ধরনের প্রবাদ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে–যা কোন জটিল ও রহস্যময় বিষয়কে জনসাধারণের নিত্য দেখা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়।

কুরআনে বর্ণিত এ ধরনের একটি উদাহরণ নিম্নে লক্ষ্য করুন ঃ

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ط

"আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং প্রত্যেক নদীনালা নিজ নিজ পাত্র অনুপাতে তা বহন করে নিয়ে চলেছে। আবার যখন প্লাবন এলো, তখন উপরিভাগে ফেনাও জেগে উঠলো।"–(সূরা আর রাদ ঃ ১৭)

এখানে এমন একটি দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে যা মানুষের প্রকাশ্য শ্রুতিগোচর ও দৃষ্টিগোচর। সত্যিই তো আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে, সেই বৃষ্টির পানি পৃথিবীর নদীনালা, খালবিল দিয়ে গড়িয়ে যায় পরিমাণ মত, তারপর পৃথিবীর উপরিভাগে প্রচুর ফেনা জমে।......কিন্তু এ দৃশ্য তুলে ধরার তাৎপর্য কি ? আল্লাহ এর বাহ্যিক অর্থটাই কেবল বুঝাতে চাচ্ছেন, তা নয়। তিনি আয়াতের শেষাংশে বলেছেন ঃ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط

"তিনি এভাবেই হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত পেশ করেন।"

আবার বলেছেন ঃ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ط

"আল্লাহ এভাবেই উদাহরণ দিয়ে থাকেন।"

www.pathagar.com

এখন এ উদাহরণের আসল তাৎপর্য কি, সেটাই আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্ আমাকে যে হেদায়াত ও জ্ঞান দান করেছেন, তার উদাহরণ হলো, পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে যেন বৃষ্টি নামলো। সেই ভূখণ্ডে একদল মানুষ.......।"

বস্তুত কুরআনের তাফসীর জানবার জন্য সবার আগে আমাদেরকে হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর শরণাপন্ন হতে হবে। ওহী যোগে আসা হেদায়াত ও জ্ঞানকে তিনি বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন এ হাদীসে। সুতরাং কুরআনের এ উদাহরণকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর কৃত এই তাফসীরের আলোকে দেখলে আমরা তাতে ৪টা উপকরণ খুঁজে পাই। যথা ঃ

এক ঃ আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের কাছে যে জ্ঞান ও হেদায়াত এসেছে, তা বরকতময় বৃষ্টির সমতুল্য।

দুই ঃ যাদের উদ্দেশ্যে এ হেদায়াত ও জ্ঞান নাযিল হয়েছে, তারা ঐ ভূখন্ড সদৃশ—যেখানে বৃষ্টি নামে।

তিন ঃ বৃষ্টি যেমন ভূমন্ডলের গভীরে তার নদী-নালা ও খালবিলে পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এই খোদায়ী হেদায়াতও তেমনি মানুষের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে। আর প্রত্যেকটি নদী-নালা যেমন নিজ নিজ প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা অনুপাতে কম বা বেশী পানি গ্রহণ করতে পারে, তেমনি মানুষের মনও তার স্বভাবগত প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতা অনুপাতে খোদায়ী জ্ঞান ও হেদায়াত ধারণ করতে পারে।

চার ঃ উপরে যা যা উল্লেখ করা হলো, তা উদাহরণের আসল শিক্ষা নয়। এর আসল শিক্ষা হলো আল্লাহর এই উক্তিটুকু فاحتمل السيل زبدا رابيا "আবার যখন প্লাবন এলো তখন উপরিভাগে ফেনাও জেগে উঠলো।" ফেনা পানির উপরে ভাসা একটা অতি নরম ও ক্ষয়িষ্ণু জিনিস। ক্ষণিক পরেই তা শুকিয়ে উবে যায় এবং তার নীচে অবশিষ্ট থেকে যায় একমাত্র পরিষ্কার টলটলে মহা উপকারী পানি। এ হচ্ছে হক ও বাতিলের উদাহরণ। বাতিল ঐ ফেনার মতই অসার ও ক্ষণস্থায়ী। আর হক ঠিক পানির মতই সারবান ও সকল জড়, জীব, উদ্ভীদ ও প্রাণীর জন্য অপরিহার্য ও মহোপকারী। ভূপৃষ্ঠের উজ্জীবনী ও উৎপাদনী ক্ষমতা পানি ছাড়া অকল্পনীয়।

আল্লাহ বলেন ঃ "এভাবেই আল্লাহ সত্য ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দেন। ফেনা তো শুকিয়ে উবে যায়। আর যা মানুষের উপকারে আসে তা থেকে যায় মাটির উপরে। এভাবেই আল্লাহ্ উদাহরণ দেন।" উদাহরণের ৪টা উপকরণই উল্লেখ করা হলো। একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে আপনি উক্ত ৪টা মূল উপকরণের ভেতরে সীমিত রেখেই এভাবে বলতে পারেন ঃ

www.pathagar.com

[১] আল্লাহ যখন আকাশ থেকে পানি নামিয়ে বস্তুজগতের সকল সজীব জিনিস তা থেকে সৃষ্টি করলেন, তখন তার অপার কর্মকুশলতা দাবী জানালো যে, আত্মিক জগতের প্রাণীদের জন্যও তিনি তাদের সজীবতা ও পরিপুষ্টির নিশ্চয়তাদানকারী কোন জিনিস নাযিল করবেন। প্রতিটি মানুষের সত্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহ ও অদৃশ্য রূহ—এই দু'টো জিনিস দ্বারা তৈরী। এই শরীরের উজ্জীবনী শক্তি ও পরিপুষ্টি সাধনে যা প্রয়োজন কেবলমাত্র তা নাযিল করেই আল্লাহ ক্ষ্যান্ত থাকবেন, আর যে রূহ এ জীব জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, তাকে অবজ্ঞা করবেন—এটা হতে পারে না। এটা যেমন বিজ্ঞানসম্মত নয়, তেমনি সৃষ্টি জগতের শৃংখলা অব্যাহত রাখার পক্ষেও তা সহায়ক নয়। আল্লাহ তায়ালা এমন অন্যায় থেকে বহু উর্ধে। মানুষের মামুলী বুদ্ধিমত্তা ও সাধারণ জ্ঞান দ্বারাই এ কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা সম্ভব এবং একথা থেকে নবুয়াত ও রিসালাতকে অস্বীকারকারী নাস্তিকদের সব সন্দেহ নিরসন হয়ে যায়। দেহের লালনের জন্য সৃষ্টি করা দ্রব্যাদির পাশাপাশি মন ও আত্মার জন্য নাযিল করা এ জিনিসটা হচ্ছে ওহী—যা আল্লাহ মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে নবীদের নেতা ও শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীর ওপর নাযিল করেছেন। এই ওহীই হচ্ছে মানুষের মনের সঞ্জীবনী শক্তির উৎস। এই শক্তি যখন তার মনে সঞ্চারিত হয় তখন তা জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং দেহের ওপর পানি যে ভূমিকা পালন করে, মনের ওপর ঐ ওহীও ঠিক সেই ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়টার দিকেই আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে ইংগীত দিয়েছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ

وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ط

"এভাবেই আমি তোমার নিকটে একটি রূহ তথা আমার বিধান ওহী করে পাঠিয়েছি। কিতাব কি জিনিস এবং ঈমান কাকে বলে—তার কিছুই তুমি জানতে না। একে আমি একটি জ্যোতি বানিয়ে দিয়েছি। যার দ্বারা আমি আমার যে বান্দাকে ইচ্ছা হেদায়াত করে থাকি।"-(সূরা আশ শুরা ঃ ৫২)

আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় কিছুটা অস্পষ্টতা আছে বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কেননা পানি তো আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাই। অভিজ্ঞতা ও নিরীক্ষণ দ্বারা মানুষ, জীব ও উদ্ভিদের ওপর পানির প্রভাব সহজেই অনুভব করতে পারি। কিন্তু এইমাত্র যার কথা বলা হলো যে, আল্লাহ তা আত্মা ও মনকে সঞ্জিবিত করা ও রাখার জন্য নাযিল করেছেন, সেটা কি ?..... সেটা তো আমরা চোখেও দেখতে পাই না, হাতেও স্পর্শ করতে পারি না। আর এ কারণে তার কোন ছবি বা আকৃতি কল্পনা করাও আমাদের অসাধ্য।

www.pathagar.com

এই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য আমরা কোন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিতে পারবো না। কেননা তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, আল্লাহ ওহী করে পাঠানো ঐ বিধানকে রূহ বলে অভিহিত করেছেন। এই রূহ প্রাণীদের দেহে সঞ্চারিত প্রাণই হোক, কিংবা আল্লাহর রসূলের নিকট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ সঞ্জিবনী শক্তিই হোক—এর কোনটারই প্রকৃত ও আসল পরিচয় উদঘাটন করা সম্ভব নয়। আসলে এই অস্পষ্টতার জন্যই আল্লাহ এ উদাহরণটা দিয়েছেন। এর দ্বারা ঐ জটিল রহস্যকে মাটি, পানি, উদ্ভিদ ও ফল ইত্যাকার ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবযোগ্য জিনিসের আকারে রূপকভাবে প্রকাশ করেছেন। বস্তুত আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুমন্ডল উচ্চতায় ও শ্রেষ্ঠতায় উপরোক্ত দুই ধরনের রূহের কোন একটিরও যদি সমতুল্য হতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা সেটির দিকে অবশ্যই ইংগীত করতেন, অথবা কমপক্ষে আমাদের কাছে রূপক বা উপমার আকারে নয়—বরং স্বাভাবিকভাবে তার উল্লেখ করতেন।

উল্লেখ্য যে, এই রহস্যময়তা কুরআনের যে বাণী আমরা পড়ি তাতে নয় বরং ঐ বাণীতে যে রূহ তথা সঞ্জিবনী শক্তি বিদ্যমান, তাতেই নিহিত রয়েছে।

২ কুরআনের উল্লিখিত উদাহরণ বা প্রবাদ বাক্যটিতে যে কয়টি উপাদান রয়েছে, তার প্রথমটি সম্পর্কে মোটামুটি একথাই বলা চলে। দ্বিতীয় উপাদান সম্পর্কে বলা যায় যে, আসলে তো আল্লাহর হেদায়াতের ওপরেই মানুষের রূহ বা আত্মার বেঁচে থাকা নির্ভরশীল। এ ছাড়া আর কোন জিনিসের সাহায্যে তা বাঁচতে পারে না। ঠিক যেমন জমীন পানি ছাড়া জীবন লাভ করে না—সোনা, রূপা, আগুন, বাতাস কোন কিছুতেই তার জীবনী শক্তি ফিরে আসে না—ফিরে আসে শুধু পানিতে। সুতরাং ওহীর জ্ঞান ও বিধান ছাড়া অন্য কিছুতে যারা প্রাণশক্তির সন্ধান করে, যারা মেকী সভ্যতায়, অসার জ্ঞান বিজ্ঞানে কিংবা পার্থিব সম্পদে ও ভোগ বিলাসে, আপন সত্তার উজ্জীবন প্রত্যাশা করে, তারা নিছক অলীক কল্পনার ভিত্তিতে চলে। সত্য বলতে কি, তারা মৃত্যুর আঁধার গলিতে ঘুরে মরে। তারা যা চায় তাতেই মৃত্যু আর যা এড়িয়ে চলে তাতেই রয়েছে জীবনের হাতছানি। আল্লাহর ফরমান লক্ষ্য করুন ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۭ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতপর আমি তাকে জীবিত করলাম এবং তাকে এমন জ্যোতি দান করলাম যার সাহায্যে সে মানব সমাজে চলাফেরা করতে পারছে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান—যে অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তা থেকে বের হতে অক্ষম ? অবিশ্বাসীদের কার্যকলাপকে এভাবেই তাদের কাছে চমকপ্রদ করে দেয়া হয়েছে।"-(সূরা আল আনআম ঃ ১২২)

বস্তুত মৃত জমীন যেমন আল্লাহর রহমত স্বরূপ বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হয়ে উর্বর, শস্যশ্যামল না হওয়া এবং তার ভেতর ও বাহির সজিব ও তাৎপর্যমন্ডিত না হওয়া পর্যন্ত মৃতই থাকে, ঠিক তেমনি জীবনের সত্য ও সঠিক উৎস থেকে দূরে থাকা পর্যন্ত এই হতভাগা মানবকূলও মৃতই থেকে যায়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের মত গাফেল ও উদাসীনদেরকে এই বলে সাবধান করেছেন ঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

"জেনে রেখ, আল্লাহ মৃত জমীনকে জীবিত করে থাকেন। নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছি, যাতে তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার।"-(সূরা আল হাদীদ ঃ ১৭)

এখানে আল্লাহ জমীন বলতে হৃদয়ে বা মনের জমীনই বুঝিয়েছেন। কেননা এর অব্যবহিত পূর্বের আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ لا وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

"মু'মিনদের কাছে কি এখনো সে সময় আসেনি, যখন তাদের মন আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর নাযিল করা নির্ভুল বিধানের প্রতি নিবেদিত ও সমর্পিত হবে, যখন পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের মত দীর্ঘায়ূ ও নিষ্ঠুর এবং তাদের অনেকের মত পাপিষ্ঠ হবে না ?"-(সূরা আল হাদীদ ঃ ১৬)

পবিত্র কুরআনে এ ধরনের বহু আয়াত আছে, যাতে অনুর্বর মাটিকে বৃষ্টি দিয়ে উর্বর করার উল্লেখ রয়েছে এবং তার অব্যবহিত পূর্ব কিংবা পরের আয়াতে মনের সজীবতা ও পরিশুদ্ধির ইংগীত দেয়া হয়েছে। ঐ ধরনের বহু

www.pathagar.com

আয়াত উল্লেখ করে আমরা দেখাতে পারি যে, সেখানে মৃত মাটি বা জমীন শব্দ দ্বারা মন বা হৃদয়ের জমীই বুঝানো হয়েছে। তবে দীর্ঘসূত্রিতার আশংকায় তা থেকে বিরত থাকছি।

একইভাবে ওপরে যে জীবনের কথা বলা হলো, সেটাও নিছক জৈবিক সত্তার চালিকাশক্তিই নয়—যা অঙ্গপ্রত্যংগে প্রবাহিত হওয়া মাত্রই যে কোন প্রাণীর মতই মানুষকেও চঞ্চল ও গতিশীল করে তোলে। আমরা বরং সেখানে বলতে চেয়েছি আত্মিক শক্তির কথা। আমাদের সত্তার অভ্যন্তরে একটা অদৃশ্য আত্মিক আধার রয়েছে যার ভেতরে ঐ আত্মিক শক্তি প্রবাহিত হয়ে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। জৈবিক দেহের সাথে খাদ্য ও পানীয়ের যে সম্পর্ক থাকে, আত্মিক শক্তির সাথে তার সে সম্পর্ক থাকে না। এ আত্মিক শক্তি আসলে আল্লাহর নাযিল করা ওহী ও রিসালাতের মধ্যে সুপ্ত এক গোপন প্রবাহ। ঊর্ধজগতের এই পবিত্র প্রবাহ যখন ঐ আধারে সঞ্চালিত হয়, তখন তা নড়ে চড়ে ওঠে, জেগে ওঠে, চঞ্চল ও সজীব হয়ে ওঠে। অন্যথায় তা এক নির্জীব ও নিস্প্রাণ পদার্থ—চাই তার ধারকের দেহ কাঠামো দৃশ্যত যতই সুঠাম ও প্রাণচঞ্চল হোক না কেন।

এখনেই আমাদের প্রশ্ন ঃ আত্মিক কাঠামোতে যখন আত্মিক শক্তি প্রবাহ সঞ্চালিত হয় তখন তার আলামত কি রকম দাঁড়ায়? মাটির সাথে যখন পানি মিশ্রিত হয়ে এবং তার ফলে যখন মাটির পরতে পরতে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হয়, তখন আমরা তা টের পাই ফসল ফল ও ফুল দেখে। কিন্তু যে জীবনের কথা আমরা বলছি (অর্থাৎ আত্মিক জীবন) তার কি কোন চিহ্ন নেই—যা দেখে আমরা তাকে চিনতে পারি? হ্যাঁ, কুরআন ও হাদীসে এর আলামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ এক ধরনের কতকগুলো অনুভূতি ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় ইতিপূর্বে যার অস্তিত্ব ছিল না। এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি মূল্যবোধের উল্লেখ করছি। অবশ্য এগুলোর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়।

এক ঃ আত্মিক শক্তি যার মধ্যে জাগ্রত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে, সে পার্থিব জীবনে তার ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে ও গৌরববোধ করে। তার সন্তোষ ও গৌরববোধ প্রাপ্ত ঐশ্বর্যের পরিমাণ তথা আধিক্য বা স্বল্পতার ওপর নির্ভরশীল থাকে না। তার এ সন্তোষ এমন এক দুর্ভেদ্য রহস্য, যা পরিমাপ, পরিধি ও পরিসংখ্যানের জগতের ঊর্ধের এক ভিন্নতর জগত থেকে জন্ম নিয়ে তার চেতনায় এসে অবস্থান করে। তাই বলা যায়, সে সুখী এবং গর্বিত। তবে তার সুখ ও গর্ববোধের কারণ বা উৎস আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়।

দুই ঃ পার্থিব জীবনের যত ঝুঁকি, ঝামেলা ও দায়দায়িত্ব তার ওপর আপতিত হয় এবং যেসব কর্তব্য তাকে পালন করতে হয়, তা তার কাছে কঠিন

www.pathagar.com

ও গুরুভার না হয়ে অত্যন্ত হালকা ও সহজসাধ্য বলে অনুভূত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا○

"যে আল্লাহর সম্পর্কে সাবধান থাকে, আল্লাহ তার জন্য তার কাজ সহজ করে দেন।"-(সূরা আত তালাক ঃ ৪)

সহজ ও হালকা অনুভূত হওয়ার কারণ এই যে, সে ঐসব গুরুদায়িত্ব পালনে কেবল তার জৈবিক শক্তি দিয়েই তৎপর হয় না, বরং তার সত্তায় যে রূহানী শক্তির আর্বিভাব ঘটেছে, তার সাহায্যেও সে বলিয়ান থাকে।

তিন ঃ মানুষের সম্পদ, পদ, পেশা ও জাতিগত পার্থক্যের দরুন যে সামাজিক ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়, তার নজরে সে ভেদাভেদ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়। সকলের মর্যাদা তার কাছে সমান মনে হয়। এভাবে সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা সৃষ্টিকারী এক দুর্লংঘ্য ঐক্য তার কাছে প্রতিভাত হয়।

চার ঃ যে কোন ধরনের গর্হিত ও অসৎ চরিত্রকে ঘৃণা করা, গর্হিত চরিত্রধারী মানুষকে অপছন্দ করা এবং যে কোন ধরনের ন্যায় ও সৎ গুণাবলীকে ভালোবাসা এবং তার ধারকের প্রতি খুশী হওয়া তার মজ্জাগত স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়।

পাঁচ ঃ প্রত্যেক মানুষের মনই রকমারি কামনা, বাসনা ও ভোগ স্পৃহায় পরিপূর্ণ থাকে এবং তা তাকে বিভিন্ন রকমের খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, গগণচুম্বি বাসভবন, মনোরম আসবাব ও বিছানাপত্র, বিলাস দ্রব্য, পদমর্যাদা ও অর্থপ্রাচুর্য, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ○

"মানুষের জন্য তাদের মনোপুত জিনিস নারী, সন্তান, স্বর্ণরৌপ্যের স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি জমি পরম আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। মূলত ভালো আশ্রয় তো আল্লাহর নিকটই রয়েছে।-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪)

এই সমস্ত কামনা-বাসনা ও লালসার বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণের কথা সবার জানা। কিন্তু আমরা যে জীবনের কথা বলছি, সেটা যখন তার ভেতরে

www.pathagar.com

সঞ্চারিত হবে, তখন এসবের প্রতি তার অনুভূতি কি ধরনের হবে ? নিশ্চয়ই তার অনুভূতি এরূপ হবে যে, এর দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়াই তার কাম্য। তার বেশী কিছু নয়। যখন কোন খাদ্য ও পানীয়ের জন্য সে আগ্রহী হবে, তখন সে তার প্রতি লোভাতুর ও আসক্ত হবে না, তার প্রতি বিলাসী ভোগবাদী ও লালসাকাতর হবে না—কেবল দেহকে তুষ্ট ও পুষ্ট করে টিকিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতটুকু একান্ত প্রয়োজন, ততটুকুই সে গ্রহণ করে ক্ষান্ত থাকবে।

আর যখন পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করবে, তখন ততটুকুই গ্রহণ করবে যতটুকু শরীরের চাহিদা পূরণের জন্য সহজ লভ্য। এর অতিরিক্ত কোন সাজসজ্জা ও বিলাস ব্যসনের আকাংখী হবে না। উপরোক্ত আয়াতে যে ভোগ বিলাস ও কামনা-বাসনার কথা আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন, তার কোন একটার সম্মুখীন যখন সে হবে, তখন তার অনুভূতি এক ধরনের পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠবে। তখন এ অবস্থাটাকে 'জুহদ' তথা বস্তুগত ভোগে অনাসক্তি অথবা অনীহা কিংবা অনুরূপ যে কোন নামে অভিহিত করা যায়। তবে সর্বাবস্থায় মনে রাখতে হবে যে, সেটা সমগ্র চেতনা ও অনুভূতিতে এমন এক অবস্থা পরিব্যপ্ত হওয়ার শামিল যা 'তৃপ্তি' ও পরিতুষ্টিরই নামান্তর। কেননা তার আত্মার জগতে ইতিপূর্বেই জীবনের যে সওগাত নেমে এসেছে, তা তাকে বহু বিচিত্র রকমের স্বাদ, আনন্দ, সামগ্রী ও তৃপ্তি এনে দিয়েছে। যার ফলে তার কাছে সকল জৈবিক সামগ্রী, জৈবিক ক্ষুধা ও হীন লালসা মূল্যহীন ও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তার চেতনা ও অনুভূতি সেই গভীর ও অনুপম সম্পদ সামগ্রী অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অদৃশ্য জগতের সাথে যার সম্পর্ক চিরদিন অবিছিন্ন থাকে। এই সম্পদ সম্পর্কেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলতেন ঃ "আমার জীবনে কখনো কখনো এমন সময় আসে, যখন আমার মন আনন্দে নাচতে থাকে। তখন আমি মনে মনে বলি ঃ আমি যে অবস্থায় আছি, জান্নাতবাসী যদি তেমনি অবস্থায় থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তারা পরম সুখী জীবন যাপন করে।"

ছয় ঃ আমরা এ যাবত পাঁচটি আল্লাহ প্রদত্ত সামগ্রীর কথা আলোচনা করেছি। মানুষের আত্মিক সত্তায় যখন আল্লাহমুখী জীবনের গোপন তত্ত্ব সঞ্চারিত হয় তখনই সে ঐ পাঁচটি সামগ্রীর উপস্থিতি উপলব্ধি করে। অন্য কথায় বলা যায় ঃ আল্লাহমুখী জীবনের সবচেয়ে স্পষ্ট আলামত হলো, মু'মিনের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনই ঐ উপলব্ধির বাস্তব প্রতিফলন বা ব্যাখ্যা হিসেবে প্রতিভাত হয় মনের গভীরে সুপ্ত এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গোপন তত্ত্বের আওতা থেকে বের করে বাস্তবতার জগতে নিয়ে আসা হয়। অতপর তাকে সংগ্রামী জীবনের জন্য এক মহৎ আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে তার সুগভীর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এ

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় কখনোই সে লোক দেখানো বা মোনাফেকী আচরণ করে না এবং করতে পারেও না। কেননা সে এমন একটি প্রজ্ঞাজাত রহস্য দ্বারা প্রভাবিত যা তাকে উদ্বুদ্ধ ও বশীভূত করে। কর্মে উজ্জীবিত হওয়া ছাড়া তার আর কিছু করার থাকে না। সেই কর্মেই সে সুখী এবং পূর্ণ পরিতৃপ্তবোধ করে।

এই প্রেক্ষাপটে দুনিয়ার নশ্বর জীবনকে কেন্দ্র করে মানুষরূপী শয়তানদের মধ্যে যে কাড়াকাড়ি ও সংঘাত সৃষ্টি হয়, তার নাম জীবন নয়। আর যে দৈহিক কামনা-বাসনা নিষ্ক্রীয় মানবমূর্তিগুলোকে আলোড়িত ও আন্দোলিত করে এবং যার উস্কানীতে তারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ও পরস্পরের ওপর আক্রমণ চালায় তার নামও জীবন নয়। তুচ্ছ ও নগণ্য দেহগুলোকে মনোরম ও চাকচিক্যময় পোশাক পরানো এবং তার মুখ গহবরে রকমারি খাদ্য ও পানীয় ঢালাকেও জীবন বলা চলে না। আসল জীবন হলো আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত আত্মা ও আল্লাহর অনুগ্রহে বর্ধনশীল মহৎ অনুভূতিগুলো। অথবা বলা যেতে পারে, চক্ষুর অন্তরালের এই সুপ্ত সত্তার সজীবতাই প্রকৃত জীবন। এই সজীব সত্তাই ব্যক্তি ও জাতির সজীব ও প্রাণময় অস্তিত্বের নিয়ামক। এই সত্তাই মানুষের ভেতরে জ্ঞানের ভান্ডার, জীবন ও শক্তির উৎস, মহত্ব, স্বাধীনতা ও মর্যাদা উদ্দীপক এবং প্রত্যেক মহিমান্বিত ও সম্ভ্রান্ত সৃষ্টির উৎস। এই সত্তার জীবন ও অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহর নাযিল করা হেদায়াত ও জ্ঞান দ্বারাই সংরক্ষিত হতে পারে।

এই কল্যাণময় অন্তর্নিহিত সত্তাই হলো আমাদের মুনষ্যত্বের জমীনের সর্বোত্তম ফসল। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে যে জীবনতত্ব নাযিল করেছেন, তা দিয়েই এ ফসলে পানি সিঞ্চন সম্পন্ন হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে আল্লাহর ওহীর জ্ঞান দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে এই সত্তাই সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরামের মানবীয় ব্যক্তিত্বে জন্মলাভ করেছিল, ওহীর কল্যাণেই অতপর এই সুপ্ত ফসল বেড়ে উঠেছিল ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল। এভাবে বড় হয়ে, মোটাতাজা হয়ে, শক্ত ও লম্বা হয়ে অবশেষে এক সময় তা সবলতা ও পূর্ণতা লাভ করেছিল, তার ফল মজাদার খাদ্যে পরিণত হয়েছিল। এ স্তরে পৌছার পরই আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ـ

"যেন একটা কৃষিক্ষেত, তা প্রথমে অংকুর বের করেছে, অতপর তাকে শক্তিশালী করেছে, পরে তা মোটা শক্তিশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতপর তা

www.pathagar.com

নিজের কান্ডের ওপর দাঁড়িয়েছে। চাষকারীদেরকে তা মোহিত করে।"

–(সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৯)

আর এর শেষ ফল কি? তাহলো لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ "যেন কাফেররা এ সবের ফলে ফুলে সুশোভিত হওয়ার দরুন জ্বলতে থাকে।"

বস্তুত এটাই হলো আসল জীবন। আমেরিকা ও ইউরোপের সেই জীবন নয়—যা সর্বত্র মূর্খ লোকদের কামনার বস্তু। ঐসব বাধাবন্ধনহীন কাফেরের দেশে আসলে মানুষ নেই—আছে শুধু কতকগুলো বিদ্রোহী শয়তান। তারা মানবীয় হৃদয় বিহীন শূন্য প্রান্তরগুলোতে বসতি স্থাপন করেছে। দেখতে তারা মানুষের মতই। কিন্তু তাদের দেহের ভেতরে আসন গেড়ে বসে আছে শয়তান। সে তাদেরকে সর্বত্র অন্যায়ভাবে ও গোর্হিত কাজের জন্য উস্কে দেয়। তাই তাদেরকে নাশকতা ও ধ্বংসাত্মক কাজেই মেতে থাকতে দেখা যায়। তারা যা-ই গড়ে, ভাঙ্গার জন্য গড়ে। আর যা-ই আবিষ্কার করে, ধ্বংসের উদ্দেশ্যেই করে। জুলুমের জন্যই সর্বদা প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর ধন-সম্পদ অর্জন করে দুনিয়ায় কেবলমাত্র দর্প ও অহংকারের সাথে চলাফেরা এবং বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য। এসব অপতৎপরতা কোনভাবেই জীবনের আওতায় পড়ে না।

৩ (সূরা রাদের আয়াতে) উল্লিখিত উদাহরণের তৃতীয় যে উপাদান রয়েছে, সেটা এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ঃ নদীনালা ও খালবিলের সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা এক রকম নয়....এর ভেতরে যেটিতে বেশী পানি থাকে, যার গভীরতা ও প্রশস্ততা বেশী, যা পৃথিবীকে পানি দিয়ে সিঞ্চিত করার বেশী যোগ্যতা রাখে, সেটাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে নদীনালার পানি প্রবাহ বেশী, তার দুই কিনারে গাছপালা, ফসলাদি ও বাগবাগিচা অপেক্ষাকৃত বেশী জন্মাবারই কথা এবং মানুষের মনও তার দিকে বেশী করে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

ঠিক তেমনি, আল্লাহর নির্দেশ গ্রহণ করার ব্যাপারে মানুষের মনও বিবিধ রকমের। কেউ আছে বিপুল পরিমাণে গ্রহণ করে তার আত্মিক সত্তাকে প্লাবিত করে দিতে পারে। অন্যরা তার চেয়ে কম গ্রহণ করে অথবা গ্রহণ করার যোগ্যতা ও প্রশস্ততা কম রাখে। এরই ভিত্তিতে মানুষের মানের তারতম্য ঘটে। সবচেয়ে উন্নতমানের মানুষ হলো যিনি সবচেয়ে বেশী আল্লাহর নাযিল করা বাণী ও বিধানকে গ্রহণ করতে পারেন, মানুষের নিকট তা বেশী করে পৌছাতে ও তাদের বেশী করে উপকৃত করতে পারেন। স্বভাবতই এ ধরনের মানুষের মনে আল্লাহভীতির গাছ টগবগিয়ে বেড়ে ওঠে। হেদায়াত ও কল্যাণের বৃত্তকে সে তার আশপাশের মানুষের ওপর সম্প্রসারিত করে এবং সাধারণ মানুষের মন তার প্রচারিত আদর্শ ও তার অনুকরণের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়।

www.pathagar.com

বস্তুত এ জন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অনুসারীদের সংখ্যা বাড়লে খুশী হতেন, গৌরববোধ করতেন এবং এ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়াতে উদ্দীপিত করতেন।

তবে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক নদনদী, খালবিলের পানি ধারণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ক্ষমতার অতিরিক্ত পানি সরবরাহ করা হলে প্লাবন ও গরকী হতে বাধ্য। দেশের ধ্বংস ও বিনাশ সাধন অনিবার্য। তেমনিভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি সত্ত্বার আল্লাহর জ্ঞান ও হেদায়াত গ্রহণের সীমিত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সে যদি ঐ ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা বহন করে, তাহলে অচিরেই সে অবসন্ন বিতৃষ্ণ ও আল্লাহর প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে। এমনকি সে সন্দেহ সংশয়ে পড়ে যেতে পারে। যা বুঝবার ক্ষমতা সে রাখে না তা শিখে সে বিপথগামী হয়ে যেতেও পারে। আল্লাহর রসূল (সা) তাই বলেছেন ঃ "ইসলাম বড়ই নাজুক জিনিস। তাই খুবই ধীরে সুস্থে এর দিকে অগ্রসর হও। যে ব্যক্তি তার সওয়ারী জন্তুকে মাত্রাতিরিক্ত তাড়াহুড়া করে হাকায়, সে গন্তব্যেও পৌঁছতে পারে না, সওয়ারী জন্তুকেও খতম করে ছাড়ে।" অবশ্য নদীতে যদি তার ক্ষমতার চেয়ে বেশী পানি প্রবাহিত করতে হয়, তবে তা স্বাভাবিক নিরাপদ পদ্ধতিতেই করা সম্ভব। তাকে খনন করে তার পলি মাটি সরাতে হবে, তাকে গভীর ও চওড়া করতে হবে। মানুষের মনও তার বর্তমান ক্ষমতার অতিরিক্ত ধারণে সক্ষম হতে পারে। তবে সেটা একমাত্র আল্লাহই করতে পারেন। নদীনালার ওপর মানুষের যতটা কর্তৃত্ব চলে, মনের ওপর তা চলে না। মনের ওপর একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব চলে। রসূল (সা) বলেছেন ঃ মানুষের মন আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে বিভ্রান্ত কিংবা বিশুদ্ধ করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ج

"তুমি যাকে চাইবে, তাকেই হেদায়াত করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহই যাকে চান হেদায়াত করতে পারেন।"–(সূরা আল কাসাস ঃ ৫৬)

নদীতে বানের পানি আসার আগে তা শুকনো থাকে। তাতে তখন অনেক ধূলোবালি, ময়লা, আবর্জনা, ন্যাকড়া ও চামড়ার টুকরো ইত্যাদি থাকে। বানের পানি আসা মাত্রই এসব জিনিস সরে যায় এবং নদীর অভ্যন্তর ভাগ তা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। নদীর তলা থেকে পানির ওপরে এসব জিনিস ভেসে আসে এবং তারপর তা বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর হেদায়াত যখন মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন তা তাদের মনকে পবিত্র ও কলুষমুক্ত করে। কোন কলুষ কালিমা মনের ভেতরে টিকে থাকতে পারে না। অতি তাড়াতাড়ি তা অপসৃত হয়।

www.pathagar.com

তবে অতীতের পাপ ও গাফিলতিপূর্ণ জীবনের প্রতি ধিক্কার ও অনুতাপ সম্বলিত এক পুণ্যময় নতুন প্রজ্ঞা বা চেতনা মনের ভেতরে আবির্ভূত হবেই। এই ধিক্কার ও অনুশোচনা আত্মশুদ্ধি ও পাপ স্খলনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। অনুতাপ সমৃদ্ধ এই নবচেতনার জোয়ারে ছোটবড় সমস্ত গুনাহ খড়কুটোর মত ভেসে যায়। পাপের সেই ঘৃণ্য রূপ গুনাহগার বান্দাহর চোখে বারবার ভেসে ওঠে এবং তাকে পীড়িত ও ব্যথিত করে। সাথে সাথে সে একথা অনুভব করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে তিনি তার মনে ঐ নবচেতনা জাগরুক করেছেন। যতক্ষণ না তার মন থেকে পাপ চিন্তা দূরিভূত না হয়—যেমন পানির স্রোত থেকে ময়লা আবর্জনা ভেসে দূরে সরে যায়—ততক্ষণ তার মনে এই কৃতজ্ঞতার ভাব বাড়তে থাকে।

এ থেকে এই মর্মে একটা সূক্ষ্ম আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, মানুষের মনে আল্লাহর ওহীর জ্ঞান প্রবেশ করে তাকে প্লাবিত ও পবিত্র করার আগ পর্যন্ত সেখানে শয়তানের অনুপ্রবেশ ও কর্তৃত্ব চালু থাকে। মানব মনে শয়তানের এই হস্তক্ষেপের দরুন সেখানে দুষ্কৃতি ও অন্ধকার জন্মলাভ করে। আল্লাহর ওহীর জ্ঞান থেকে যাদের মন যতবেশী বঞ্চিত, তাদের মনে ততবেশী শয়তানের প্রভূত্ব ও আধিপত্য বজায় থাকে। কুপ্রবৃত্তি এবং অসৎ কামনা ও বাসনার আমদানী করা অপবিত্রতা ও কলুষতা এবং গুনাহর ফলে সৃষ্ট কলংকের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর রহমতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হলেই সেই কলুষ কালিমা ধোলাই করে পাক-সাফ করে দেয় এবং তাকে পুনরায় সৌন্দর্য সুষমায় মন্ডিত করে। সাহাবায়ে কেরামের জীবনই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাহেলী যুগে তাদের মন ছিল জাহেলিয়াতের কলুষ কালিমা ও আবর্জনায় ভরা বদ্ধ কূয়া। আল্লাহর ওহী সেখানে আসা মাত্রই তা হয়ে উঠলো হেদায়াতের নদনদী এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের আধার। এটাই আল্লাহর শাশ্বত রীতি। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। প্রত্যেক মানুষের মনে শয়তানের কিছু না কিছু প্রভাব থাকে। আল্লাহর জ্ঞান ও হেদায়াত সেখানে না ঢোকা পর্যন্ত তা থেকে মন পবিত্র হতে পারে না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জাহেলী ও ইসলামী জীবনে এর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে। শুধু হযরত ওমরের কথাই বা বলি কেন। সীরাত ও হাদীসের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তায়ালা নবুয়াতের আগে ও পরে একাধিকবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামের কাছে ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁর পবিত্র বক্ষ চিরে তাঁর মনের ভেতর থেকে অপবিত্র অংশ বের করে দিয়ে তাঁর মনকে পবিত্র করেছেন এবং তাকে পরে ঈমান ও প্রজ্ঞা দিয়ে পূর্ণ করেছেন। এ ঘটনা তাঁর শৈশবেও ঘটেছে, যৌবনেও ঘটেছে। এতে করে রসূল (সা) বিশিষ্টতা লাভ করেছেন। তার মনকে সর্বোচ্চ পরিমাণে পবিত্র করা হয়েছে যাতে করে আল্লাহর ওহীর নূর জিবরীল কর্তৃক এমন নির্মল

www.pathagar.com

পবিত্র স্থানে নাযিল করা যায়, যা নূর দ্বারা উদ্ভাসিত। একথাই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

"আলোর ওপর আলো। আল্লাহ তার আলোর দিকে তাকেই চালিত করেন, যাকে চালিত করতে চান। মানবজাতির জন্য তিনি উপমাসমূহ পেশ করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে বিজ্ঞ।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩৫)

এখানে যে সূক্ষ্ম ইংগীত রয়েছে, তা থেকে মনস্তত্ব, মনের ধর্ম ও চরিত্র এবং ভালো ও মন্দ গ্রহণে মনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অত্যন্ত নির্ভুল তথ্য অবগত হওয়া যায়। তবে সেই মনস্তাত্বিক আলোচনায় আমি ব্যাপৃত হবো না। যারা আল্লাহর অনুগ্রহ আশা করেন এবং আত্মশুদ্ধি ও তাওবার ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত নন, তাদের জন্য এ আয়াতে অনেক উপকারিতা রয়েছে। কেননা আল্লাহর কিতাবে মানুষের মনের সকল রোগ ও মলিনতা দূর করার ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই সর্বক্ষণ আল্লাহর কিতাবকে অধ্যয়ন করতে থাকা এবং তার দ্বারা নিজের পিপাসা নিবৃত করতে থাকা সকলের কর্তব্য।

৪- আয়াতে (সূরা রাদের আয়াতে) প্লাবনে বাহিত যে ফেনার উল্লেখ করা হয়েছে তা কি জিনিস? এ উদাহরণে তার অবস্থান কোথায়?

ফেনা হলো একটা নরম চকচকে বুদবুদে ভরা পদার্থ যা মাটির সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়ে যখন পানি প্রবেশ করে অথবা বেগবান স্রোতের সাথে যখন নদীর দু'কূল ছাপিয়ে পানি প্রবাহিত হয় কিংবা কোন কারণে পানি তরঙ্গায়িত ও আলোড়িত হয়, তখন সেই পানির ওপর ভাসতে থাকে। অচিরেই সেই বুদবুদ ভেঙ্গে যায় এবং সেই চকচকে পদার্থ শূন্যে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এ উদাহরণে তার অবস্থান অত্যন্ত সূক্ষ্ম। জগতের আসল সত্যের পাশাপাশি বাতিলের অবস্থান কি রকম, তা ব্যক্ত করার জন্যই আল্লাহ এই সূক্ষ্ম তত্ব পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاۤءً ج وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ط ۝

"এভাবেই আল্লাহ হক ও বাতিলের বিশ্লেষণ করেন, ফেনা তো উবে যায়। কিন্তু যা মানুষের কাজে লাগে (পানি) তা পৃথিবীতে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে থাকেন।"–(সূরা আর রাদ ঃ ১৭)

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্ পানিকে সত্যের সাথে, আর সত্য ও হেদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত মানুষের মন বা মানবীয় স্বভাবকে প্লাবিত নদ-নদীর সাথে তুলনা করেছেন। অতপর সর্বশেষে বাতিলকে পানির ওপরে ভাসমান নরম ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর ফেনার সাথে তুলনা করে উপমাকে পূর্ণতা দান করেছেন।

ফেনার গঠন ও উপাদান ঃ এখানে আমাদের প্রশ্ন, ফেনা যে একটা ক্ষণস্থায়ী জিনিস, তাতো জানলাম। কিন্তু তা কোত্থেকে এলো ? তার উৎস কি ?

এ প্রশ্নের জবাব থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, বাতিল কত তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তু ?

ফেনা পানির কোন উপাদান নয়। পানির উপরে তা ভাসে এই যা। তাহলে তা কিসের দ্বারা কিভাবে তৈরী ? তবে কি তার মাটির সাথে কোন সম্পর্ক আছে ?

এ সম্পর্কে বড়জোর এতটুকু বলা যায় যে, তা একটা ক্ষণস্থায়ী বস্তু। বায়বীয় গ্যাস থেকে তৈরী। ধুয়া বা ধুলার কণিকা ও পানির ক্ষুদ্রতম বিন্দুর সমবায়ে গঠিত নরম পদার্থ।

এতে কি হিসেবে ধরার মত কোন জিনিস আছে ? পানির বিন্দু থেকে তৈরী নম্র ও নাজুক দেহের এ জিনিসটা ভেঙ্গে গেলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। সত্যের মোকাবিলায় বাতিলের অবস্থা অনুরূপ। জগতে অস্তিত্বশীল সকল জিনিসেরই উৎস হলো হক বা সত্য। কিন্তু বাতিলের কোন উৎস বা অস্তিত্ব নেই। পানির তুলনায় ফেনার বুদবুদ যেমন, হকের তুলনায় বাতিল তেমনি। সুতরাং বাতিল অলীক কল্পনা ও বিভ্রান্তিকর খেয়ালের ফানুস ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যের পোশাকে তা মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। এভাবে এক সময় বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকৃতিও গ্রহণ করে। ফলে অজ্ঞ ও অদূরদর্শী লোকেরা তার দ্বারা ধোঁকা খায়। কিন্তু আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো সেই স্থায়ী উপাদানসমূহ—যা মানুষের উপকারে আসে। যখন বলা হবে যে, ফেনার বুদবুদ পানির উপাদানকে আশ্রয় করে মূলত অবাস্তবকে বাস্তবের আকৃতি দিতে সচেষ্ট, তখন একথাই বুঝা যাবে যে, বাতিল নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার জন্য যে চেষ্টা করে, তা আসলে অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বশীল করে দেখানোরই অপচেষ্টা মাত্র। সেই সাথে একথাও প্রমাণিত হবে যে, জগতে বাতিলের অস্তিত্ব ঐ বুদবুদের মতই তুচ্ছ, নগণ্য ও বায়বীয় কতকগুলো কণার সমষ্টির মতই অবজ্ঞেয়। আর এই কণা সমষ্টিকে পরস্পরে মোলায়েমভাবে সংযুক্ত করার প্রয়োজনে কিছু পানি আহরণ করা হয়। বস্তুত এভাবে বাতিলকে ফেনা বলে অস্তিত্বহীন দ্বারা মিছেমিছি সংগঠিত এই জিনিসটির যথার্থ পরিচয়ই ব্যক্ত করা

www.pathagar.com

হয়েছে। তথাপি আমাদের আশংকা হয় যে, কোন সরলমনা মানুষ হয়তো ভেবে বসতে পারে যে পরস্পরে সংযুক্ত ঐ কণাসমূহ একটা উল্লেখযোগ্য জিনিসে পরিণত হয়েছে। (এরূপ ভাবা কত বড় ভুল তা বুঝতে হলে) পাঠক যেন একটা বিরাট আকারের ফেনা—শুধু একটা বুদবুদ নয়—হাতে নিয়ে দেখেন, অতপর তা থেকে পানির বুদবুদ গেলে তার হাতে ঐ কণা সমষ্টির কতখানি অবশিষ্ট থাকে, তা যেন লক্ষ্য করেন। হাতের তালুতে তার যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে, সেটুকুই হলো এই অস্তিত্বহীনের অস্তিত্ব গঠনের উপাদান। জগতে যেসব উপাদান বা কণা বাতিলের অস্তিত্ব গঠন করে, তাকেও এ উদাহরণের আলোকেই বুঝে নিতে হবে। (অর্থাৎ সত্যের কিছু কণিকাকে আশ্রয় করেই বাতিল টিকে থাকে।)

হকপন্থীদের দৃষ্টিতে বাতিল ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে আমরা বাতিলের কোন স্বার্থকতা কল্পনা করতে পারি না এবং তাকে টিকিয়ে রাখার মত কোন উল্লেখযোগ্য শক্তিরও সন্ধান পাই না। কেবল এতটুকু শক্তির সন্ধান পাই—যতটুকু পানির ফেনাতে পাই। (অর্থাৎ ফেনা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পানি থেকে যতটুকু কণিকা বা উপাদান নিয়ে শক্তি অর্জন করে বাতিলও হক থেকে ততটুকু শক্তি নিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখে।)

এই সত্য যখন সন্দেহাতীতভাবে পাঠক উপলব্ধি করবেন, তখন তার মন মগজে ও অন্তর্দিষ্টিতে এমন প্রবল ও তীব্র আলো ফুটবে, যা দ্বারা সকল জিনিসের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হবে। কোন বাহ্যিক চমক দ্বারা ধোঁকা খাওয়ার অবকাশ আর থাকবে না। তখন এই আলোকে উদ্ভাসিত মন ও মগজের অধিকারীরা বুঝতে পারবে যে, বাতিলের সাথে লড়াই করতে ও তাকে যে কোন ময়দানে প্রতিহত করতে তাদের পানির ওপরের ঐ ফেনা ও বুদবুদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার চেয়ে বেশী কষ্ট করতে হয় না। এটা কেমন করে সম্ভব—একথা আমাকে জিজ্ঞেস না করে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন যে, আপনি ঐ আলো কতখানি অর্জন করতে পেরেছেন, আর তা অর্জন করার যোগ্যতা কতখানি লাভ করেছেন। তাহলে আপনার এ জিজ্ঞাসার জবাব আমার দিতে হবে না। আপনিই বুঝতে পারবেন যে, এই বাড়ন্ত ফেনা ও বুদবুদের স্থায়ীত্ব হকের শক্তিমান হাতের করুণার ওপর নির্ভরশীল। কেননা হককে দিয়েই আল্লাহ বাতিলকে আঘাত করেন ও তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেন। এই হকের হাত যখন উদ্যত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং সত্যের আলো বা নূর যখন তার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তখন বাতিল তার সামনে এত অক্ষম ও নির্জীব হয়ে পড়ে, যেমন ফেনা ও বুদবুদ কারো লাঠি, হাত বা পায়ের আঘাত কিংবা কারো মুখের ফুংকারের সামনে অসহায় ও বিপন্ন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

এ জন্যই আমরা যখন কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত পড়ি তখন একটা বড় রকমের ঘনিষ্ঠতাবোধ অনুভব করি ঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ قف ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

"দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমান লোকদের সদম্ভ চলাফেরা তোমাকে যেন প্রতারিত করতে না পারে। এসব কয়েক দিনের ভোগের আনন্দ মাত্র। এরপর তাদের সকলের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেটা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৬-১৯৭)

এই নিকৃষ্ট ঠিকানা—যা কিয়ামতের দিন তাদের আবাসস্থল হবে, তাতো পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই হাতে ন্যস্ত। কিন্তু দুনিয়াতে তা কতখানি নিকৃষ্ট, সেটা আয়াতের প্রথমাংশ থেকেই স্পষ্ট। অর্থাৎ বাতিলপন্থীদের যে বিরাট ক্ষমতা এবং বিশাল ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও কর্তৃত্ব দেখা যাচ্ছে, তা একটা স্ফীত ফেনা ছাড়া আর কিছু নয়। শিশুর মত নির্বোধ ও প্রতারিত লোকদের কাছেই তা বড় মনে হয়। সুতরাং এই ফেনাকে কোন গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়। কেননা তা কোন কিছুর সামনেই টিকে থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে এ আয়াত থেকে মু'মিন এক অতি মিষ্ট ও অতি আপনজন সুলভ আকর্ষণ ও উদ্দীপনা লাভ করে। সে উদ্দীপনা তাকে কোন সমস্যার সামনেই মাথা নোয়াতে দেয় না। সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতটি লক্ষ্য করুন ঃ

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لا قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ط قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ لا كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

"অতপর তালুত ও সহযাত্রী মুসলিমগণ যখন নদী পার হয়ে এগিয়ে গেল, তখন তারা তালুতকে বললো ঃ আজ (বাতিলপন্থী) জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করার কোন শক্তিই আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যারা বিশ্বাস করতো যে, তাদের একদিন নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে হবে, তারা বললো ঃ অনেকবারই দেখা গেছে যে, একটি ক্ষুদ্র দল আল্লাহর ইচ্ছায় বৃহত্তর দলের ওপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ সবসময় ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৯)

পবিত্র কুরআনে বাতিলকে এভাবে তুচ্ছ শক্তি নগণ্য ভোগের ও মনোরঞ্জনের বস্তু ও নিকৃষ্ট আদর্শ ও চরিত্র হিসেবে পেশ করে যেসব বর্ণনা

www.pathagar.com

এসেছে, তার সব ক'টা তুলে ধরা এখানে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সূরা আর রাদের পূর্বোক্ত আয়াতে তাকে যে ফেনা ও বুদবুদের তুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই কথাটা সবসময় মনে রাখাই যথেষ্ট। কেননা এটা মনে জাগরুক থাকলে প্রত্যেক আয়াত থেকেই বাতিলের নিতান্ত হীন ও নগণ্য চিত্রই ফুটে উঠবে।

বাতিলের প্রবণতা ও ফেনার বাষ্প ঃ এবার ফেনার সেই বাষ্প সম্পর্কে বলবো—যা না হলে ফেনা ফুলতো না, ফাঁপতো না এবং ধুলি কণার সমন্বয়ে সেই নগণ্য বস্তু তৈরী হতো না। সেই বাষ্পটা কি জিনিস ? বিজ্ঞানের বক্তব্য এই যে, এই বাষ্প বা গ্যাস তৈরী হয়েছে কতিপয় পঁচে যাওয়া দেহ থেকে। আর ঐ দেহগুলো পঁচে কতিপয় উপকরণের স্বাভাবিক ক্রিয়ায়। এখান থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর বিশ্লেষণ কত নিখুঁত ও সূক্ষ্ম এবং তার চিত্রন প্রক্রিয়া কত বিস্ময়কর।

উল্লেখিত উদাহরণে বর্ণিত পচন ও বিনাশন প্রক্রিয়ায় তৈরী গ্যাস মানুষের প্রবৃত্তির লালসা এবং হীন কামনা-বাসনারই প্রতীক। উক্ত গ্যাস যেমন ফেনা ও তার ফাঁপা বুদবুদের মূল উপাদান, তেমনি মানুষের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা এবং নশ্বর পার্থিব জীবনের তুচ্ছ ধূলিকণার প্রতি তার দুর্নিবার মোহই পৃথিবীতে বর্তমান যে কোন বাতিলের প্রধান উৎস।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, মানুষের ভেতর এই পচন ও বিকার কোত্থেকে কিভাবে এল—যার কারণে তার মধ্যে ঐসব খারাপ কামনা-বাসনা ও লোভ-লিপসার সৃষ্টি হলো ?

এ পচন ও বিকার তার ভেতরে নতুন তৈরী হয়নি। এটা তার সহজাত। আল্লাহ তাকে যখন ঘৃণীত পানি এবং দুর্গন্ধময় মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই এটা তার সঙ্গী হয়ে আছে। কাজেই মানুষের স্বভাবের মধ্যে যেটুকু নীচতা ও হীনতা দেখা যাবে, সেটুকু সেই মাটি ও পানি থেকেই সৃষ্ট। আল্লাহ আমাদেরকে এই ঘৃণ্য ও দুর্গন্ধময় মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য কিছু লোক যখন কোন কোন ব্যাপারে হীনতা, নীচতা, পাপ ও গোমরাহীতে লিপ্ত হবে, তখন তাদের মধ্যে তার বিপরীত কিছু গুণাবলীও দেখা যাবে, এমন ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন।

এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, প্রতিনিয়ত যে পবিত্র পানি নদ-নদীতে প্রবাহিত হয়, তা তার যাবতীয় পুঁতিগন্ধ ও মলিনতাকে হয় ধুয়ে সাফ করে দেয়, নচেৎ অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। ফলে ঐ নদ-নদীতে আর কারো জন্য কোন ক্ষতির কারণ থাকে না। তাতে দুর্গন্ধও থাকে না। ধ্বংসাত্মক জীবানুও

www.pathagar.com

থাকে না। নদ-নদীতে তো পানির কল্যাণে এই পরিশোধনের কাজ সাধিত হয়। এখন জানতে হবে, মানুষের ভেতরকার আধারগুলোকে মানুষের জন্মগত মলিনতা ও পংকীলতা থেকে এবং খারাপ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার জন্য তিনি কোন্ জিনিস নির্ধারিত করে রেখেছেন?

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে একটা কথা বলে রাখা দরকার। আল্লাহ সূরা রাদে নদ-নদী, পানি ও ফেনার যে উদাহরণ দিয়েছেন, উপরোক্ত আলোচনার কোথাও আমরা সে উদাহরণের আওতার বাইরে এক চুল পরিমাণও যাইনি। সমগ্র আলোচনায় আমরা শুধু ঐ উদাহরণেরই সমতুল্য ও সদৃশ জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলেছি। আর তার একটাকে অন্যটার ওপর কেয়াস করেছি। এর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দেয়া এই অনবদ্য উদাহরণটিতে যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও নির্দেশাবলী নিহিত রয়েছে তা খুঁজে বের করা। অতপর প্রশ্নের জবাব দিতে আমাদের আর বেগ পেতে হচ্ছে না। জবাব এই যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পুঁতিগন্ধময় মাটি থেকে সৃষ্টি করার পর তার সৃষ্ট পবিত্র আত্মা থেকে নির্গত বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন পানির ধারা দিয়ে আমাদেরকে প্লাবিত করেছেন। সেই রূহ বা আত্মাকে আমাদের দেহের ভেতরকার গোপন জগতে স্থাপন করেছেন এবং তার দ্বারা আমাদের ভেতরকার নির্জিব অংশগুলোকে জীবন্ত, মলিন ও অপবিত্র জিনিসগুলোকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেছেন। আর এসব সম্পন্ন করার কারণেই তিনি এই নতুন সৃষ্টি মানুষকে সম্মানিত করার জন্য ফেরেশতাদের সিজদা করার নির্দেশ দেয়াকে যথার্থ মনে করেছেন।

সেই পবিত্র নূরানী সৃষ্টিকে মানুষের দেহের মধ্যে স্থাপিত করেই তিনি ক্ষ্যান্ত হননি. বরং যুগ যুগান্তরে ও বংশ পরম্পরায় স্বীয় নবী ও রসূলদের ওপর এক জ্যোতির্ময় হেদায়েতের ধারা অবতীর্ণ করে তাকে আরো সহায়তা দান করেছেন। উপরোক্ত উদাহরণে এদিকে ইংগীত করেই বলা হয়েছে ঃ

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, আর সেই পানি বিভিন্ন নদ-নদীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রবাহিত হয়েছে।" বস্তুত আকাশ থেকে নেমে আসা পানি ভূপৃষ্ঠের নদ-নদীকে যেভাবে পবিত্র করে, পরিশুদ্ধ করে, সংরক্ষণ ও সিঞ্চন করে, ঠিক তেমনি হেদায়াতের ঐ আলোক ধারা যা নবীদের ওপর আকাশ থেকে নেমেছে—তাও আমাদের সত্তাকে পবিত্র করে, পরিশুদ্ধ করে, সংরক্ষণ ও সিঞ্চন করে।

মানব প্রকৃতিতে নিহিত ত্রুটিযুক্ত বৈশিষ্টসমূহ

আমরা আগেই জেনেছি যে, ফেনা পংকিলতা বিশেষ—যা নিতান্ত তুচ্ছ, নিকৃষ্ট ও অনুপকারী বস্তু। এর কোন শক্তিই নেই, স্থীতিও নেই। এ বৈশিষ্টের

www.pathagar.com

উৎস বা কারণ কি, তাও আমরা জেনেছি। ফেনা যে বাষ্প বা গ্যাস থেকে উৎপন্ন, তার রকম ফের উল্লেখ করে আমাদের কাজ নেই। কিভাবে তা বিলীন হয়ে যায় এবং মলিনতার সৃষ্টি করে, তাও বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের বক্তব্য শুধু উক্ত উদাহরণটির গভীর তাৎপর্য নিয়ে। গ্যাস বা বাষ্প বলে যে আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও খারাপ কামনা-বাসনা ও তা থেকে সৃষ্ট মলিনতাকে বুঝায়, তা নিয়েই আমরা কথা বলছি। বস্তুত আমাদের মানবীয় সত্তা যে মাটি থেকে সৃষ্টি সেই মাটির স্বভাব আমাদেরকে নিখুঁতভাবে যে বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগীত দেয়, উক্ত মলিনতা দ্বারা সে বৈশিষ্ট্যকেই বুঝানো হয়েছে।

এবারে আমরা দার্শনিক কল্পনাকে এড়িয়ে বাস্তবতার সম্মুখীন হবো। সে ক্ষেত্রে আমরা বলবো ঃ মানুষ একটা নির্জিব মাটি। তাতে জীবন সঞ্চারণের জন্য পানির প্রয়োজন। অথবা একথাও বলা চলে যে, মানুষ সম্পূর্ণ নেতিবাচক সৃষ্টি। তার মধ্যে কোনই ইতিবাচক বা সক্রিয়তাবোধক গুণ বৈশিষ্ট্য নেই। সে সম্পূর্ণ অক্ষম ও হীনবল, সম্মানহীন ও সম্পদহীন, নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন, মূর্খ ও অজ্ঞ। এমতাবস্থায় এই মাটির প্রকৃতি ও স্বভাব কি দাঁড়াতে পারে? এই মৌল সত্তা—যা থেকে মানুষ গড়ে উঠেছে—তার পরিণতি কি হতে পারে? একটা নিরেট নেতিবাচক স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব তৈরী হওয়া ছাড়া আর কিছু হতে পারে না —যার মধ্যে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্রও নেই।

মানসিক বা আত্মিক মৃত্যু ও তার তাৎপর্য

এই শূন্যতা ও দেউলিয়াত্বই এ মাটির স্বভাব। আর এটাই কুরআনে বর্ণিত আত্মিক বা মানসিক মৃত্যুর মর্মার্থ। পক্ষান্তরে সকল নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত এবং সকল ইতিবাচক গুণের আধার একমাত্র আল্লাহর মহান সত্তা। একথাই আল্লাহ তার ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ○

"হে মানবজাতি ! তোমরাই আল্লাহর সামনে দরিদ্র। আর আল্লাহই সমৃদ্ধিশালী, চির প্রশংসিত।"-(সূরা ফাতের ঃ ১৫)

দরিদ্র সকল দিক দিয়েই। জ্ঞান, শক্তি, সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চতা ইত্যাকার যতসব গুণে আল্লাহ স্বয়ং গুণান্বিত এবং যা অর্জন করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে আহবান জানিয়েছেন—এসব কয়টা গুণেই আমরা দরিদ্র ও দেউলে। এ জন্যই আমাদের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাকে জানবার আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা।

www.pathagar.com

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আকাংখা এবং কিভাবে তা ধ্বংসাত্মক লালসায় রূপান্তরিত হয়

এটা এমন একটা বিষয়, যা আমাদের দৃষ্টির সামনে আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত আলোচনার গুরুত্ব তুলে ধরে। কিন্তু এ মুহূর্তে আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছিনে। আমরা শুধু আলোচনা করতে চাইছি সেই নিরেট নেতিবাচক দিকটি—যা আমাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। এ নেতিবাচক দিক মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতে অপূর্ণতা, দৈন্য ও মুখাপেক্ষীতাকে উপলব্ধি করার মজ্জাগত প্রবণতা সৃষ্টি করে। সে উপলব্ধি এমনভাবেও জন্মাতে পারে যে, তার বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহ হয়তো তা টেরও পাবে না। কিন্তু তা তার অন্তর্নিহিত বুদ্ধিমত্তায় তীব্রভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে নিজের অজ্ঞাতসারেই মানুষ এমন কতকগুলো ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়ে যাকে আমরা নফসানী খাহেশ ও প্রবৃত্তির লালসা বলে থাকি।

উদাহরণ স্বরূপ, কখনো কখনো সে এমনভাবে অর্থ আহরণে প্রবৃত্ত হয় যে, সে নিজের প্রয়োজন পূরণের উপায় মনে করে আহরণ করে না। সত্য ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে কিংবা শত্রুর ওপর জয়ী হওয়ার উপকরণ মনে করেও তা উপার্জনে উদ্যোগী হয় না। বরং নিছক প্রবল ও সুগভীর লোভ ও লালসার বশবর্তী হয়ে অথবা জন্মগত অভাব রোধ দ্বারা তাড়িত হয়েই অর্থ উপার্জনে উদগ্রীব হয়। বস্তুত দরিদ্র ব্যক্তি প্রয়োজন পূরণের খাতিরে নয়—বরং তার সহজাত প্রবৃত্তির শূন্যতা ও দৈন্যবোধকে নিবৃত্ত করার জন্যই অর্থ আহরণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পদ তার এই দৈন্য ও অভাবকে কণা পরিমাণও দূর করতে সক্ষম নয়। এটা দূর করতে পারেন শুধু আল্লাহ। তাঁর অবিচ্ছেদ্য গুণাবলীই এই পিপাসা, ক্ষুধা, দারিদ্র, অপূর্ণতা ও নির্জিবতাকে দূর করে তাকে সুস্থ, সচ্ছল, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সজীব করে তুলতে পারে। সম্পদ অভাববোধকে দূর করতে পারে না বলেই আমরা দেখতে পাই, একজন দরিদ্র যখন অর্থ উপার্জনের সুযোগ পায়, তখন সে আর কোন স্তরে গিয়েই ক্ষ্যান্ত হতে চায় না। এমনকি সে তৃপ্তিকে অনুভবই করতে পারে না। কেননা প্রকৃত উৎসকে বাদ দিয়ে সে ভিন্ন উৎস থেকে তৃপ্তি লাভ করতে চায়। ফলে সে সত্যিকার তৃপ্তি ও সমৃদ্ধির নাগাল পায় না। যেমন ক্ষুধার্ত শিশু মায়ের স্তনের নাগাল না পেয়ে আঙ্গুল চুষতে আরম্ভ করে। এতে তার ক্ষুধা ও পিপাসা কোনটাই নিবৃত্ত হয় না।

মানুষের লোভ ও লালসা অর্থের প্রতিও হতে পারে, আবার নানা রকমের ভোগ-বিলাস ও সাজসজ্জার উপকরণের প্রতিও হতে পারে। কখনো তা প্রশংসা ও খ্যাতি লাভের অভিলাসেও রূপান্তরিত হতে পারে। অহংকারের বশে অগ্রাধিকার লাভের লিপ্সায়ও তাকে পেয়ে বসতে পারে। সমগোত্রীয়দের ওপর

www.pathagar.com

আধিপত্য, শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লাভের জন্য উদগ্রীব হতে পারে, কিংবা অন্য কোন ধরনের উচ্চাভিলাসে মত্ত হয়ে অন্যায়ভাবে কোন কিছু অর্জনে সচেষ্ট হতে পারে। এই চেষ্টা করার সময় সে বহু ভুল-ভ্রান্তি, গুণাহ ও জুলুমে লিপ্ত হতে পারে। সে নিজের ওপর এবং অন্যদের ওপর জঘন্য রকমের অপরাধও করে বসতে পারে। পৃথিবীতে স্বীয় প্রভাব ও আধিপত্যের তারতম্যে তার অপরাধের পরিধি ক্ষুদ্র কিংবা বিশাল হতে পারে। সীমা অতিক্রমকারী বা আগ্রাসনকারী একক ব্যক্তি কিংবা জাতি-উভয় রকমের হতে পারে। অপরাধ স্থূল ও বস্তুগত অথবা অদৃশ্য ও মানসিক হতে পারে—যেমন হীনকাপুরুষতা, জঘন্য তোষামোদ, প্রভুত্বের অহংকার কিংবা খোদায়ীর অলীক আকাংখা। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, সে লোভের ভ্রান্তি কিংবা হীন আহম্মকীতে লিপ্ত হতে পারে। কারুণ যেমন লোভের বশবর্তী হয়ে ঘোর অর্থগৃধ্নু ও চরম কৃপণ হয়ে বসেছিল কিংবা ফেরাউন যেমন নির্বোধের মত "আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় খোদা" এই ঘোষণা দিয়েও তৃপ্ত না হওয়ায় আকাশে আরোহণ করার উপায় খুঁজেছিল এবং তার হাস্যকর খোদায়ীর অলীক কল্পনাকে সেখানে বিস্তার করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল—ঠিক তেমনি। মানুষ এ ধরনের মাতলামীতে পুরোপুরি কিংবা আংশিক লিপ্ত হতে পারে। কি কারণে ? কারণ কি তা সে নিজেও জানে না। তবে এতে সে এক ধরনের ফূর্তি ও আনন্দ লাভ করে, এক ধরনের ভোগের তৃপ্তি পায় এবং প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। আর এতেই সে খুশী। তার স্বভাবে নিরেট নেতিবাচক চরিত্র অথবা অক্ষমতা ও বঞ্চনাপ্রসূত দৈন্যবোধ ছাড়া তার এ বাতুলতার পেছনে আর কিছুই সক্রিয় থাকে না। এই দৈন্যবোধ তার হীনতা ও নীচতাকে বড়ত্ব ও মহত্ব, অক্ষমতাকে ক্ষমতা, অপূর্ণতাকে পূর্ণতা, অজ্ঞতাকে বিজ্ঞতা, শূন্যতাকে পুষ্টতা এবং দেউলেপনাকে সমৃদ্ধি বলে আখ্যায়িত করে। এ সময়ে তার সুপ্ত চেতনার গভীরে একটা শাশ্বত আর্তনাদ উত্থিত হয়। কিন্তু সে তা শুনতে পায় না, তার মন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। সে আর্তনাদ আসে তার রূহানী সত্তা থেকে —যা নিকটে অবস্থিত জীবন রক্ষক পানির দিকে ব্যাকুলভাবে হাত বাড়ায়, কিন্তু সে পানির নাগাল পায় না। অথচ ভোগ লালসায় মত্ত এই মানুষটি এই ব্যাকুল তৃষ্ণাকে মেটানোর জন্য সত্য ও ন্যায়ের নির্ঝরিণী থেকে পানি পান করার পরিবর্তে এমন উৎসের অনুসন্ধান করে, যা মোটেই পানির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, নফসানী খায়েশ বা প্রবৃত্তির কামনা ও লালসা আসলে বঞ্চিত ও দেউলে মানব সত্তার স্বপ্নীল উচ্চাশা ছাড়া আর কিছু নয়। আঙ্গুল চোষা যে নিরীহ ঘুমন্ত শিশু আঙ্গুল চোষার তাৎপর্য কি, তা একেবারেই জানে না, এ মানুষটির হুশ জ্ঞান সেই শিশুর চেয়ে মোটেই উচ্চমানে উন্নীত নয়। এই দুই শিশু একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং অপরজন প্রাপ্ত

www.pathagar.com

বয়স্ক—উভয়ের কার্যকলাপে এ দিক দিয়ে একটা সাদৃশ্য লক্ষণীয় যে, উভয়েই এমন একটা নিস্ফল ও বৃথা চেষ্টায় লিপ্ত—যার পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। তবে উভয়ের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্যও রয়েছে। একজন নিজের মঙ্গলকে প্রত্যাখ্যান করে ঘোর অমঙ্গল ও পরিতাপকে স্বেচ্ছায় ডেকে আনে, আর অপরজন তা ডেকে আনে না জেনে ও না বুঝেই।

আল্লাহ একথাই কুরআনে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ○

"যেসব লোক কুফরীতে লিপ্ত ছিল, (কেয়ামতের দিন) তাদেরকে ডেকে বলা হবে ঃ আজ তোমাদের নিজেদের ওপর তোমাদের যেরূপ রাগ ও পরিতাপের উদ্রেক হচ্ছে, তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার সময় তোমরা যখন তা অস্বীকার করছিলে তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর তার চেয়েও বেশী রাগান্বিত হচ্ছিলেন।"–(সূরা আল মু'মিন ঃ ১০)

চোখ ধাঁধাঁনো বিজ্ঞানের কাছে যা হতবুদ্ধিকর

জেনে রাখুন, হক ও বাতিলের সংঘাত সমগ্র বিশ্বজগতেরই এক চিরন্তন সংঘাত। যে ব্যক্তি এই সংঘাতের রকমারি রূপ বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হয়, তার পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল, দুর্গম ও সমস্যা সংকুল। তাই আমি নিজেকে অত্যন্ত হতবুদ্ধি ও অসহায় অনুভব করি এই ভেবে যে, এই চমকপ্রদ উদাহরণের তাৎপর্য থেকে কোন্‌টা গ্রহণ এবং কোন্‌টা বর্জন করবো। মনে হয় যেন আমি এক ভয়ংকর গভীর আবর্তের সামনে দাঁড়িয়ে—যা এক জায়গায় স্থির থাকছে না। কেবল হক ও বাতিলের দুর্ভেদ্য রহস্য পর্যন্তই তা পৌছুচ্ছে না, বরং তা আমাদের এই বস্তু জগতের সীমানা পেরিয়ে আখেরাতের জগত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করছে। উল্লিখিত উদাহরণ পেশ করার পর আমাদের জন্য সরল ও প্রাঞ্জল মহাগ্রন্থ কুরআনের আয়াতসমূহের আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকছে না। আয়াতসমূহ যখনই হক ও বাতিল সম্পর্কে কথা বলবে তখন তার প্রতিটি শব্দের মর্ম বুঝতে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হবে, তার সূক্ষ্ম ইংগীতের লক্ষ্য কি সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। কেননা আমরা এখানে হক ও বাতিল সংক্রান্ত উদাহরণটি সম্পর্কে যেটুকু আলোকপাত করেছি, তা প্রত্যেক আয়াতের লক্ষ্য ও বক্তব্য বুঝবার জন্য যথেষ্ট।

প্রবৃত্তি বা নফ্‌স যে মানুষকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করে, কুরআন সে কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে। ঈমান বিনে যাবতীয় নেক আমল সেই মরিচিকার

www.pathagar.com

মত বৃথা—যাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি বলে ভুল করে, এ সম্পর্কেও কুরআন হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। কুরআন সেসব লোকের কথাও আলোচনা করেছে, যারা সবচেয়ে বেশী নিষ্ফল কাজ করেছে এবং যারা পার্থিব জীবনে তাদের সম্পদ ও সন্তান দ্বারা নিপীড়িত ও নিগৃহিত হয়েছে। প্রবৃত্তি পূজারীদের নির্বুদ্ধিতা, বিবেকবান লোকদের দূরদৃষ্টি, নির্জীব মানুষকে জীবনদান, মৃতদের খোদায়ী বাণী গ্রহণে অক্ষমতা, কাফেরদের মনোমুগ্ধকর মেঘ দ্বারা উদ্ভিদের উদগম, কৃষি ক্ষেত্রে উদ্ভিদের অংকুর ফুটে বের হওয়া এবং পরে তা শক্ত ও মোটা হয়ে দাঁড়ানো যা চাষীদেরকে মোহিত ও উল্লসিত করে এ সবই এবং এ ছাড়া আরো অনেক কিছু কুরআনে আলোচিত হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া এ ক্ষেত্রে অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি যে, এই উদাহরণটি অতি চমকপ্রদ ও কল্যাণকর এক অণুবিক্ষণ যন্ত্র স্বরূপ, যা আমাদের চর্মচক্ষু ও অন্তর চক্ষুর সামনে বহু নিগূঢ় সত্যকে তুলে ধরে। এই অণুবিক্ষণ দিয়ে যখন আমরা প্রত্যেকটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দেবো, তখন ঐ সমস্ত নিগূঢ় সত্য অবশ্যই চোখের সামনে ভেসে ওঠবে।

মোদ্দাকথা দাঁড়ালো এই যে, বাতিল এবং ফেনা উভয়ের নগণ্য অস্তিত্বের তিনটে সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথমত, উভয়ই এমন বস্তু যার মূল বিলীন হয়ে গেছে এবং যার মূলের সাথে কোন সম্পর্কও নেই। তা নিতান্তই উড়ে এসে জুড়ে বসা বস্তু। দু'টোর কোনটারই এমন গুণ নেই—যা তাকে হিসেবে ধরার মত মূল বস্তুতে পরিণত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, উভয়ই এমন জিনিস—যার দ্বারা কোনই উপকার সাধিক হয় না, যা কোন ফলাফল প্রসব করে না। তৃতীয়ত, উভয়ই ত্বরিত বিলীন হয়ে যায়। এর কোন স্থায়িত্ব নেই।

বস্তুত হকের যে মৌলিকত্ব আছে এবং বাতিল যে তুচ্ছ বস্তু, তা কুরআন যেভাবে চিত্রিত করেছে, তেমন সুন্দরভাবে আর কেউ চিত্রিত করতে পারে না। অনুরূপভাবে আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতাশালী কালাম মু'মিনকে হকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে এবং বাতিলকে হীন ও নগণ্য বস্তু বলে মেনে নিতে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করে, তেমন আর কোন কিছু করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য আমাদের বা আর কারো কোন অবদান প্রত্যাশা করা চাই না। মানুষ সুদূর কিংবা নিকট অতীতে এ ব্যাখ্যা বহুবার দিয়েছে। যারা দিয়েছে তাদের মধ্যে জ্ঞানী, মূর্খ, দার্শনিক ও অদার্শনিক সবরকমেরই লোক আছে। তাদের কেউ এত সংক্ষেপে ও এত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় কুরআনের এই দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে পারেনি, যতটা কুরআন নিজে করতে পেরেছে।

www.pathagar.com

ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন মানুষের স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

এ যাবত যা কিছু আলোচনা করেছি, তা ছিল সেই ফেনা সম্পর্কে—যা মানুষের মনের নদীতে ও তাদের দুনিয়ার কর্মজীবনের অপার সমুদ্রে ভেসে ওঠে। অর্থাৎ স্থূল বাতিল সম্পর্কে। ফেনা যেমন পানিকে ঢেকে রাখে, তেমনি বাতিলের নীচে হক চাপা পড়ে থাকে। ফলে মানুষের চোখে তা পড়ে না এবং সে যে পথ ও পদ্ধতিতে জীবন যাপন করে যাচ্ছে, সেটাই তার কাছে নিখুঁত ও সুন্দর মনে হয়। অধিকাংশ মানুষের অবস্থাই এই রকম। কিন্তু আরেক শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ মু'মিনের কথা। মু'মিনের মনের নদী যখন আল্লাহর ওহী ও নিগূঢ় তত্ত্ব দ্বারা প্লাবিত হয়, তখন তার জীবনেও ছোটখাট ত্রুটি দেখা যায়। তার বাহ্যিক জীবনে এগুলো ফেনার মতই ভাসমান। অচিরেই তা বিলীন হয়ে যায়। অতপর অবশিষ্ট থাকে শুধু বিশুদ্ধ নির্মল পানির উচ্ছল ফোয়ারা। সে স্রোতধারা শুধু সত্য ও কল্যাণেরই জোয়ার বইয়ে দেয়। এটাই স্বভাবগত প্রক্রিয়া। আমাদের জীবনে কিছু ভুলভ্রান্তিও ঘটুক, এটা যেন আল্লাহরই ইচ্ছা। আমাদের স্বভাবে পার্থিব জীবনের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী জিনিস থাকুক—এটা তিনি চেয়েছিলেন। এ জন্যই গুনাহ মানুষ হিসেবে আমাদের স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনুরূপভাবে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জন ও আমাদের স্বভাবের এক নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষেরই মনে পাপ ও পুণ্যের ইচ্ছা ঢুকিয়ে দিয়ে রেখেছেন। এখন বান্দা পুণ্য দিয়ে নিজেকে বিশুদ্ধ করবে, না পাপ দিয়ে তাকে কলুষিত করবে, সেটা তার এখতিয়ারে রেখে দিয়েছেন। তবে সে যতই পুণ্যময় হতে চেষ্টা করুক এবং নিজের ওপর যতই পাহারাদারী করুক, চিরদিনের জন্য সে নিজেকে স্বভাবজাত ভুলত্রুটি ও পার্থিব জীবনের অনিবার্য কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে না। কিছু না কিছু ভুল সে করবেই। কেননা দুনিয়ার নদ-নদীতে যেমন পানির ওঠানামা ও জোয়ার ভাটা আছে, তেমনি মনের নদীতেও পরিবর্তনের ধারা চিরকাল অব্যাহত থাকে। এই পরিবর্তনের ধারা ক্রমে মানুষের বাহ্যিক সত্তার ওপর দূষণীয় ফাঁপা বস্তুর সমাবেশ ঘটে থাকে। মনের এই অবস্থান্তরকে রসূলুল্লাহ (সা) জ্বলন্ত উনুনের ওপর উদ্বেলিত ডেগচির সাথে তুলনা করেছেন। ডেগচিতে উদ্বেলিত দ্রব্যের ওপর এক সময় ফেনার আস্তরন ভেসে ওঠে। মনের ভেতরেও এ প্রক্রিয়া চলে এবং তার ফলে বাহ্য সত্তায় ফেনা পুঞ্জিভূত হয়। মনের এই ফেনাই মু'মিনের ছোটখাট গুনাহ বা পদস্খলন। রসূলুল্লাহ (সা) এই বিষয়টাই এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ۔

www.pathagar.com

"আমার জীবন যার মুঠোর ভেতর, সেই আল্লাহর কছম—তোমরা যদি মোটেই গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে নিতেন এবং এমন এক জাতিকে সেখানে আনতেন, যারা কিছু গুনার কাজও করতো, আবার মাফও চাইতো আর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করতেন।"

একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, আল্লাহর রসূলের চেয়ে পরহেজগার কোন মানুষ হতে পারে না। তা সত্ত্বেও হাদীস থেকে জানা যায় যে, নামায পড়ার সময় নিজের পরনের কাপড়ের নক্শা ও চাকচিক্যের ওপর তাঁর নজর পড়ে গিয়েছিল। তাই নামায শেষে তিনি ঐ কাপড় বদলে ফেলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই কাপড় আমাকে নামাযে মনোনিবেশ করতে দেয়নি। সোনা হারাম হওয়ার আগের ঘটনা। তাঁর হাতে একটা সোনার আংটি ছিল। মেম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়ার সময় তার ওপর তাঁর নজর পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা খুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, আমি এক নজর তোমাদের দিকে দিচ্ছি, আর এক নজর এই আংটির দিকে।

শুধু তাই নয়, হাদীসে এও আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ "আমার মন (মাঝে মাঝে) মেঘাচ্ছন্ন হয়।"

হাদীসের প্রখ্যাত টিকা গ্রন্থ মিসবাহে বলা হয়েছে ঃ "এই হাদীসে মনের মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার অর্থ হলো দুনিয়ার স্বার্থ সংক্রান্ত চিন্তা এতটা জোরদার হওয়া যে তার কারণে আল্লাহ ও আখেরাতের চিন্তা ব্যাহত হয়। যদিও দুনিয়াবী স্বার্থ চিন্তারও গুরুত্ব আছে ; তবে আখেরাতের ভাবনার তুলনায় তা খেলাধুলার মতই তুচ্ছ। এসব আপদ রসূলুল্লাহর (সা) হৃদয়ের নদ-নদীতে কি কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতো ? আমরা জানি যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশুদ্ধতম নদী এবং নির্মলতম সাগর। কিন্তু তবুও সত্য কথা এই যে, সেই নির্মলতম সাগর বা নদীতেও পার্থিব চিন্তার আপদ ফেনার মত ভেসে উঠতো। তবে তা যে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হতো এবং অতি শীঘ্রই তা বিলীন হয়ে যেত, তা উপরোক্ত হাদীস থেকেই জানা যায়। তিনি অবিলম্বেই এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠতেন। ফলে নদীর ফেনার মতই তা দ্রুত বিলীন হয়ে যেত। যেমন নক্শা বিশিষ্ট কাপড় ও সোনার আংটি ফেলে দিয়ে তিনি অচিরেই ঐ আপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

কোন কোন মু'মিনের মধ্যে একটু বেশী ফেনা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। কিছু সংখ্যক মু'মিনের মধ্যে আবার ফেনার পরিমাণ খুবই কম থাকে। তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এঁদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ط

"এরাই হচ্ছে আল্লাহর পথপ্রাপ্ত। কাজেই তুমিও তাদের পদাংক অনুসরণ কর।"- (সূরা আল আনআম ৯০)

সূরা রাদে বর্ণিত উদাহরণটি থেকে যেসব নিগূঢ় তত্ত্ব আমি খুঁজে পেয়েছি, এখানে তাই বিবৃত করলাম। অবশ্য ওখানে আরো বহু মূল্যবান তথ্য থাকতে পারে—যার নাগাল আমি পাইনি। তবে যে সামান্য তত্ত্ব ও তথ্য পেশ করলাম, তাতে করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর বর্ণিত জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কত ব্যাপক, কত গভীর ও সুদূর প্রসারী, তা বেশ ভালোভাবেই আন্দাজ করা যায়।

আল্লাহর মহান কিতাবের একটি মাত্র লাইনে এমন বিরাট ও সদূর প্রসারী তাৎপর্যমণ্ডিত বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে এতবড় মুজিজা সম্পন্ন হতে পারলো, সে রহস্য নিহিত রয়েছে ঐ উদাহরণটিতেই, যাকে আল্লাহ অমর ও অক্ষয় করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

"বস্তুত আল্লাহ মানুষের জন্য উদাহরণাবলী পেশ করেন। আল্লাহ তো সকল বিষয়েই অগাধ জ্ঞানের অধিকারী।"-(সূরা আন নূর ঃ ৩৫)

রসূলের বর্ণিত উদাহরণাবলী

উদাহরণ পেশ করার এই যে রীতি আল্লাহ প্রবর্তন করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটা অনুসরণ করতেন। তিনি বহু উদাহরণ পেশ করতেন। সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলোকে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের সাথে তুলনা করে সরল ও সহজবোধ্য করে দিতেন। শুধু সহজবোধ্য নয়, অনেকটা চোখে দেখা জিনিসের মতই করে দিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেইসব উদাহরণের একটি আমরা পেশ করছি এখানে ঃ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা জাকারিয়া আলাইহিস সালামের ছেলে ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি নিজেও তা করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও তা করতে বলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে ইতস্তত করার উপক্রম করেছিলেন। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিলেন পাঁচটি কাজ নিজে করতে এবং বনী ইসলাঈলকে তা করার নির্দেশ দিতে। এখন হয় তুমি তাদেরকে নির্দেশ দাও নচেৎ আমি দেই। ইয়াহিয়া বললেন ঃ তুমি যদি আমার আগেই নির্দেশ দিয়ে

www.pathagar.com

দাও, তাহলে আমার আশংকা হয়, আল্লাহ আমাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেবেন অথবা আযাব দেবেন। তাই তিনি জনগণকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সমবেত করলেন। মসজিদ ভরে গেল এবং লোকেরা ভদ্রভাবে বসলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন যেন এই পাঁচটি কাজ আমিও করি এবং তোমাদেরকেও করার নির্দেশ দেই ঃ

প্রথমত, তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। যে ব্যক্তি শরীক করে তার উদাহরণ এই রকম ঃ যেন এক ব্যক্তি নিজের টাকা বা সোনা দিয়ে একটি গোলাম কিনলো এবং তাকে বললো ঃ এই আমার বাড়ী। এখানে বসে তুমি উপার্জন করবে এবং উপার্জিত দ্রব্য আমার কাছে সমর্পণ করবে।..........কিন্তু গোলামটি উপার্জন করতে লাগলো এবং উপার্জিত দ্রব্য তাঁর মালিকের পরিবর্তে অন্য কারো কাছে সমর্পণ করতে লাগলো। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার গোলামের এ ধরনের আচরণ মেনে নেবে?

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তোমাদেরকে নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন। নামায পড়ার সময় এদিক ওদিক তাকাবে না। কেননা বান্দার নামায পড়ার সময় যতক্ষণ এদিক ওদিক না তাকায় ততক্ষণ আল্লাহ তার মুখের দিকেই মুখ করে থাকেন।

তৃতীয়ত, তোমাদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। রোযাদারের উদাহরণ এই যে, সে সেই ব্যক্তির মত, যার কাছে একটি কস্তুরী রয়েছে এবং সে একটি দলের সাথে রয়েছে। সেই কস্তুরীর সুগন্ধে সে নিজেও যেমন মোহিত, দলের সকলেও তেমনি চমৎকৃত। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়েও উৎকৃষ্ট।

চতুর্থত, তিনি তোমাদেরকে ছদকার নির্দেশ দিয়েছেন। ছদকাকারীর উদাহরণ হলো, সে শত্রুর হাতে গ্রেফতার সেই ব্যক্তির মত, যাকে শত্রুরা পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে হত্যা করতে নিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সে বললো, আমার যা কিছু আছে তা মুক্তিপণ হিসেবে তোমাদেরকে দেবো। এতে তারা তাকে মুক্তি দিল।

পঞ্চমত, আল্লাহকে স্মরণ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে সে ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শত্রুরা ধাওয়া করে আসছে, আর সে দৌড়াতে দৌড়াতে একটা মজবুত দুর্গ পেয়ে গেল এবং তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সে নিজেকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করলো।.........তেমনি বান্দা আল্লাহর স্মরণ ছাড়া নিজেকে শয়তানের কবল থেকে বাঁচাতে পারে না।"

www.pathagar.com

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। আহমদ ও তিরমিজী এ হাদীস সংকলন করেছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, তাওহীদ, নামায, রোযা, ছদকা ও আল্লাহর স্মরণ—এই ক'টি জিনিসকে এক একটা উদাহরণ দিয়ে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে এগুলোতে মানুষের জন্য কল্যাণ ও মুক্তির কি কি উপকরণ আছে।

বস্তুত তাওহীদের মোদ্দাকথা হলো, ভালোবাসা, ভয় ও আশা-এ তিনটে ভাবাবেগকেই একমাত্র আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করতে হবে। মানুষ তার জীবনের যে ক্ষেত্রে যে কাজই করুক—এই কয়টি বড় বড় ও মৌলিক ভাবাবেগ এবং এগুলো থেকে উৎপন্ন অন্যান্য জিনিসের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত হয়েই তা করে। তাই বান্দার মনের এ কয়টা ভাবাবেগ—ভয়, ভালোবাসা ও আশা—যখন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, তখন তার সবকিছুই হবে আল্লাহর জন্য। তাঁর কথা, কাজ, ভ্রমণ, খানাপিনা, সকাল ও বিকালের পরিভ্রমণ, নামায ও ব্যক্তিগত ইবাদাত, জীবন ও মৃত্যু—সবই আল্লাহর জন্য হয়ে যেতে বাধ্য। এটাই আল্লাহ আমাদের কাছে চান এবং এর জন্যই তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এটাই তাওহীদের মর্ম ও তাৎপর্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্যে এই তিনটে ভাবাবেগকে শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন যেন এগুলোকে আমরা তার দিকেই বিস্তৃত ও তার সাথেই সংযুক্ত করি। এগুলো মহাপবিত্র রজ্জুর মত মানুষকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে। এই ভাবাবেগ-গুলোকে যখন কেউ আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্য কাউকে দেয় —আল্লাহ যেন তেমন বদনছিব কাউকে না করেন—তখন সে ঐ জিনিসগুলোকে তার অনুপযুক্ত জায়গায় স্থাপন করে অর্থাৎ তার সাথে অন্যায় ও অবৈধ আচরণ করে এবং নিজেকে নিজের স্রষ্টা ছাড়া অন্যের অনুগত বানায়। এটাই আসল কুফরি, আসল মূর্খতা এবং অন্ধত্ব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদাহরণটিতে একথাই চমৎকারভাবে ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এর উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি নিজের টাকা বা সোনার বিনিময়ে একটা গোলাম খরিদ করলো। অতপর তাকে বললো ঃ এই আমার বাড়ী, এই আমার জমী, বাগিচা, অথবা কারখানা। এ আমারই কাজ। তুমি এখানে কাজ কর এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলো আমার বাড়ীতে এনে পৌঁছে দিও। অতপর গোলামটি কাজ করতে লাগলো। কিন্তু উৎপন্ন জিনিস সে তার মনিবের পরিবর্তে অন্য লোকের বাড়ীতে পৌঁছাতে লাগলো। নিজের গোলাম এমন হবে —এটা কেউ পসন্দ করতে পারে কি ? নিশ্চয়ই নয়। এটা যখন আমাদের কারোরই পছন্দনীয় নয়, তখন আল্লাহর বান্দাদের পক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি মনের আবেগ ও আকর্ষণ অনুভব করা এবং সেই আবেগের

www.pathagar.com

প্রেরণায় কাজ করা আল্লাহর কাছে আরো বেশী অপছন্দীয় হবে—এটাই স্বাভাবিক। এটা অত্যন্ত সহজবোধ্য উদাহরণ। এর দ্বারা তাওহীদের আকিদা অত্যন্ত মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রোযা হচ্ছে মানুষের দৈহিক ও মানসিক চাহিদা বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং আল্লাহর ইপ্সিত আত্মশুদ্ধি এবং কল্যাণ লাভের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণেরই নাম। বস্তুত এ উপাদানগুলো অর্জিত হলেই রোযা পূর্ণাঙ্গ ও চরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত হতে পারে। রোযার এসব লক্ষ্য অর্জিত হলেই তা দ্বারা মানবীয় গুণাবলীর উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এর দ্বারাই এই মহৎ গুণাবলী ইন্দ্রিয়ের কামনা ও প্রবৃত্তির লালসার উর্ধে উঠে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুগ্রহ অর্জনের উপযুক্ত অনমনীয় ও অজেয় সংকল্পের পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম। হাদীসে কুদসীতে এই তাৎপর্যই তুলে ধরা হয়েছে এই বলে :

يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِىْ

"সে তার খাদ্য ও প্রবৃত্তির কামনাকে আমারই জন্য বিসর্জন দেয়।"

অর্থাৎ ঐ দু'টো জিনিসের বিনিময়ে আল্লাহর যে সন্তুষ্টি, অনুগ্রহ, দয়া ও দান লাভ করার আশা করা যায়, তার উদ্দেশ্যেই এবং তার আশায়ই সে ঐ দু'টোকে বর্জন করে।

এতে করে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুপম উপাদান দ্বারা গড়ে ওঠে। সে সত্তা তখন পবিত্রতা, মহত্ব, বিশুদ্ধতা ও উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হয়ে ওঠে। রোযাদারকে রক্ত ও মাংসের তৈরী সত্তা রূপে বাহ্যত দেখা গেলেও ভেতরে সে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত সত্তায় পরিণত হয়। তার মিষ্ট কথা, সততাপূর্ণ আচরণ ও মহৎ চরিত্র চারপাশের মানুষের নাকে মন মাতানো সুগন্ধি ছড়ায়। রোযা সংক্রান্ত এক হাদীসের উদাহরণ এই সত্যকেই তুলে ধরেছে এভাবে :

"তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত, যে একদল মানুষের মধ্যে কস্তুরী সহকারে বসবাস করে। ফলে সকলেই তার সুগন্ধে মোহিত হয়। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও উত্তম।"

এবার ছদকার প্রসঙ্গ। আল্লাহর পথে যা-ই দান করা হয় তাকে ছদকা বলা হয়। সম্পদের প্রেম এবং তা জমিয়ে রাখার প্রবল মোহ ও লিপ্সা মানুষের জন্মগত স্বভাবের অন্তর্গত। তাই আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা মনের ওপর বলপ্রয়োগেরই শামিল। এই বলপ্রয়োগ দ্বারা দাতা নিজের জন্মগত ভোগলিপ্সার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করে থাকে।

www.pathagar.com

পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত উদাহরণের সাথে এর সম্পর্ক এভাবে নির্ণয় করা যায়, মানুষের মন তার সমস্ত অন্তর্নিহিত উচ্চ ক্ষমতা, প্রবণতা ও ঝোঁক সহকারে মানব সত্তার প্রধান ও মৌলিক উপাদান। এই মনের সঞ্জীবনী অমৃত হলো আল্লাহর স্মরণ। আর সৎকাজ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে দান হচ্ছে মনের তৎপরতার বাস্তব ক্ষেত্র—যে তৎপরতা দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন সুসংহত ও দ্বিগুণ সবল হয় এবং সৌভাগ্য ও সম্মানের মনজিলে উপনীত হয়। কিন্তু শয়তান মানুষের অসাবধান মুহূর্তের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকে। সেই মুহূর্তটি পাওয়া মাত্রই চোখের নিমেষে সে তার মনের সেই মহৎ ও উচ্চ ক্ষমতাগুলোকে দখল করে বিকল ও আড়ষ্ট করে দিতে সক্ষম প্রবৃত্তির কতকগুলো খারাপ লালসা ঢুকিয়ে দেয়। ফলে তার মন থেকে সঞ্জীবনী অমৃত আল্লাহর স্মরণের প্রভাব বিলীন হয়ে যায়। তখন তার মনের ভেতরে দুনিয়াবী লোভ-লালসা চাঙ্গা হয়ে ওঠে, সকল ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট ও বিকল হয়ে যায় এবং কোন মহৎ আকাংখাই আর সেখানে অবশিষ্ট থাকে না। সে সবচেয়ে মারাত্মক ও সবচেয়ে ভারী দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে মানুষের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত হয়। একমাত্র আত্মবিশ্লেষণ ও আল্লাহর পথে ছদকা দেয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার মোহকে মন থেকে সরিয়ে ফেলা এবং কৃপণতা ও অর্থগৃধ্নুতার শৃংখল ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া এ অবস্থা থেকে তার মুক্তি পাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না। একমাত্র এভাবেই তার জীবনের প্রকৃত সজীবতা ফিরে আসতে পারে এবং তার সত্তায় সত্যের দিকে ধাবমান হওয়ার সংকল্প ও প্রেরণা পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। অন্য কথায়, এভাবে তার ওপর থেকে শয়তানের চক্রান্তের জাল ছিন্ন হতে পারে। এই সত্যই তুলে ধরা হয়েছে হাদীসের উদাহরণের এই উক্তিতে ঃ

আমি তোমাদেরকে ছদকা দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। ছদকা দানকারীর উদাহরণ হলো ঃ সে সেই ব্যক্তির মত যাকে শত্রু বন্দী করেছে এবং পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। অতপর সে বলে ঃ "আমি তোমাকে যত চাও মুক্তিপণ দিচ্ছি এবং এভাবে সে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।"

আর আল্লাহর স্মরণ হলো মানুষের মনের শক্তি ও সজীবতার নিয়ামক। শয়তান মানুষের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু। সে সবসময় মানুষকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে হটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। তাকে খারাপ কাজের প্ররোচনা দেয় এবং প্রবৃত্তির কামনা ও বাসনাকে চমৎকারভাবে সাজিয়ে তার কাছে পেশ করে। সে যদি শয়তানের প্ররোচনার অনুসরণ করে ও তার অনুগত হয়ে যায় তাহলেই আল্লাহকে ভুলতে বাধ্য, আর আল্লাহও তাকে ভুলে থাকবেন। খোদায়ী জীবন সূত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে তার মন ক্ষীণবল হতে

www.pathagar.com

হতে এক সময় সম্পূর্ণ মৃত হয়ে যাবে। এরপর তার সত্তার আর কোন শক্তি ও ক্ষমতা থাকবে না। মৃত মন মানব সত্তাকে কণা পরিমাণও শক্তি যোগাতে সমর্থ নয়। মনের সজিবতা বলতে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন কিংবা উচ্ছল রক্তের চলাচলকে বুঝায় না। বরং সত্যের প্রতি আগ্রহী এবং কল্যাণের লক্ষ্যে নিবেদিত থাকাই হলো প্রকৃত ও পুরিপূর্ণ সজিবতা। মন যখন এই অর্থে সজিব হবে তখনই মানুষ সত্য, কল্যাণ ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রামী সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং আজীবন পারবে। সত্য ও কল্যাণের সাথে তার খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা তাকে অন্যায় ও বাতিলের মোকাবিলায় কঠোর ও অনমনীয় রাখবে, সত্যের আগ্রহ ও আকাংখা তাকে দুর্নীতি ও অপকর্মের হোতাদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে রাখবে।[১] বস্তুত এই সংগ্রামমুখর জীবনই প্রকৃত জীবন। এছাড়া অন্য যে জীবন, তা হচ্ছে মৃতদের—যাদেরকে অন্যায়ভাবে কিংবা অজ্ঞতাবশত সজিবদের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। সজিব মনের প্রাণচঞ্চলতা ও সংগ্রাম মুখিতার উৎস হলো তার মধ্যে আল্লাহর উপস্থিতি। (অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ) অথচ শয়তানের কাছে এটাই সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার। কেননা সে মানুষকে সর্বক্ষণ জীবনের এই উৎস থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় এবং সে জন্য আল্লাহর স্মরণ থেকে তাকে ভুলিয়ে রাখা যায় এমন পন্থারই আশ্রয় নেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, (আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত) সজিব মনই হলো মানুষের মনুষ্যত্বের রক্ষাকবচ। যার সজিব মন নেই, সে একটা শূন্য দেহকাঠামো ছাড়া আর কিছু নয়। দুনিয়া ও আখেরাতে তার কোনই মূল্য বা ভারত্ব নেই। তাই আল্লাহ পরম দয়া পরবশ হয়ে আমাদেরকে সাবধান করেছেন এবং এই বিপজ্জনক শত্রু থেকে তার নিরাপদ রক্ষাব্যূহে আশ্রয় গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। সে রক্ষাব্যূহ হলো আল্লাহর স্মরণ। তিনি বলেছেন ঃ

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ ط اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ع

"অতএব তোমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় নাও। আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সাবধানকারী।"

একটি হাদীসে কুদসীতে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে বলেন ঃ

---

১. পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিতে আল্লাহ এই কথাই বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ط

"হে মু'মিনরা তোমরা তোমাদের নিকটতম কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। এ লড়াইতে তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে!"–(সূরা আত তাওবাহ ঃ ১২৩)

www.pathagar.com

انا مع عبدى ماذكرنى وتحركت شفتاه بى

"যতক্ষণ বান্দা আমাকে স্মরণ করে এবং আমাকে নিয়ে সোচ্চার থাকে ততক্ষণ আমি তার সাথে থাকি।"

বস্তুত আল্লাহ যার সাথে থাকবেন, সে শক্তিশালী ও বিজয়ী হবেই, কোন শত্রুই তার শক্তির সামনে টিকতে পারে না। এমনকি যদি সারা পৃথিবীর সকল জ্বিন ও মানুষ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় তবুও নয়। আর একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ একথাই বলেছেন ঃ

أنا عند كل عبدى الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه

"আমি সেই বান্দার সঙ্গেই থাকি, যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করার সময় আমাকে স্মরণ রাখে।"

আল্লাহর এই সাহচর্য যদি তাকে এত শক্তি যোগাতে পারে, তাহলে সে সাহচর্য যে তাকে তার ক্ষতি করতে ইচ্ছুক যে কোন শয়তান ও মানুষ থেকে রক্ষা করতেও সক্ষম, সে কথা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

এটাই পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের উদাহরণটির নিম্নলিখিত উক্তির মর্মার্থ ঃ "আল্লাহকে স্মরণকারী সেই ব্যক্তির মত, যার পেছনে শত্রু প্রবল গতিতে ছুটে আসছে, আর সে ছুটতে ছুটতে একটা সুরক্ষিত দুর্গ সামনে পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়লো এবং শত্রুর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করলো। এমনিভাবে আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে।" এ পর্যন্ত দু'টো উদাহরণ পেশ করা হলো। একটা কুরআন থেকে, অপরটা হাদীস থেকে। আর একটা উদাহরণ আমরা পেশ করতে চাই প্রচলিত উদাহরণসমূহ থেকে। এটা অবশ্যই উক্ত দু'টো উদাহরণের মত মর্যাদাবান ও উঁচু মানের নয়। ধরুন, শরীয়াত কতকগুলো মারাত্মক অপরাধের যে ন্যায়সঙ্গত, কঠোর ও কার্যকরভাবে দমনমূলক শাস্তি নির্ধারণ করেছে, সেগুলোকে আপনি অন্যায়ের যথার্থ প্রতিরোধকারী এবং অপরাধের শিকড় উৎপাটনকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আপনি সেইসব লোকের জবাব দিতে চান, যারা শরীয়াতের এই শাস্তিগুলোতে বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান বলে আপত্তি তোলে। আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। ইখওয়ানের এক ভাই এ ক্ষেত্রে যে জবাব দিয়েছেন, আপনি দিব্বি সেই জবাব দিতে পারেন। জবাবটা এই একজন সুদক্ষ চিকিৎসকের কর্তব্য হলো রোগীর এমন চিকিৎসা করা, যাতে তার রোগ দূর হয় এবং তার নিরাময় ও সুসাস্থ্য নিশ্চিত হয়। এ রকম চিকিৎসার জন্য যদি কোন তিক্ত ঔষুধ খাওয়ানো অপরিহার্য হয়, তবে তা তাকে খাওয়াতে হবে। নচেৎ সে রোগীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে দোষী

www.pathagar.com

হবে। আর যদি চিকিৎসার স্বার্থে তার পেট কিংবা কোন অঙ্গ কাটার দরকার হয়, তবে সেটাকে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা আখ্যা দেয়া মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা বরঞ্চ একটা রহমত—যা বেচারা রোগীর সুখ, শান্তি ও শক্তি পুনর্বহালের উপায় হিসেবে বিবেচ্য। রোগীকে বাঁচানোর জন্য যদি অপারেশন অনিবার্য হয়েই দেখা দিয়ে থাকে তবে যত শীঘ্র সম্ভব অপারেশন করাই বুদ্ধিমানের কাজ —চাই দেখতে তা যতই নিষ্ঠুর বা কষ্টদায়ক মনে হোক না কেন। রোগের চিকিৎসায় এই পদক্ষেপ নেয়া যখন আপত্তিকর নয় বরং কল্যাণকর, তখন সেই বিজ্ঞতম আইনপ্রণেতা—যিনি তার আইন দ্বারা সমাজ দেহ থেকে ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী রোগ নির্মূল করতে চান, তাঁর কাজে আপত্তি কেন ? সেই মহান আইন প্রণেতা একজন চিকিৎসক ছাড়া আর কি ? পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তিনি সমাজের চিকিৎসা করেন, আর আমাদের ডাক্তার চিকিৎসা করেন শরীরের। চিকিৎসকের কর্তব্য হলো রোগীকে রোগমুক্ত করা, তার জন্য স্বাস্থ্য পালনের উত্তম নীতিমালা রচনা করা—যা সে পানাহারে, ঘুমে ও খেলাধূলায় মেনে চলবে, যাতে করে আজীবন সুস্থ থাকতে পারে। তেমনি আইন প্রণেতারও দায়িত্ব এই যে, তিনি সমাজকে রোগমুক্ত করবেন, তার জন্য সর্বোত্তম মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ আইন-কানুন ও ফৌজদারী বিধি রচনা করবেন—যা সমাজে বিপর্যয় ও ধ্বংসের উপাদানগুলোকে নির্মূল করতে পারে, সমাজকে মজবুত ও সুস্থ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং মানুষের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও স্থিতিশীল করতে পারে। আমরা যেমন রোগীর চিকিৎসা ও তার স্বাস্থ্যের উত্তম ব্যবস্থাপনার নিরীখেই চিকিৎসকের সাফল্য নিরূপন করে থাকি, তেমনি সমাজ কতখানি নিরাপত্তা, শৃংখলা এবং মানবিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিশ্চয়তা পেল, তার নিরীখেই আইন প্রণেতার সাফল্য নিরূপন করতে পারি। চিকিৎসকের কাছ থেকে যেমন আমরা আশা করি যে, রোগ নিরাময়ের আর কোন ওষুধ পাওয়া না গেলেই কেবল তিক্ত ওষুধ প্রয়োগ করবেন এবং অন্য পন্থায় নিরাময়ের আশা না থাকলেই কেবল অপারেশনের ব্যবস্থা নেবেন, তেমনি আইন প্রণেতার কাছ থেকেও আমরা এটাই প্রত্যাশা করি যে, সমাজের স্বাভাবিক কোমল, উদার ও নমনীয় ভাবধারার ওপর ততক্ষণ কোন নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করবেন না যতক্ষণ তাকে অক্ষুণ্ন রাখা জনস্বার্থ কিংবা ব্যক্তিস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে না দাঁড়ায়। তার কাছে এটাও সকলের প্রত্যাশা যে, কঠোরতর শাস্তি প্রয়োগের সুপারিশ কেবল তখনই করবেন, যখন দেখবেন যে, ছোটখাট শাস্তি দ্বারা অপরাধ ও দুষ্কৃতির প্রবণতা এবং আগ্রাসন ও বলপ্রয়োগের ঔদ্ধত্যের সম্ভাবনা নির্মূল করার অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

ইসলামী আইনের রচয়িতা যিনি মানবসমাজের চিকিৎসকও বটে—এই পদ্ধতিই অবলম্বন ও প্রবর্তন করেছেন। চুরির শাস্তির বিধি রচনা করার আগে সরকারী কোষাগারে সংগৃহিত অর্থে অভাবী নাগরিকের প্রাপ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কেননা সে সম্পদ আল্লাহরই। কোন নাগরিক বেকার হয়ে পড়লে সে যদি ব্যবসায়ী হয় তবে রাষ্ট্র তাকে পুঁজি সরবরাহ করবে, আর সে যদি পেশাজীবি হয় তবে তাকে চাকুরী দেবে অথবা সচ্ছল হবার মত জীবিকার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাকে ভাতা দেবে। আর্থিক বা দৈহিকভাবে বিপদগ্রস্ত নাগরিককে জীবন ধারণের যোগ্য ত্রাণ সাহায্য দিতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে। নিস্ব ও অচল হয়ে যাওয়া বৃদ্ধের জন্য দুর্দিনের সহায়ক জীবিকা সঞ্চিত থাকতে হবে সরকারী কোষাগারে। অক্ষম ও নিস্ব অভিভাবকহীন ছেলেমেয়ে রেখে কেউ মারা গেলে তাদের স্বাভাবিক জীবিকার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রই তাদের তত্ত্বাবধান করবে।

অপরাধ দমনের আইন রচনার জন্য এই হচ্ছে মৌল দিকদর্শন। কোষাগারের সঞ্চিত অর্থ যদি অভাবীদের অভাব মেটাতে পর্যাপ্ত না হয় তাহলে রাষ্ট্রকে আইনগত ব্যবস্থা কিংবা (প্রয়োজনে) অস্ত্রের সাহায্যে সক্ষম লোকদের কাছ থেকে অভাব মেটানোর যোগ্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে রাষ্ট্রকে। মানুষের মনকে সন্তুষ্ট করার এর চেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা আর কি থাকতে পারে? এসব হীতকর ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর যখন মহান আল্লাহ ঘোষণা করলেন ঃ

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ط

"চোর পুরুষ বা নারী যেই হোক—তার হাত কেটে দাও। এটা তাদের অপকর্মের প্রতিফল আল্লাহর দেয়া শাস্তি।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৮)

তখন এ ঘোষণায় যে সর্বোচ্চমানের বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায় বিচার প্রতিফলিত, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

এ শাস্তি নির্ধারণ করার সময় মহান আইন রচয়িতা আল্লাহ সমাজ কাঠামোতে চৌর্যবৃত্তির অবস্থানটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। সে সমাজের জন্য তিনি অধিকার, বিধি ও নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সমাজ এমন একটা কাঠামোর নাম—যার নিয়ামক নির্দিষ্ট আকিদা-বিশ্বাস, অর্থনৈতিক নীতিমালা ও জীবিকা উপার্জনের তৎপরতা। এখানে অবশ্য এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ নেই। অর্থনীতি দ্বারা আমরা বলতে চেয়েছি জাতীয় সম্পদের কথা। জাতীয় সম্পদ বলতে যা কিছু বুঝায় তা মূলত আল্লাহর সম্পদ —যা তিনি মানব সমাজকে দিয়েছেন—যাতে তার আদর্শিক চাহিদা মেটে, তার আদর্শিক প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি সুসংহত ও সংরক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে

www.pathagar.com

মানুষের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল রয়েছে যে, জাতীয় সম্পদ জাতীয় অস্তিত্বের রক্ষা কবচ। এটা এমন একটা উপকরণ, যার ব্যাপারে সকলেরই চিন্তা ও অনুভূতি একাত্ম। প্রত্যেকের মনে এ যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এ অনুভূতি অত্যন্ত গভীর যে, এই সম্পদ তার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ সম্পদের বৃদ্ধিতে সে খুশী হয়, এর সংরক্ষণে সে যত্নবান ও আগ্রহী থাকে এবং একে সবরকমের ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। কেননা সংরক্ষণের এ চেষ্টা তার নিজের সংরক্ষণেরই চেষ্টা বলে সে অনুধাবন করে। ফলে এই সামগ্রিক সংরক্ষণে ও সামষ্টিক একাত্মতায় সমগ্র সমাজের লোকেরা এক দেহের মত সংঘবদ্ধ হয়। একজনের কোন ক্ষতি হলে সকলেরই ঘুম হারাম হয়ে যায়, সকলেই অস্থির হয়ে ওঠে। এটাই 'প্রকৃত একাত্মতা ও সংহতি।' সংহতি কোন সংস্কারকের চাপিয়ে দেয়া জিনিস নয়, কোন আইন রচয়িতা বা গবেষকের অলীক খেয়াল বা আকাশ কুসুম কল্পনাও নয়। এটা একটা স্বভাব সিদ্ধ আদর্শিক ও মনস্তাত্বিক সত্য। সকল বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমান আনার ফলেই মনে এ সত্যের উপলব্ধি ঘটে।

এ ব্যাপারে যে আইন চালু আছে বা হবে, সেটা ভালো আইন না কালাকানুন, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আসল বিবেচ্য বিষয় হলো সমাজের লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে অনুভূতির ঐক্য থাকা চাই যে তাদের পারস্পরিক সংহতি ও একাত্মতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বিদ্যমান। সেই বিশ্বাস ও আস্থার বদৌলতে প্রতিটি লোক অর্থোপার্জনে মনোনিবেশ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। নিজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য অর্থের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনা করেই সে তা উপার্জনে ব্রতী হয়। কেননা তার সমৃদ্ধি ও উচ্চ মর্যাদা লাভের সাথে অর্থের মজবুত যোগসূত্র রয়েছে।

উক্ত অনুভূতি ও আস্থা যখন থাকবে না, একাত্মতা ও সংহতির প্রক্রিয়া যখন দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বন্ধন যখন ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বার্থপরতা এসে তার স্থান দখল করবে এবং আত্মপূজা ও অহমিকাবোধ হিংসা, বিভেদ এবং অন্যের জান ও মালের নিরাপত্তা ও পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার বিষাক্ত মানসিকতার জন্ম দিতে আরম্ভ করবে। উক্ত অনুভূতি ও আস্থার অবসানের প্রথম আভাস পেয়েই যদি শাসন কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, ত্বরিত সতর্কতামূলক নির্দেশ জারী করে যে অশুভ জিনিসের প্রাদুর্ভাবের সংকেত পেয়েছে, তার বিপজ্জনক উপস্থিতি রোধ করার পদক্ষেপ না নেয় এবং তা বিদ্যমান সকল ব্যবস্থা ও শৃংখলাকে লন্ডভন্ড করার সুযোগ পেয়ে যায়, তাহলে আর কোন সমাজ ও আদর্শের অস্তিত্ব থাকবে না। এমতাবস্থায় সমাজটা পরিণত হবে ডাকাত ও বিশ্বাসঘাতকদের আখড়ায়—যারা আইনকে

www.pathagar.com

হাতে তুলে নেবে এবং আধুনিক সভ্যতার উদ্ভাবিত সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই হলো জাতিসমূহের ধ্বংস ও পতনের তাৎপর্য। তাই ইসলাম যখন চোরের হাত কেটে দিয়ে সম্পদের মালিকানা সংরক্ষণের জন্য সমাজকে উৎসাহিত করে, তখন সে ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক একটা বিশেষ পরিমাণের সম্পদের ওপর আগ্রাসন চালানোর কারণে তা করে না। বরং সমাজকে উপরোক্ত ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্যই তা করে।

ইসলামের প্রতিটি আইনে এবং প্রতিটি শাস্তিমূলক বিধিতে এই প্রজ্ঞার ধারার স্ফূরণ ঘটতে দেখা যায়। অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ পরিমাণে সে প্রতিটি জন্মগত প্রবৃত্তি ও আবেগের স্বাভাবিক দাবী পূরণ করার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করে, কোনটাকেই সে বঞ্চিত করে না কিংবা কোন দাবী পূরণে বাড়াবাড়ি বা সীমা অতিক্রম করে না। এভাবে হালাল পন্থায় তাকে পরিপূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট করার পর বিনা প্রয়োজনে অপরাধে প্রবৃত্ত হওয়ার দরুন তাকে শাস্তি দেয়। উদাহরণ স্বরূপ কামাবেগ চরিতার্থ করার জন্য তাকে অত্যন্ত উদার ও প্রশস্ত হালাল পন্থা নির্দেশ করে বলেছে ঃ

"দুইজন, তিনজন অথবা চারজন—যা তোমার ভাল লাগে—স্ত্রী গ্রহণ কর।" এরপরও যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তার ওপর বেত মারা অথবা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার শাস্তি প্রয়োগ করে।

এরপর আমরা যদি আমাদের আইন প্রণেতা ও অনৈসলামী সমাজের আইন প্রণেতার কে কতখানি সফল হয়েছে তা জানতে চাই তাহলে আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে যে, এই দুই আইনের কোন্‌টা গরীবের চাহিদা কতখানি মেটাতে পেরেছে এবং কোন্ আইন সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি দূর করতে কতখানি সফল হয়েছে ? অনৈসলামী সমাজকে আমরা জিজ্ঞেস করবো যে, নারী পুরুষের সম্পর্ককে বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখবার চেষ্টা আমরাও করেছি, আপনারাও করেছেন। আপনারা কি মনে করেন যে, আপনাদের চেষ্টা সমাজকে বিশুদ্ধ করা ও রাখায় সমাজ থেকে খারাবী দূর করা এবং বিবাহের সমস্যাবলীর সমাধানে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে ? এ ব্যাপারে আপনারা কি আমাদের সমান সফলতা লাভ করতে পেরেছেন ? এ প্রশ্নের জবাবে আপনারা কি 'হ্যাঁ' বলতে পারেন ? সমাজের অবিবাহিত যুব ও পৌঢ়েরা কি আপনাদের সেই চেষ্টায় তৃপ্ত এবং তাদের সতিত্ব ও ইজ্জত নিয়ে কি তারা নিরাপদে আছে ? আপনারা কি বলতে পারেন যে, আপনাদের আইন ও শাস্তি বিধান সমাজ থেকে ব্যভিচারের প্রবণতা ও অশ্লীলতা দূর করতে সক্ষম হয়েছে ? পেরেছে কি তা লম্পটদেরকে শায়েস্তা করতে এবং নৈতিক শিষ্টাচার ও শালীনতা বজায় রাখতে বাধ্য করতে ?

www.pathagar.com

এর জবাব আমরা একমাত্র এটাই পাবো যে, অনৈসলামী সমাজের আইন প্রণেতারা এ ব্যাপারে শুধু ব্যর্থই প্রমাণিত হননি, বরং তাদের প্রতি যে আর আস্থা স্থাপনের অবকাশ নেই তাও প্রমাণিত করেছেন। একজন ব্যর্থ ও বিশ্বাসঘাতক চিকিৎসক—যিনি তার রোগীর চিকিৎসায় নিজের চরম অক্ষমতা কিংবা স্বেচ্ছায় অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন, তার দেয়া ওষুধ তার মুখের ওপর ছুড়ে মারা উচিত। ঠিক তেমনি ব্যর্থ ও বিশ্বাসঘাতক আইন প্রণেতারও মুখের ওপর ছুড়ে মারা উচিত তার রচিত নিষ্ফল আইন। মানুষ একটা বিশুদ্ধ ও সমস্যামুক্ত সমাজ চায়। যে ব্যবস্থা পূর্ণ নিপুণতা ও নিশ্চয়তা সহকারে এই সমাজ গড়ে দেয়ার গ্যারান্টি দিতে পারবে, সেই ব্যবস্থাকে অবশ্যই সকলের মেনে নিতে হবে। নচেত এর একমাত্র বিকল্প হলো নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা। নিম্নের আয়াত দু'টোতে সতর্কবাণীই উচ্চারিত হয়েছে ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْالَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَهُمْ ط وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۝

"তারা যদি আপনার দেয়া বিধান না মানে তাহলে জেনে নিন, তারা নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করছে। আর যারা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের চেয়ে বিপথগামী আর কে ? আল্লাহ স্বেচ্ছাচারীদের সুপথ দেখান না।"–(সূরা আল কাসাস ঃ ৫০)

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ۝ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ۝

"যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে নিন, আল্লাহ তাদের কোন পাপের কারণে তাদেরকে বিপদে ফেলতে চান। আসলে অনেক লোকই পাপ প্রবণ। তারা কি তবে জাহেলিয়াতের শাসন ব্যবস্থাই চায় ? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে ভালো শাসনকর্তা আর কে আছে ?"
–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৯-৫০)

উপরে চিকিৎসকের সাথে আইন প্রণেতার যে উপমা দেয়া হলো এবং উভয়ের কাজের যে বিশ্লেষণ ও তুলনা করা হলো, তা যথার্থ মানসিক তৃপ্তিদায়ক এবং যে কোন অবিশ্বাসী ও গর্বিত ব্যক্তির সকল কুযুক্তি খন্ডানোর জন্য যথেষ্ট।

www.pathagar.com

(৪)

চলতি ঘটনাবলীকে শিক্ষামূলক ও উপদেশমূলক করে পেশ করাও এক ধরনের উদাহরণ। এটা কাহিনীর আওতাভুক্ত নয়। কাহিনী দিয়ে তো একটা বিশেষ বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলা হয় এবং একটা বিশেষ শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়া হয়। কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে একটা অব্যক্ত মর্মকে স্পষ্ট করা হয় এবং তাকে একটা বাস্তব ঘটনার রূপ দিয়ে জীবন্ত ও প্রভাবশালী করে পেশ করা হয়। কিন্তু চলতি ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের যে আবেদন জানানো হয়, তার উদ্দেশ্য কাহিনীর উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। চলতি ঘটনার শিক্ষা আলোচনায় শেষ পরিণতির বিবেচনাই মুখ্য। শেষ পরিণতি দেখিয়ে মানুষের মনকে খারাপ প্রবণতা থেকে মুক্ত করা, তাকে সাবধান করা, ভীতি প্রদর্শন করা এবং কর্মে উদ্দীপিত ও উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে এ ধরনের উদাহরণও প্রচুর পরিমাণে শিখবার সুযোগ রয়েছে।

আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং তার দাবী পূরণে ব্রতী না হওয়া ঐ নিয়ামতকে হারানোর এবং তা হারিয়ে শোচনীয় দুর্দশাপূর্ণ জীবন যাপনের অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সৃষ্টি জগতে এটা আল্লাহর একটা চিরাচরিত রীতি। কুরআনে একথা বহুবার আলোচিত হয়েছে এবং আমরা দৈনন্দিন জীবনে এর ভূরি ভূরি বাস্তব নমুনা দেখি। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۝

"তুমি তাদের কর্মকান্ড দেখনি—যারা আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী করেছে এবং নিজেদের জাতিকে ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে?"
– (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৮)

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝ (النحل : ١١٢)

"আল্লাহ একটা দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। একটা জনপদ ছিল, নিরাপদ ও পরিতৃপ্ত। সকল স্থান থেকে তার জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা আসতো। অতপর সে আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী করলো। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও সন্ত্রাসের স্বাদ গ্রহণ করালেন। এসব ছিল তারই কৃতকর্মের পরিণতি।"

আরবরা সাবা সাম্রাজ্যের ইতিহাস জানতো। সে সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা অঢেল সম্পদের অধিকারী ছিল। হঠাৎ এক কপাল পোড়া বন্যা এসে তাদের

www.pathagar.com

ফসল, ঘরবাড়ি—সব ধ্বংস করে দেয়। এতে তাদের সামাজিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে সমগ্র আরব উপদ্বীপের এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্গতির অবসানের জন্য তারা আরবের ঊষর মরুর প্রান্তরে প্রান্তরে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তাদের এই শোচনীয় দশা পরবর্তীকালে প্রবাদে পরিণত হয়। যখনই কোন সমাজে বিচ্ছেদ দেখা দিত, বলা হতো ঃ "ওরা সাবার মত শতধা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।"

আরবদের এ সবই জানা ছিল। তাই সেই ঘটনাকে আল্লাহ মানুষের শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ج جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ط كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ○ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ○ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ط وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ○ (سبا : ٥١ - ٧١)

"সাবার জন্য তাদের বসতিতেই নিদর্শন ছিল ঃ দু'টি বাগান ছিল ডানে ও বামে। তোমরা তোমাদের প্রভুর দেয়া রিজিক খাও এবং তাঁর শোকর গুজারী কর। দেশ খুবই পবিত্র এবং প্রতিপালক ক্ষমাশীল। তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। তাই আমি তাদের ওপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা পাঠালাম এবং তাদের দু'টো বাগানের বদলে অন্য দু'টো বাগান দিলাম। তাতে তিক্ত ফল, ঝাউ গাছ এবং কিছু পরিমাণ বরই গাছ ছিল। এ ছিল তাদের কুফরীর প্রতিফল—যা আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম। আসলে অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া কাউকে আমি এমন প্রতিফল দেই না।"

জনসাধারণের মধ্যে এ জাতীয় উদাহরণ ও প্রবাদের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তা ছাড়া উপদেশের ক্ষেত্রে এগুলো বেশ হৃদয়গ্রাহীও। কাজেই এ জাতীয় প্রবাদ আর বেশী উল্লেখ করে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। ব্যক্তি কিংবা জাতিসমূহের বিপর্যয়ে প্রকৃত শিক্ষার্থীর জন্য খুবই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। শুধু এটুকু স্মরণ রাখতে হবে যে, খুবই নিকট অতীতের এবং লোকের ভালো স্মরণ আছে—এমন ধরনের ঘটনা অধিকতর শিক্ষাপ্রদ হয়ে থাকে।

(৫)

প্রবাদ বা উদাহরণ হিসেবে আরেক ধরনের প্রতীকধর্মী কিস্‌সার প্রচলন রয়েছে। এ ধরনের কিস্‌সা যারা রচনা করেছে তারা একে শাব্দিক অর্থে প্রয়োগ

www.pathagar.com

করে না। এর ভেতরে একটা রহস্যময় অর্থ থাকে—যা তারা কিস্‌সা বলার আগে অথবা পরে ব্যক্ত করেন। আমরা এগুলোর সাহায্যে বহু নছিহত করে থাকি। অনেক সময় প্রচারককে বিশেষ জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়। সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা সঙ্গত হয় না। প্রতীকধর্মী কিস্‌সা তাকে তার বক্তব্য তুলে ধরতে সাহায্য করে। তাছাড়া এতে এক ধরনের অভিনবত্বের স্বাদ রয়েছে। মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে এতে একটা নবজাগরণের প্রেরণাও বিদ্যমান। এ জাতীয় কিস্‌সা বা কাহিনী বলতে গিয়ে কাহিনীকারকে কখনো কখনো কিছু অস্বাভাবিক দুর্বোধ্য ও বিরল উপাদান পেশ করতে দেখা যায়। এর ফলে কাহিনী আরো মজাদার ও কৌতুকপ্রদ হয়ে ওঠে। আর শ্রোতাদের মন ও মগজ নিজের লাগাম বক্তার কাছেই সমর্পণ করে। কাহিনী বর্ণনা শেষ করার পর বক্তা যখন মূল সমস্যার সমাধান ও রহস্যের বিশ্লেষণ করা শুরু করবে, তখন শ্রোতার মন ও মগজে হেদায়াতের আলো ঝলমল করে উঠবে, তার বক্তব্য থেকে শ্রোতার মনে উপলব্ধি ও সন্তুষ্টির জোয়ার বয়ে যাবে। এটা অনিবার্য। কেননা বক্তা এখানে বস্তুর ব্যাখ্যা বস্তু দিয়েই করেছে। বিরল ও দুর্বোধ্য জিনিস বোধগম্য হয়ে উঠেছে। এই বোধগম্যতা অর্জিত হবার পর সে একথাও বুঝতে পারে যে, মানুষ মাত্রেই নিজের অজ্ঞাতসারে বহু দুর্বোধ্য জিনিসের ওপর জীবন অতিবাহিত করে থাকে। শ্রোতা যখন নিজের সেই বৈপরিত্য উপলব্ধি করে, তখন নিজের ওপর বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যায়। আর এ উপলব্ধিতে ইসলামের দাওয়াতদাতাই তার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

এখানে আমরা একটা প্রতীকধর্মী উদাহরণ পেশ করবো। তবে তার আগে ভূমিকা হিসেবে কয়টি কথা বলা দরকার ঃ অধিকাংশ মানুষেরই স্বভাব এই যে, দুনিয়ার ভোগবিলাসে এতটা মত্ত হয়ে যায় যে, ওটাই তাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ওর পেছনেই তারা সকল প্রচেষ্টা ও সকল চিন্তা-ভাবনাকে নিয়োজিত ও সংগঠিত করে। এই সংগঠন ও নিয়োগ করণের মধ্যেই তাদের সকল সময় ও আবেগ উদ্দীপনা ব্যয়িত হয়। তাই আখেরাতের চিন্তা ও ভাবনা তাদের মনে আসে না এবং তার জন্য কোন কাজও তারা করে না। এ জন্যই দেখতে পাবেন, একদিকে তাদের পার্থিব জীবন যে রকম জৌলুসপূর্ণ ও তৎপরতাময়, অপরদিকে ঠিক তেমনিভাবে তাদের পরকালীন জীবন পরিত্যক্ত অনুর্বর জমীর মত নিষ্ফল ও নিষ্ক্রীয়। এটা মানুষের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, বিকারগ্রস্ত চিন্তা ও উদাসীনতারই ফল। সে এমন একটা বিষয়ে উদাসীনতা দেখাচ্ছে, যা তার অনিবার্য পরিণতি।........আখেরাতের এই অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে উদাসিনতার এই বক্তব্য একেবারেই নির্ভুল ও পরম সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কথাটা যদি এভাবেই সাদামাটাভাবে বলা হয়, তাহলে উদাসীন লোকদের মনে তা তেমন সাড়া জাগাতে পারবে না, তাদের সম্বিত

www.pathagar.com

ফেরাতে পারবে না। আমরা এই পরম সত্যটি প্রখ্যাত ওয়ায়েজ আবু হাজেমের উপদেশমালায় পড়েছি। সুলায়মান বিন আবদুল মালেক তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "হে আবু হাজেম ! আমরা মৃত্যুকে এত ভয় করি কেন ?" তিনি জবাবে বলেছিলেন ঃ "কেননা আপনারা আপনাদের পার্থিব জীবনকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রীতে সমৃদ্ধ করেছেন কিন্তু আখেরাতকে বিরাণ করে রেখেছেন। আর একটা জৌলুসপূর্ণ জায়গা থেকে বিরাণ জায়গায় যাওয়ার কথা উঠলে মানুষ স্বভাবতই ঘাবড়ে যায়।" এই উপদেশমালায় ঐ সত্যটিকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে তা মনকে আরো গভীরভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত করে। কিন্তু নিম্নের প্রতীকধর্মী কিস্‌সাটিতে এই সত্যটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা আরো বেশী চিত্তাকর্ষক, আরো বেশী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। কিস্‌সাটি লক্ষ্য করুন ঃ কথিত আছে যে, এক সময়ে একটি রাজ্যের নিয়ম ছিল যে, প্রজারা একজনকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজার পদে বরণ করে নিত। তারা এক বছর অথবা অনুরূপ মেয়াদে তাকে রাজা বানাতো। তবে যে ব্যক্তি তাদের রাজা হতে সম্মত হতো, তাকে তারা শর্ত দিত যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের রাজকীয় সুখ সম্ভোগ করার পর প্রজারা তাকে একটা ঊষর মরুভূমিতে নিয়ে যাবে যেখানে পানি, ছায়া ও তরুলতা—কিছুই নেই। তারা তাকে সেই মরুভূমিতে রেখে আসবে এমনভাবে যে, সে সেখান থেকে বেরুতেও পারবে না এবং তার কাছে কোন খাদ্য ও পানীয় বাইরে থেকেও সরবরাহ করা হবে না। ফলে এক সময় চরম অসহায় অবস্থায় তাকে ক্ষুধা ও পিপাসায় ছটফট করে ঐ জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে মরে যেতে হবে। এই রাজ্যের ওপর দিয়ে একদিন একজন বিদেশী পর্যটক যাচ্ছিল। সে দেখলো, প্রজারা ভীষণ পেরেশান ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় রয়েছে। সে তাদের উদ্বেগের কারণ জানতে চাইল। প্রজারা তাকে বললো ঃ আমাদের রাজা নেই। দেশী বা বিদেশী কেউ আমাদের রাজা হতে সম্মত হচ্ছে না। তুমি কি সম্মত হবে আমাদের রাজার পদ গ্রহণ করতে ? সে বললো ঃ অবশ্যই হবো। কোন বুদ্ধিমান লোক কি এমন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারে ? লোকেরা তাকে বললো ঃ যে ব্যক্তি আমাদের রাজা হতে সম্মত হয়, তার ওপর আমরা কি শর্ত আরোপ করি এবং তার শেষ পরিণতি কি হয় তা কি তুমি জান ? পর্যটক বললো ঃ তোমরা কি কি শর্ত আরোপ কর ?

প্রজারা তাদের শর্তাবলী খুলে বললো। পর্যটক তা শুনে ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললো ঃ তোমাদের কি আর কোন শর্ত আছে ? তারা বললো ঃ না। পর্যটক কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে গভীরভাবে চিন্তায় মগ্ন হলো। সে ছিল ভীষণ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। কিছুক্ষণ পর সে মাথা তুললো এবং বললো ঃ "ঠিক আছে। আমি রাজী।" অতপর লোকটি রাজকীয় দায়িত্ব গ্রহণ

www.pathagar.com

করলো। সে অত্যন্ত দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাময় নীতির ভিত্তিতে শাসন পরিচালনা করতে লাগলো এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করলো। লোকেরা তার ওপর খুব খুশী হলো। তাদের জীবনে শৃংখলা ও সমৃদ্ধি এল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজকীয় ভোগ-বিলাস ও ঐশ্বর্যে সে তার ঊষর মরুর ভয়াবহ পরিণতির কথা ভুললো না। সে ঐ মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলো। সেখানে ফলমূলের বাগান, শস্যখামার ও ভবনাদি নির্মাণের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করার জন্য সে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও গবাদি পশু পাঠালো। এসব কাজ অতিদ্রুত সম্পন্ন হতে লাগলো। নদী, খাল ও পুকুর ইত্যাদি খনন করে সেখানে মিষ্ট পানি প্রবাহিত করা হলো এবং মনোরম বৃক্ষরাজির ঘন বনানী গড়ে তোলা হলো। কৃষকরা রকমারি ফসল উৎপাদনে এগিয়ে এল। রাজার জন্য সেখানে গড়ে উঠলো সুরম্য অট্টালিকা। বসবাসে আগ্রহী অন্যান্যদের জন্যও নির্মিত হলো প্রাসাদোপম ভবনসমূহ। এভাবে সেই মরুভূমি একটা নয়নাভিরাম সবুজ বাগানে রূপান্তরিত হলো।

এভাবে দিন গড়িয়ে চললো। প্রজারা ঘুণাক্ষরেও জানলো না রাজার এই অভাবনীয় কীর্তির কথা। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে প্রজারা রাজার কাছে এসে নোটিশ দিল ঃ হে রাজা ! তোমার মেয়াদ শেষ। এবার তুমি দয়া করে তোমার মরু জীবনের দিকে পাড়ি জমাও। রাজা গভীর আত্মবিশ্বাস, স্বস্তি ও স্থিরতার সাথে মুচকি হেসে সম্মতিসূচক জবাব দিল। বললো, "হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।" লোকেরা তার অবিচলতা ও স্থিরতা দেখে অবাক হলো। দেখলো, রাজা কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন বা উৎকিণ্ঠত নয়। সকলে তাকে নিয়ে মরুভূমির পথে এগিয়ে চললো। সারা পথ তারা সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলো রাজার এমন সগর্ব ও নিসংকোচে পদচারণার রসহ্য কি। কিন্তু কোনই কূল কিনারা করতে পারলো না। মরুভূমিতে পৌছে লোকেরা তো হতবাক। চারিদিকে বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল মাঠ, ফলে ফুলে সুশোভিত মনোরম উদ্যান ও সবুজ বনানী। আর সেই নয়ন জুড়ানো মন লোভা দৃশ্যের মাঝখানে জাঁকালো অট্টালিকার সারি। হতবুদ্ধি লোকেরা রাজাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ এসব কি দেখতে পাচ্ছি ? রাজা বললো ঃ যারা আমার পূর্বে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করতো, তারা ক্ষণস্থায়ী আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়ে পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন থাকতো। আমাকে তা উদাসীন করতে পারেনি। ভয়াবহ পরিণতির অনিবার্যতার কথা আমি ভুলিনি। আমি তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। তাই মেয়াদ শেষে আজ আমি এমন সুন্দর জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছি, যেখানে শুধু অঢেল কল্যাণ আর সুখ বিরাজমান।

তখন প্রজারা উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে বললো ঃ "হে বুদ্ধিমান রাজা ! তুমিই যথার্থ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। আমাদের শাসক হওয়া একমাত্র তোমাকে সাজে।

www.pathagar.com

তুমি আমাদের সাথে ফিরে চল। আবার সিংহাসনে আরোহণ কর। আমরা তোমাকেই ঐ আসনে বহাল রাখবো।"

এই কিস্‌সাটিতে কয়েকটি অযৌক্তিক ব্যাপার লক্ষণীয়—যা শুধু কল্পনার চোখেই সুন্দর মনে হয়। যেমন প্রজাদের তরফ থেকে রাজাকে নির্দিষ্ট মেয়াদ বেধে দেয়া এবং সেই মেয়াদ শেষে ঊষর মরুভূমিতে স্থানান্তরিত হবার শর্ত আরোপ। এটা এমন আজব ব্যাপার যে, সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের প্রত্যেককেই কি একদিন এই পার্থিব জীবন ত্যাগ করে যেতে হবে না? এখানকার আরাম-আয়েশ ও রূপ জৌলুস কি একদিন শেষ হবে না? আর তার জন্য কি একটা মেয়াদ নির্ধারিত নেই? আমাদেরকে কি একদিন অজানা অচেনা কবরে গিয়ে ঠাঁই নিতে হবে না? এই অকাট্য সত্যের প্রেক্ষাপটে ভেবে দেখলে কি একে আশ্চর্য মনে হয়? এটা কি রাজকীয় ঐশ্বর্য থেকে বিরাণ মরুতে স্থানান্তরের চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার? এখানে কি প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি অপরটির সাথে তুলনীয় ও উপমেয় নয়? নিশ্চয়ই এতে এমন অপূর্ব সাদৃশ্য বিরাজমান যে, মানুষের মনকে তার ভুলে যাওয়া অনিবার্য অভাবনীয় পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত ও সতর্ক করে দেয়। এটা এমন একটা উদাহরণ যা তার চোখের পর্দা খুলে দেয় এবং তার গাফিলতি ও উদাসিনতা দূর করে দেয়। বস্তুত এ ধরনের উদাহরণ আমাদের সামনে যতবেশী তুলে ধরা হবে ততই ভাল। এ কিস্‌সার বাকী অংশের বিশ্লেষণ করতে আমরা চাইনে। কেননা তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

বহু অলীক কল্পকাহিনী এমন আছে, যাকে আপনি এ ধরনের শিক্ষাপ্রদ রূপক কাহিনীতে রূপান্তরিত করতে পারেন। এ ধরনের কিস্‌সা থেকে যখন আপনার বক্তব্যের সমর্থক উপাদানকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটা সহজেই শিক্ষামূলক রূপক কাহিনীতে পরিণত হতে পারে। প্রখ্যাত রুশ দার্শনিক টলষ্টয়ের একটা বইতে আমি এ জাতীয় একটা কাহিনী পড়ে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেখানে তিনি সেইসব ধনিক শ্রেণীর ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়েছেন—যারা দেশের শুধু শাসন ক্ষমতাই নয়, বরং দেশের সকল সম্পদের ওপরও নিজেদের একচেটিয়া অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। তিনি বলেছেন যে, ঐ ধনিক শ্রেণী অত্যন্ত অলস ও শ্রমবিমুখ জীবন যাপন করে। দরিদ্র শ্রেণীর ওপর নির্ভর করেই তারা বেঁচে থাকে। এই দরিদ্র শ্রেণীই হলো সমাজের সবচেয়ে অক্ষম ও নিস্ব তথা শ্রমজীবি শ্রেণী। এতদসত্ত্বেও যত ক্ষমতার দাপট ও ধন-সম্পদ সবই ধনিকদের মুঠোর মধ্যে। আর যত দারিদ্র, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা অন্যদের প্রাপ্য। জীবনকে এই ধনিকরা কি দিয়েছে? জীবন তো চেষ্টা, শ্রম ও সংগ্রামেরই নাম। পৃথিবীর মাটির স্তর ভেদ

www.pathagar.com

করে কিংবা হাতুড়ি কোদাল ইত্যাদি মেরে জীবিকা আহরণ করাই তো জীবন। যে মেহনত করবে, সেই সম্পদ লাভ করবে, যে চাষ করবে সেই ফসল পাবে, যে শ্রম করবে সে আপন শ্রমের ফল ভোগ করবে—এটাই তো স্বতসিদ্ধ কথা। কিন্তু এই ভোগবিলাসী শ্রেণী কোন্ শ্রমটি সম্পাদন করে থাকে ? অথচ অঢেল সম্পদ ও নেয়ামত তাদেরই ভোগদখলে। তাদের এক একজন দিনের বেলা অলস জীবন কাটায় এবং খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দেয়। আবার রাতের বেলাও কাটিয়ে দেয় বন্য ফূর্তি, উদ্দেশ্যহীন এবং নোংরা অথবা পরিচ্ছন্ন হরেক রকমের আমোদ উল্লাসের ভেতর দিয়ে। এর কোনটাই তো জীবনের সহায়ক নয়। এর কোনটাই তো উৎপাদনশীল কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না। এসব অর্থহীন আমোদ-ফূর্তিতে জমিও চাষ হয় না, লোহাও পিটিয়ে সোজা করা হয় না, কোন অর্থও এতে বিনিয়োগ হয় না, কোন সম্পদও অর্জিত হয় না। অথচ কি আশ্চার্য ! এই অলস লোকগুলোই কোন কাজ না করেই সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে, সমস্ত ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির মালিক হয়ে যাচ্ছে এবং সমস্ত কার্যকর ক্ষমতাও তাদের মুঠোর মধ্যেই আসছে।

মূলত পার্থিব জীবনের ধর্মই এই যে, সে মানুষকে কাজ ছাড়া সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ দিতে কার্পণ্য দেখায়। ফলপ্রসূ শ্রম, সামনে এগিয়ে দেয়া ইতিবাচক চেষ্টা এবং আত্মার মধ্য থেকে আগত অজেয় শক্তি—এ তিনটি জিনিস পার্থিব জীবনের অপরিহার্য চাহিদা মেটায়। অতপর এ তিনটের বিনিময়ে সে তাকে দেয় পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক। যে যতটা শক্তি জোগাবে, যে যতখানি কাজ করবে, সে ততটা পারিশ্রমিক পাবে। কিন্তু এই নিষ্ক্রীয় ও অলস লোকগুলো পৃথিবীকে কি দিচ্ছে ? কুড়েমি ও আল্লাহর কর্মচঞ্চল বান্দাদের ওপর নাহক আধিপত্য বিস্তার ছাড়া তাদের আর কি অবদান আছে ? তাহলে অবস্থাটা কেমন মনে হয় ? পার্থিব জীবনের নিয়ম-কানুন কি পাল্টে গেল ? অক্ষম ও অকর্মন্য লোকেরাই সমৃদ্ধি পাবে আর মেহনতি মানুষ বঞ্চিত থেকে যাবে এটাই কি দুনিয়ার রীতি হয়ে দাঁড়ালো ? দুনিয়ার রীতি তো পশ্চাদমুখী হওয়ার কথা নয়। অক্ষম ও অকর্মণ্য লোকেরা তো মেহনতি মানুষের করুণা নির্ভর হওয়া ছাড়া বাঁচতে পারে না। তথাপি অবস্থাটা বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়ালো কিভাবে ? দারিদ্র, ক্ষুধা, বস্ত্রাভাব, হীনবলতা কিভাবে মেহনিত মানুষের ভাগ্যে জুটলো ? কিভাবেই বা নিষ্কর্মা লোকদের ভাগ্যে অর্থ, বিত্ত, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য জুটলো ?

আফসোস ! এই নিষ্কর্মা লোকেরা নিষ্কর্মা থেকেও যখন অর্থ বিত্ত ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়, তখন শ্রমজীবি মানুষের বদান্যতা ও অনুগ্রহের জন্য তাদের একটু প্রশংসাও করে না বা মুবারকবাদও জানায় না তাদের পাওনা হিসেবে নিদেনপক্ষে তাদের প্রতি একটু সম্মানও দেখায় না, তাদেরকে খাদ্য ও

www.pathagar.com

বস্ত্র দিয়ে একটু পুরস্কৃতও করে না। শুধু কি এখানেই শেষ ? তারা নিষ্ক্রীয় তো আছেই, তদুপরি এত কৃতঘ্নও যে, নিজেদের সমাজের আর দশজনের চেয়ে বিশিষ্ট করে জাহির করেও তাদের চাহিদা মেটে না। এজন্য নিজেদের কর্তৃত্বের দাপট ও ক্ষমতার দোর্দন্ড প্রতাপ প্রকাশ করার জন্য শ্রমজীবি মানুষের পিঠে চাবুক মারা, তাদের মানবাধিকার হরণ করে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিক্ষেপ করা, তাচ্ছিল্যভরে অবজ্ঞা করা এবং পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঔদ্ধত্য দেখনো তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে চলেছে। এই অব্যাহত উৎপীড়নে তাদের চোখ কোঠরাগত, চেহারা ফ্যাকাশে, পেট ক্ষুধাতুর এবং দেহ জরাব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এই কর্মহীন অলস ধনিক গোষ্ঠী কর্মজীবি মানুষের ঘাড়ে স্থায়ীভাবে জেকে বসেছে। এই ঘাড়ে সওয়ার হওয়াটা তাদের এত মজা লেগেছে যে, পাছে তারা ঘাড় থেকে ফেলে দেয় এই ভয়ে তাদের গলা প্রবলভাবে জাপটে পেঁচিয়ে ধরে বসেছে এবং হুমকি দিচ্ছে যে কোন অবাধ্যতার ভাব দেখালে গলা টিপে বা ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হবে। এ জন্য হতভাগা শ্রমজীবি মানুষের পক্ষে এই উৎপীড়ন ততদিন সহ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই যতদিন আল্লাহ তাদের মুক্তির ব্যবস্থা না করেন। দার্শনিক টলষ্টয়ও এ ধরনের অথবা এর কাছাকাছি বক্তব্য রেখেছেন। আমি তাঁর সে উক্তির উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। তিনি তাঁর বক্তব্যের এই পর্যায়ে এসে আরব্য উপন্যাসের এক কল্প-কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। কল্প-কাহিনী হলেও তা দিয়ে তিনি অত্যন্ত স্বার্থকভাবে নিজের বক্তব্যকে প্রমাণিত করতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এসব নিষ্কর্মা অলস ধনিক ও কর্তা ব্যক্তিরা তাদের উৎপীড়নের শিকার দরিদ্র কর্মজীবিদের সাথে যে আচরণ করে থাকে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো আরব্য উপন্যাসের এই গল্পটি ঃ অত্যন্ত সুস্থ-সবল ও সুঠামদেহী এক কোমল হৃদয় যুবক এক প্রশস্ত সুন্দর শ্যামল প্রান্তর দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। পথে তার দেখা হলো এক রোগজীর্ণ দুর্বল শীর্ণকায় বামুনের সাথে। তার বাহু দু'খানি শুকিয়ে বানরের বাহুর মত চিকন হয়ে গেছে। পায়ের থোড়া দু'টিও এত জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে যে, তার ওপর ভর করে সে কিছুতেই চলতে পারছে না। দেখলে মনে হয় যেন রশীর টুকরো। সে ঐ সুস্থ-সবল যুবককে দেখে ডাক দিল এবং তাকে নিজের ক্ষুধা ও রোগের কথা জানিয়ে অত্যন্ত বিনম্র ভাষায় অনুরোধ করলো যে, যেহেতু সে চলার ক্ষমতা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে, তাই দয়া করে সে যেন তাকে অমুক জায়গা পর্যন্ত ঘাড়ে করে নিয়ে যায়। যুবকটির মন গলে গেল এবং সে তাকে ঘাড়ে সওয়ার করলো। বামুনটা যেই ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে, অমনি তার জীর্ণশীর্ণ পায়ের থোড়া দিয়ে তার গলা পেচিয়ে ধরলো এবং তাকে বললো ঃ "হে যুবক ! আমাকে তোর এভাবে আজীবন ঘাড়ে করে রাখতে হবে। তুই যেখানেই চলাফেরা করবি, আমাকে এভাবে ঘাড়ে সওয়ার করে

www.pathagar.com

নিয়ে যাবি। আমাকে তুই ফলবান গাছের ধারে নিয়ে যাবি। আমি তোর ঘাড়ের ওপর বসে ফল পেড়ে খাবো। আমাকে ঘাড়ে করে তুই ঝর্ণার কাছে নিয়ে যাবি, আমি ঘাড়ের ওপর বসেই পানি খাবো। এক মুহূর্তও আমি তোকে ছাড়বো না বা বিশ্রাম করতে দেবো না। আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করবিনে খবরদার ! তাহলে কিন্তু আমি তোর গলা টিপে মেরে ফেলবো। অতপর সে যুবকের গলায় নিজের পায়ের থোড়া পেঁচিয়ে ধরে এমন এক কষুণি দিল যে, যুবকের দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। তার ফাঁস লাগা গলা থেকে একটা আর্তচিৎকার ফুটে বেরুল। মুখে রক্ত এসে গেল এবং চোখ দু'টো ছিটকে বেরুনোর উপক্রম হলো। সে করুণভাবে অনুনয় করে বললো ঃ দোহাই বামুন বাবা ! আমাকে শুধু একটু শ্বাস নিতে দাও। অতপর তুমি আমাকে যত খুশী এবং যা খুশী করতে বল, করবো। বামুন তাকে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার সুযোগ করে দিল। অসহায় যুবক এই ভয়াবহ আপদকে ঘাড়ে বয়ে বয়ে সময় কাটাতে লাগলো। বামুন অনুমতি না দিলে সে একটু পানিও পান করতে পারে না। বামুনের উচ্ছিষ্ট খাদ্য ছাড়া তার খাবারও জোটে না। ফলে তার শরীর দিন দিন কৃষ এবং জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠতে লাগলো। অথচ ঘাড়ে চড়ে বসা তার ভাগ্যবিধাতা একান্ত অনুগত সেই বাহকটির দুঃখ দুর্দশার কোন তোয়াক্কাই করে না।

৬ আরেক প্রকারের প্রবাদ আছে, যা নানা রকমের পশু ও পাখীর মুখে কথিত গল্প ও জ্ঞানের কথার আকারে রচিত হয়েছে। এ ধরনের প্রবাদ শ্রোতার কাছে ঐ জ্ঞানের কথাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরে। কেননা তা এমন এক উৎস থেকে উচ্চারিত যা জ্ঞানের কথা বা অন্য কোন কথাকে ভালো করে ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। এ জাতীয় বহু সংখ্যক প্রবাদ প্রচলিত আছে। তার একটি এখানে উল্লেখ করছি ঃ

কথিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি একটি চড়ুই শিকার করেছিল। চড়ুইটি শিকারীকে বললো ঃ হে শিকারী ! আমাকে নিয়ে তুমি কি করবে ? সে বললো তোমাকে জবাই করবো, তারপর রান্না করবো, তারপর খাবো। চড়ুই বললো ঃ আমার দ্বারা তোমার ক্ষুধাও মিটবে না, শরীরের পুষ্টিও সাধিত হবে না। আমাকে বরং ছেড়ে দেয়াই তোমার পক্ষে ভালো। তোমাকে আমি তিনটে মূল্যবান কথা শিখিয়ে দেবো। আমাকে খাওয়ার চেয়ে সেই কথাগুলো তোমার অনেক উপকারে আসবে। প্রথম কথাটা আমি তোমার হাতে থাকতেই শেখাবো। দ্বিতীয় কথাটা শেখবো গাছের ডালে গিয়ে, তৃতীয় কথটা পাহাড়ের ওপর গিয়ে। শিকারী বললো ঃ ঠিক আছে। এখন তোমার কথাগুলো বল। পাখী বললো ঃ প্রথম কথাটা এই যে, তোমার যে জিনিস হাতছাড়া হয় তার

www.pathagar.com

জন্য কখনো আফসোস করো না। এরপর শিকারী তাকে ছেড়ে দিল। পাখীটি গাছের ডালে গিয়ে দাঁড়ালো। তখন সে বললো ঃ যখন কোন অযৌক্তিক ব্যাপার শোন, তখন বিশ্বাস করো না যে তা হয়েছে কিংবা হবে। অতপর পাহাড়ের ওপর উড়ে গিয়ে পাখীটা বললো ঃ হে হতভাগা ! তুমি যদি আমাকে জবাই করতে তাহলে আমার পাকস্থলীতে ২০ মিসকাল তথা ২.৫ আউন্স অর্থাৎ ৩০ দিরহামের সমপরিমাণ একটা রত্ন পেতে। শিকারী একথা শোনামাত্র গভীর অনুশোচনায় হাতের আঙ্গুল কামড়ালো। কিছুক্ষণ থেমে সে বললো ঃ এবার তোমার তৃতীয় কথাটা বল। পাখী বললো ঃ হে দুর্ভাগা ! তুমি প্রথম দু'টো এত দ্রুত ভুলে গেলে। কেমন করে তোমাকে তৃতীয়টা বলি, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যা হারিয়ে যায় তা নিয়ে আফসোস করো না ? অথচ এক্ষুণি তুমি আমাকে হারিয়ে আফসোস করছ। আমি তোমাকে বলেছি ঃ যে বুদ্ধির অগম্য কোন ব্যাপার শুনলে তাতে বিশ্বাস করো না। তুমি এক্ষুণি বিশ্বাস করে নিয়েছ যে, আমার পেটে ২০ মিসকাল ওজনের রত্ন রয়েছে। অথচ আমার সকল হাড্ডি মাংস ও পালক ইত্যাদি মিলিয়েও ২০ মিসকাল ওজন হতে পারে না।

এ থেকে সেই শ্রেণীর মানুষের স্বভাব স্পষ্ট হয়ে যায়, যারা জ্ঞানের কথাকে শুধু তাত্ত্বিকভাবে পছন্দ করে। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ওপর লোভ-লালসার প্রাধান্য বিস্তৃত হয় এবং তার মোকাবিলায় যুক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ করা ভুলে যায়। এখন মানুষ কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে ক্ষুদ্র জীব-জন্তুর হাসির খোরাকে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করবে ?

তিন ঃ নিদর্শনাবলী নিরীক্ষণ

বাস্তব বুদ্ধিমত্তার—যা কিনা বাস্তবতা সম্মত দৃষ্টিভংগীও বহন করে—একটা বৈশিষ্ট্য হলো, প্রাকৃতিক নিদর্শন, প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলো এবং ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ সচেতন, প্রাণবন্ত, প্রজ্ঞাময়, জাগ্রত, সতর্ক ও ভাবুক মন নিয়ে নিরীক্ষণ করা—উদাস, নির্জীব ও অর্গলবদ্ধ মন নিয়ে নয়। জাগ্রত মন নিয়ে নিদর্শনাবলীর ওপর নজর দিতে হবে এবং সেগুলোর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে যুগের আবর্তনে কোথায় কি উত্থান-পতন ঘটেছে।

মানব সমাজের অতীত জীবনের অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে, সেই অতীত জীবনের চিহ্নসমূহের মূল্যায়ণ করতে হবে এবং অতীতের সেই মৃত লোকগুলোকে কল্পনার মানসপটে জীবন্ত করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অতপর তাদের কার্যকলাপের ওপর নজর বুলাতে হবে। তাদের কথাবার্তা, লেন-দেন, আচার-আচরণ নিরীক্ষণ করতে হবে এবং ভালো ও মন্দ আবেগের মধ্য দিয়ে আবর্তনশীল তাদের অস্থিরতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-

www.pathagar.com

ভাবনা করতে হবে। এসব কাজ সম্পন্ন করার পর যখন পর্যবেক্ষকের মন স্পন্দিত হবে এবং সে নিজেকে একটি বাস্তব ও সজিব অবস্থায় দেখবে, তখন সে বুঝবে যে, যাদেরকে সে এখন অন্তরচক্ষু দিয়ে দেখছে তারা মৃত। তারা কালক্রমে ইতিহাসের এমন ভগ্নস্তুপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, যার অবস্থান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এতে করে তার মন নরম হবে এবং একাগ্র হবে। উদাসীনতা ও গাফলতির হাজারো পর্দা তার সামনে থেকে অপসৃত হবে।

বস্তুত অতীতের এসব প্রাচীন নিদর্শন তৎকালীন মানব সমাজের অবস্থা, তাদের ফেলে যাওয়া সভ্যতাকে নির্মাণ করার সময় তাদের মন ও মানসিকতা কি রকম ছিল, তাদের অভিষ্ট সাধন এবং আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকাকালে তারা পরিণামের চিন্তা বর্জিত ছিল, না আল্লাহ ও আখেরাতের কথা মনে রেখেই সে দিকে অভিযাত্রা করেছিল, সে সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য জানাতে সক্ষম।

এসব নিদর্শন আজকের জীবন্ত বংশধরদের জানায় যে, অতীতের মানব জাতি তাদের পার্থিব জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক বজায় রাখা সত্ত্বেও এ জীবন ত্যাগ করে তাদের পরপারের গন্তব্যে পৌছুতে বাধ্য হয়েছে। তাই তোমরাও তাদের মতই পরকালীন জীবনের অভিযাত্রিক। তাই আল্লাহর ভয় দ্বারা সেই অনন্ত সফরের পাথেয় সংগ্রহ কর। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আখেরাতের জীবনের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে যত্নবান হও। সেখানকার সুখ ও সম্পদের যোগ্য করে নিজেদেরকে গড়ে তোল। সেখানে শূন্য হাতে যেতে না হয়, সে জন্য সতর্ক হও। প্রাচীন নিদর্শনসমূহের সাথে পরিচিত হওয়ার কাজটা যেন এরূপ সুষ্ঠুভাবে অথবা আরো ভালভাবে সম্পন্ন হয়। তা যেন আমাদেরকে এই মহাবিশ্বে আমাদের সত্যিকার অবস্থান কি, তা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা যেন আমাদেরকে আল্লাহর কথা এবং তার এই বিস্ময়কর জগতে তার বিভিন্ন সৃষ্টির ওপর কি কি ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে, সে কথা মনে করিয়ে দেয়।

মনে রাখবেন আপনি আল্লাহর পথে আহবানকারী। আপনার পয়লা কাজ হলো মনকে জাগানো, মৃত বিবেককে উজ্জীবিত করা। নিদর্শনসমূহের সাথে যদি এভাবে পরিচিত হতে পারেন তবেই আপনি আপনার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবেন। এ রকম শুষ্ক পরিচয় লাভ করে কোন ফায়দা নেই যে, প্রাচীন যুগের লোকেরা এমন এমন ধরনের রান্নার সরঞ্জাম ব্যবহার করতো, এমন এমন ধরনের প্রসাধনী ও বিলাস সামগ্রী ব্যবহার করতো। তারা খাট বা লম্বা, চাপা কিংবা ঢোল্লা পোশাক পরতো, কিংবা এমন ধরনের কৃষি সরঞ্জাম ব্যবহার করতো বা অমুক জাতির ঢংএর পূজা-অর্চনা করতো। আজকাল স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবেই শিক্ষা দেয়া হয় এবং এভাবেই শিক্ষার কোর্স সমাপনের দায় সারা হয়। অথচ শিক্ষার্থীর মনের বন্ধ দুয়ার তাতে খোলে না, কতকগুলো নির্জীব প্রথা ছাড়া আর কোন কিছু সে শিখতে পারে না।

www.pathagar.com

নিদর্শনাবলী বলতে আমরা শুধুমাত্র প্রাচীন বা আধুনিক যুগের লোকদের নিদর্শন বুঝাচ্ছি না। আমরা বুঝাচ্ছি প্রতিটা নিদর্শন। এমনকি জীবিত লোকদের নিদর্শনও। অতীত ও সমসাময়িক—সকল নিদর্শনেই সুস্পষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তবে যারা মন দিয়ে শুনতে ও বুঝতে চায় কেবল তারাই তা থেকে শিখতে পারে। এই নিদর্শনাবলীর প্রত্যেকটিতে আল্লাহর নিয়ম বিধি ব্যক্ত হয়েছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বজগতের একটা না একটা চিহ্ন তাতে পরিস্ফুট। তবে সে জন্য তা বুঝবার মত মন ও অনুভূতি থাকতে হবে। বুঝবার ও জানবার পর তা জনগণকে চিত্তাকর্ষক, বোধোদ্দীপক ও দৃষ্টি উদ্দীপ্তকারী পন্থায় বুঝাতে হবে।

এখানে অবশ্য আমি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণের কথা বলছি না। শুধুমাত্র ইসলামের দাওয়াত দানকারীর দায়িত্বের সাথে একাজটা যতটুকু সংশ্লিষ্ট এবং যতটুকু প্রয়োজনীয় ততটুকুর ওপরই গুরুত্ব আরোপ করছি। তাই কবি, সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ইতিহাসবেত্তাদের তৃপ্তি দিতে পারে এমন ব্যাপক কথা আমার কাছ থেকে দাবী করা ঠিক হবে না। ইসলামের দাওয়াতদানকারী শুধু কতকগুলো কৌশল ও নিয়ম-কানুন রপ্ত করেই ক্ষান্ত থাকুন, তা আমাদের কাম্য নয়। তাঁর ভেতরে এমন যোগ্যতার সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, যাতে তিনি মানুষের মন গলিয়ে দিতে পারেন, তাদের চিন্তায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাদেরকে উপদেশ আহরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। ইতিপূর্বে এ প্রসঙ্গে যা কিছু বলেছি, তাতে এই কর্মপন্থা সম্পর্কে কিছু ইংগীত দেয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং কালের আবর্তন থেকে উপদেশ আহরণের শিক্ষা আমরা কুরআন থেকেই পেয়েছি। এটা জানা কথা যে, কুরআন আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার শ্রেষ্ঠতম পন্থাই বাতলে দেয়।

আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে এবং অতীতের মানবগোষ্ঠীর নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছেন। তাদের স্মৃতিচারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

"(হে নবী !) তুমি তাদেরকে বল ঃ তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখ যে, অপরাধীদের কি পরিণতি হয়েছিল।"—(সূরা আন নামল ঃ ৬৯)

কিভাবে এই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে সে সম্পর্কেও পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط

كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا

www.pathagar.com

وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۖ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا

اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

"তারা কি পৃথিবীতে ঘোরাফিরা করে দেখেনি তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কি পরিণতি হয়েছিল ? তারা তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। জমীনকে তারা চাষ দিয়েছিল এবং এদের চেয়ে বেশী আবাদ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন। বস্তুত আল্লাহ তাদের ওপর জুলুম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করতো।"–(সূরা আর রূম ঃ ৯)

আরো বেশী করে শিক্ষাগ্রহণের নিমিত্ত আল্লাহ আমাদেরকে সে সব জাতির নিদর্শন নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছেন যাদের ওপর তাদের অবাধ্যতা হেতু আল্লাহ আযাব নাযিল করে তাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন এবং তাদের পরিত্যক্ত জনপদগুলোকে একেবারেই জনমানব শূন্য করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ সূরা কাসাসের এক আয়াতে বলেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ

مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ○

"উচ্ছৃংখল ও গর্বিত অনেক গ্রামকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। সেইসব গ্রামবাসীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর খুব কম দিনই তাদের ঘর-বাড়ীতে জনবসতি ছিল। (তাদের পরে) একমাত্র আমিই তাদের উত্তরাধিকারী ছিলাম।"–(সূরা আল কাসাস ঃ ৫৮)

এখানে "তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাদের ঘর-বাড়ীতে খুবই কম দিনই জনবসতি ছিল" এই কথাটা যে কতখানি মন গলানো ও আত্মসংযমে উদ্বুদ্ধকারী উপদেশে পরিপূর্ণ এবং অনাদি অনন্ত সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর কাছে মানুষের মনকে অবনমিত করার কি সাংঘাতিক প্রেরণা যে এতে বিদ্যমান, তা সত্যিই ভেবে দেখবার বিষয়। এরপরেই বলেছেন ঃ "অতপর আমিই তাদের উত্তরাধিকারী ছিলাম।" অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ○ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ

مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ○ (الحجر : ٢٣ - ٢٤)

"একমাত্র আমিই তো জীবিত করি, মৃত করি এবং একমাত্র আমিই তো উত্তরাধিকারী। যারা অতীত হয়ে গেছে তাদেরকেও আমি চিনতাম। আর

www.pathagar.com

যারা পরবর্তী সময়ে দুনিয়ায় এসেছে তাদেরকেও আমি চিনতাম।"
–(সূরা আল হিজ্‌র ঃ ২৩-২৪)

আল্লাহ্ ঘর-বাড়ী প্রাসাদ ও পরিত্যক্ত স্মৃতিগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন—যাতে চিন্তাশীল মানুষ ঐসব ঘর-বাড়ী অথবা তার ছেড়ে যাওয়া অধিবাসীদের কথা স্মরণ করে। তিনি বলেন ঃ

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ○ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْاٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ○

"কত অপরাধী জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আজ সেগুলো উল্টে পড়ে আছে। কত কূপ অকেজো এবং কত প্রাসাদ বিধ্বস্ত হয়ে রয়েছে। এই লোকেরা কি পৃথিবীতে চলাফেরা করেনি—যাতে তাদের মন বুঝতে এবং কান শুনতে পেত ? আসলে তো চোখ অন্ধ হয় না। অন্ধ হয় বুকের ভেতরে অবস্থিত মন।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪৫-৪৬)

অধিকন্তু আল্লাহ্ এও বলেছেন যে, এই চিন্তা-ভাবনাই হেদায়াতের পথ খুলে দেয়। তিনি আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চান যে, আমরা যেন বিধ্বস্ত জনপদ দিয়ে চলাফেরা করার সময় আল্লাহর নিদর্শনাবলী উপলব্ধি করি। ঐসব জনপদ নীরবে মানুষকে বহু উপদেশ দিচ্ছে—যা আমাদের অনেকেই শুনতে পায় না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ط اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ○

"আমি তাদের পূর্ববর্তী কত জাতিকে ধ্বংস করেছি—যাদের বসবাসের জায়গা দিয়ে তারা চলাফেরা করে। এ ইতিহাস কি তাদেরকে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে না ? নিশ্চয়ই এতে অনেক শিক্ষা রয়েছে। তারা কি শুনতে পায় না ?"–(সূরা আস সিজদাহ ঃ ২৬)

আল্লাহ্ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ঐসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো আল্লাহর গজবের যোগ্য হয়েছিল শুধু এ জন্য যে, তারা তাদের জীবনের আসল উৎস থেকে এবং শুদ্ধি লাভের উপকরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা

www.pathagar.com

হঠকারিতার আশ্রয় নিয়েছিল এবং আল্লাহর বিধানকে নষ্ট করার চক্রান্তে মেতেছিল। পক্ষান্তরে তাদেরই সমাজে ও জনপদে একই সাথে বসবাসকারী মু'মিনদেরকে তিনি তাদের ঈমান ও সংযমী জীবন-যাপনের বদৌলতে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। বস্তুত এরূপ ইতিহাস বর্ণনা অধিকতর ও পূর্ণতর উপদেশ লাভে সহায়ক। আল্লাহ্ সূরা নাম্‌লে বলেন ঃ

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً ۢبِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

"তারাও চক্রান্ত করেছিল। আমিও চক্রান্ত করেছিলাম। আমার চক্রান্ত তারা বুঝতেই পারেনি। তাদের চক্রান্তের ফলটা কি হয়েছিল দেখতো! ফল এই হয়েছিল যে, আমি তাদেরকে ও তাদের সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। ঐতো তাদের বাড়ী-ঘর তাদেরই অপরাধের পরিণামে উল্টে পড়ে রয়েছে। জ্ঞানী লোকদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। অবশ্য আমি ঈমানদার ও খোদাভীরুদেরকে রক্ষা করেছিলাম।"

–(সূরা আন নাম্‌ল ঃ ৫০-৫৩)

সর্বশেষ যে বিষয়টা লক্ষণীয় তাহলো এই যে, এসব ধ্বংসাবশেষকে তিনি অত্যন্ত কুশলী উপদেশদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন এবং এগুলোকে অবহেলাকারীদের ওপর আজাব নাজিল করার সময় শেষ সতর্কবানী রূপে উপস্থাপিত করেন। সূরা ইবরাহীমের একটি উক্তি লক্ষ্য করুন ঃ

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ○ وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ○ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ○ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

www.pathagar.com

"(হে মুহাম্মাদ !) সেই দিন সম্পর্কে তুমি এই লোকদেরকে সাবধান কর, যখন আজাব তাদেরকে গ্রাস করবে। তখন এই জালেমরা বলবে ঃ হে আমাদের রব, আরো কিছু সময় অবকাশ দাও, আমরা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করবো এবং রসূলদের অনুসরণ করবো। কিন্তু তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা কি সেইসব লোক নও যারা ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলতো যে, আমাদের তো কখনো পতন হবে না ? অথচ তোমরা সেই জাতিসমূহের বসতিসমূহে বসবাস করেছিলে যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে আর তোমরা দেখছিলে যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছি। তাদের দৃষ্টান্তও আমি তোমাদের কাছে দিয়েছি। তারা নিজেদের সব কূটকৌশল প্রয়োগ করেছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি কূটকৌশলের জবাব আল্লাহর কাছে বর্তমান ছিল। যদিও তাদের কৌশলাদি এত মারাত্মক ছিল যে, তাতে পর্বত পর্যন্ত নড়ে উঠতে পারে। অতএব হে নবী ! তুমি কখনো ধারণা করবে না যে, আল্লাহ কখনো নিজের রসূলদের কাছে করা ওয়াদা খেলাফ করবেন। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রবল ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"

–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৪-৪৭)

অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ পূর্বতন সেই অপরাধী জাতিগুলোর নাম এবং তাদের অপরাধের উল্লেখ করেছেন। এভাবে নিদর্শনকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জাতির নাম, অপরাধ এবং শাস্তি সহকারে উল্লেখ করা মানুষের মনে অপেক্ষাকৃত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ স্বরূপ লূত আলাইহিস সালামের জাতির ঘটনা ধরা যাক। ফিলিস্তিনের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সদোম শহরে তিনি রসূল হয়ে আসেন। এই অঞ্চলটা এখন মৃত সাগরের নীচে পড়েছে। সদোমবাসী ডাকাতি, রাহাজানী করতো এবং প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করতো। রসূল তাদেরকে শেষ হুশিয়ারী সংকেত দেয়ার পর আল্লাহ তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টিপাত করেন এবং প্রচণ্ড ভূমিকম্প দিয়ে তাদের বসতির ভূমিটাকে এমনভাবে ওলটপালট করে দেন যে, ওপরের অংশটা নীচে চলে আসে। তাদের সেই বসতির ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়েছে এবং উপদেশ গ্রহণের ক্ষমতা যাদের বিবেকের রয়েছে তাদের কাছে সেই ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করছে। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ۝

"অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য ঐসব কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।"–(সূরা আল হিজর ঃ ৭৫)

বস্তুতই তাতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে। কি শিক্ষণীয় ? অনেক নির্বোধ পাঠক তো এসব পড়ে ও এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। (নাউযুবিল্লাহ!) কিন্তু আমাদের সকলের বিশ্বাস থাকা উচিত যে, এর

www.pathagar.com

সবটুকুই সত্য এবং শিক্ষণীয়। আল্লাহ ঐ বসতিটাকে প্রস্তর বৃষ্টি এবং ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সেই ভূমিকম্পের স্থানটায় পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে ক্ষুদ্র উপসাগরের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে তার নাম লূত সাগর অথবা মৃত সাগর। এটা হলো প্রাচীন নাম। যদিও ঐ মানুষগুলোই নিহত হয়েছিল তাদেরই বসতির ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে। তবুও ঐ সাগরকেই মৃত সাগর বলা হয়—যা নিজের পানির দ্বারা তাদের ঘর-বাড়ীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। আর সাগরের কিনারে বাদবাকী ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। যেসব পর্যটক ঐসব এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে তারা অতীত শতাব্দীগুলোকে সেখানে যেসব ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে—তা অবলোকন করতো। ইমাম ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীরের ৪র্থ খন্ডের ৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "আল্লাহ লূত আলাইহিস সালামের জাতিকে বহু রকমের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছেন, যে ভূখন্ডে তারা বাস করতো সেখানে তিনি একটি দুর্গন্ধযুক্ত, বিস্বাদ ও কুৎসিত হ্রদ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে চলাচলের পথের পার্শ্বেই স্থাপন করেছেন—যার পাশ দিয়ে লোকজন দিনরাত যাতায়াত করে।" আল্লামা আবদুল ওহাব নাজ্জার মরহুম স্বীয় কিতাব কাসাসুল আম্বিয়াতে লিখেছেন ঃ আমার বিশ্বাস, মৃত সাগর যা এখন লূত সাগর বা লূত হ্রদ নামে খ্যাত, এই ঘটনার পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল না। ওটা এমন এক ভূমিকম্পের সৃষ্টি যা ভুখন্ডটির ওপরের অংশকে নীচের দিকে স্থাপন করে এবং তা সাগরের পৃষ্ঠের চেয়ে প্রায় ৪০০ মিটার নীচু হয়ে যায়।" অতপর তিনি বলেন ঃ গত দু' বছর অর্থাৎ ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মৃত সাগরের কিনারে লূতের জাতির নগরসমূহের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর এ উক্তিটা সম্পূর্ণ সত্য যে, "তাতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য নিদর্শনবলী রয়েছে।"

আমাদের আলোচনার কোন কোন অংশ দীর্ঘায়িত করেছি যাতে মু'মিনদের বিশ্বাস মজবুত এবং অবিশ্বাসীদের সন্দেহ দূরিভূত হয়। এবারে আমরা ঐসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর বসতি নিয়ে চিন্তা করবো। এসব বিধ্বস্ত বসতি আরবরা সিরিয়ার সফরে যাওয়া ও আসার সময় দেখতে পেত। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ط اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا
يَرَوْنَهَا ج بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ○

"তারা অবশ্যই সেই জনপদের কাছ দিয়ে যাতায়াত করেছে—যার ওপর লাঞ্ছনাকর বৃষ্টি হয়েছে। তারা কি তা দেখতো না ? আসলে তারা পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসই করতো না।"-(সূরা ফুরকান ঃ ৪০)

www.pathagar.com

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ۝ لا اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۝ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝ وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۝ لا وَبِالَّيْلِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ (الصفت : ١٣٣-١٣٨)

"লূত একজন রসূল ছিলেন। স্মরণ কর, যখন আমি তাকে ও তার পরিজনকে আজাব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম। কেবল এক বৃদ্ধা ধ্বংস-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অতপর অন্য সকলকে আমি ধ্বংস করে দিলাম। তোমরা নিশ্চয়ই তাদের কাছ দিয়ে দিনে ও রাতে যাতায়াত করে থাক। তবুও কি তোমাদের সুমতি হবে না?

উদাহরণ হিসেবে আরো একটা জাতির শোচনীয় ঘটনা উল্লেখ করছি। সে হলো আদ জাতির ঘটনা। তাদেরকে আসহাবুল আহকাফও বলা হয়। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে তারা বাস করতো। আল্লাহ তাদেরকে ভয়াবহ বাতাস দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সূরা আল হাক্কাহতে আল্লাহ বলেন ঃ

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ لا حُسُوْمًا لا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى لا كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝ ع فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۝

"আল্লাহ সেই বাতাসকে তাদের ওপর ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত চাপিয়ে রেখেছিলেন। তুমি (সেখানে থাকলে) দেখতে যে, তারা সেখানে এমনভাবে মরে পড়ে আছে যেমন পুরানো শুকনো খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ পড়ে থাকে। আজ তাদের কাউকে কি অবশিষ্ট দেখতে পাও?"
—(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৭-৮)

বস্তুত সেই বিধ্বস্ত জাতিগুলোর বাসস্থান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আরব পর্যটক মাত্রেরই চোখে পড়তো সেসব বিধ্বস্ত বসতি। কিন্তু এখন তা বালুর নীচে চাপা পড়ে আছে। এই বালু অবস্থা চাপা থেকে উদ্ধারের জন্য ভবিষ্যতের প্রত্নতাত্ত্বিককে আল্লাহ ক্ষমতা দেবেন। আল্লাহ আদ জাতির ওপর কি আযাব নাযিল করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ঃ

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ط بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ط رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ لا تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰۤى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ط كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

www.pathagar.com

"তারা যখন সেই আযাবকে মেঘের আকারে নিজেদের উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো, তখন বললো : এতো আমাদেরকে পরিসিক্তকারী মেঘ। না, বরং এটা সেই জিনিস, যার জন্য তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছিলে। ওটা এক ঝঞ্ঝা বাতাস—ওতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে। ঐ বাতাস তার আল্লাহর নির্দেশে প্রত্যেকটি জিনিস ধ্বংস করে দেবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তাদের থাকার জায়গাটুকু ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বস্তুত আমরা এভাবেই অপরাধীদের কর্মফল ভোগ করিয়ে থাকি।"–(সূরা আহকাফ : ২৪-২৫)

এ ধরনের নিদর্শনাবলী যখনি সামনে আসবে, তখন কিভাবে নিজেদের মনকে বুঝাবো, সেটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন এই আয়াতে :

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ز فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ لا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

"তাদেরকে আমি সেইসব জিনিস দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দেইনি। তাদেরকে আমি কান-চোখ ও হৃদয় দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের সেই কান-চোখ ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অমান্য করছিল। আর যে জিনিসের ব্যাপারে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো, তার মধ্যেই তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো।"

–(সূরা আল আহকাফ : ২৬)

এর সামান্য পরেই আল্লাহ্ এর শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বলেন :

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ط بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ج وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

"(যখন তারা আজাবে পরিবেষ্টিত হয়েছিল) তখন আল্লাহ বাদে অন্য যাদেরকে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে মাবুদ মেনে নিয়েছিল তারা কেন তাদের সাহায্য করলো না? বরং তারা তো তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। আসলে এ ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া আকিদা-বিশ্বাসের পরিণতি, যা তারা রচনা করে নিয়েছিল।"

–(সূরা আল আহকাফ : ২৮)

www.pathagar.com

প্রিয় দ্বীনি ভাই ! নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণের কি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি আমাদের হওয়া দরকার, এখানে তা লক্ষ্য করেছেন কি ? দেখতে পেলেন তো, কান-চোখ ও মনকে কিভাবে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর পর্যবেক্ষণ ও তা থেকে শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির উপকরণ অর্জনের মাধ্যম বানানো হয়েছে ? কি জন্য তিনি বলেছেন যে, তাদের চোখ-কান ও মন কোন কাজে আসেনি ? কেননা তারা আল্লাহর আয়াত তথা নিদর্শনাবলীকে অগ্রাহ্য করতো। আল্লাহর সেই আয়াত শুধু তাঁর কিতাবের পাঠযোগ্য আয়াত নয়, বরং বিশ্ব বরাবরে দর্শনীয় ও লক্ষ্যণীয় নিদর্শনাবলীও। আলোচ্য বিষয়ের সকল দিক ও সকল সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটেছে দাওয়াতের এ পদ্ধতিতে। এ পদ্ধতি অর্থাৎ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরার এ পদ্ধতি সত্যিই অতুলনীয়। ইসলামের দাওয়াতদাতাদের সর্বোচ্চ নেতা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরবর্তী প্রত্যেক দাওয়াতদাতার জন্য আল্লাহ এই পদ্ধতিই নির্ধারণ করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করতেন যে, অতীতের অত্যাচারী ও অনাচারীদের ইতিহাস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করলেও শুধুমাত্র তা জানলেই মানুষের মন আলোড়িত ও আন্দোলিত হয়, মন বিনয়াবনত এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। তিনি এটাও উপলব্ধি করতেন যে, সে ইতিহাস জেনে যদি শিক্ষা গ্রহণ করা না হয় তাহলে আল্লাহর গজব ও অসন্তোষ নেমে আসে। এটা একটা অকাট্য সত্য ব্যাপার—যার ব্যাখ্যা দেয়া ও যুক্তি প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন। এ ব্যাপারে একটু ভেবে দেখলেই এর যথার্থতা উপলব্ধি করা যাবে। রসূলুল্লাহ (সা) এই খোদায়ী পদ্ধতিই গ্রহণ ও কার্যকর করেছিলেন। তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিতে হবে, তা জানতেন।

রসূলুল্লাহ (সা) তবুক অভিযানের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। সেই পথের পাশেই অবস্থিত ছিল হযরত সালেহ (আ)-এর জাতি সামুদের বসতি। সে বসতির বাড়ী-ঘর ছিল পর্বতের গায়ে খোদিত। একথা কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের আগমনের পূর্বে ও পরে তাদের অবস্থা কেমন ছিল, সে কথা আমরা জানি। তারা আল্লাহ ও তার রসূলের কত অবাধ্য ও বিদ্রোহী ছিল, তাও আমরা জানি। এ কারণে আল্লাহ এক বিকট ও ভয়াবহ আওয়াজ দ্বারা তাদের প্রথমে আতংকিত ও পরে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সা) যখন সামুদ জাতির বিধ্বস্ত বস্তির নিকটবর্তী হলেন—যা আজও দৃষ্টিগোচর—তখন তাঁর মনে জালেম ও জুলুমের ঘৃণ্য স্মৃতি জাগরুক হলো এবং তিনি কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে দ্রুত বেগে সওয়ারী হাকালেন। তিনি বললেন ঃ যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের বস্তিতে তোমরা কাঁদতে কাঁদতে ছাড়া প্রবেশ করো না—যাতে তাদের ওপর যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল তা আবার তোমাদের ওপরও না আসে। এখানে "তিনি

www.pathagar.com

কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে দ্রুত বেগে সওয়ারী হাকালেন” একথাটার মধ্য দিয়ে যে তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও জীবন্ত বিবেকের বিবরণ মূর্ত হয়ে উঠেছে, এমন অলংকার সমৃদ্ধ বিবরণ আর কোথাও দেখা যায় না।

বস্তুত রসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে ইসলামের শিক্ষা এত জীবন্ত, এত মজবুত ও ধারালো ছিল যে, তাকে পুনরায় জীবন্ত ও জাগ্রত করার জন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি—দেখা দেয়ার প্রশ্নই উঠতো না। খোদায়ী আযাবে অপরাধীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃশ্য রসূলুল্লাহর মনে ঠিক ততখানি মূর্ত হয়ে দেখা দিত, যতখানি আমরা চোখে দেখতে পেলে আমাদের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে দেখা দেয়। একটু লক্ষ্য করুন যে, কোন জিনিসের সৌন্দর্য বা কদর্যতা আমাদের চোখে কত দ্রুত ধরা পড়ে এবং দেখা মাত্রই আমাদের চোখ বিস্ফারিত কিংবা সংকুচিত হয়ে আসে। অনুরূপভাবে প্রিয়জনের চেহারা দেখা মাত্রই মন কত দ্রুত প্রফুল্ল এবং দুশমনের চেহারা দেখা মাত্রই কত দ্রুত বিসন্ন হয়ে ওঠে। জুলুম ও জালেমের বিকট চেহারা আর কুফরী ও কাফেরদের কদর্য রূপ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অন্য সব জিনিসের চেয়ে বেশী ঘৃণিত ছিল। ফলে যখনই তার চোখের ও মনের দৃষ্টি সামুদ জাতির ধ্বংসস্তুপের দৃশ্যের ওপর পড়েছে, তখনই দেখতে পেয়েছেন কি নিদারুণভাবে তারা আল্লাহকে ভুলে রয়েছে এবং তার আয়াতগুলো থেকে কিভাবে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। তিনি এও দেখতে পেয়েছেন যে, যখনই তাদের সামনে তাদের সংশোধন ও সুপথ প্রাপ্তির উপায় বাতলে দেয়া হয়েছে, তখনই তারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছে এবং জীবনের আসল স্বরূপ কি তারা জানতেই চায়নি। এসব দেখা মাত্রই তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং তিনি বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন। আর সেই সাথে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে তাড়াতাড়ি সওয়ারী হেকে সেই স্থান ত্যাগ করেছেন। এমন জীবন্ত আত্মা—যা সজীবতা ও অনুভূতিহীনতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, তার সাথে অন্য কারো আত্মার তুলনাই হতে পারে না।

তবে রসূলের সাহাবাদের অবস্থা তাঁর মত নয়। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয়। তিনি আশংকা করতেন যে, পর্বতের গায়ে খনন করে তৈরী করা সেইসব বড় বড় ঘর-বাড়ী ও প্রাসাদ দেখে তারা এতটা আত্মহারা হয়ে যেতে যারে যে, এসব ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণের কথা আমাদের আর চিন্তায় আসে না। এজন্য তাদের মন হয়ে যায় পাষাণ। আর এ ধরনের পাষাণ মনের কোন মূল্য আল্লাহর কাছেও নেই, ইসলামের দুশমনদের কাছেও নেই। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতির বস্তিতে কি অবস্থায় তোমরা প্রবেশ করবে ? তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল ? তাদের বস্তিতে প্রবেশের সময় আমাদের মনে বিস্ময় জাগে।

www.pathagar.com

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এর চেয়েও আশ্চার্য কি বলবো ? সে হচ্ছে, তোমাদের মধ্যকারই কোন লোক—যে অতীত ও ভবিষ্যতের কথা তোমাদেরকে বলে। নিজেরা সঠিক পথের ওপর থাক এবং অন্যকেও সঠিক পথে রাখ। জেনে রেখ, তোমাদের আযাবের ব্যাপারে আল্লাহ বেপরোয়া। আল্লাহ অচিরেই এমন এক মানব গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটাবেন যারা নিজেদের বিপদ উদ্ধারে কিছুই করবে না।"

তিনি এই বলে সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন ঃ "এই সমস্ত শাস্তি প্রাপ্ত জাতিগুলোর কাছে যখনই যাবে, কাঁদতে কাঁদতে যাবে। যদি কাঁদতে না পার তবে যেও না, পাছে তাদের ওপর যে আযাব নাযিল হয়েছিল, সে ধরনের একটা কিছু আপদ তোমাদের ওপরও এসে পড়ে। বস্তুত এটা একথা অতি উঁচু স্তরের শিক্ষা। কেননা কোন বিস্ময়কর স্মৃতিচিহ্ন যদি জালেমের হয় এবং তা দেখে যদি কেউ মর্মাহত না হয়ে চমৎকৃত হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে নিজের অজ্ঞান্তেই জুলুম দেখে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়েছে এবং তার মনে দুর্নীতি ও অকর্মন্যতা ঢুকে গেছে। মানুষের সজীব মন এবং সচেতন ও শিক্ষাগ্রাহী বিবেকই হলো তার আসল মানবীয় সত্তা। এটা যখন সে হারিয়ে ফেলে, তখন তার মর্যাদা একেবারেই হালকা হয়ে যায়। ফলে নিজের ওপর আপতিত কোন আঘাতকে সে ঠেকাতে পারে না। সুতরাং এখানে লক্ষ্য করুন, আমাদের আত্মার সজিবতা ও হৃদয়ের জাগৃতির জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম কতবেশী উদগ্রীব। আত্মার সজিবতা যার কাম্য, তাকে রসূলের (সা) নিকট থেকেই এই সজিবতার গোপন রহস্য জেনে নিতে হবে। আল্লাহর কসম, এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলো প্রণয়নে অগ্রসর হওয়ার জন্য রসূল (সা)-এর নীতি থেকে বিচ্যুত হতে আমার কলম বিন্দুমাত্রও আমার আনুগত্য করতে প্রস্তুত নয়।

প্রাচীন নবী ও জাতিসমূহের যুগ ও তাতে যে স্মরণীয় ও শিক্ষণীয় বস্তু রয়েছে, সে দিকে দৃষ্টি দেয়া মানুষের স্বভাবগত ব্যাপার। এই স্বভাব ও তার উপকারী দিককে যথাযথভাবে কাজে লাগানোই আমাদের কর্তব্য। সেই সকল যুগ ও তার সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোর প্রসঙ্গ যখন আলোচিত হয়, তখন সেই স্মৃতি যেন আমাদের মনকে সজিবতা দান করে ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে। সে স্মৃতি যদি ভাল হয় তাহলে তো ভালই। আর যদি খারাপ হয়, পাপ ও বেহুদা হয়, তাহলে অনুশোচনা ও তওবার দ্বারা তা থেকে ভাল ও কল্যাণের নির্যাস বের করে নিতে হবে আর তা করতে পারলে সেটাও তার সজিবতার উপকরণে পরিণত হবে। আর যদি তা ভালও নয়, খারাপও নয়—এমন হয় তাহলে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তুলনা করে তা থেকে শিক্ষণীয় দিক খুঁজে বের করতে হবে।

www.pathagar.com

হযরত ওমর বিন খাত্তাব কৈশরে তাঁর পিতার উট চড়াতেন মক্কার বিভিন্ন উপত্যকায়। কিশোর ওমর স্বীয় পিতার সামনে অত্যন্ত হেয় হয়ে থাকতেন। কারণ কঠোর স্বভাবের পিতা তাকে অনবরতই কষ্ট দিতেন ও কর্মক্লান্ত রাখতেন। এভাবে দিন কাটতে থাকে। অবশেষে যখন মুহাম্মাদ (সা)-এর ইসলামী আন্দোলন চারিদিক আলোয় আলোকিত করে তুললো, তখন তিনি তাতে দাখিল হলেন। আন্দোলন মদীনায় হিজরত করলে ওমরও সেখানে হিজরত করলেন। আরো কিছুকাল এভাবে কাটলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করলেন। তার কিছুকাল পর আবু বকরও ইন্তিকাল করলেন। যুগের আরেকটি আবর্তন ঘটলো। ইসলাম তখন বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রসারিত। তার পতাকাকে উর্দ্ধে উত্তোলিত, তার শাসন প্রতিষ্ঠিত আর ওমরও তখন সমগ্র মানব জাতির কান্ডারী এবং মু'মিনদের অবিসংবাদিত নেতা আমীরুল মু'মিনীন। রসূল (সা) ও আবু বকরের পরে তিনিই তখন সকল বিষয়ে ফায়সালাকারী। ওমর তখন ভুলে গেছেন তাঁর সেই পুরানো উপত্যকার কথা এবং সেখানে তাঁর উট চড়ানোর কথা। একদিন তিনি সবান্ধবে মক্কা গিয়েছেন হজ্জ করতে। এ সময়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেই উপত্যকায় এসে পড়লেন। তাঁর তীক্ষ্ণ স্মৃতিধর মন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল ফেলে আসা কৈশরের কথা। তৎক্ষণাত থমকে দাঁড়ালেন। একদিন সেই ঊষর চারণভূমিতে ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের সাথী রাখাল বালকদের সাথে তিনি যে মর্মন্তুদ জীবন কাটিয়েছেন, আর আজ তিনি যে, উচ্চক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত এবং খ্যাতিমান, তা তিনি তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন। সেদিন আর আজকের দিনে যে তফাত—আল্লাহ তার মধ্যে যে অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছেন, তা দেখে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এ পরিবর্তন থেকে গভীর শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি তাঁর সাথীদের বললেন ঃ "এই উপত্যকায় একদিন আমি খাত্তাবের উট চড়িয়ে বেড়িয়েছি। তিনি ছিলেন কঠোর স্বভাবের। আমাকে কত তিরস্কার করতেন। আর আজ.......আমার ওপরে কথা বলার মত কেউ নেই।" তিনি তখন নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করলেন এই কবিতাটা আবৃত্তি করে ঃ

"আজ যেসব জিনিস দেখতে পাচ্ছ, তার কোনটাই চিরকাল তরতাজা থাকবে না।

শুধু আল্লাহই চিরঞ্জীব থাকবেন। আর সকল সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে, অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে শিক্ষা লাভ করার আগ্রহ থাকা কত জরুরী। আল্লাহর কাছে এই গুণ অর্জনের ক্ষমতাই প্রার্থনা করি। কেননা এর দ্বারাই আমরা আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবো।

www.pathagar.com

এর জন্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রবল স্মৃতি শক্তির প্রয়োজন। অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও প্রভাবগ্রাহী স্বভাব ও মেজাজের প্রয়োজন।

চার ঃ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়গুলো এবং তার ইন্দ্রিয়ানুভূত নিদর্শনসমূহ ও গুণাবলীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা

বস্তুত এটা হচ্ছে বাস্তব বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিকতার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা মানুষকে বাস্তবধর্মী ভাষায় সম্বোধন করা হয়। একজন দায়ী (ইসলামের দাওয়াত দানকারী) যখন সচ্চরিত্র ও অসচ্চরিত্র, ভাল-মন্দ, হক-বাতিল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করবে তখন তাকে যথাসম্ভব এগুলোর তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ এড়িয়ে চলতে হবে। আনুমানিক কথাবার্তা পরিহার করে চলতে হবে। শুধুমাত্র এসব আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়গুলোর বাহ্যিক রূপ ও তার বাস্তব লক্ষণসমূহ তুলে ধরাকেই যথেষ্ট মনে করা উচিত। কেননা সাধারণ মানুষ শুধু এটাই দেখতে পায় ও বুঝতে পারে। এটুকুই মানুষ অনুভব করে ও এর দ্বারাই তারা প্রভাবিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের পরিণতি এর দ্বারাই নির্ণিত হয়। চারিত্রিক গুণাবলীর মূল উৎস কি, কিভাবে সৃষ্টি হয় সেসব গুঢ়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে তাদের মাথা খারাপ করার কোন অর্থ হয় না। সাধারণ মানুষ ওসব নিয়ে ভাবতে চায় না। এর ওপর তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কোন ফায়দাও নির্ভর করে না। মৌলিক মানবীয় চরিত্রের একটা সুন্দর ছাপ মনের ওপর পড়া এবং বাস্তব জীবনে তার উত্তম ফল প্রকাশ পাওয়াই যথেষ্ট। এ বিষয়টা আমরা স্বয়ং কুরআন থেকেই শিখতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, এক জায়গায় আল্লাহ যখন চরিত্রের সেইসব মহৎ গুণাবলী আলোচনা করার উদ্যোগ নিলেন, যা অবলম্বন করে এক দল মানুষ তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তখন তিনি তার উৎস ও শাখা প্রশাখা ইত্যাদির উল্লেখ করেননি, যেমন নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত বই-পুস্তকে করা হয়ে থাকে ; বরং তিনি উপরোক্ত স্পষ্ট ও সহজ পন্থাই অবলম্বন করেছেন—যা সকল মানুষ সহজে বুঝতে পারে। কেননা তিনি এ গুণাবলীকে বাস্তব আকারে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ق اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝

www.pathagar.com

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ
يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا أٰخَرَ وَلَا
يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ
ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ ..... وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا
كِرَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ۝
وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ۝ أُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا
تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝

"দয়াময় আল্লাহর বান্দারা—যারা জমিনের ওপর মৃদুভাবে চলাফেরা করে। আর মূর্খরা যখন তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা শুধু বলে ঃ শান্তিতে থাক। আর যারা রাতের বেলা তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ায় ও সিজদা করে এবং যারা বলে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! জাহান্নামের আযাব আমাদের কাছ থেকে হটিয়ে দাও। (কেননা) তার আযাব খুবই প্রাণান্তকর। বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা বড়ই জঘন্য। যারা খরচ করার সময়ে বেহুদা খরচও করে না, বখিলীও করে না বরং দুই সীমানার মাঝখানে থাকে। যারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদকে ডাকে না, আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। এসব যারা করে তারা তার প্রতিফল পাবে।........যারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না, আর কোন আজেবাজে কাজের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলে ভদ্রভাবে অতিক্রম করে। যাদেরকে তাদের রবের আয়াত শুনালে তার ওপর অন্ধ ও বধিরের মত পতিত হয় না। যারা দোয়া করতে থাকে যে, "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দাও এবং আমাদেরকে সৎলোকদের নেতা বানাও। এরাই হচ্ছে সেইসব লোক, যারা নিজেদের ধৈর্যের ফল স্বরূপ উচ্চভবন পাবে। সেখানে তারা কেবল সালাম ও মোবারকবাদই লাভ করবে।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৩-৭৫)

এই স্পষ্ট ভাষণের মধ্যে এমন কিছু নেই, যা মানুষের মনকে বিরক্ত ও বিতৃষ্ণাগ্রস্ত করে তোলে কিংবা এক ঘেয়েমী এনে দেয়। বরং এ ভাষণ অত্যন্ত

www.pathagar.com

ব্যাপক অর্থবোধক, উঁচুমানের তথ্যে পরিপূর্ণ, দ্ব্যর্থহীন এবং সূর্যের আলোর মত নির্মল। এমনকি অজ্ঞ লোকদের কেউ কেউ এমনও মনে করে যে, এতে নতুন কোন অজানা বিষয় নেই, বরং সবকিছুই সকলের জানা ও বুঝা জিনিস।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে যে নৈতিক গুণাবলী বাস্তব আকারে প্রকাশ পেয়েছে—যথা ঐ গুণাবলীর ধারকদের চলাফেরা, কথাবার্তা, রাতের বেলায় নামায ও আল্লাহর সাথে নিভৃত আলাপ, আয়-ব্যয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন, অবৈধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ও সীমা অতিক্রম থেকে নিবৃত থাকা ইত্যাদি—এসবের বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি শুধু একথাই বলতে চাই যে, এ বর্ণনার এত শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে যে, তা মানুষকে এসব গুণাবলী অর্জনে আল্লাহর ঐ মহান বান্দাদের অনুকরণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম। আল্লাহর কালামের এ এক নিগূঢ় রহস্যময় মোজেজা। মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি এর গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা দূরে থাকুক, এর ধারেকাছেও তার দৃষ্টি পৌঁছাতে পারে না।

এটা নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত মহান শিক্ষাকে পরিপূর্ণরূপে অর্জন করে নিয়েছিলেন। আল্লাহর প্রদত্ত এই নির্ভুল ও সুদৃঢ় জীবন যাপন প্রণালী তার স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। তাই স্বীয় সাহাবীদেরকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তিনি নানা রকমের আন্দাজ ও অনুমানের ওপর নির্ভর করেননি। বরং তিনি আল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত বাস্তব পদ্ধতির অনুসরণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার কার্মপদ্ধতি ছিল এ রকম ঃ

১ চর্মচক্ষে দৃষ্টিগোচর বাহ্যিক চেহারা বা বেশভূষার প্রতি তিনি ইংগীত দিতেন অথবা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তা থেকে ইঙ্গিত বিষয়ের সমাধান খুঁজে নিতেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি তাঁর কথাবার্তায় উচ্চ ও নিগূঢ় তত্ত্বের ও লক্ষ্যের উল্লেখ করতেন। অর্থাৎ মানুষের আধ্যাত্মিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যমান নির্ধারণ ও উপলব্ধি করাকেই বেশী গুরুত্ব দিতেন বাহ্যিক আকৃতি ও বেশভূষার চাইতে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যমান তিনি এমন কার্যকর পদ্ধতিতে নির্ধারণ করতেন যে, যা শ্রোতার দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় জন্মাতো এবং দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তির মনও তাতে তুষ্ট হতো। একদা এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছ দিয়ে যেতে দেখে তিনি তাঁর কাছে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই লোকটিকে তুমি কেমন মনে কর ? তিনি জবাবে বললেন ঃ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোক। আল্লাহর কসম, এ লোকটি কোন বিয়ের প্রস্তাব দিলে এবং কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সা) চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর আর একটি লোককে দেখিয়ে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ লোকটি তোমার মতে কেমন ? তিনি বললেন ঃ ইনি মুসলমানদের মধ্যে একজন দরিদ্র লোক। কোন বিয়ের প্রস্তাব বা সুপারিশ তার

www.pathagar.com

পক্ষ থেকে এলে তা গ্রহণ করা চলে না। এমনকি সে কোন কথা বললে তাও কর্ণপাত করার যোগ্য বিবেচিত হয় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ পূর্ববর্তী লোকটির মত লোক দিয়ে যদি দুনিয়া ভর্তি থাকে তবু তার চেয়ে এই শেষোক্ত লোকটিই উত্তম।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলনা করার জন্য দরিদ্র কিংবা ধনাঢ্যতার দিক দিয়ে সমমানের দু'জন লোক বাছাই করেননি। তিনি যদি দু'জন দারিদ্র ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করতেন অথবা দু'জন ধনীর মধ্যে তুলনা করতেন এবং একজনকে অপরজনের চেয়ে উত্তম বলে রায় দিতেন, তাহলে সে তুলনা তাঁর উদ্দেশ্য পূরণে স্বার্থক ও যথেষ্ট হতো। কিন্তু তিনি বাইরে জৌলুস আছে অথচ ভেতরটা নোংরা এমন এক ধনীর সাথে তুলনা করলেন এমন এক দরিদ্র ব্যক্তির—যার অন্তর অত্যন্ত পবিত্র ও মহৎ কিন্তু তার বাইরের বেশভূষা অত্যন্ত নগণ্য ও সাদামাটা। বস্তুত এটা বিশ্বনবীর নবী সুলভ সূক্ষ্ম দৃষ্টিরই একটা নমুনা। এতে উক্ত উভয় রকমের মানুষের মধ্যেকার বিস্তর ব্যবধানই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এই একই নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করতে গিয়ে একদিন তিনি হযরত আবু জর (রা)-কে বললেন ঃ তুমি কি সম্পদের প্রাচুর্যকেই ধনাঢ্যতা মনে কর ? তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা তো তাই মনে করি। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে সম্পদের অভাবকেই কি তুমি দারিদ্র মনে কর ? তিনি বললেন ঃ জ্বি। তখন রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আসলে মনের ধনাঢ্যতা তথা তৃপ্তিই প্রকৃত ধনাঢ্যতা। আর মনের অতৃপ্তি ও অভাববোধই প্রকৃত দারিদ্র। এসব প্রশ্ন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একজন শিষ্যের নিকট পেশ করেছিলেন। আর শিষ্য নিজের জ্ঞানের পরিধি অনুসারে তার জবাব দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মানবতার সবচেয়ে বড় ও মহান শিক্ষক (সা) প্রকৃত দারিদ্র ও ধনাঢ্যতা কি তা শিখিয়ে দেন। আর শুধু এটুকু শিখিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। বরং তিনি হৃদয়ের নিস্তেজ ও নিস্তব্ধ তন্ত্রীতে জাগরণ ও স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে এমন আরো বহু জ্ঞানোদ্দীপক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। হযরত আবু জর বলেন ঃ রসূল (সা) আমাকে কুরাইশ বংশীয় এক ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি অমুককে চিন ? আমি বললাম ঃ জ্বি। তিনি বললেন ঃ তাকে তুমি কেমন মনে কর ? আমি বললাম ঃ সে কারো কাছে কিছু চাইলে তাকে বিফল করা হয় না। কোথাও উপস্থিত হলে তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। অতপর সুফ্ফাবাসী জনৈক সাহাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।[১] তিনি বললেন ঃ অমুককে চিন ? আমি বললাম ঃ না। অতপর তিনি তাঁর আকৃতি ও গুণাবলী

১. মসজিদে নববীর একটি অংশের নাম সুফ্ফা। এখানে ভিটেমাটিহীন দরিদ্র সাহাবীরা থাকতেন।

www.pathagar.com

বর্ণনা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে চিনলাম। বললেন ঃ তাঁকে তুমি কেমন মনে কর। আমি বললাম ঃ সে তো একজন দরিদ্র সুফ্ফাবাসী। তিনি বললেন ঃ আগের লোকটির চেয়ে সে ভাল। সে পৃথিবীর ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন সেরা মানুষ।

হাদীসের গ্রন্থাবলীতে এমন বহু রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যা থেকে বুঝা যায় যে, এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য এই ধরনের তুলনা আরো বহুবার বহুভাবেই করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে এখানে আর একটি উদাহরণ পেশ করছি। একদিন রসূল (সা) বাজারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের সবার জানা যে, বাজার একটা ছোটখাট দুনিয়া বিশেষ। একজন বিক্রি করছে, একজন কিনছে, একজন তার মালের দিকে খদ্দেরদের ডাকছে, আর একজন মাল কিনতে এগিয়ে যাচ্ছে, আর একজন পিছিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকেরই এমন ব্যস্ততা যে, তার অন্য কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করারও ফুরসত নেই। কেউ লাভের কথা ভাবছে, কেউ সস্তায় জিনিস কেনার চিন্তায় আছে। যে দুনিয়ার প্রতি তাদের এমন প্রবল ঝোঁক, তার প্রকৃত মূল্যমান কি, সেটা তিনি বুঝিয়ে দেবেন মনস্থ করলেন। বাজারের সেইসব লোক ইতিপূর্বে শিখেছে যে, দুনিয়ার সম্পদ অত্যন্ত নগণ্য ও তুচ্ছ, আল্লাহর কাছে তার মূল্য একটা মশার ডানার সমানও নয়। তবে সে শিক্ষা ছিল নিতান্তই তাত্ত্বিক ও পুথিগত। শরীয়াতের বিভিন্ন বিধান নিছক কেতাবী পর্যায়েই তারা শিখেছে। এবার রসূল (সা) তাদেরকে বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতিতে দ্বীনের শিক্ষা দিতে চাইলেন ঠিক সেই অবস্থায় যখন তারা দুনিয়ার ঝঞ্ঝাটে নিমজ্জিত এবং বিশ্লেষণের উপায়-উপকরণ যখন তাদের চোখের সামনেই বিদ্যমান। বাজারের মধ্যে একটি ক্ষুদে চোখ বিশিষ্ট মৃত ছাগলের বাচ্চা পড়ে ছিল। তার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর আশপাশের লোকজনকে বললেন ঃ এই মৃত ছাগলের বাচ্চাটি এক দিরহাম দিয়ে কিনতে তোমাদের কেউ রাজী আছে কি ? তারা বললো ঃ এক দিরহাম তো দূরের কথা, কোন সামান্যতম মূল্য দিয়েও আমরা কেউ ওটা নিতে রাজী নই। ওটা দিয়ে আমরা কি করবো ? তিনি আবার বললেন ঃ ওটা তোমাদের হয়ে যাক, এ কি কেউ পসন্দ কর না ? তারা বললো ঃ আল্লাহর কসম, ওটা যদি জীবিত থাকতো, তবু ওর ক্ষুদে চোখ একটা খুঁত হিসেবে গণ্য হতো। আর এখন তো ওটা মড়কে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ওর প্রতি আগ্রহী হবার প্রশ্ন আসে কিভাবে ? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহর দৃষ্টিতে এই দুনিয়া তোমাদের জন্য ঐ মরা ছাগলের চেয়েও নিকৃষ্ট। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বাস্তব তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন প্রকিয়ায় এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন তেমনি তিনি মানুষের জন্য নানা বিরক্তিকর ও ঘৃর্ণাহ দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়েও তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

www.pathagar.com

২ সুপ্ত ও সূক্ষ্ম নিগূঢ় রহস্যকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করে পেশ করার জন্য রসূলুল্লাহ (সা) এমন পন্থাও অবলম্বন করতেন যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে ঐ রহস্যের খুবই জাজ্বল্যমান ও অনুভবযোগ্য লক্ষণসমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। যেমন একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ পাপ কি জিনিস ? ঈমান কি জিনিস ? পুণ্য কাকে বলে ? এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য তত্ত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন। প্রশ্নকর্তারা তাদের জিজ্ঞাস্য তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্যের পরিপূর্ণ বুঝ লাভ করতে চেয়েছেন এর দ্বারা। রসূল (সা)-এর জবাব কি দিয়েছেন ?

একটু ভাবুন তো, বড় কোন দার্শনিক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উচ্চ ডিগ্রীধারীকে যদি এ প্রশ্ন করা হতো তাহলে তারা কি জবাব দিতেন ? উচ্চতর বিদ্যাগত ডিগ্রীধারী এ প্রশ্নের জবাবে বড় বড় গ্রন্থের গভীরে গিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের উক্তি উদ্বৃত করার চেষ্টা করতো এবং তার ভেতরে তুলনা করে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ সেই বিচারে প্রবৃত্ত হতো। অতপর এমন একটা গবেষণা নিয়ে আপনার কাছে হাজির হতো যা আপনার সন্তোষ ও তৃপ্তি উৎপাদনে সক্ষম বলে তার ধারণা। আর দার্শনিক তো নিরেট কেতাবী সংজ্ঞাই পেশ করতো যা আপনার কাছে অধিকতর অস্পষ্ট ও জটিল মনে হতো। একটু বেশী অনুগ্রহ করলে সে বড়জোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও আন্দাজ-অনুমানের প্রাচুর্য দিয়ে পরিবেশ এমন ভারাক্রান্ত করে তুলতো যে, তা শোনার পর আপনার মনে হতো যেন আপনি প্রশ্নের কোন উত্তরই পাননি। এমনকি হয়তো বা শেষ পর্যন্ত আপনাকে ঐ প্রশ্ন করার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হতো। কিন্তু সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্নের কি জবাব দিলেন তা একটু লক্ষ্য করুন। তিনি বললেন ঃ

الاثم : اذا حاك فى نفسك شيئ ... فدعه .. الاثم ما حاكَ فى صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس ـ

الايمان : اذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فانت مؤمن

পাপ ঃ যখন কোন জিনিস সম্পর্কে তোমার মনে খট্‌কা লাগে তখন তা বাদ দাও।......তোমার মনে যে জিনিস নিয়ে খট্‌কা লাগে এবং যা লোকে জানুক—এটা তোমার পসন্দ হয় না—সেটাই পাপ।

ঈমান ঃ যখন তোমার খারাপ কাজ তোমাকে পীড়া দেয় এবং তোমার ভালো কাজ তোমাকে উৎফুল্ল করে তখনই তুমি মু'মিন।

হযরত ওয়াবেছা ইবনে মা'বাদ (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, এই সাক্ষাতেই নেক আমল সম্পর্কে যা কিছু জানা দরকার, তাঁর কাছ থেকে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করে জেনে নেই এবং কোন কিছুই বাদ না রাখি। রসূল (সা) আমাকে বললেন ঃ হে ওয়াবেছা, আমার কাছে এস। আমি একেবারে তাঁর হাঁটুতে হাঁটু লাগিয়ে বসলাম। অতপর তিনি বললেন ঃ হে ওয়াবেছা, তুমি যা জিজ্ঞেস করতে এসেছ তা বলবো ? আমি বললাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! বলুন। তিনি বললেন ঃ তুমি তো নেক কাজ কী এবং বদ কাজ কী—জিজ্ঞেস করতে এসেছ। তাই না ? আমি বললাম ঃ জ্বি। তিনি নিজ হাতের তিন আঙ্গুল একত্রিত করে আমার বুকে আস্তে আস্তে আঘাত করে বলতে লাগলেন ঃ হে ওয়াবেছা, তোমার নিজের মনের কাছে জিজ্ঞেস করো। যে ব্যাপারে মন সন্তুষ্ট থাকবে সেটাই নেক কাজ। আর যে ব্যাপারে মন দ্বিধাগ্রস্ত থাকবে ও খট্‌কা লাগবে, সেটাই বদ কাজ। তা লোকে যতই ফতোয়া দিক না কেন।

এখানে আমি আর কোন মন্তব্য করতে চাইনে। কেননা আমি চাই, আপনি কিসে সন্তুষ্ট সে ব্যাপারে আপনার মনকেই জিজ্ঞেস করবেন। রসূল (সা)-এর এ জবাব যে একেবারেই নিখুঁত ও নির্ভুল, সে সম্পর্কে আপনার নিশ্চিত হওয়া দরকার। কেননা এ জবাবই আপনার ও এসব তত্ত্বের মাঝে অবিচ্ছেদ্য আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম। সুতরাং এই বাস্তব ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি আপনার আয়ত্ব করা জরুরী। কারণ এ বিষয়ে যেসব উপকরণের কোন প্রভাব নেই, সেসব উপকরণ থেকে এ প্রক্রিয়া মুক্ত। আর এ প্রক্রিয়া সেসব রকমারি আবেগ ও অনুভূতিতে পূর্ণ—যা ঐ তত্ত্বেরই ফল ও ফসল এবং যার সাহায্যে মানুষ পাপ কিংবা পুণ্য কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে।

রসূল (সা) আরো বলেন ঃ মানুষের মনে দু' রকমের প্রেরণা আসে ঃ একটি আসে ফেরেশতার পক্ষ থেকে। আর সেটা হলো সৎকাজের আগ্রহ এবং সত্যের স্বীকৃতি ও উপলব্ধি। এটা যার মনে অনুভূত হবে তার জানা দরকার যে, ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। আর একটা প্রেরণা শয়তানের তরফ থেকে আসে। আর তাহলো ঃ খারাপ কাজের আগ্রহ, সত্যকে অস্বীকার এবং ভালো কাজ রোধ করার প্রবৃত্তি। যার মনে এ প্রবৃত্তি অনুভূত হবে তার উচিত বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً

مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার হুকুম দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্বাস দেন। বস্তুত আল্লাহ অত্যন্ত উদার ও সর্বজ্ঞ।"–(সূরা আল বাকারাহ ঃ ২৬৮)

www.pathagar.com

আল্লাহ আমাদের মহান বন্ধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন। বরং আল্লাহ নিজে যে পুরস্কার সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করেন তাই দান করুন। দেখুন ! কত নিস্বার্থ উদার তার হৃদয় খানি ! উপরোক্ত হাদীসখানি পড়ুন। বরং পূর্ববর্তী হাদীসগুলোও পড়ুন। তারপর আমাকে বলুন, আমাদের কাছ থেকে তিনি নিজের জন্য কী চেয়েছেন ? তার সমগ্র সত্ত্বাই ছিল আমাদের জন্য নিবেদিত। তাঁর সমগ্র জীবনকে তিনি উৎসর্গ করেছেন আমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া, আমাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা ও শয়তান থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার কাজে। আমাদের সুখ ও সৌভাগ্যই ছিল তাঁর পরম কাম্য। তিনি ঐকান্তিক স্নেহের আবেশে বলতেন ঃ "আমিতো তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য।" তিনি নিজের জন্য কী সংগ্রহ করেছেন ?.......... তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তখন তাঁর প্রিয় বর্মটি এক ইয়াহুদীর নিকট কয়েক মুষ্ঠি গমের বিনিময়ে বন্ধক দেয়া ছিল।

হাদীস অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, তিনি নিরন্তর আমাদেরকে প্রকৃত সত্যের শিক্ষা দিয়েছেন, ভালো কাজের ও কল্যাণময় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, হৃদয়ের সৎ প্রবৃত্তিগুলোকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, আর এ সবের মধ্য দিয়ে এবং এ সবের আড়ালে সক্রিয় দেখতে পাই তার স্নেহময়, দয়াময় কোমল মনকে, দেখতে পাই আমাদের সুখ-শান্তির উদগ্র ও অভূতপূর্ব গভীর বাসনা। তাঁর প্রতিটি কথায় ও কাজে তাঁর এই কল্যাণ-কামিতারই পরিচয় পাই—কোন পিতা তার সন্তানদের জন্য যতখানি কল্যাণকামী হতে পারে তার চেয়েও বেশী কল্যাণকামী। হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ আপনার উপর নিরন্তর শান্তি বর্ষণ করতে থাকুন। আবার বলি ঃ কী অনাবিল মন তার।......পাঠক দেখতে পাচ্ছেন যে, তিনি যখন এই মোহনীয় শিক্ষা দিচ্ছেন তখন আপনাকে অকল্যাণ থেকে সাবধান করতেও তিনি কত ব্যাকুল ও ব্যগ্র। মাথার চুল যেমন বেড়ে গেলে কান বেয়ে ঘাড় ছুই ছুই করে, তেমনি মনের দুইটা বাড়ন্ত প্রান্ত রয়েছে। একটা প্রান্ত ফেরেশতার এবং অন্যটা শয়তানের হাতে আর উভয়ে মনকে দু' দিকে টানতে থাকে। প্রত্যেক টানেই মন বিবিধ রকমের প্রেরণা পায়। ফেরেশতার টানে মানুষ লাভ করে আল্লাহর ইচ্ছায় অঢেল কল্যাণের আশ্বাস ও সত্যের উপলব্ধি। আর শয়তানের টানে তার মধ্যে জেগে ওঠে অকল্যাণের প্রবৃত্তি, সত্যের অস্বীকৃতি ও তার ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয়। পাঠক কি লক্ষ্য করেছেন এই বিস্ময়কর সতর্কীকরণ ও নির্ভুল শিক্ষা —যা আপনাকে আপনার মনের গভীরতম প্রকোষ্ঠের নিকট সমর্পণ করে এবং আপনার মনে যে প্রেরণা জাগে, তার বিচারে ও বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে ? যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি কল্যাণ ও সততার প্রেরণা পায়, তার জানা উচিত যে, সেটা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এবং সে জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণ ও অন্যায়ের প্রেরণা পায়, তার বুঝতে হবে যে, ওটা শয়তানের কাছ থেকে এসেছে এবং তার উচিত বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ্ কামনা করা। এ পর্যায়ে নিম্নের আয়াতটির ওপর আবার নজর বুলান ঃ

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা ও করুণার আশ্বাস দেন। বস্তুত আল্লাহ মহৎ ও সর্বজ্ঞ।"–(সূরা আল বাকারাহ ঃ ২৬৮)

আমি আপনাকে রসূলের শিক্ষার সৌন্দর্য, তাঁর মনের ঔদার্য ও করুণার সৌন্দর্য দ্বারা পরিপূর্ণ রূপে বিমোহিত হবার জন্য আমার সাথে যোগ দেয়ার আহবান জানাই। বস্তুত সেই বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক — যে তার মন থেকে উত্থিত আহবানের প্রতি সর্বদা কান লাগিয়ে রাখে। অতপর যে আহবান কল্যাণের ও সৎকর্মের, তা কবুল করে ও বাস্তবায়িত করে। আর যে আহবান অন্যায় ও অকল্যাণের, তাকে আত্মশুদ্ধি মোজাহাদা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে দমন ও প্রতিহত করে।

৩ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব আধ্যাত্মিক বা রূহানী তত্ত্বকে তার নিকটতম বাস্তব বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং এমনভাবে বিশেষিত করেছেন, যাতে তা তার সত্যিকার পরিচয় তুলে ধরে এবং তা ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও মন্দ কাজে অনীহা ও ঘৃণা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর বর্ণনা অনুসারে যে ব্যক্তি মানুষের নিকট প্রার্থনার হাত বাড়ায় সে তাঁর মুখমণ্ডলে কালিমা লেপন করে। আল্লাহর নিকট মানুষের সবচেয়ে সম্মানিত জিনিস হলো তার মুখমণ্ডল। এখানে দেখুন, ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে, তাকে ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন ঃ "তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি ভিক্ষাবৃত্তি করতে করতে মারা যায়, তবে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে যে, তার মুখে এক টুকরো গোশতও থাকবে না।" তিনি আরো বলেছেন ঃ "ভিক্ষাবৃত্তি জখম স্বরূপ। মানুষ তার মুখমণ্ডলকে এর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করে। যে ব্যক্তি মুখে এ ক্ষত চিহ্ন বহাল রাখতে চায় সে রাখতে পারে, আর যে তা ত্যাগ করতে চায় সে ত্যাগ করতে পারে।"

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমি আব্বাসকে বললাম ঃ আপনি রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়ে সদকা আদায়ের কর্মচারী হিসেবে একটা চাকুরী চেয়ে নিন। আব্বাস (রা) গিয়ে চাইলেন। রসূল (সা) বললেন ঃ আমি মানুষের গুনাহ ধোয়ার জিনিস আদায়ে আপনাকে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবো না। বস্তুত রসূল (সা) সদকাকে এখানে যেভাবে চিত্রিত ও বিশেষিত করেছেন কুরআনের আলোকে তা সম্পূর্ণ সঠিক ও যথার্থ। আল্লাহ বলেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط

"(অর্থাৎ হে রাসূল !) আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা আদায় করুন যার সাহায্যে তাদেরকে পবিত্র করতে পারবেন।"-(সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তির কথা আলোচিত হচ্ছিল। সে লোকটি সারারাত ঘুমিয়ে কাটায়। তিনি বললেন ঃ "এ ব্যক্তির কানে শয়তান পেশাব করেছে।" কারণ যে ব্যক্তির মন তাকে রাতের কিছু অংশ নামায পড়ে গুনাহ মাফ চেয়ে ও দোয়া করে কাটাতে বলে না, সে একজন গাফেল মানুষ। কল্যাণ লাভের উপায় সম্পর্কে সে অজ্ঞ। সে জানে না কোন্ সময় মানুষ প্রকৃতই লাভবান হবার সুবর্ণ সুযোগ পায়। শয়তান তাকে উপহাস করে এবং তার খালি কান দু'টোতে বিদ্রূপের সাথে পেশাব করে। কেননা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে যে আল্লাহ মানুষকে ডেকে বলতে থাকেন "কেউ কি ক্ষমাপ্রার্থী আছে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত। কেউ কি তাওবাকারী আছে, তার তাওবা আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ইত্যাদি।" সে সম্পর্কে সে নিরেট অজ্ঞ। আল্লাহ আমাদেরকে দিন ও রাতে তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল থাকার দুর্মতি থেকে রক্ষা করুন।

রসূল (সা) বলেছেন ঃ "জুময়া (অর্থাৎ জুমায়ার নামায) গরীব মানুষের হজ্জ।" এ উক্তি দ্বারা তিনি জুময়ার তাৎপর্যের অত্যন্ত নির্ভুল বর্ণনা দিয়েছেন। বস্তুত সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর। কা'বা শরীফও আল্লাহর ঘর। তবে পার্থক্য এই যে, কা'বা সবচেয়ে বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ও বরকতপূর্ণ আল্লাহর ঘর। সুতরাং জুমায়ার দিন আল্লাহর সাক্ষাত লাভের জন্য মসজিদে গমন তাঁর সাক্ষাতের জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠতম ঘরে গমন করে হজ্জ করারই পর্যায়ভুক্ত। যদিও অন্যান্য মসজিদের হজ্জ ও কা'বা শরীফের হজ্জের মধ্যে পার্থক্য ঠিক ততখানি, যতখানি উভয়ের মর্যাদায়। কিন্তু আল্লাহ তার অশেষ অনুগ্রহের দ্বারা বড় হজ্জ পালনে অক্ষম তার দরিদ্র বান্দাদের এরূপ ব্যবস্থা করেছেন যে, তাদের সাধারণ মসজিদে জুময়ার নামায আদায়েই কা'বা শরীফে হজ্জের সমান সওয়াব লাভ হবে। দরিদ্রদের জন্য এ এক বিরাট সুসংবাদ। তারা হলো পৃথিবীতে আল্লাহর

www.pathagar.com

পরিজন। তারা আল্লাহর মহত্তম রেয়াত লাভের সবচেয়ে বেশী হকদার। হে আল্লাহ ! দরিদ্রদের ওপর কৃত তোমার এই অনুগ্রহে তুমি আমাদেরকে শামিল কর, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং কেয়ামতের দিন তোমার মহান রসূলের পতাকাতলে তাদের দলভুক্ত হয়ে আমাদেরকে সমবেত কর।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর এক হাদীসে আছে ঃ জান্নাতের বাগানগুলোতে তোমরা ফলমূল আহরণ কর। সাহাবীগণ বললেন ঃ জান্নাতের বাগান কোথায় ? তিনি বললেন ঃ যেসব বৈঠকে আল্লাহকে স্মরণ বা আলোচনা করা হয়। ....সুতরাং তোমরা সকাল-বিকাল আল্লাহর স্মরণে কাটাও এবং তোমাদের আপনজনদেরকে তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দাও।"

ইতিপূর্বে আমার এক আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর স্মরণ তাঁর রাজকীয় বাগান থেকে নেমে আসা সুগন্ধি বিশেষ—যা মানুষের এই দুনিয়াতে বসবাস করার সময়েই তাকে আগাম জান্নাতী রূহ সরবরাহ করে। কোন কোন মহাত্মা বলেছেন ঃ দুনিয়াতে বসেই যে জান্নাতে বসবাসের সুখ ভোগ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর স্মরণের অনুষ্ঠানগুলোতে বসে।" এ সম্পর্কে অন্য এক বুজুর্গ বলেছেন ঃ "দুনিয়াতে একটি জান্নাত আছে। এতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে না সে আখেরাতের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" বলা বাহুল্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিকরের তাৎপর্য সম্পর্কে যে নির্ভুল ও যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন, এসব বুজুর্গের কথা তা থেকেই গৃহীত।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের কোন ব্যক্তি সফরে যেভাবে উটকে কৃষ ও দুর্বল করে তেমনি মু'মিন শয়তানকে কৃষ ও হীনবল করে দেয়।" আল্লাহর দিকে মু'মিনের প্রাণান্তকর অগ্রযাত্রাকে এই হাদীসে যে রূপ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার তুলনা আমরা অন্য কোথাও পাই না। মু'মিন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যে অভিযান ও সাধনা চালায়, তাতে তাকে ক্রমাগত আল্লাহর নিরঙ্কুশ আনুগত্য করে যেতে হয়, এমন নেক আমল অব্যাহত রাখতে হয় যা কোন দিন ক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণ অব্যাহত রাখার দরুন সে এমন সুরক্ষিত ও শক্ত দুর্গে আশ্রয় নেয় যে, শয়তান আর কোন ক্রমেই তার লাগাম ধরতে পারে না এবং তাকে তার গন্তব্য ও লক্ষ্য থেকে বিপদগামী করতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানুষের জন্য একটা শয়তান নিযুক্ত আছে। সে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার পেছনে লেগে থাকে। কিন্তু যে মু'মিন তাঁর লক্ষ্য পথে দৃঢ়ভাবে ও অবিচলভাবে চলতে থাকে, তার শয়তানটা তার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপিয়ে ওঠে। ক্রমাগত এ কাজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত সে দুর্বল ও কৃষ হয়ে যায়। এ বর্ণনার চেয়ে

www.pathagar.com

মজাদার বর্ণনা মু'মিনের কাছে আর কিছু নেই এবং তার সাধনা ও সতর্কতাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলতে এ বর্ণনায় যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো হয়েছে, তেমন আর কোন বর্ণনায় হতে পারে না।

প্রিয় দ্বীনি ভাই ! এ পর্যন্ত যে কয়টি হাদীস বর্ণনা করলাম, তাতে কয়েকটি চারিত্রিক দোষ ও গুণের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আল্লাহর দিকে ডাকার একটি পদ্ধতির দৃষ্টান্ত হিসেবে এগুলো উল্লেখ করেছি। আমার এ অভিভাষণের শুরুতে আমি একে বাস্তব যুক্তি প্রদর্শনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হিসেবে শিরোনাম দিয়েছি।

পাঠক লক্ষ্য করেছেন এসব বর্ণনার দু'টো মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত তাৎপর্য বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ সত্য ভাষণ, অতপর সন্তোষ কিংবা ঘৃণাবোধকে এমন শক্তভাবে জাগিয়ে দেয় যাতে করে চারিত্রিক দোষ সম্পর্কে ঘৃণার সৃষ্টি অথবা চারিত্রিক গুণের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। খবরদার ! একথা ভাববেন না যে, নিছক ওয়াজ নছিহতে ব্যবহৃত উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যেমন তেমনভাবে এসব বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে। কখখনো তা নয়। সাধারণ মানুষের বর্ণনা হলে তেমনটি হতে পারতো। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা তেমন হতে পারে না। তিনি তো আর নিজের খেয়াল খুশী মত কথা বলেন না। তিনি মেপে মেপে কথা বলেন। তার বর্ণনা একেবারে সত্য ও বাস্তবসম্মত এবং সেভাবেই তা সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। আবারও সাবধান করে দিচ্ছি যে, এসব বর্ণনার মধ্যে নিছক আলংকারিক উপমা বা রূপক কথা বলার ইচ্ছা ফুটে উঠেছে বলে মনে করবেন না—যেমন কিছু কিছু দুর্বল মস্তিষ্কের লোকেরা মনে করে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থান ও মর্যাদা এত উচ্চে যে, আমাদের মত সাধারণ মানুষ এবং আমাদের চেয়েও উঁচু স্তরের মানুষের পক্ষেও তার মর্যাদার নাগাল পাওয়া এবং তার উক্তির কদর্থ করে তাকে তার সরল ও সোজা অর্থ থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা ও বিনা কারণে তার ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ নেই। রসূল (সা)-এর বক্তব্যের সরল অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ যদি বুঝাতে চেয়ে থাকতেন তাহলে আরবী ভাষার এসব বিচিত্র উদাহরণ, উপমা ও রূপক বর্ণনায় সেই ইঙ্গিত অর্থ বুঝানোর জন্য যথেষ্ট উপকরণ থাকতে পারতো। অন্যান্য উদাহরণ, উপমা ও রূপক বর্ণনায়—যেখানে অবস্থা ভেদে ভিন্নতর অর্থ বুঝানোর প্রয়োজন অনুভূত হতো—সেখানে রসূল (সা) সেই ভিন্ন অর্থে বোধগম্য করে কথা বলেছেন। কাজেই আমাদের সকলের আল্লাহ ও রসূলের কথা বুঝতে এই সরল সহজ ও প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণের পদ্ধতিই অনুসরণ করা উচিত। কেননা এ পদ্ধতিই আমাদের আকিদা-বিশ্বাস, সম্ভ্রম ও দ্বীনের জন্য সর্বোত্তম রক্ষাকবচ।

www.pathagar.com

আমি এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করছি এজন্য যে, আমাদের কেউ যেন কথা বলার সময় বল্গাহারা হয়ে নৈতিক গুণাবলীকে ইচ্ছামত বস্তুগত বিশেষণে বিশেষিত না করে, যা কিনা তার শৈল্পিক বর্ণনাভঙ্গীতে মজাদার লাগে, আর চারিত্রিক দোষগুলোকে প্রচলিত শিল্পীসুলভ রুচি অনুসারে গ্রহণযোগ্য করে বিশ্লেষণ না করে। বস্তুত আমরা সত্যেরই বিশ্লেষণ করছি। কাজেই আমাদের উচিত এই দোষ ও গুণগুলোর পরিচয় সেই উৎস থেকেই সংগ্রহ করা যেখান থেকে আমরা সত্যকে তথা কুরআন ও হাদীসকে শিখেছি ও জেনেছি। এ দু'টোর সীমা ডিংগিয়ে গেলে আমাদের ভুলের মধ্যে পড়তেই হবে এবং অচিরেই আমাদের কথায় বৈপরিত্য প্রকাশ পাবে। কুরআন ও হাদীস থেকে শেখা সহজ-সরল ও প্রত্যক্ষ বর্ণনা ও বিশ্লেষণের এ পদ্ধতি সত্যিকার পরহেজগার ও আল্লাহভীরু লোকদেরই তরিকা। এটাই আমাদের গ্রহণ ও প্রয়োগ করা কর্তব্য। মানুষকে যখনই দ্বীন সংক্রান্ত তত্ত্ব বুঝাতে চাবেন, তখন এই তরিকা বা পদ্ধতিকেই আকড়ে ধরবেন।

এ প্রসঙ্গে আমাদের পূর্ব পুরুষদের উক্তি থেকে একটা উদাহরণ পেশ করছি—যার অনুকরণে আপনি আরো অনেক কথা বলতে পারবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, মু'মিনের পিছে লাগা শয়তান দুর্বল ও কৃষকায়। এ বর্ণনা তিনি আমাদের একটু আগে বর্ণিত হাদীস থেকেই আত্মস্থ করেছেন। কয়েস বিন হাজ্জাজ বলেন ঃ আমার পিছে লাগা শয়তানটা আমাকে বললো ঃ আমি আপনার মধ্যে যখন প্রবেশ করেছি তখন সেই উটের মত দৃপ্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলাম যে, নরনারীর বাছবিচার না করে যে কোন উটের সাথে সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আজ আমি চড়ুই পাখীর মত হীনবল হয়ে গেছি। আমি বললাম ঃ কেন ? সে বললো ঃ আল্লাহর স্মরণ দ্বারা আপনি আমাকে দুর্বল করে ফেলেছেন। বস্তুত এটা শয়তান ও মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সেই সম্পর্ক ও অবস্থাটাই ব্যক্ত করে—যা হুবহু রসূল (সা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে।

আর একটা উদাহরণ নিন। এটি সেই হাদীসের বক্তব্য অনুকরণে রচিত যাতে সদকাকে মানুষের পাপ ধোয়ার উপকরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর স্বাধীনকৃত গোলাম আসলাম বলেন যে, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম বললেন ঃ দান হিসেবে পাওয়া একটা উটের সন্ধান আমাকে দাও, যা আমি নিজের বোঝা বহন ও অন্যান্য কাজে লাগানোর জন্য আমীরুল মু'মিনীনের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারি। আসলাম বলেন ঃ আমি একটা উট দেখিয়ে বললাম ঃ এই দেখুন, সদকার একটি উট। আবদুল্লাহ ইবনুল আরকাম সে উটটি নিতে অস্বীকার করলেন। কেননা তিনি

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন এমন উট—যা যুদ্ধলব্ধ অথবা যাকে জনগণের জন্য আটক করা বা খরিদ করা হয়েছে। তিনি ছদকার উটের প্রতি নিজের অনীহা ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন ঃ একটা মোটাসোটা লোক যদি প্রচন্ড গরমের দিনে তার পাজামার নীচের অঙ্গ ও বোগল ধোয়া পানি তোমাকে খেতে দেয় তাহলে তুমি কি তা খাবে ? আসলাম বলেন ঃ একথা শুনে আমি রেগে গেলাম। বললাম ঃ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। এমন কথা আমাকে কেন বলছেন ? তিনি বললেন সদকাতো মানুষের ময়লা-যা ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়।

এসব মহান ব্যক্তি রসূল (সা)-এর কথাগুলোকে তার যথার্থ ব্যাপকতর অর্থে উপলব্ধি করতেন। বোদ্ধা মন দিয়ে তা হৃদয়ঙ্গম করতেন। অতপর তাকে যেমন দেখতে পাচ্ছেন, ইঙ্গিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন।

পরবর্তীতে 'ইসলাম প্রচারকের উৎস' শিরোনামযুক্ত অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত আরো কিছু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে সেই মহা সত্যের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করুন, যার ব্যাপারে আমাদের মহান পূর্বপুরুষগণ ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ প্রার্থনা কবুলকারী, অতি ঘনিষ্ঠ।

৫—আমাদের দুনিয়ার বাস্তব অবস্থার সাথে অদৃশ্য বিষয়সমূহের তুলনা

আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনা দিয়েছেন হিসাব-নিকাশ এবং দাড়ি পাল্লার। মানুষের সে সবের সম্মুখীন হওয়া, সেদিন মানুষের অনুতাপ ও অনুশোচনা, কেয়ামতের ভূমিকম্প, তার ভয়াবহতা রহমত ও আযাবের ফেরেশতা, আরশ ও কুরছী, লওহ ও কলম এবং অনুরূপ আরো অনেক কিছুর বর্ণনা দিয়েছেন—যার অস্তিত্বের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। একথা সন্দেহাতীত যে, আমরা ঐসব জিনিস দেখতে বা অনুভব করতে অক্ষম। কেননা ঐসব সুউচ্চ বাস্তবতাকে অনুভব করার মত ইন্দ্রিয় আমাদের নেই। যেমন জন্মগতভাবে ঘ্রাণ শক্তি থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি আতর, মেশক ও ফুলের মধ্যে কি সুবাস রয়েছে তা অনুভব করতে পারে না। কেননা ঐসব জিনিস অনুভব করার ক্ষমতা তার নেই। আল্লাহ যখন এসব অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত জিনিস তার কোন সৃষ্টিকে অবহিত করতে চান, তখন তা অবশ্যই আমাদের এসব প্রচলিত ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন করেন না, বরং অন্য কোন রকমের ইন্দ্রিয় দ্বারা করেন। তার সামনে থেকে আবরণ তুলে নেন এবং যা ইচ্ছা করেন তাই তাকে দেখান। আল্লাহ বলেন ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۙ

"তিনিই আলেমুল গায়েব। তাই অদৃশ্য রহস্য কাউকে জানতে দেন না। কেবলমাত্র তার কোন মনোনীত রসূলকেই তা জানান। সে ক্ষেত্রে তিনি তার আগে ও পিছনে পাহারা বসিয়ে দেন।"-(সূরা জ্বিন ঃ ২৬-২৭)

কুরআনে সংক্ষেপে বর্ণিত, এসব অদৃশ্য রহস্যের বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা যদি এগুলো এতটা দক্ষতার সাথে মানুষের কাছে পেশ করতে পারি, যাতে তাদের মনমগজ তা উপলব্ধি করতে পারে এবং তাদের সত্তায় তার প্রতিফলন ঘটে, তাহলে আমরা মানবজাতিকে এক সর্বব্যাপী অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হব এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণ ও সুখ-শান্তির দুয়ার খুলে দিতে পারবো। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সাধারণ মানুষ তার পরকাল সম্পর্কে নিদারুণভাবে উদাসীন এবং তাদের একটি বিরাট অংশ মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত। ফেরেশতা, জ্বিন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়াতীত জিনিস অস্বীকার করার রোগে অনেকেই আক্রান্ত। এসব আপদ ও অধিকাংশ মানুষকে বিপুল কল্যাণ থেকে অথবা বলতে গেলে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এর ফলে তারা বস্তুগত সভ্যতা এবং তার তুচ্ছ ও নশ্বর দ্রব্যসম্ভার ছাড়া আর কোন কিছুকেই স্বীকার ও বিশ্বাস করে না। এ জন্য এগুলোর জন্য তারা হন্যে হয়ে প্রতিযোগিতায় নামে এবং পাগলের মত লড়াইতে লিপ্ত হয়। এই লড়াই ও প্রতিযোগিতায় তারা হীনতা ও বর্বরতার সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত নামে। এত নিম্নস্তরে নামে যে, সে স্তরে তাদের চাইতে হিংস্র বন্য জন্তুদেরকে মানবতার নিকটতর মনে হয়। কুরআনে এদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ط إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ○

"তুমি কি মনে কর যে, সেই প্রবৃত্তি পূজারীদের অধিকাংশ শ্রবণ শক্তি ও বোধশক্তির অধিকারী ? তারা তো পশুর মত বরং তাদের চেয়েও বিপথগামী।"-(সূরা আল ফুরকান ঃ ৪৪)

সুতরাং এ ধরনের লোকদেরকে আমাদের সেই অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনতে আহবান জানানো কর্তব্য—যা তারা মানে না এবং মৃত্যুর পরপারের জীবন ও বাস্তবতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেয়া উচিত—যাতে করে তাদের মানবতা, শান্তি ও সৌভাগ্য ফিরে আসে।

আমরা কতটা নিখুঁত ও সুন্দরভাবে এসব তত্ত্ব পেশ করতে পারি তার ওপরই নির্ভর করে মানবতা ও শান্তি পুনপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা। কাজেই সত্যিকার

www.pathagar.com

মর্মস্পর্শী করেই তা পেশ করতে হবে, যাতে তাদের চৈতন্য ফিরে আসে—চাই তা রাতারাতি আসুক কিংবা ধীরে ধীরে আসুক।

একটা ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী এমনও আছে যারা নিজেরদেকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ভাবে। তাদের কাছে এসব তত্ব বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেশ করা দরকার। সম্ভব হলে তাদেরকে তাদের পসন্দসই যুক্তি ও ভাষার সাহায্যে আহবান জানানোই আমাদের কর্তব্য। তবে সাধারণ মানুষের জন্য সবচেয়ে প্রভাবশালী পন্থা এই যে, তাদের কাছে এর প্রতিটি সত্যকে দুনিয়ার বাস্তব অবস্থার সাথে উপমা দিয়ে পেশ করতে হবে। অদৃশ্য তত্বের সাথে দুনিয়ার বাস্তব অবস্থার খানিকটা সাদৃশ্য ও তুলনা তুলে ধরতে হবে। এতে করে তাদের মনের অর্গলবদ্ধ দুয়ার খুলে যাবে এবং কথা অন্তরের অন্তস্থলে ঢুকে যাবে।...... এ ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ এই যে, ক্রমাগতভাবে এবং বেশী বেশী করে ঐসব অদৃশ্য তত্ব মনে করিয়ে দিতে হবে। কেননা দুনিয়ার লম্বা লম্বা আশা মানুষকে সেসব কথা ভুলিয়ে দেয়। ফলে মন কঠিন হয়ে যায়।

একবার ইখওয়ানের এক ভাই কথা প্রসঙ্গে এরূপ গল্পের অবতারণা করলেন ঃ এক বাদশাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি তার রাজ্যে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ সৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ রাজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে তিনি নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। রাজ্যের বড় বড় আমীর ওমরাগণ রাজ দরবারে হাজির হতে লাগলেন এবং প্রত্যেকে ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদটি লাভের আকাংখা ইশারা ইংগিতে প্রকাশ করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় সহসা রাজা তাদের জানালেন যে, তিনি ঐপদে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন যা তাদের কল্পনারও অতীত। তিনি জানালেন যে, এমন একজন অতি সাধারণ মানুষকে তিনি নিয়োগ করবেন, যার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে ঐ পদের নাগাল পাওয়া অসম্ভব বলে মনে করা হয়। তিনি সকল আমীর ওমরাহকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে, যাকে নিয়োগ করা হবে তাকে সবাই যেন তাজীম ও সম্মান করে। কেননা খোদ রাজাই তাকে নিয়োগ করেছেন এবং তাকে সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সকলেই স্বেচ্ছায় রাজার ইচ্ছাকে স্বাগত জানালো। কিন্তু একটি লোক অহংকারে মত্ত হয়ে ও হিংসার বশবর্তী হয়ে তার ধারণা মতে, সেই নিম্ন মর্যাদার লোকটিকে সম্মান জানাতে অস্বীকার করলো। এভাবে সে রাজার হুকুম অগ্রাহ্য করলো। রাজা তাকে তাঁর বর্তমান সকল অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করে দরবার থেকে বিতাড়িত করলো এবং তার ওপর তাঁর প্রবল ক্রোধ ও বিরাগ প্রকাশ করলেন। বিতাড়িত ও পদচ্যুত লোকটি তাতে আরো রাগান্বিত হয়ে বললো ঃ "এই যে লোকটিকে আপনি আমার ওপর অগ্রাধিকার দিলেন, তার দ্বারা কি কাজ সংঘটিত হয় তা আপনি শীঘ্রই দেখতে পাবেন। আমি তার ও তার বংশধরের কাছে খুবই ঘনিষ্ট ও প্রিয় হয়ে যাবো এবং তারা আপনার

www.pathagar.com

অবদান ও অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে এবং আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। আপনি যা পসন্দ করেন না, আমার সাথে মিলিত হয়ে সে তাই করবে। এভাবে আমি তাদেরকে আপনার সম্মানজনক নৈকট্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বো।" রাজা ঐ লোকটির প্রতি ও তার বংশধরের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময় ছিলেন। তাই বিভিন্ন দূত পাঠিয়ে তাদেরকে তিনি ঐ বদ স্বভাবের বিতাড়িত লোকটির শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার থেকে সাবধান করতে লাগলেন এবং তার কোন কথা শুনতে ও মানতে নিষেধ করতে লাগলেন। তাদেরকে হুশিয়ার করে দিলেন যে, ঐ লোকটির আনুগত্যের পরিণতি রাজার ঐ সম্মানিত পদ ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে চরম লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্যের স্বীকার হওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না।

আশ্চার্যের বিষয় যে, এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত লোকটি ও তার বংশধররা অল্পদিনের মধ্যেই ঐ প্রকাশ্য শত্রুর শত্রুতার কথা ভুলে গেল। তাদের অধিকাংশ রাজার হুশিয়ারী ও সতর্কবাণীকে অগ্রাহ্য করতে আরম্ভ করলো। দুষ্ট শত্রুর আকর্ষণীয় মিষ্ট কথা শুনতে ও মানতে আরম্ভ করলো। অথচ সেই মিষ্ট কথার ভেতরে ছিল ধ্বংসাত্মক বিষ। যখনই কেউ কেউ তার দিকে ঝুঁকতে লাগলো, অমনি সে তাকে তার প্রভুর বিরাগভাজন করে তুলতে লাগলো, যাতে শেষ পর্যন্ত তাকেও বিতাড়িত হতে হয়। এখন আপনিই বলুন, এটা কি কোন বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ় চরিত্রের পরিচায়ক? রাজার অবদান ও অনুগ্রহের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতার কিছুই কি এতে প্রতিফলিত হয়েছে? তারা তাদের সেই চরম শত্রুর অনুগত হবে যাকে তাদেরই কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে—এটা কি আদৌ সুমতি ও দৃঢ়তার পরিচায়ক? অনুগত হওয়া তো দূরের কথা, তার ধারে কাছে ঘেষাও কি তাদের উচিত?

এটা যদি আপনার কাছে আশ্চর্যজনক ও অস্বাভাবিক মনে হয়, তবে জেনে রাখুন যে, এরূপ ব্যাপার যথার্থই সংঘটিত হয়েছে। এই অস্বাভাবিক ও গর্হিত কাজই আমরা করে ফেলেছি। এই মহান সম্রাট স্বয়ং আল্লাহ। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ পদটি হলো পৃথিবীতে তার খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের পদ। রাজ্যের বড় বড় আমলা হলো ফেরেশতারা। তাদেরকেই তিনি বলেছিলেন যে, "আমি পৃথিবীতে খলিফা নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" অতপর তারাই যেন তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আশা করেছিলেন যে, তিনি ঐ পদের জন্য তাদেরকেই অগ্রগণ্য মনে করবেন। অত্যন্ত আদবের সাথে তারা শুধু ইশারা ইংগীতে বলেছিলেন যে, ঐ মর্যাদালাভের অধিকারটা একান্তই তাদের। তারা বললেন: এই পদের উপযুক্ত কি শুধু তারা নয়, যারা ওটাকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারবে এবং তাকে নষ্ট করবে না?

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ (البقرة : ٣٠)

"যমীনে কি আপনি এমন লোককে পাঠাতে চান, যারা সেখানে ফেতনা ফাসাদ ছড়াবে এবং রক্তপাত করবে ? অথচ আমরাই তো আপনার তসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত আছি।-(সূরা বাকারা ঃ ৩০)

"আমরাই তো আপনার তসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত আছি"-একথা দ্বারা মনে হয়, তারা এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদের মনোনীত হবার আশায় তাদের উচ্চতর গুণবৈশিষ্ট্যের দিকে ইংগীত করছেন। আল্লাহ এর জবাবে বললেন ঃ

اِنِّىْ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○

"আমি যা জানি তা তোমরা জান না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ৩০)

আল্লাহ সেই মনোনীত ব্যক্তিটির প্রকৃতি এই বলে তুলে ধরলো যে, সে এক মুষ্ঠি মাটির চেয়ে কম বা বেশী কিছু নয়। তবুও যেহেতু তিনিই সেই মাটির তৈরী মানুষকে উচ্চতর মর্যাদা প্রদান করেছেন, তাই তাকে সম্মান দেখাতে তিনি নির্দেশ দিলেন। সূরা সোয়াদে এ ঘটনার বর্ণনা লক্ষণীয় ঃ

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۖ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ○ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ○ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ○

"আপনার প্রভু যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করতে মনস্থ করেছি। যখন তাকে তৈরী করবো এবং তাতে আমি প্রাণ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পতিত হবে। ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করলো। কিন্তু ইবলিস করলো না। সে অহংকার করলো এবং অমান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো। আল্লাহ বললেন ঃ হে ইবলিস ! যাকে আমি নিজেই তৈরী করলাম তাকে সিজদা

www.pathagar.com

করতে তোকে কিসে নিবৃত্ত করলো ? তুই কি অহংকার করলি, না তুই উচ্চ মর্যাদা লাভ করে ফেলেছিস ? সে বললো ঃ আমি তো ওর চেয়ে ভাল। আমাকে আগুন দিয়ে এবং ওকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বললেন ঃ তাহলে জান্নাত থেকে বেরিয়ে যা। তুই বিতাড়িত এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোর ওপর আমার অভিসম্পাত।"

–(সূরা সোয়াদ ঃ ৭১-৭৮)

আমাদের চরম শত্রুর সাথে আমাদের এই হলো ঘটনা। আল্লাহ আমাদেরকে এ ঘটনা জানিয়ে দিচ্ছেন। এই শত্রুর সাথে আমাদের আচরণ কেমন ? আমরা আদমের ও তার বংশধরের যে আচরণ অপসন্দ করতাম এবং অশোভন মনে করতাম, আমরা সে আচরণই তো করে চলেছি। আর সে বংশধর তো আমরাই। আর আমরাই সেই জঘন্য ভুল করে চলেছি।

শত্রু আরো বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। সে বললো ঃ

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

"হে প্রভু ! তুমি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করে দিলে, তাই আমি তাদের জন্য পৃথিবীতে পাপকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলবোই এবং তাদের সবাইকে বিপথগামী করবোই। তবে তাদের মধ্যে যারা তোমার নিষ্ঠাবান বান্দা, তাদেরকে করতে পারবো না।"–(সূরা আল হিজর ঃ ৩৯-৪০)

সে আরো বললো ঃ

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

"অতপর আমি তাদের ওপর আগে থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে ও বাম থেকে এসে হামলা চালাবো। ফলে তাদের অধিকাংশকেই তুমি কৃতজ্ঞ পাবে না। আল্লাহ বললেন ঃ দূরহ্ এখান থেকে—নিন্দিত ও বিপর্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যা। আদমের বংশধরের মধ্য থেকে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদেরকে ও তোকে দিয়ে আমি জাহান্নাম ভর্তি করবো।"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৭-১৮)

www.pathagar.com

ভেবে দেখুন, আল্লাহর রহমত থেকে আমাদেরকে বহিষ্কার করা ও আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এই শয়তানের আগ্রহ কতদূর গিয়ে পৌঁছেছে। কেবল শত্রুতা ও বিদ্বেষের জন্যই তার এত অপচেষ্টা। তার এ বিদ্বেষ আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করানো পর্যন্ত থামবে না। তার এ বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান ঘটা সুদূর পরাহত।

এ শত্রু সম্পর্কে আমাদেরকে আল্লাহ যেভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যেভাবে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন, সেটা তার এক মস্তবড় মেহেরবাণী। তিনি বলেন ঃ

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا

"হে আদম সন্তান ! শয়তান যেমন তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে, তেমনি তোমাদেরকেও যেন মসিবতে নিক্ষেপ না করে।" -(সূরা আল আরাফ ঃ ২৭)

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ۝

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। তাই তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করে নিও। সে তার অনুসারীদেরকে কেবল এই জন্যই ডাকে—যাতে তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হয়।"-(সূরা আল ফাতের ঃ ৬)

আল্লাহ খেলাফতের সম্মান ও পদমর্যাদা লাভের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর এই শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখা থেকে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ۝

"তবে কি তোমরা শয়তান ও তার বংশধরকে আমার বিকল্প অভিভাবক হিসেবে মেনে নেবে ? অথচ সে তোমাদের শত্রু অপরাধীদের সে অত্যন্ত জঘন্য বিকল্প বটে !"-(সূরা কাহাফ ঃ ৫০)

শয়তানের দুর্দমনীয় বিদ্বেষের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, সে তার শিকারকে ফাঁদে আটকানোর জন্য তার পেছনে অনবরতই লেগে থাকে, তাকে আল্লাহর থেকে দূরে টেনে নেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে যতক্ষণ না তাকে পুরোপুরি নিজের দখলে নিয়ে নেয়। অতপর তাকে তার প্রাপ্য সম্মান ও আল্লাহর রহমত

www.pathagar.com

থেকে বঞ্চিত করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে। এভাবে শিকারকে জাহান্নামে নিক্ষেপের উদ্দেশ্য যখন তার পূর্ণ হয় তখন দূরে বসে তা দোযখের আগুনে দগ্ধ হতে দেখে তৃপ্তি পায় এবং উপহাস ও বিদ্রূপের এমন সব কথা তাকে বলে, যার দরুন দুঃখে ও রাগে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

সূরা ইবরাহীমের চতুর্থ রুকূ'তে আল্লাহ শয়তানের এই তামাশা দেখার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"বিচার ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর শয়তান বলবে যে, হে মানুষ ! আল্লাহ তো তোমাদেরকে সঠিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যে প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তার খেলাপ করেছি। অবশ্য আমি তোমাদের ওপর কোন বলপ্রয়োগ করিনি। শুধু দাওয়াত দিয়েছি, আর অমনি তোমরা তা গ্রহণ করেছ। সুতরাং আজ আর আমাকে ভর্ৎসনা করো না, নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমাকেও তোমরা উদ্ধার করতে পারবে না, আর আমিও তোমাদেরকে উদ্ধার করতে পারবো না। দুনিয়ার জীবনে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছিলে, সেটা আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। অপরাধীদের জন্য তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে।"-(সূরা ইবরাহীম ঃ ২২)

এ পর্যন্ত বলার পর ইখওয়ানের সেই ভাই এ পৃথিবীতে খলিফা হয়ে আসা সম্পর্কে এবং সেই খিলাফতের দায়িত্ব পালনে যে সম্মান ও মর্যাদা নিহিত, সে সম্পর্কে মানুষের উদাসীনতার আলোচনা করতে লাগলেন। আর অভিশপ্ত শয়তান—যার আমাদের সর্বনাশ করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই—তার শত্রুতা সম্পর্কে মানুষ কত গাফিলতিতে লিপ্ত সে কথাও বলতে লাগলেন। আল্লাহর হুশিয়ারী ও সতর্কবাণীকে আমরা যেভাবে ভুলে বসে আছি, তিনি তারও বর্ণনা দিলেন এবং এই সকল উদাসীনতা ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসার আবশ্যকতার উল্লেখ করলেন। আল্লাহর ভয় এবং শয়তান সম্পর্কে

www.pathagar.com

সতর্কতা অবলম্বন তথা আল্লাহর স্মরণ ও কৃতজ্ঞতাবোধে অনুপ্রাণিত হওয়ার তাগিত দিলেন।

ইতিপূর্বে আমি ইসলাম প্রচারে উদাহরণ প্রয়োগের বিষয়ে যে আলোচনা করেছি—বর্তমান আলোচনা তা নিয়ে নয়। সেটা ছিল তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর সাথে বাস্তব পার্থিব জিনিসের সাদৃশ্য বর্ণনা সংক্রান্ত। আর এখন যা বলছি, তা হচ্ছে অদৃশ্য জগতে যেসব ব্যাপার ইতিমধ্যেই সংঘটিত হয়েছে তার সাথে চাক্ষুস দর্শিত আজকের জগতের তুলনা করা সংক্রান্ত। যে দু'টো ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হলো, তা মনগড়া বা কল্পনাপ্রসূত নয়। এর একটি ঘটেছিল আল্লাহর খাচ দরবারে ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাদের আসরে। আর অপরটি আমাদের দুনিয়ায় নিত্য ঘটমান।.......এই তুলনার সাহায্যেই আমরা দৃশ্যমান বিষয়ের ওপর অদৃশ্য বিষয়কে কেয়াস করে নিতে পারি, এতে করে মনের সন্দেহ-সংশয় ও অস্পষ্টতা বিদূরিত হয়। এসব অদৃশ্য বিষয় সন্দেহ দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। সেই সন্দেহ খণ্ডনের ফলে মনের চক্ষু দিয়ে তা দেখা সম্ভব হয়। এমনকি তা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখার মতই হয়ে দাঁড়ায়। যেমন হযরত হারেসা (রা) প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকালে বলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি আমার প্রবৃত্তিকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি। ফলে আমি রাত জাগরণ ও দিনে ক্ষুধা পিপাসা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করেছি। এখন আমার মনে হয়, আল্লাহর আরশ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এবং জান্নাত যেন আমার ডান পাশে, জাহান্নাম বাম পাশে এবং পুলসিরাত আমার পায়ের নীচে।"

উদাহরণ স্বরূপ আমি একথাও উল্লেখ করছি যে, জ্ঞানী বাদশাহদের রীতি এই যে, তারা সেইসব নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করে থাকেন যারা কোন বস্তুগত পুরস্কারের আশা না রেখেই নেক কাজ করে থাকেন। এসব নিষ্ঠাবান বুজুর্গ তাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করে থাকেন এবং তার দৃষ্টিতে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তারপর একদিন যখন প্রভুর কাছে হাজির হন, তখন প্রভু তাদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন, তাদের মন তৃপ্ত হয়ে যায়, এমন সব উপঢৌকন তাদেরকে দেন, নিজের কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন তাদেরকে অভিনন্দিত করে ও তাদের অবদানকে স্বাগত জানায় এবং তাদেরকে সালাম দেয়। এসব তো দুনিয়াতেই হয়ে থাকে। এর চেয়েও উত্তম উপঢৌকন ও অভিনন্দন রাজাধিরাজ আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া যায়। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন ঃ

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

www.pathagar.com

جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ وَالۡمَلٰٓئِکَۃُ یَدۡخُلُوۡنَ عَلَیۡهِمۡ مِّنۡ کُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَیۡکُمۡ بِمَا صَبَرۡتُمۡ فَنِعۡمَ عُقۡبَی الدَّارِ ۝

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত ধৈর্য ধারণ করেছে, নামায কায়েম করেছে, আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে এবং খারাপ কাজের প্রতিকার ভালো কাজ দ্বারা করে, পরকালীন জীবনে সমস্ত প্রতিদান তাদেরই প্রাপ্য। সে প্রতিদান চিরস্থায়ী জান্নাত—যেখানে তারা এবং তাদের নেক্কার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানগণ প্রবেশ করবে আর ফেরেশতারা তাদের কাছে সকল দরযা দিয়ে ঢুকে বলতে থাকবে : তোমাদের ধৈর্যের জন্য তোমাদের ওপর সালাম। বস্তুত এ জগতের প্রতিদান কত সুন্দর !"–(সূরা আর রা'দ : ২২-২৪)

উক্ত অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হচ্ছে সেইসব দরিদ্র মোহাজের—যাদের সাহায্যে যাবতীয় শূন্যস্থান পূরণ করা হয় এবং সকল অবাঞ্ছিত ব্যাপার থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। তারা তাদের বুকের ভেতর সকল আশা-আকাংখা অপূর্ণ রেখে মারা যায়। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলেন : তোমরা এদের কাছে যেয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানাও। ফেরেশতারা বলেন : আমরা আপনার আকাশের বাসিন্দা এবং আপনার সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তবু কি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাদেরকে সালাম ও অভিনন্দন জানাতে ? আল্লাহ বলেন : তারা ছিল আমার এমন বান্দা যারা একমাত্র আমারই আনুগত্য করতো—কাউকে আমার সাথে শরীক করতো না, তাদের দিয়ে যতসব শূন্যস্থান পূরণ করা হতো, তাদের দিয়েই বিপদ আপদ থেকে আত্মরক্ষা করা হতো এবং মনের আশা-আকাংখা অপূর্ণ রেখেই মারা গেছে। এরপর ফেরেশতারা তাদের কাছে যায় এবং সকল দরযা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করে আর বলে : তোমাদের ধৈর্যের জন্য তোমাদেরকে অভিনন্দন। এই জগতের প্রতিদান কত সুন্দর।"

এ হলো দু'টো জিনিস। একটা হলো ফেরেশতাদের সর্বোচ্চ দরবারের অদৃশ্য তত্ত্ব। অপরটি এই দুনিয়াবাসী যা ভালোবাসে তাই। কিন্তু এ দু'টো জিনিসের তুলনামূলক পর্যালোচনা মনকে আনন্দে উৎফুল্ল করে এবং ঐ অদৃশ্য তত্ত্বের দাবী অনুসারে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই তুলনামূলক পর্যালোচনায় আমি যে প্রয়োজনীয় সব কথাই বলতে পেরেছি তা নয়। আমি শুধু এর

www.pathagar.com

দ্বারোদ্ঘাটন করেছি এবং পথের সন্ধান দিয়েছি মাত্র। এখন পাঠকের কর্তব্য, এই তুলনামূলক পর্যালোচনাকে সম্পন্ন করতে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগানো। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, আপনার সামনে এ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান যে, দুনিয়ার বাদশাহগণ ধনী ও প্রভাবশালী লোকদের ছাড়া আর কাউকে তেমন গুরুত্ব দেয় না বা শ্রদ্ধা করে না। যারা নিষ্ঠাবান ও নেক্‌কার বলে পরিচিত, তাদের কোন মূল্য তারা দেয় না। অথচ আল্লাহ্ এ রকম মানদন্ড দিয়ে পরিমাপ করেন না। তিনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকেই অগ্রাধিকার দেন এবং অন্তরের উৎকৃষ্টতাকে শ্রদ্ধা দেখান। এ জন্য তার তাবত সৃষ্টির মধ্যে দরিদ্র মোহাজেরদেরকেই সর্বাগ্রে জান্নাতে যাবার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আপনার সামনে আরো বহু দৃষ্টান্ত আছে—যার বিশ্লেষণ করে আমি আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

ইখওয়ানের অনেক ভাই বলে থাকেন যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মহান নেতা হযরত হাসানুল বান্না (র) এমনি ধরনের ওয়াজ ও নছিহত মানুষকে করতেন। তিনি বলতেন ঃ আমাদের মধ্যে কারো যদি কোন মামলা থাকে এবং কোর্ট থেকে মামলার শুনানীর তারিখ জানিয়ে নোটিশ আসে, তখন সে ঐ মামলা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সে মামলা তার মন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও দূর হয় না। সে তৎক্ষণাত ঝানু বুদ্ধিমান লোকদের পরামর্শ নিতে আরম্ভ করে, দলীল দস্তাবেজ তৈরী করা শুরু করে দেয়, উকিল ঠিক করে ও সাক্ষী নিয়োগ করে। অতপর শুনানীর দিন এলে কোর্টে চলে যায় বহু বিচিত্র আবেগ-অনুভূতি নিয়ে এতসব সত্ত্বেও অনেক সময় রায় ঘোষণা হবার পর দেখা যায় তার বিরুদ্ধেই রায় দেয়া হয়েছে। জরিমানা অথবা কয়েক বছর বা মাসের মেয়াদে কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। এ রকম রায় ঘোষণার পরও তার হাতে উচ্চতর আদালতে আপীল করার সুযোগটি থেকে যায়। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার পরও যখন রায় তার বিরুদ্ধে যায় তখন সে যায় সর্বোচ্চ আপিল আদালতে। এতসব সুযোগ হাতে আছে জেনেও নিম্ন আদালতের শুনানীর দিন তাকে ভীষণ চিন্তিত ও ভীত দেখা যায়।

মুরশিদ হাসানুল বান্না বলেন ঃ দুনিয়ার এই সামান্য মামলায় যখন আপনার এই অবস্থা হয়, তখন এর চেয়ে বড় মামলায় যখন আপনাকে নোটিশ দেয়া হয় তখন আপনার অবস্থা কি রকম হওয়া দরকার। সে মামলায় আপনার বিরুদ্ধে যে নোটিশ দেয়া হয়েছে তা এসেছে স্বয়ং কুরআনের ব্যাপারে। আপনাকে যিনি আসামী করে মামলা ঠুকেছেন তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর শুনানীর দিন হলো কেয়ামতের দিন এবং তার স্থান হলো হাশরের ময়দান। আর বিচারক কোন মানুষ নয়—বরং আসমান ও

www.pathagar.com

জমীনের মহাপরাক্রান্ত অসীম শক্তিধর আল্লাহ। সাক্ষীরা সবই আপনার ভেতরের এবং আপনার বিরোধী। আপনারই জিহ্বা, হাত, পা ও চামড়া। সে আদালতের রায়ও চূড়ান্ত রায়। তার কোন রদ-বদল হয় না কোথাও। কেননা সে রায় এমন বিচারকের যিনি কোন ভুল করেন না। কোন মুক্তিপণ দিয়ে তার রায়ের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না আর সে রায়ের কার্যকরিতাও কেউ রোধ করতে বা স্থগিত করতে পারে না। এর ফল হয় আগুন—যার কাষ্ঠ মানুষ ও পাথর ; নচেৎ জান্নাতে—যা আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিদ্যমান—যা কেবল সংযত ও সাবধানী নেককারদের জন্য নির্ধারিত। এই সমস্ত বক্তব্যকেই মহান নেতা হাসানুল বান্না কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করেছেন।

আমি মনে করি, এসব উদাহরণ দ্বারা আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা আপনার কাছে পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

৬—বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়ানো আল্লাহর অসংখ্য ও বিচিত্র নিদর্শন ও মানুষকে দেয় নেয়ামতসমূহ পর্যবেক্ষণ।

প্রিয় দ্বীনি ভাই ! বিশ্ব প্রকৃতি আপনার সামনেই উন্মুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীতে বিস্তৃত আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনে তা পরিপূর্ণ। আপনি এ মহাবিশ্বকে নিজ চোখে দেখছেন, নিজ কানে তার শব্দ শুনছেন, নিজ মুখ দ্বারাই তার স্বাদ গ্রহণ করছেন, নিজ নাক দ্বারাই তার ঘ্রাণ নিচ্ছেন, নিজ পা দিয়েই তার পথে হাটছেন এবং তার বস্তু নিচয়কে নিজ হাতেই ব্যবহার করছেন। সুতরাং আপনি এ বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত এবং সেও আপনার সাথে সম্পৃক্ত। কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটা এক অবিসংবাদিত সত্য। কেননা এ সত্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত। এ অনুভূতি এমন অকাট্য ও স্বতসিদ্ধ যে তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

অন্য কথায় বলা যায়, আপনি যখন বলেন যে, আমি আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, পর্বত, নদনদী, শস্যক্ষেত, মানুষ ও পশু সবই দেখি—যখন বলেন যে, আমি এ মহাবিশ্বের বস্তু ও প্রাণীগুলোকে দেখি, তার শব্দ শুনি, তার ঘ্রাণ পাই, তাকে স্পর্শ করি এবং সে আমাকে স্পর্শ করে, তার ভেতরে অনুপ্রবেশ করি এবং সে আমার ভেতরে অনুপ্রবেশ করে—এসব যখন বলেন, তখন আসলে এমন একটা বাস্তব জিনিসের কথাই বলেন যা আপনার ও সকল মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুভূত।

বিশ্ব প্রকৃতি থেকে আমরা কি বুঝেছি ?

আমাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে সঙ্গতভাবেই একটা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। সেটা এই যে, বিশ্বপ্রকৃতির এই সমস্ত জিনিস—যার সাথে সে

www.pathagar.com

ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যার ভেতরে সে অনুপ্রবেশ করেছে এবং যা তার ভেতরে অনুপ্রবেশ করেছে, অতপর তার ওপর সে পর্যাপ্ত দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ চালিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তার অন্তর্নিহিত রহস্য ও মূল্যমান সম্পর্কে অবগত হয়েছে —সেসব জিনিসকে সে যথার্থই পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করেছে। বস্তুত এসব জিনিসই যে এ বিশ্বজগতে তার দেখা প্রথম জিনিস, তাতে আর সন্দেহ কি? এসব জিনিসকে জানার মাধ্যমে সে তার জ্ঞানভান্ডারে প্রথম স্বতসিদ্ধ জ্ঞান আহরণ করেছে। আমরা একথা বলছি না যে, প্রচলিত টেকনিক্যাল পরিভাষায় সর্বাত্মক জ্ঞান আহরণ বলতে যা বুঝায়, তাই তাকে করতে হবে। কেননা সে একটা অসাধ্য ব্যাপার। আমরা শুধু এতটুকু চাই যে, এসব জিনিসের প্রতি সে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তা এগুলোকে ভেদ করে এর সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য ও এর বিস্ময়কর নির্মাণ তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছে যাক। যাতে করে সে এ সবের ভেতরে নিহিত নির্মাণ কৌশলের অপরূপ সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং নেয়ামত ও অনুগ্রহের প্রাচুর্য উপলব্ধি করে। প্রথম সরল-সহজ পর্যবেক্ষণেই সে এই উপলব্ধিতে পৌঁছে যুক্তি ভিত্তিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। এই যুক্তিভিত্তিক পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া কি মানুষ রপ্ত করতে পেরেছে? বিশ্বজগতের পর্যবেক্ষণের এ প্রক্রিয়া প্রথম স্থূল দৃষ্টি দিয়ে শুরু হয়ে ক্রমে উন্নতি লাভ করে সর্বব্যাপী ও পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণের পরিণত হওয়ার কথা। নিগূঢ়তম তত্ত্ব উপলব্ধির পর্যায়ে উপনীত হওয়া এবং মুগ্ধ ও চমৎকৃত হওয়ার অদম্য আকাংখা সৃষ্টি করার কথা। প্রশ্ন এই যে, এই লক্ষ্য কি অর্জিত হতে পেরেছে? না, শুধুমাত্র ভাসা ভাসা, উদাস ও চলমান দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই দায়সারা হয়েছে এবং এক পা দু'পা বাড়িয়ে অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ এই প্রশ্নের জবাবই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

মানুষের শৈশব

মানুষ শিশুকালেও আকাশ দেখেছে, আজ যখন সে একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ তখনো সে আকাশ দেখছে। ভাববার বিষয় এই যে, তার আজকের পরিণত বয়সের দেখায় কি শিশুকালের দেখা থেকে কোন পার্থক্য বা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে? শৈশবে সে দেখতো যে, নীল একটা জিনিস দুনিয়াকে ঘিরে রেখেছে। বয়োপ্রাপ্তির পর সে কি তা নিয়ে একটুও চিন্তা-ভাবনা করেছে? আকাশের দৈর্ঘ, প্রস্থ, ব্যাপ্তি ও তার সৃষ্টি কৌশলের নিপুণতা নিয়ে কি সে ভেবে দেখেছে ? সে কি আকাশের দিকে হাত বাড়ানোর চেষ্টা করে দেখেছে যাতে সে বুঝতে পারে যে, তাকে ধরতে সে কত অক্ষম? মানুষ যা কিছু নিজ হাত দিয়ে তৈরী করে তার সাথে আকাশে আল্লাহ যে অভাবনীয় ও বিস্ময়কর জ্যোতিষ্কসমূহ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে কত পার্থক্য, তা কি সে ভেবে দেখেছে ? তা ভেবে দেখলে এই অচিন্তনীয় ও বিশাল নির্দশনের গুরুত্ব কত, তা সে অবশ্যই বুঝতে পারতো।

www.pathagar.com

বিস্ময়োদ্দীপক ও গরিয়ান এই সৃষ্টিকে সে কি অন্তরের চক্ষু দিয়ে নিরীক্ষণ করেছে, যাতে করে তার অসীম ক্ষমতাবান মহান স্রষ্টার পরিচয় লাভ করতে পারে—যিনি চর্মচক্ষু দিয়ে দেখার যোগ্য জিনিস সৃষ্টি করেন অথচ নিজে পরম দক্ষতা নিপুণতার সাথে চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। বয়োপ্রাপ্ত হয়ে সে কি এই বিস্ময়কর আকাশের প্রতি এভাবে বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, না শিশুকালে যে রকম দৃষ্টি দিত, তাই দিয়ে চলেছে ? এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, সাধারণভাবে বয়োপ্রাপ্ত মানুষের মহাকাশ ও অন্যান্য সৃষ্টি নিরীক্ষণ একজন শিশুর অবলোকনের চেয়ে উন্নতমানের নয়। এ দিক থেকে বলা চলে, বয়োপ্রাপ্ত মানুষ আসলে একটা বয়স্ক শিশু ছাড়া কিছু নয়। বিশ্বজগতের পর্যবেক্ষণে সে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি ও উৎকর্ষসাধন করতে পারেনি। বিশ্ব মানবতা তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই ব্যাপারে এমন কোন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি—যার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, সে ঐ অগ্রগতির মাধ্যমে তার আদিম সরলতা এবং শিশুসুলভ চেতনাহীনতা ও উদাসীনতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।

মানবতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা

বিশ্ব প্রকৃতিকে শিশুর মত সরল ও উদাসীন দৃষ্টি দিয়ে না দেখে প্রখর ও সূক্ষ্ম চিন্তামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারলেই মানবতার যথার্থ উন্নতি সম্ভব। বিশ্ব প্রকৃতিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিদর্শনের অভিনবত্ব ও অনুপমত্ব যখন তার চোখে প্রতিভাত হবে, মন দিয়ে তা উপলব্ধি করবে এবং তা থেকে উপযুক্ত জ্ঞান ও শিক্ষা আহরণ করবে, অন্য কথায় যখন সে প্রতিটি জিনিসকে তার স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত থাকার পটভূমিতে দেখতে পাবে, তখনই তা হবে সঠিক মানের দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ। এরূপ দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণেই মানুষের উৎকর্ষ ও পূর্ণতার নিশ্চয়তা নিহিত। পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি তার অথবা তার অন্তর্নিহিত জীবনের যথার্থ পরিচয় বহন করে। দৃষ্টি যদি হয় স্থবির ও নিশ্চল তবে বুঝতে হবে তার আত্মা স্থবির, চেতনা নিষ্প্রভ ও অন্তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আর দৃষ্টি যদি হয় প্রখর, বুদ্ধিদীপ্ত ও জীবন্ত, তবে বুঝতে হবে তার আত্মাও জীবন্ত ও শক্তিমান, তার প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি সচল, সক্রিয় ও শিক্ষা গ্রহণে পারঙ্গম, আর তার হৃদয় সজাগ, সচেতন এবং যাবতীয় মহৎ আবেগ ও অনুভূতিতে উজ্জ্বল। আর এটা তখনই সম্ভব যখন প্রকৃতির বস্তুনিচয়ের সাথে অসংগতিশীল ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন আচরণকারীদের স্বভাব বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করা যাবে।

সুতরাং মানুষের উদাসীনতা এবং তার হৃদয়ের চেতনাহীনতা কি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা ভেবে দেখবার মত। সে আকাশ ও তার দশ দিগন্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও তার চেতনা ও অনুভূতিতে কোন আলোড়ন বা চাঞ্চল্যের

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয় না এবং সে বিস্ময়ে অভিভূত হয় না। আকাশে সূর্যকে বিনীত ও অনুগত দেখেও তার বিবেক চমৎকৃত হয়ে থমকে দাঁড়ায় না। বরং সে এটা ওটা ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে দেখে ও নির্বিকার থাকে, যেন তার কোন গুরুত্বই নেই। এমন কি তার কোন অস্তিত্বই যেন সে অনুভব করতে পারে না।

এ রকম মানুষ যত বয়োপ্রাপ্তই হোক—আসলে অবোধ শিশু। সে তার মনুষত্ব্যের আদিম স্তরে রয়েছে, যদিও ইতিহাসের বহু যুগ যুগান্তর ও বহু বংশধর সে পেরিয়ে এসে থাকে। এমন শিশুসুলভ সরলতা মাতমের যোগ্য, করুণার পাত্র—যা তার ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে যা কিছু ঘোরাফিরা করে তা ছাড়া আর কিছু বোঝে না এবং বড় বড় প্রতিভাধর মহজ্জনদের দৃষ্টিতে যেসব জিনিস গুরুত্ববহ, তা অবজ্ঞা করে। শিশুকে দেখুন। পরিণত লোকদেরকে কোন বিষয়ে আলোচনারত দেখতে পেল। কিছুক্ষণ শুনলো। কিন্তু বুঝলো না এবং তার দিকে আকৃষ্ট হলো না। তাই পরক্ষণেই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখলো, অদূরে কতকগুলো শিশু খেলছে বা কথা বলছে। তৎক্ষণাত তাদের কাছে ছুটে গেল। তাদের কথা বুঝলো এবং তাতেই তন্ময় হয়ে ও আনন্দে মত্ত হয়ে রইল।......এরূপ শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বয়স্ক লোকেরা—যাদেরকে বয়স্ক শিশু বলাই সঙ্গত—তাদের মধ্যেই মার্কোনী ঘোষণা করছেন যে, তিনি ইটালিতে বসে বোতাম টিপবেন, তাতে অষ্ট্রেলিয়াতে একটা বাতি জ্বলে উঠবে। আর যায় কোথায় ! বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় সবাই। এই খবরই হয়ে ওঠে তাদের মজলিসের আলোচ্য বিষয়। সকলে এ মহা আবিষ্কার ও বিরাট প্রতিভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, ভক্তিতে গদগদ ![১] অথচ প্রতি রাতে মহাকাশ তাদের সামনে প্রতিভাত হয়। একটা নয় অসংখ্য প্রদ্বিপ তাতে প্রজ্জ্বলিত হয়। কোন বোতাম না টিপেই আল্লাহ্ তাতে আলোক সঞ্চার করেন। সেসব প্রদ্বিপ তেল ছাড়াই জ্বলে, বিদ্যুত ছাড়াই আলোকিত হয়। এ দু'টো ব্যাপারের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর চাঞ্চল্যকর ? কোন্‌টি বেশী বিস্ময়কর ও গুরুত্ববহ ? কিন্তু আপনি দেখবেন, ঐসব বয়োজ্যেষ্ঠ শিশুরা আকাশের প্রদ্বিপগুলোর দিকে একটিবারও দৃষ্টি দিতে চান না। দিন ও রাতের একটি মুহূর্তও তারা এ নিয়ে আলোচনায় কাটান না। কেননা উর্ধ আকাশ হতে উঁকি দেয়া এসব গ্রহ-নক্ষত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের তত্ব ব্যক্ত করে। এসব তত্ব বয়োপ্রাপ্ত পরিণত লোকেরাই অনুধাবন করতে সক্ষম-বয়স্ক শিশুরা নয়।

একটা উৎকট ব্যাধি—যার নিরাময় প্রয়োজন

বিস্ময়ের ব্যাপার যদি কিছু থাকে তবে সেটা এই যে, মানুষের মনে পরিপক্কতা অর্জনের অসংখ্য উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সে অবোধ শিশুর মত

১. উল্লেখ্য যে, আমার এ আলোচনা আমি চল্লিশের দশকের প্রথমাংশে লিপিবদ্ধ করি।

www.pathagar.com

জীবনযাপন করে চলেছে। আপনি যখনই আল্লাহর কোন একটি নিদর্শনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন এবং তার অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হবেন, তখনই ঐসব উপকরণ সক্রিয় হয়ে উঠবে, প্রবল হয়ে উঠবে এবং আপনার মনে তা জাগৃতি ও উন্নতির সঞ্চার করবে। এটাও পরম বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আজকের মানুষ অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন ও অত্যাশ্চর্য বস্তুতে ভরপুর আকাশের নীচে এবং বিশাল বিশাল পাহাড়-পর্বত, বিস্তীর্ণ সমুদ্র, ভয়াল মরুভূমি ও মালভূমি, উদ্ভিদ, প্রাণী ও জড়পিন্ড সহ অসংখ্য রহস্যে পরিপূর্ণ পৃথিবীর বুকে বসবাস করছে। অথচ সে এতই অচেতন যেন তার মাথার ওপরে বা পায়ের নীচে লক্ষণীয় কোন জিনিসই নেই। মহাবিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান এসব নিদর্শন যদি গুপ্তভাবে অবস্থান করতো অথবা তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে কঠোর মানসিক খাটুনীর প্রয়োজন হতো, তাহলে তার অবজ্ঞা অবহেলা বা না দেখার জন্য কিছু ওজর বা অজুহাত আমরা খুঁজে পেতাম। কিন্তু তাতো নয়। এগুলো তো খালি চোখে দেখা যাওয়ার মত জাজ্জ্বল্যমান, এবং স্নায়ু দিয়ে অনুভব করার মত স্পষ্ট। মানুষের সামনে তা সর্বাবস্থায় ও সকল সময় প্রতিভাত।

সে অন্ধও নয়, এসব নিদর্শনের অস্তিত্ব সন্ধানে তার মাথায় কোন বেগও পেতে হয় না এবং জিনিসগুলো গুপ্ত অবস্থায়ও বিরাজ করছে না। তা সত্ত্বেও সে যে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করছে না এবং এর দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হচ্ছে না, এটা কি সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার নয়? এসব বাধা থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিছক তার হৃদয়ের অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ব এবং তার প্রজ্ঞা ও বিবেকের অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার কারণেই সে যে আল্লাহর এসব নিদর্শন থেকে লাভবান হতে পারছে না, এটা কি বেদনাদায়ক নয়?

এই মূঢ়তা, উদাসীনতা ও নির্বুদ্ধিতাই আজকের মানবজাতির সবচেয়ে ব্যাপক ব্যাধি। এ ব্যাধিতে যখন মন-মগজ আক্রান্ত হয় তখন তা বিনষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় এবং তার আবেগ ও অনুভূতি হয়ে যায় মৃত ও নির্জীব। ফলে আল্লাহর কোন নিদর্শন দ্বারা আর তা প্রভাবিত হয় না। তার চর্মচক্ষুতো যা দেখার মত তা দেখেই, কিন্তু তার মন-মগজে তার কোন ছাপ পড়ে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝

"বস্তুত চোখ তো বন্ধ হয় না। আসলে অন্ধ হয় মন—যা বুকের মধ্যে অবস্থিত।—(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪৬)

জনৈক ইখওয়ানী ভাই একবার বলেছিলেন ঃ আমার ধারণা, এই উদাসীনতা মনের কোন রোগ নয় বরং একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান

www.pathagar.com

অসংখ্য নিদর্শনের কোনটারই এমন ক্ষমতা নেই যে, মানুষের ভাবাবেগকে তা আলোড়িত ও জাগ্রত করতে পারে।

তার অপর বন্ধু তাকে বললেন ঃ না, আপনি যেমন ধারণা করেছেন আসল ব্যাপার তা নয়। আপনার সব রকমের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনের জন্য আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আপনি লক্ষ্য করুন ঃ

"মানবজাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে যারা গভীর হতাশায় নিমজ্জিত তাদের কেউ কেউ এরূপ কল্পনা করে থাকে যে, ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে ভূগর্ভে ঘরবাড়ী এমনকি পুরো শহর নির্মিত হবে। এসব শহর বা ঘরবাড়ী নির্মাণের উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধ বিগ্রহ ও আগ্রাসী হামলার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রেহাই লাভ। এখন মনে করুন, এ ধরনের একটি শহর ভূগর্ভে নির্মিত হয়েছে। মানুষ সেখানে যান্ত্রিক আলো বাতাস দ্বারা জীবনযাপন করছে এবং ভূপৃষ্ঠে প্রকৃতির যে অঢেল অবদান ও নিয়ামত রয়েছে, তা থেকে তারা বঞ্চিত। আরো মনে করুন যে, এহেন শহরে একটি মানব শিশু জন্মগ্রহণ করলো এবং মাঠে ময়দানে লালিত পালিত হয়ে বেড়ে উঠলো। সেখানে সে দিনরাত কেবল বিজলী বাতি জ্বলতে দেখে। উপরের দিকে তাকালে সে উচ্চ ও শক্ত স্তম্ভসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত কংক্রিটের তৈরী 'আকাশ' দেখতে পায়। এসব দেখে শিশুর বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, পৃথিবীটা বোধ হয় এ রকমই এবং এখানকার জীবন যাপনের রীতিপ্রথা এই রকমই চলতে থাকবে। শিশু একদিন বড় হলো ও যুবকে পরিণত হলো। একদিন তাকে ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করার সুযোগ দেয়া হলো এবং সে যথার্থই ভ্রমণ করলো। এবার তার কি অবস্থা হতে পারে আপনি নিজেই ভাবুন। দাঁড়িয়ে সে আকাশের বিস্ময়কর দৃশ্য প্রথমবারের মত অবলোকন করলো। সেই আকাশ আর তার ভূগর্ভস্থ শহরে যে আকাশ দেখেছে, তার মধ্যে তুলনা করে দেখলো। যে আকাশ সে ইতিপূর্বে দেখেছে, তাতো স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিকে তা এক সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ করে ফেলে। আর এখানে যে আকাশ বিরাজমান তা অভিনব ও অপূর্ব। দৃষ্টি এখানে অনেক উর্ধে ও চারদিকের সুপ্রশস্ত পরিসরে পরিব্যপ্ত হয়। এ আকাশকে তার স্রষ্টা স্তম্ভ ছাড়াই উর্ধে তুলে রেখেছেন। এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে তার মনে যে ভাবান্তর হয়, তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সূর্যের দিকে অপার বিস্ময়ে তাকায় সে যুবক। তাকে দেখতে পায়, অতি উজ্জ্বল এক আলোক পিণ্ড রূপে—যা সমগ্র বিশ্ব চরাচরকেও আলোয় উদ্ভাসিত করে। দেখেই সে বুঝতে পারে, এই অত্যাশ্চার্য প্রদীপ আর তার ভূগর্ভস্থ শহরের বাতিগুলোতে কি বিস্তর ব্যবধান। সে উপলব্ধি করে যে, ঐ শহরের সবগুলো বাতিকে যদি একটি আলোক পিণ্ডে সমাবিষ্ট করা হয় এবং সেই সকল বাতির শক্তি একক শক্তিতে পরিণত হয়। তাহলেও সূর্যের

www.pathagar.com

সামনে তা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য ও নিষ্প্রভ হয়ে থাকবে। সে একথাও অনুধাবন করবে যে, তার শহরের বাতিগুলোর মত এ বাতিটা কোন খুঁটির ওপর দাঁড়ানো বা ঝুলন্ত নয়। আর যখন দেখে যে, পৃথিবীর ওপরে জ্বলন্ত এ প্রদীপটি তার বিস্তীর্ণ মহাশূন্য পরিমন্ডলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিভ্রমণশীল, তখন তো তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কিভাবে তা চলে ও ঘোরে, কোন্ শক্তির বলে তা সঞ্চালিত হয়, আর এমন তীব্র আলো সে কোথা থেকে পায়, কে তার এসব কিছুর ব্যবস্থাপনা করে—এসব ভেবে সে কূলকিনারা খুঁজে পায় না। এ যুবকের ব্যাপারে আর একটু ভাবুন। রাত হলো। সমগ্র পরিবেশ পাল্টে গেল। মুক্তোর মত ঝিকমিক করা তারকারাজি আকাশে দৃষ্টিগোচর হলো। আকাশের দশ দিগন্তে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করলো। এ এমন এক দৃশ্য, যা তার মনকে একবারেই দিশেহারা করে দিতে সক্ষম। বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিতে সমর্থ। ক্ষণেকের জন্য হয়তো তার শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে যেতে পারে বিস্ময়ের আতিশয্যে। মধ্যরাতের দৃশ্য আরো মনোহর হয়ে দেখা দেবে তার কাছে। তখন হয়তো অর্ধ গোলাকার আর একটি আলোক পিন্ড আকাশে উঁকি দিয়েছে। আর তাতে যেটুকু অন্ধকার মহাশূন্যে বিরাজ করছিল তাও দূর হয়ে গেছে। নিথর, নিস্তব্ধ পৃথিবীর বুক তার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কোন্ নিপুণ ব্যবস্থাপকের হাতের ছোঁয়ায় এ অপরূপ সৌন্দর্যের মেলা বসতে পারলো ? এ বিস্ময়ের রাজ্যে এগুলো কিসের নিদর্শন ও কিসের চিহ্ন ? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আপনি যদি এই নবাগত যুবকটির সাথে একটি রাত ও একটি দিন কাটান, তার বাহ্যিক ভাবান্তরগুলো লক্ষ্য করেন এবং তার অন্তরের ভাবনাগুলো ধরতে চেষ্টা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, কিভাবে আল্লাহর নিদর্শনগুলো পর্যবেক্ষণ করা আমাদের জন্য জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। আমি নিশ্চিত যে, এমতাবস্থায় আপনি অটল সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, এসব মনোরম দৃশ্য থেকে যে উপদেশ পাওয়া যায়, তা যাদের মনকে আলোড়িত ও আন্দোলিত করে না তাদের মন আসলে নির্জীব ও স্থবির হয়ে গেছে।

চিকিৎসা

এখন আমাদের দেখতে হবে যে, এ ব্যাধির চিকিৎসার কোন পথ আছে কিনা। মানুষের আত্মাকে উজ্জীবিত ও উন্নত করার কোন উপায় আছে কিনা। এই গাঢ় পর্দা দূর করে দিয়ে মানুষের মনকে প্রস্ফুটিত ও কলংকমুক্ত করার কোন অবকাশ আছে কিনা। মনের ভেতরে অনুপ্রবেশকারী প্রত্যেক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার দেয়ালের মধ্য দিয়ে এমন কোন গবাক্ষ তৈরী করা যায় কিনা, যার সাহায্যে সে আল্লাহকে ও তার সর্বোচ্চ দরবারকে দেখতে সক্ষম হয়। আরো পরিষ্কার ভাষায় বললে বলতে হয় যে, মনুষ্যত্বকে অক্ষম শিশুর স্তর থেকে

www.pathagar.com

উন্নত করে শক্তিমান, পরিপক্ক ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়া যায় কিনা, সেটাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে। হাঁ, এর পথ খুবই সহজ এবং উন্মুক্ত। সে পথটা খুঁজে বের করার কষ্টটুকু আমরা স্বীকার করতে চাই না। একটু চিন্তা-ভাবনা করার সামান্যতম পরিশ্রমও করতে চাই না। নিরাময়কারী অমৃতের পেয়ালা আমাদের মুখের কাছেই অবস্থিত, মজার সাথে একটা চুমুক দেব—এই যা বাকী। আমাদের চোখের সামনে যেসব জিনিস বিরাজমান, তার দিকে একটু দীর্ঘ সময় তাকিয়ে পরপর দু'টা নজর বুলাতে হবে। একটা নজর হবে চর্মচক্ষুর। এই নজরে আমরা জিনিসটার বাহ্যিক খোলসটাই শুধু দেখতে পাবো। দ্বিতীয় নজর হবে অন্তর চক্ষুর। এই চক্ষু দিয়ে কোন জিনিসকে দেখার অর্থ হলো, ঐ জিনিসটা যে আসলে একজন কর্তার কর্ম, তা উপলব্ধি করা। এ রকম নজর বুলানোর পরপরই মনে প্রশ্ন জাগবে যে, কে এর অস্তিত্ব দিল, কে এর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ? এ জিজ্ঞাসা যখন আমাদেরকে মহান স্রষ্টা আল্লাহ পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছাবে, তখনই এই নজর পূর্ণ হবে। একই দৃষ্টিতে এই দুই দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া চাই। এজন্য খুব বেশী কষ্ট করতে হবে না। প্রথম দৃষ্টির সময় উদাসীন অন্তর চক্ষুকে সতর্ক ও জাগ্রত করতে হবে, ভেতরের সুপ্ত সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই সতর্ক করা ও জাগিয়ে তোলার কাজ যখন সম্পন্ন হবে, যখন এভাবে বাহির থেকে ভেতরে এবং ভেতর থেকে বাহিরে গমনাগমন সম্পন্ন হবে, তখনই বুঝতে হবে যে, মন ঐ জিনিসটির সঠিক পরিচয় লাভ করেছে এবং মনের প্রবাহ আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এটাই প্রকৃত জীবন এবং এটাই উন্নতি ও উৎকর্ষের সর্বোচ্চ ও পূর্ণতম স্তর। এ চিকিৎসাটা যে কত সহজ, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। এটাই সর্বাত্মক, সবচেয়ে ফলপ্রসূ এবং সহজ চিকিৎসা।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন যে, মানুষকে কিভাবে ব্যাধিগ্রস্ত, শিশুসুলভ সরল ও অপরিপক্ক বলে অভিযুক্ত করা যায় ? অথচ এই মানুষই তো নিত্য নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প কারিগরি ও আবিষ্কার উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে বিশ্বজগতকে অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে সে তো অতীতের সকল বংশধর ও সকল যুগের চেয়ে অগ্রগামী।

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য আমরা একটা সর্ববাদী সম্মত সূত্রের সাহায্য নেব। সকল মানুষই একথা বলে থাকে যে, জ্ঞান একটা জ্যোতি স্বরূপ। এই জ্যোতির স্বার্থকতা এই যে, যার কাছে এই জ্যোতি আছে সে চোখে দেখা জিনিসের প্রকৃত অন্তর্নিহিত স্বরূপও দেখতে পাবে। তাই নয় কি ? আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর কোন গুপ্ত রহস্য উদঘাটন কিংবা কোন অলৌকিক কাণ্ড

www.pathagar.com

ঘটানোর গুরুভার অর্পণ করছি না। আমরা তাকে শুধু এতটুকু দায়িত্ব দেবো যে, সে জ্ঞানহরণকারীকে এমন জ্যোতি সরবরাহ করবে যা তার ওপরের আকাশ ও নীচের পৃথিবীর আসল স্বরূপ উন্মোচন করতে পারবে। আর এই আকাশ ও পৃথিবীর এমনকি এর মধ্যে বিরাজিত প্রতিটি জিনিসেরই আসল স্বরূপ বা পরিচয় হলো এই যে, তা "একজন স্রষ্টার সৃষ্টি এবং একজন কারিগরের কারিগরি।" কিন্তু মানুষ সাধারণত কোন জিনিসকেই এভাবে দেখতে অভ্যস্ত নয়। একটি অবলা ও অবোধ প্রাণী কোন জিনিসকে যে রকম দেখে, মানুষের দেখা তা থেকে বেশী বা উন্নত কিছু নয়।

জ্ঞান নিসন্দেহে আলো। তবে তা চর্মচক্ষুর জন্য নয়—অন্তর চক্ষুর জন্য। এই আলো যখন কারো অন্তর চক্ষুকে উদ্ভাসিত করে, তখন তা চর্মচক্ষুতে যা দেখা যায় তাও দেখতে পায় এবং তার উর্ধেও দেখতে পায়। এখন আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। আধুনিক পণ্ডিতদের জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি সঠিক জ্ঞান-বিজ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে তার কতটুকু সুফল পাওয়া গেছে? তাদের অন্তর চক্ষু যখন স্বতসিদ্ধ সত্যগুলোও দেখতে পায় না এবং একটা কর্মের পেছনে যে একজন কর্তা রয়েছেন তা দেখতে পায় না, তখন সে জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে আলোর পরশ আছে, তা কিভাবে বলা যায়? আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্তই যে, তা মানুষের মস্তিষ্ককে শুধুমাত্র দেহের সেবা করার উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখিয়েছে। খাদ্য তৈরী, সম্পদের আয়-ব্যয়, ব্যবসা প্রশাসন এবং যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কলাকৌশল শিখিয়েছে। সবল যাতে তার চেয়ে কম শক্তিমান ও কম সম্পদশালীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, সে জন্য যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কলাকৌশল শিখিয়েছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে আরো শিখিয়েছে রাজনীতির ধুরন্ধরতা ও কূটকৌশল, যা কেবল স্বার্থোদ্ধার ও আপন সুবিধা আদায়ের কুটীল ও চাতুর্যপূর্ণ পথ বাতলে দেয়। শিখিয়েছে প্রকৌশল ও কারিগরি বিদ্যা—যা সেচের জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করে, রাস্তাঘাট সংস্কার করে, ভবনাদি নির্মাণ করে এবং যন্ত্র সঞ্চালন ও নির্ভুল লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য নিক্ষেপের বিধি উদ্ভাবন করে। আরো শিখিয়েছে চিকিৎসা বিদ্যা। এদ্বারা দেহের চিকিৎসা, রোগ জীবানু প্রতিরোধ এবং সম্ভাব্য সকল সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা দেহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপায় নির্ণয় করা হয়েছে। এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ দ্রুততম সময়ে কার্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের দেহের ওপর থেকে কষ্টকর পরিশ্রম লাঘব এবং তাকে বিলাসিতার উপকরণ সরবরাহ করে আয়েশী জীবনযাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। তা ছাড়া রেডিও, টেলিভিশন ও রকমারি আবিষ্কারের ব্যবস্থা করেছে। বিজ্ঞান এতসব উপকরণ মানুষকে সরবরাহ করেও তাকে নিছক বিলাস ব্যসন, উদরের চাহিদা ও দেহের

www.pathagar.com

পূর্ণতা সাধনের আকাংখার গোলাম বানিয়ে দেয়ার চেয়ে বেশী কিছু করতে পারেনি। আর এসব উপকরণ সেই ঐশী জ্যোতির কোন বাহন হয়ে আসেনি। কেননা মানুষ এসবের ভেতরে এমন কিছু দেখতে পায় না যাতে এগুলোকে মহান স্রষ্টা আল্লাহর নিদর্শন মনে করতে পারে। আল্লাহ্ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তা এই বিজ্ঞানের মান ও মর্যাদাকে সীমিত করে দেয়। আসলে মানুষের রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবশ্যকতা তো শুধুমাত্র নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণ কিংবা জরুরী কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই। সে জরুরী কর্তব্য হলো রকমারি ফসল, ভবন, শিল্প কারখানা ও জনহিতকর যন্ত্রপাতি দ্বারা পৃথিবীকে সুসজ্জিত ও সুগঠিত করা। এটা এমন একটা কর্তব্য—যার নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখিত হয়েছে। একমাত্র যে বিষয়টি এ ক্ষেত্রে আপত্তিকর, তাহলো মানব রচিত এই সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মানুষের উচ্চতর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আলো ও প্রাণশক্তির উৎস বলে মনে করা। বস্তুত এ ধারণা ভুল। অধিকাংশ মানুষ এ ভুলের মধ্যেই নিপতিত। যে জ্ঞান নিছক জৈব ও দৈহিক প্রয়োজন পূরণের কাজে নিয়োজিত, তার পক্ষে এমন কোন ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়, যা তার ক্ষমতা ও দায়িত্বের বহির্ভূত, এমন কিছু দেয়া সম্ভব নয়, যা তার প্রকৃতির বহির্ভূত। যে জ্ঞান কোন জিনিসের শুধুমাত্র বস্তুগত দিককেই প্রত্যক্ষ করে, আর তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ ও তত্ত্বানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সে শুধু জৈবিক কল্যাণ সাধনকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য রূপে নির্ধারণ করে এবং তার আধ্যাত্মিক সত্তা যে কোন রকমের উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে না, সে জ্ঞানে আলো আসবে কোত্থেকে ? এ ধরনের জ্ঞান দ্বারা যখন মানুষ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করবে, তখন তার সে উন্নতি শুধু পার্থিব খোলস ও জৈবিক দিক পর্যন্তই সীমিত থাকবে এবং ঐ পর্যায়েই তাকে স্বীকৃতি দেয়া যাবে। যে শিক্ষা ও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বকে উজ্জীবিত করা সম্ভব, তার ক্ষেত্রে এ জ্ঞানের কোনই অবদান থাকতে পারে না।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপর্যয়

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তার যাবতীয় উপাদান মানুষের আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে কোন ভূমিকা রাখতে সম্পূর্ণ অপারগ। মানুষকে বাদবাকী সৃষ্টি জগতের সাথে সংযুক্ত ও সম্মিলিত করে দিতে অক্ষম। অন্য কথায়, সে তার অন্তরে সেই আলো প্রজ্জলিত করতে অসমর্থ—যার সাহায্যে সে জগত ও জীবনের আসল রূপ দর্শন ও প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে পারে। বিবেককে জাগিয়ে তোলা ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিকে উন্নতি ও উৎকর্ষ দানের সকল উপায়-উপকরণ থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা শূন্য ও নিঃস্ব। কেননা সেতো মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে স্বীকারই করে না। তার যে মহানুভবতা এবং সৎ বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে, সৃষ্টিকে

www.pathagar.com

স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল হিসেবে দেখবার যে ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টি তার রয়েছে, তাকেও সে স্বীকৃতি দেয় না, বরং মানুষকে সে একটা বিবেকহীন পশু ও অচেতন যন্ত্রের মত মনে করে। সুতরাং মানুষ যতক্ষণ এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকবে যে, ভালো মন্দের বিবেচনা শক্তি মানুষের উদরে থাকে না বরং তার মন-মগজে থাকে এবং জ্ঞানের আলো চর্মচক্ষুতে নয় বরং অন্তর চক্ষুতে দীপ্তিমান থাকে, ততক্ষণ সে কেমন করে পরিপক্কতা ও বিবেচনা শক্তির অধিকারী হবে এবং কেমন করেই বা ঐশী জ্যোতি তথা নির্ভুল জ্ঞান লাভ করবে ? আমি আগেই বলেছি যে, মানুষের যথার্থ উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে তার ভাসা ভাসা উদাস দৃষ্টিকে তত্ত্বানুসন্ধানী দৃষ্টিতে পরিণত করার ওপর। কারণ একমাত্র এই প্রক্রিয়াই মানুষের চর্মচক্ষু ও অন্তর চক্ষুকে দৃশ্যমান নিদর্শনের মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব অবলোকনের জন্য উন্মোলিত করে দেয় এবং সেইসব নিদর্শনে আল্লাহর যে প্রজ্ঞা ও নিগূঢ় তত্ত্ব লুক্কায়িত রয়েছে, তা দ্বারা উপকৃত ও প্রভাবিত হওয়ার ক্ষমতা তাকে দান করে। একথা আমরা এ জন্যই বলেছি যে, এটাই হলো মানুষের আভ্যন্তরীণ তথা আধ্যাত্মিক সত্তাকে পরিপুষ্ট করার একমাত্র সহজ পন্থা। অন্য কথায়, এটাই হলো সেই অটুট স্নায়ুতন্ত্রী যা মানব সত্তাকে তার পবিত্র ও আল্লাহমুখী জীবনের উৎসসমূহের সাথে সংযুক্ত করে দেয়। কিন্তু আজকের প্রচলিত মানব সভ্যতার এমন কোন বাস্তব কর্মপন্থা বা নিষ্ঠাপূর্ণ আগ্রহ ও উদ্যোগ নেই যা মানুষকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে। সভ্যতার এই ঘাটতির দরুন ঐ স্নায়ুতন্ত্রীটি দুর্বল ও ক্ষীণকায় হতে হতে ছিন্ন হয়ে গেছে। ফলে এই সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান সৃষ্টি —মানুষ—প্রাণশক্তি হারিয়ে সৃষ্টিকূলে কোণঠাসা এবং জীবনের আলো ও আত্মার খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। এ সৃষ্টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পুণ্যবান সাহাবাদের আলোকোজ্জল যুগটিতে যেমন সুখ সমৃদ্ধির মুখ দেখেছিল, তার সমগ্র ইতিহাসে তেমন সুখ শান্তি আর কখনো দেখেনি। কিন্তু সে যুগের সেই সুখকে সে যথাযথ সমাদরের দ্বারা ধরে রাখতে পারেনি। তাই সেই পুণ্যবানদের পরে এমন উত্তরাধিকারীরা এলো যারা নামাযের ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করলো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। এর ফলে তাদের ওপর এলো বিপর্যয়। এ বিপর্যয়ের দরুন তারা পুনরায় অপরিপক্ক শিশুর স্তরে নেমে গেল। আজকের এ সভ্যতা—যাকে তার ধারক বাহকরা অন্যায়ভাবে 'বৈজ্ঞানিক ও আলোকময় সভ্যতা' নামে অভিহিত করে থাকেন—তার সম্পর্কে ধারণা করা গিয়েছিল যে, তা মানুষের ভেতরে সত্যপ্রীতি ও ন্যায়বোধের যে উৎস রয়েছে, যে মৌলিক প্রতিভা ও জন্মগত মেধার ভাণ্ডার রয়েছে, তার দিকে মনোযোগ দেবে এবং তা থেকে সর্বোত্তম ফায়দা হাসিল করবে। কিন্তু এ সভ্যতা তার সকল জ্ঞানের বাহাদুরি সত্ত্বেও বিপথগামী হয়ে গেছে। ফলে তা

www.pathagar.com

মানুষের পাশবিক সত্তাকেই শুধু মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে, যা নিছক মাটির তৈরী মাটিতেই প্রত্যাবর্তিত এবং মাটি দ্বারাই পরিপুষ্ট।

একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ

মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবানকারী কোন ব্যক্তি বাস্তব যথার্থ আহবানকারী হতেই পারবেন না—যদি তিনি চারপাশের বিদ্যমান আল্লাহর নিদর্শনাবলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম না হন। কেননা এসব নিদর্শন সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর সাক্ষ্য ও বর্ণনা দেয়। ইতিপূর্বের আলোচনায় আমি এমন কয়েকটি কার্যকর পন্থার উল্লেখ করেছি, আল্লাহর দিকে আহবানের ব্যাপারে যা অত্যন্ত উপযোগী এবং বাস্তববাদী যৌক্তিকতা যার দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট। আমার মতে, ঐ সমস্ত পন্থার মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন ও নিয়ামতসমূহের নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সবচেয়ে কাছাকাছি এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার সবচেয়ে সহজ উপায়।

কাজেই অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে, আমাদের চোখের সামনে বিরাজমান এই জগত আল্লাহর এক উন্মুক্ত গ্রন্থ। আর এই জগত যে অসংখ্য বিচিত্র সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ রয়েছে, সেগুলোকে বলা যায়, ঐ গ্রন্থের জীবন্ত ছত্র। এসব ছত্রেছত্রে আমরা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, অপার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কুশলতা, দয়া ও মহানুভবতা, মমত্ব ও ভালোবাসা, অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণই পড়ি। তাই যখনই আমাদের চোখ, কান, হাত ইত্যাদি কোন জিনিসের ওপর পড়বে, তখনই বুঝতে হবে যে, আসলে তা আল্লাহর নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান ও শিক্ষার এক বিরাট ভাণ্ডারের ওপর পড়েছে।

আল্লাহর সবচেয়ে মহৎ কীর্তি এই যে, তিনি এই গ্রন্থ পড়া বিদ্বান ও মূর্খ নির্বিশেষে সকলের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। এগুলোকে তাকিয়ে দেখা, শোনা বা স্পর্শ করা এবং তার পর ঐ জিনিসের সাথে তার স্রষ্টার কি সম্পর্ক, সেই আলোকে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাই যথেষ্ট। অর্থাৎ তাকে আল্লাহর সৃষ্টি ধরে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এ রকম চিন্তা-ভাবনা দ্বারা এমন বহু শিক্ষা অর্জিত হয় ও নিদর্শন উদঘাটিত হয়, যা আল্লাহর গুণাবলীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। অতপর তা মানুষের মনে কোমল ও নরম অনুভূতি এবং অত্যন্ত উঁচু মানের প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করে। এর ফলে মনে হয় যেন একজন উঁচু দরের পণ্ডিতের আত্মা তার ভেতরে অনুপ্রবেশ করেছে। এই স্তরে যখন সে পৌঁছে তখন তার ও আল্লাহর মধ্যে সম্মিলন ঘটে এবং আধ্যাত্মিক প্রাণরসে উজ্জ্বল আল্লাহর ঘনিষ্টতম দরবারের পথ তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। এরপর অন্তরাত্মা কম্পিত ও অনুরক্ত হয়, চক্ষু অশ্রু বিগলিত

www.pathagar.com

হয় এবং সমগ্র সত্তা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। এরূপ মুহূর্তে মানুষ আল্লাহর জ্যোতির একটা পিণ্ডে পরিণত হয়। তার মন বুদ্ধিবৃত্তি, গোস্ত ও হাড় —সবই জ্যোর্তিময় হয়ে যায়। তার আগে পিছে, উপরে নীচে সর্বত্র শুধু আলো আর আলো জ্বল জ্বল করে। মানুষ যখন অনুভব করবে যে, তার মন আলোড়িত ও স্পন্দিত, তার দেহ শিহরিত ও অশ্রু বিগলিত, তখন তার জানা উচিত যে, সে জগতরূপী এই গ্রন্থের অন্তত একটা লাইন বুঝতে পেরেছে। কেননা চিন্তা-ভাবনার অনিবার্য ফল হিসেবে সে স্রষ্টার গুণাবলীর কিছু না কিছু লক্ষণ ও নিদর্শন আয়ত্ব করতে অবশ্যই পারবে। আর নিদর্শনেই রয়েছে শিক্ষা। আর এ শিক্ষা হলো মনের অভ্যন্তরে উদ্ভাসিত এক তিক্ষ্ণ আলোক রশ্মি। এ আলোক রশ্মিই তাকে আলতোভাবে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেয়। এভাবে যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এবং পরম আশা, ভালোবাসা ও অনুরাগ নিয়ে তাঁর সামনে সমগ্র আবেগ অনুভূতি সহকারে সিজদায় পড়বে, তখন সে জানা ও বুঝার এমন স্তরে উপনীত হবে, যে স্তরে পরিপক্ক জ্ঞানীরা ছাড়া কেউ পৌছতে পারে না—তা সে যতই নিরক্ষর হোক এবং স্কুল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের শরণাপন্ন না হোক।

রোগ ও ওষুধ

তাই বলি, প্রিয় দ্বীনি ভাই ! এই মহান লক্ষ্যকে নিজের আকাঙ্খার কেন্দ্রবিন্দু বানান। জেনে রাখুন, পবিত্র কুরআনেই প্রত্যেক আহ্বানকারীর রোগের যথার্থ ওষুধ, চিকিৎসার প্রণালী এবং উপায়-উপকরণ সে বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছে। আর তার আগে সে রোগের ব্যাখ্যা দিয়েছে।

১-রোগ হলো মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্তা তথা আত্মা বা রূহের নির্জীবতা ও বিকৃতি, তার স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া—যার দরুন সে কোন কিছু দেখতে শুনতে ও বুঝতে পারে না। এতে করে সে মৃতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যদিও আদমশুমারীতে অন্যায়ভাবে তাকে জীবিতদের মধ্যে শামিল করা হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ○ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

"(হে রসূল !) আপনি মৃত ও বধিরদেরকে ডাক শোনাতে পারবেন না —যখন তারা পেছনে ফিরে পালাতে থাকবে। আপনি অন্ধদেরকে গোমরাহী থেকে সোজা পথে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। যারা আমার

www.pathagar.com

আয়াতগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আনুগত্যশীল, কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবেন। আর তারাই মুসলমান।"

–(সূরা আন নাম্‌ল ঃ ৮০-৮১)

বস্তুত হেদায়াতপ্রাপ্তি নির্ভর করে মানুষের আত্মার বিশুদ্ধতা ও তার অনুভূতির সুষ্ঠুতার ওপর। দৈহিক ইন্দ্রিয়সমূহের ওপর তেমন কিছু নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝

"বস্তুত চর্মচক্ষু অন্ধ হয় না—অন্ধ হয় বুকের মধ্যে অবস্থিত মন।"

—(সূরা আল হাজ্জ ৪৬)

এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেকের দু'টি করে চোখ রয়েছে। একটি হলো বাহ্যিক চোখ। অর্থাৎ তার চর্মচক্ষু। আর একটি হলো আভ্যন্তরীণ চোখ। এটা হলো তার মন তথা আত্মার চোখ। বাহ্যিক চোখ কোন জিনিসের শুধুমাত্র বাহিরের আকৃতিটাই দেখতে পায়। অথচ বাহিরের আকৃতি একটা নগণ্য জিনিস—যার কোন দাম নেই এবং যার সম্পর্ক শুধু রং, আয়তন, আকৃতি ও বস্তু ইত্যাদির সাথে। আর আভ্যন্তরীণ বা অন্তর চক্ষু জিনিসের আসল রূপ বা পরিচয় দেখে ও উপলব্ধি করে। আর প্রত্যেক জিনিসের আসল রূপ এই যে, তা আল্লাহর সৃষ্টি। ঐ জিনিস পর্যবেক্ষণ থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যে, তার সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পেছনে আল্লাহর হাত সক্রিয় রয়েছে। এ শিক্ষা গ্রহণ করলে আল্লাহর সে হাত নজরে পড়বে। জিনিসটির স্বচ্ছতা ভেদ করে আল্লাহর হাত চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। আল্লাহকে এভাবে দেখতে পাওয়ার মানেই হলো সবকিছু পেয়ে যাওয়া, জীবন, জ্ঞান, আলো, সম্পদ ও ঐশ্বর্য—সবকিছুই পাওয়া। যে ব্যক্তি এসব লাভ করবে, দুনিয়ার জীবনে অন্য যতকিছু থেকেই সে বঞ্চিত হোক—তাতে তার কিছু আসে যায় না। আর এটা যে লাভ করে না, তার বাহ্যিক চোখ ও কান যত শক্তিমানই হোক, তাতে তার কোনই লাভ হবে না। বস্তুত কোন আকৃতি দেখা বা কোন শব্দ শোনাই বড় কথা নয়। কেননা এ ধরনের দেখা ও শোনা চতুষ্পদ প্রাণীও দেখে ও শুনে থাকে। সূরা বাকারার আয়াতে একথাই বলা হয়েছে ঃ

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

"এসব লোক—যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা এরূপ ঃ রাখাল জন্তুগুলোকে ডাকে। কিন্তু তারা ডাকের

www.pathagar.com

আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পায় না। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। তাই তারা কথা বুঝতে পারে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭১)

ইমাম ইবনে কাছীর এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ অর্থাৎ অন্ধত্ব, গোমরাহী ও অজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা চারণশীল জন্তুর মত। সে জন্তু কথা বোঝে না—কেবল রাখালের চিৎকারের আওয়াজ শোনে মাত্র।" ইমাম জামাখশারী বলেন ঃ তাদেরকে যে ব্যক্তি ঈমানের আহবান জানায় তার আহবানের শুধু সুরেলা আওয়াজটাই তারা শোনে—তার কথার মর্ম তারা উপলব্ধি করে না এবং সেদিকে মনও দেয় না। এটা জন্তুকে চিৎকার করে আহবানকারী সেই রাখালের মত অবস্থা—যার কেবল চিৎকারটাই তারা শোনে। অন্য কিছু তারা বোঝে না যেমন বিবেকবান লোকেরা বোঝে।" সুতরাং আসল রোগটা হলো বধিরতা। মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্তা এই রোগে আক্রান্ত হয়। আসল রোগ তার অন্ধত্ব এবং বাকশক্তিহীনতাও। এ রোগ তাকে অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখে এমনভাবে যে, তার নড়াচড়াও করার সুযোগ থাকে না। একথাই নিম্নের আয়াতে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

"যারা আল্লাহর আনুগত্যকে অগ্রাহ্য করেছে তারা বধির ও বোবা হয়ে অন্ধকারে ডুবে আছে। আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন, আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।"

—(সূরা আল আনআম ঃ ৩৯)

২-এই রোগের বাহ্যিক লক্ষণ—যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—তা হচ্ছে, ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত জিনিস সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া, শুধুমাত্র চলমান দৃষ্টি দিয়েই এবং শ্রবণ করেই ক্ষ্যান্ত থাকা। এর ফলে মানুষ যা কিছুই দেখে, তা কার্যত না দেখার মতই হয়ে দাঁড়ায়। অপূর্ব ও বিস্ময়কর সব নিদর্শন দেখেও সে বিন্দুমাত্র আলোড়িত ও স্পন্দিত হয় না। কেননা সে সেই চোখ দিয়ে দেখেই না যা তাকে আলোড়িত ও জাগ্রত করতে পারে। সেই শায়িত ব্যক্তির মতই সে সময় অতিবাহিত করে যে, চোখ মেলেছে, কিন্তু চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু। তার সামনে দিয়ে কে যায় কে আসে তা সে দেখেও দেখে না। জনৈক আরব কবি এ অবস্থার চিত্র একেছেন এভাবে ঃ

يا ناظرا يرنو بعيني راقد

ومشاهد الأمر غير مشاهد

www.pathagar.com

ঘুমন্ত চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকা হে দর্শক,
যে বিরাজমান অবস্থাকে দেখেও দেখ না।

আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াত দু'টিতেও এ দিকেই ইংগীত করেছেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ○

"আকাশকে আমি একটি সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি। অথচ তারা আকাশের এ নিদর্শন থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।"—(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩২)

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

"আকাশ ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে তারা এগুলোর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে অথচ চোখ ফিরিয়ে নেয়।"—(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৫)

৩-এই অন্ধত্ব তথা নির্জীবতার কার্যকর চিকিৎসা কি, কুরআন তাও বলে দিয়েছে। তাহলো, আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজমান নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা করা—আমাদের সত্তায় বিরাজমান সব নিদর্শন এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ—যা আল্লাহ আমাদেরকে উদার হস্তে দান করেছেন তা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহ বলেন ঃ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ○ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ○

"বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে। রয়েছে তোমাদের নিজ নিজ সত্তায়ও। তোমরা কি দেখছ না। আর আকাশেই তোমাদের রিজিক এবং প্রতিশ্রুত প্রতিদান রয়েছে।"—(সূরা আজ জারিয়াত ঃ ২০-২২)

বস্তুত এই চিন্তা-ভাবনা দ্বারাই বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত জিনিসসমূহের প্রতিকৃতি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়সমূহে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। এর দ্বারাই মানুষ বুঝতে, তুলনা করতে ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়। আর এটাই হলো মন বা আত্মার সজিবতা এবং তার শোনা ও দেখার তাৎপর্য। চিন্তা-ভাবনা না করা হলে এর কোনটাই সম্ভব হয় না। কেননা চর্মচক্ষুতে দর্শন সংক্রান্ত স্নায়ুতন্ত্রী যে কাজ করে, চিন্তা-ভাবনা এখানে সেই কাজই সমাধা করে। চোখের ওপর বস্তুর ছবি পড়লেই দর্শনের কাজ সমাধা হয় না। বরং সেই ছবি দর্শনতন্ত্রীর সাহায্যে বোধশক্তির কেন্দ্রে অর্থাৎ মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক। এই দর্শনতন্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন কিংবা নষ্ট হয় তাহলে দর্শনের কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। কারণ মস্তিষ্ক তখন কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হয় না। চিন্তার ব্যাপারটাও তেমনি। চিন্তাও একটা দর্শনতন্ত্রী—যা আভ্যন্তরীণ বোধকেন্দ্রে অর্থাৎ মনের

www.pathagar.com

মধ্যে সঞ্চালিত করে চর্মচক্ষুতে দেখা জিনিসের আকৃতি। এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই মনের পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়। আর সেই সাথে সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে অর্জিত শিক্ষার প্রেরণা। কিন্তু চিন্তার প্রক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন মন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সেখানে আর এমন কোন ফাঁক থাকে না যার মধ্য দিয়ে বস্তুর প্রকৃতস্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। তাই মানুষ তখন নির্বোধ চতুষ্পদ জন্তুর মত শুধুমাত্র চর্মচক্ষুর দ্বারা জিনিসের বাহ্যিক ছবি দেখেই ক্ষ্যান্ত থাকে।

চিকিৎসার পদ্ধতি

কুরআন যখন বলে যে, আসমানে, জমীনে এবং মানুষের নিজ সত্তায় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, তখন শুধু ইংগীত দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকে না, বরং কি কি নিদর্শন রয়েছে তারও উল্লেখ করে। সে নিদর্শনকে তার নাম, গুণাগুণ কিংবা তার ভূমিকা উল্লেখের মাধ্যমেও তুলে ধরে। শেষ পর্যন্ত কথা কান ও মনমগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং চিকিৎসার পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। এই সমস্ত খোদায়ী নিদর্শন বর্ণনাকারী কুরআনের যাবতীয় আয়াত উদ্বৃত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে শুধু একটি আয়াত উদ্বৃত করবো এবং পাঠকের ওপর আস্থা রাখবো যে, কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করে বাদবাকী সকল আয়াত নিজেই জেনে নিতে পারবেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ○ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

"তোমাদের ইলাহ্ শুধুমাত্র একজন। দয়াময় ও দানশীল সেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। নিশ্চয়ই (১) আসমান ও (২) জমীনের সৃষ্টিতে (৩) দিন ও রাতের পালাক্রমে আবর্তনে (৪) মানুষের কল্যাণকর জিনিসপত্র নিয়ে সমুদ্রে পরিভ্রমণ রত নৌযানে (৫) আকাশ থেকে আল্লাহর বর্ষিত পানিতে (৬) সেই পানি দিয়ে তাঁর মৃত জমীনকে পুনরুজ্জীবনে (৭) অতপর পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী বিস্তারে এবং (৮) বাতাসকে ও আসমান জমীনের মাঝখানে বশীকৃত মেঘমালাকে সঞ্চালিত করার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৩-১৬৪)

www.pathagar.com

কুরআন যদি শুধুমাত্র 'আসমান জীমনে অনেক নিদর্শন আছে' এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি বলেই চুপ থাকতো, তবে তাও যথেষ্ট হতো। কিন্তু সে সবিস্তারে ও উদাহরণ সহকারে প্রত্যেকটি নিদর্শনের বিবরণ ও বিশ্লেষণ দিয়েছে, যাতে করে এসবের মধ্যে যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে সে সম্পর্কে বাহ্য দৃষ্টি ও অন্তর দৃষ্টি উভয়ই সচেতন ও সজাগ হয়।

(১) আকাশের সৃষ্টির মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের বহু আয়াতে মহাশূন্যের এই সকল অপরূপ ও চমকপ্রদ সৃষ্টির বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো কুরআন পড়ে যে কোন পাঠক সহজেই উদ্ধার করতে পারেন। তাই আমরা এগুলোর বিবরণ দীর্ঘায়িত করছি না।

(২) শিক্ষাগ্রহণের জন্য যথেষ্ট বিস্তারিত বিবরণ সহকারে শুধুমাত্র পৃথিবীর উল্লেখ করেছে।

(৩) দিন ও রাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে।

(৪) নৌযানের কথাও বিশেষভাবে বর্ণনা করেছে। আর

(৫) বৃষ্টি (৬) ফসল (৭) জীবজন্তু ও (৮) মেঘ–এর প্রত্যেকটির কথা এমনভাবে আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করেছে যে, চিন্তাশীলের সামনে তা আল্লাহর অপার করুণা ও অনুগ্রহের নিদর্শনাবলী স্পষ্ট করে তুলে ধরে। সূরা রাদের প্রথম দিকে উল্লেখিত এর কয়েকটি উদাহরণ আমরা উল্লেখ করছি।

১-আল্লাহ তায়ালা আসমান সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝

"তিনিই সেই মহান আল্লাহ যিনি আসমানকে কোন খুঁটি ছাড়াই উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সে দৃশ্য তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। অতপর আল্লাহ তাঁর আরশের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করে দিয়েছেন। এরা উভয়েই নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরিভ্রমণরত। তিনি সকল বিষয়ের পরিচালনা করেন। তিনি নিদর্শনসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করতে পার।"–(সূরা আর রাদ ঃ ২)

২-আর পৃথিবী সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

"তিনিই সেই আল্লাহ যিনি পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করেছেন, তাতে পাহাড়-পর্বতের খুঁটি গেড়েছেন ও নদনদী প্রবাহিত করেছেন এবং সকল রকমের ফল থেকে দু'টি করে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন। এসব কিছুর মধ্যেই চিন্তাশীল গোষ্ঠীর জন্য নিদর্শনমালা রয়েছে।"-(সূরা আর রাদ ঃ ৩)

৩-উদ্ভিদ সম্পর্কে বলেন ঃ

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"পৃথিবীতে ভিন্ন ভূখণ্ড রয়েছে যা মূলত পরস্পর মিলিত। আঙ্গুরের বাগান আছে, ক্ষেতখামার আছে, খেজুরের গাছ আছে—যাদের কিছু একহারা এবং কিছু দ্বৈত। অথচ একই পানি সবাইকে সিক্ত করে। কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে আমি কিছু ফলকে উত্তম বানাই, আর কিছুকে বানাই অপেক্ষাকৃত কম সুস্বাদু। যাদের বুদ্ধি আছে তাদের জন্য এসবের মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।"-(সূরা আর রাদ ঃ ৪)

সূরা নাহলে বিপুল সংখ্যক নিদর্শন ও নেয়ামতের উল্লেখ করে আল্লাহ উপসংহারে বলেন ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর তাহলে গুণে শেষ করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ দয়াশীল ও ক্ষমাশীল।"-(সূরা আন নহল ঃ ১৮)

মানুষের নিজের সত্তা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলোর দিকে নজর দেয়ার পদ্ধতি শিখিয়েছেন এই বলে ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ○ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۙ○ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ط ○

www.pathagar.com

"মানুষ তাকিয়ে দেখুক, কি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবল বেগে স্খলিত পানি থেকে—যা পিঠ ও বুকের হাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।"-(সূরা আত তারেক ঃ ৫-৭)

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۙ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۙ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۙ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۙ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۙ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۙ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۙ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ؕ

"মানুষ তার খাদ্যের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুক যে, আমি ঢালাওভাবে পানি বর্ষণ করেছি, অতপর পৃথিবীকে আশ্চর্যমত দীর্ণ করেছি, অতপর তাতে শস্য, আঙ্গুর তরি-তরকারী, যয়তুন, খেজুর, নিবীড় বন, আর রকমারি ফল ও উদ্ভিদ খাদ্য উৎপন্ন করেছি তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য জীবিকার সামগ্রী হিসেবে।"-(সূরা আবাসা ঃ ২৪-৩২)

এরপর আমি পাঠককে একাকী ছেড়ে দিতে চাই। নিজে নিজে এসব নিয়ে চিন্তা করুন এবং নিজের চিন্তাশক্তি ও অনুধাবন শক্তিকে পরীক্ষা করুন।

গুণের দিকে নজর দেয়া চাই—পরিমাণের দিকে নয়

কুরআন যখন আমাদেরকে এসব সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দিতে বলে, তখন যেমন খুশী তেমনভাবে দৃষ্টি দেয়ার জন্য ছেড়ে দেয় না, উদাস ও স্থবির দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলে না। বরং যথার্থ ও নির্ভুল দৃষ্টি দেয়ার পন্থা বাতলে দেয়। এমন পন্থা বাতলে দেয়, যা আমাদের সাথে আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং দ্রুততম সময়ে গড়ে তোলে। সে আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন পরিমাণ নয়, গুণের দিকে নজর দেই। গুণই হলো সারবস্তু ও শিক্ষা আর পরিমাণ হলো আকার ও আয়তন। গুণ নির্ণয় করা যায় মন দিয়ে। আর পরিমাণ প্রত্যক্ষ করা যায় বাহ্যিক ইন্দ্রিয় দ্বারা। আল্লাহর এ উক্তিটি লক্ষ্য করুন ঃ

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۙ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

"তাদের মাথার ওপর যে আকাশ বিরাজমান, তার দিকে তাকিয়ে কি তারা দেখে না যে, কিভাবে আমি তাকে নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত

www.pathagar.com

করেছি। অথচ তাতে কোন ফাঁক ফোকল থাকতে পারেনি। আর পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করেছি, তাতে পাহাড়-পবর্ত সংস্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ রাজি উদগত করেছি যাতে তা প্রত্যেক অনুগত বান্দার জন্য স্মরণিকা ও চক্ষু উন্মোচনকারী হয়।”-(সূরা কাফ ঃ ৬-৮)

আল্লাহর এ উক্তিটিও লক্ষ্য করুন ঃ

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ

“তারা কি দেখে না যে, কিভাবে উট সৃষ্টি করা হয়েছে, কিভাবে আকাশকে উর্ধে স্থাপন করা হয়েছে, কিভাবে পাহাড়কে শক্তভাবে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কিভাবে ভূমণ্ডলকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক। তুমি তো উপদেশদাতা ছাড়া কিছু নও।”

-(সূরা আল গাশিয়া ঃ ১৭-২১)

শুধু এখানেই শেষ নয়, সৃষ্টির গুণগত দিক যে বহু রকমের হয়ে থাকে, কুরআন সে কথাও উল্লেখ করে, যাতে যে কয়টি দৃষ্টান্ত সে উল্লেখ করে তার ওপর ভিত্তি করে আরো অনেক দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ভাবন করতে পারি কিংবা তাকে মূল হিসেবে ধরে নিয়ে তা থেকে বিভিন্ন শাখা ও উপশাখা রচনা করে নিতে পারি। এ জন্যই কখনো কখনো সে আমাদের সামনে অনেক কাল্পনিক দৃষ্টান্তও পেশ করে এবং আমাদের মন-মগজে সেই কাল্পনিক দৃষ্টান্তের ভেতর অবাধে বিচরণ করার সুযোগ দেয়—যাতে করে তার মধ্য দিয়ে তার আসল শিক্ষাটা আয়ত্ব করে নিতে পারি। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ ○ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ ○

“(হে নবী!) আপনি বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ যদি তোমাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত রাতকে স্থায়ী করে চাপিয়ে রাখেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ মাবুদ আছেন যিনি তোমাদের কাছে

www.pathagar.com

দিনের আলো নিয়ে আসবেন ? একথা কি তোমরা শুনতে পাও না ? (হে নবী !) আপনি আরো বলুন ঃ আল্লাহ্ যদি তোমাদের ওপর দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে চাপিয়ে রাখেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ ইলাহ্ আছেন যিনি তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত নিয়ে আসবেন ? এটা কি তোমরা দেখতে পাও না ?”-(সূরা আল কাসাস ঃ ৭১-৭২)

কখনো কখনো সে আমাদের কাছে এমন প্রশ্নের অবতারণা করে যে, তা সমস্ত পর্দা ছিন্ন করে দেয় এবং আমাদেরকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের সামনে নিয়ে দাঁড় করায়। যেমন সূরা ওয়াকেয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝ ءَ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝ عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝ ءَ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ۝ ءَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ۝ ءَ اَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ۝

“তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ যে, এই যে তোমরা বির্যপাত কর, তা থেকে সন্তান উৎপাদন তোমরা কর, না আমি করি ? আর এই যে, তোমরা চাষ কর, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছ ? তা থেকে ফসল উৎপাদন তোমরা কর, না আমি করি ? আমি তো ইচ্ছা করলে ফসলকে ভূষি বানিয়ে দিতে পারি। তখন তোমরা স্তম্ভিত হয়ে অনুশোচনা করতে থাকবে। আর এই যে পানি তোমরা পান কর, তা নিয়ে কি বিচার-বিবেচনা করে দেখেছ ? এই পানি কি মেঘমালা থেকে তোমরা বর্ষণ কর, না আমি করি ? আমি ইচ্ছা করলে তো তাকে তীব্র লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারতাম। এমতাবস্থায় তোমরা কেন কৃতজ্ঞ হও না ? আর ভেবে দেখেছ কি যে, এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও—তার গাছ কি তোমরা বানিয়েছ না আমি বানিয়ে থাকি ?”-(সূরা আল ওয়াকেয়া ঃ ৫৮-৭২)

www.pathagar.com

চিকিৎসার ফল

শেষ কথা এই যে, যেসব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি দেখে চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত, তাদের অনুভূতিকে শুধু এই চিন্তা-ভাবনার স্তরে পৌঁছিয়েই তিনি ক্ষ্যান্ত হন না বরং শেষ ফলটি আহরণ করাবার জন্য তাকে নিয়ে আরো ঊর্ধে ধাবিত হন। এত ঊর্ধে ধাবিত হন যে, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির পেছনে যে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে এবং যে অনমনীয় নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও সূক্ষ্ম কুশলতা রয়েছে—যা কিনা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের কাছে স্পষ্টতই প্রতিভাত হয়—তার সম্পর্কে গভীর চিন্তায় তাকে অনুপ্রাণিত ও নিমগ্ন করে। এই স্তরে এসে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ নিছক ঠাট্টা ও পরিহাসচ্ছলে এই আসমান-জমীন ও তার ভেতরকার নিদর্শনসমূহকে সৃষ্টি করেননি বা অস্তিত্ব দান করেননি। এসব সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। এসব সৃষ্টি করেছেন পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে। এগুলোকে তিনি দৃঢ় সংকল্প ও নিপুণ কৌশলের সাথে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

"আসমান ও জমীনকে আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি সত্য ও ন্যায়ের নিরীখেই তা সৃষ্টি করেছি—তবে অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"
–(সূরা আদ দুখান ঃ ৩৮-৩৯)

অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ○

"আমি আসমান জমীন এবং তার মধ্যস্থ জিনিসগুলোকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি খেলাই করতে চাইতাম তবে তা আমি নিজ থেকেই করতে পারতাম—যদি তা আমি যথার্থই করতে ইচ্ছুক হতাম। আমি বরং সত্যকে দিয়ে বাতিলকে আঘাত করি, ফলে সত্য বাতিলকে খণ্ডন করে এবং শেষ পর্যন্ত বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বস্তুত তোমরা যা কিছু অসত্য বর্ণনা দিচ্ছ, তার কারণে তোমাদের ধ্বংসই অনিবার্য।"
–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৬-১৮)

www.pathagar.com

এ হলো চিন্তা-ভাবনার সর্বোচ্চ চূড়া ও সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরে উপনীত হয় শুধু আল্লাহর অনুগত বান্দারা। মানুষ যখন চিন্তা-ভাবনা করতে করতে তার অন্তরের অন্তস্থলে নেমে যায় এবং তার প্রকৃতির গভীরতম স্তরে প্রবেশ করে, তখনই এই উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ○

"তারা কি তাদের আপন সত্তা নিয়ে ভাবে না ? আল্লাহ তো আসমান জমীন ও তার মধ্যস্থ সকল জিনিসকে শুধু ন্যায়সঙ্গতভাবেই এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বেশকিছু সংখ্যক মানুষ তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করে না।"

–(সূরা আর রূম ঃ ৮)

যদিও এই পর্যন্ত শিক্ষা দেয়াই যথেষ্ট ছিল, তথাপি আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে তার নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময় বুদ্ধিমান লোকেরা যেসব কথা বলে থাকেন, তা উদ্বৃত করেছেন, যাতে আমরাও তার অনুসরণ করি এবং আমরাও ঐ শিক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি। কেননা এসব উক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের মনের কথাই প্রতিফলিত এবং আমাদের মনের ভাবই প্রস্ফুটিত হয়েছে বলে আমরা বুঝতে পারি। আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ○ لا لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ○ لا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ○

"আর যিনি সকল জোড়ভুক্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে যানবাহন বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তার পিঠে চড়তে পার, অতপর তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামতের কথা তার পিঠে চড়ার পর স্মরণ করতে পার এবং বলতে পার ঃ সেই মহান স্রষ্টার গুণকীর্তন করি যিনি আমাদের জন্য এই বাহনকে অনুগত করে দিয়েছেন নতুবা আমরা তো একে বশ করতে পারতাম না। বস্তুত আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যেতে হবে।"

–(সূরা আয যুখরুফ ঃ ১২-১৪)

www.pathagar.com

অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"নিশ্চয় আসমান ও জমীনের সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পালাক্রমে আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক শিক্ষা ও নিদর্শন রয়েছে—যারা শুইতে, বসতে ও দাঁড়াতে আল্লাহকে স্মরণ করে, আসমান ও জমীনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে এবং বলে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি সর্ব দোষমুক্ত। অতএব আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

এ হলো কুরআনের দিগদর্শন ও মানুষের রোগের সে যে চিকিৎসা করে, তার একটি নমুনা। এর সমতুল্য দিগদর্শন আর কি কোথাও দেখেছেন ? এর চেয়ে উত্তম চিকিৎসা কি আর কোথাও পাওয়া যাবে ? বস্তুত এ হলো রোগের উৎকৃষ্টতম ওষুধ। সকল কল্যাণ ও সুখের গোপন রহস্য এতেই নিহিত। এটাই সেই অনুপম নিয়ামত—যার সম্পর্কে তিনি তার প্রিয় বান্দাদেরকে আগাম সুসংবাদ দিয়েছেন, যার আবির্ভাবের আগেই তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ দিয়েছেন শুধুমাত্র এর গুরুত্ব, মহিমা ও কল্যাণকারিতা ব্যক্ত করার জন্য। যেমন বলেছেন ঃ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

"বলুন, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। তিনি অচিরেই তার নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনবে। বস্তুত তোমার প্রভু তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞ নন।"–(নামল ঃ ৯৩)

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

"অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো দূরদিগন্তে এবং তাদের সত্তার মধ্যে—যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই

www.pathagar.com

সত্য। তোমার প্রভু যে সকল জিনিসের ওপর সাক্ষী—এটা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়।"–(সূরা হামিম আস সাজদা ঃ ৫৩)

তবে দুর্ভাগা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত লোকেরা এ নিয়ামত থেকে দূরে রয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে যথাযথভাবে সাবধান করে দিয়েছেন তাদেরকে সৃষ্টি জগতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে এমন একটা পর্দা থেকে। যেমন ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ

"অচিরেই আমি সেইসব লোককে আমার নিদর্শনসমূহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবো যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে.........."অর্থাৎ তিনি তাদের মনকে সৃষ্টি সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন।
–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৪৬)

বাস্তব উদাহরণ

এই চিকিৎসা ও মানুষের মনকে রোগমুক্ত করায় তার কার্যকরিতা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ ইতিহাস থেকে এর একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এবং এর মাধ্যমে কার্যকর উপায়ে এর বিশ্লেষণ করেছেন। এতে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ যখন তার চারপাশে অবস্থিত নিদর্শন ও নিয়ামতসমূহের দিকে চিন্তাপূর্ণভাবে ও শিক্ষালাভের আশায় দৃকপাত করে তখন তার থেকে পর্দা সরে যায়। তার মন বিগলিত হয়, তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয় এবং পরিশেষে লাশরিক আল্লাহর কাছে পৌছে যায়। এ সম্পর্কে তিনি এমন উদাহরণ পেশ করেছেন যার মাধ্যমে তার নছিহত ও উপদেশ যথার্থ পূর্ণতা লাভ করেছে এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا

www.pathagar.com

تُشْرِكُوْنَ ○ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ○

"এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও জমীনে আমার নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও রাজত্ব দেখিয়ে দেই—যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই যখন রাত হলো তখন সে নক্ষত্র দেখতে পেল। সে বললো ঃ এই কি আমার প্রভু ? নক্ষত্র ডুবে গেলে সে বললো ঃ যারা ডুবে যায় তাদেরকে আমি পসন্দ করি না। আবার যখন চাঁদকে উজ্জল হয়ে উদিত হতে দেখলো তখন বললো ঃ এই কি আমার প্রতিপালক ? তা যখন ডুবে গেল তখন বললো ঃ আমার প্রতিপালক যদি আমাকে সঠিক পথ না দেখান তাহলে আমি বিপথগামী হয়ে যাবো। তারপর যখন সূর্যকে আলোকোজ্জল দেখলো তখন বললো ঃ এই কি আমার প্রভু ? এটা তো সবচেয়ে বড়। সেটাও যখন ডুবলো তখন সে বললো ঃ হে আমার জাতি ! আমি তোমাদের অংশীবাদী তৎপরতা থেকে মুক্ত। যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন, আমি একনিষ্ঠভাবে শুধু তারই দিকে মুখ ফেরালাম এবং কাউকে তার সাথে শরীক করবো না।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৭৫-৭৯)

নমুনা ও নির্দেশনা

যারা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করেন তাদের প্রত্যেককে আমরা এই উপদেশ দেই যে, এই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে আয়ত্ব করে নিন এবং একে নিজের জীবনের সম্বল ও সরঞ্জামের অন্তর্ভুক্ত করুন। কেননা মানুষের ওপর এর যে দুর্জয় প্রভাব তা তো লক্ষ্য করেছেনই। এও দেখেছেন যে, আল্লাহ এই প্রকিয়াতেই মানুষকে তার দিকে আহবান জানিয়েছেন। কুরআনে তিনি আর কোন জিনিসের ওপর এত জোর দেননি, যতটা জোর দিয়েছেন চিন্তা-ভাবনাকে জাগৃতি ও উজ্জীবনের পথ ও পন্থা হিসেবে গ্রহণ করার ওপর। তাই প্রচারক মাত্রেরই কর্তব্য আল্লাহ যে পথ দেখান, তাই আকড়ে ধরা। তার উচিত, তার শ্রোতাদেরকে নিদর্শনাবলীর প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দান, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজের সহজাত যোগ্যতা ও কর্মকুশলতাকে কাজে লাগিয়ে নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

কতিপয় নমুনা

সুপথগামী মনীষীগণ মানুষকে আল্লাহর বিচিত্র ও বিস্ময়কর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করা ও তার মধ্যে চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টি করার জন্য যেসব বিচিত্র কৌশল অবলম্বন ও প্রেরণাদায়ক নসিহত করেছেন, তার কিছু নমুনা আমরা এ প্রসঙ্গে পাঠকের সামনে তুলে ধরছি ঃ

www.pathagar.com

১-একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপদেশ দিচ্ছিলেন। তিনি নিজের হাতের তালু মেলে ধরলেন, তাতে থু-থু দিলেন এবং তার পাশে নিজের আঙ্গুল স্থাপন করলেন। অতপর বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "হে আদম সন্তান ! আমাকে তুমি কেমন করে হারিয়ে দেবে। আমিতো তোমাকে এর মত তুচ্ছ জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছি। অতপর যখন তোমাকে এক সুঠাম দেহ দিয়ে দাড় করালাম, তুমি দু'টো কাপড় পরে চলতে আরম্ভ করলে এবং পৃথিবীতে তোমার মত কত শান্তশিষ্ট মানুষ রয়েছে—তখন তুমি অর্থ উপার্জন করতে লাগলে কিন্তু তা ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে লাগলে। অতপর তোমার প্রাণ যখন কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌছে গেল, তখন তুমি বললে ! আমি এক্ষুণি ছদকা করছি। অথচ তখন আর ছদকা করার সময় কোথায় ?" পাঠক একটু চিন্তা করলেই এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন। আমার ব্যাখ্যা ও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

২-আর একবার ইমাম আবু হানিফা (র) একদল পাষাণ হৃদয় মানুষের সামনে বক্তৃতা করছিলেন। তিনি সে বক্তৃতায় যথাসাধ্য বাস্তবধর্মী উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রথমে তিনি এমন ভান করলেন যেন কোন একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি একটা খবর পেয়ে চিন্তায় মুষড়ে পড়েছি। লোকেরা আমাকে জানিয়েছে যে, রকমারি পণ্য ভর্তি একটা জাহাজ সমুদ্রে রয়েছে। তাতে কোন পাহারাদারও নেই, চালকও নেই। তা সত্ত্বেও জাহাজটা চলাচল করছে। আপনা আপনিই চলছে। বড় বড় ঢেউ অতিক্রম করে চলছে, বন্দরে নোঙ্গর করছে, আবার তা ছেড়েও রওনা হচ্ছে। যেখানে খুশী তা ভ্রমণ করছে এবং চালক না থাকা সত্ত্বেও আপন গন্তব্যস্থল থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে না। শ্রোতারা বললো ঃ এমন একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে চিন্তায় মগ্ন হওয়া আপনার জন্য ঠিক নয়। কেননা কোন বুদ্ধিমান লোক এমন খবর দিতেও পারে না এবং কেউ তা বিশ্বাসও করতে পারে না। তখন তিনি বললেন ঃ হে জনমন্ডলী ! তোমরাই তো এ ধরনের কথা বলছ। মুখে না বললেও তোমাদের চালচলন থেকে এ রকম কথাই ব্যক্ত হচ্ছে। এই যে সৃষ্টিজগত এও একটা জাহাজের মতই। এতে অনেক উর্ধজগত ও নিম্নজগত রয়েছে এবং তাতে বহু সসার পদার্থ বিদ্যমান। সেইসব বস্তুর আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য ও তার পরিচালনার কলাকৌশল নিয়ে তোমরা কেন চিন্তা-ভাবনা করনি ? এসব বস্তু কি কোন পরিচালকের পরিচালনা ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে ?

একথা শুনে শ্রোতাদের মন অভিভূত হলো এবং যারা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারা ইসলাম গ্রহণ করলো।

www.pathagar.com

৩-আর একবার ইমাম শাফেয়ী (র) উপদেশচ্ছলে বলছিলেন ঃ এই হলো তুত গাছের পাতা। এর স্বাদ ও বর্ণ একই। অথচ গুটি পোকা এই পাতা খেলে তা তার পেট থেকে রেশম হয়ে বের হয়। মৌমাছি খেলে মধু হয়, গরু ছাগলে খেলে গোবর হয়, আর হরিণে খেলে হয় কস্তুরী। অথচ তা একই জিনিস। স্রষ্টার কি অপার মহিমা !

৪-আর একবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ওয়াজ নসিহত করছিলেন। তার পাশে কাপড়ে আবৃত একটা কিছু ছিল। তা দেখিয়ে তিনি বললেন ঃ এখানে একটা সুরক্ষিত দুর্গ আছে। দুর্গটা অত্যন্ত কোমল ও মসৃণ। তাতে কোন দরজা ও জানালা নেই। বাইরে থেকে তা সাদা রুপার মত এবং ভেতর থেকে নিখাদ সোনার মত। দুর্গটি এভাবে থাকতে থাকতেই সহসা তা দীর্ণ করে তার মধ্য থেকে শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন একটা প্রাণী বেরিয়ে এল। প্রাণীটার চেহারা খুবই সুন্দর এবং আওয়াজ খুবই মিষ্টি। এভাবে ইমাম সাহেব শ্রোতাদের কৌতুহল ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলার পর ঢাকনাটা তুলে ফেললেন। তখন সকলে দেখলো, একটা ডিম ফেটে চৌচির হয়ে আছে আর তার পাশেই রয়েছে সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া ক্ষুদ্র মুরগী ছানা। কি অপার মহিমা সেই কুশলী স্রষ্টার—যিনি জড় পদার্থ থেকে সজিব প্রাণী এবং সজিব প্রাণী থেকে নিষ্প্রাণ পদার্থ নির্গত করেন ! নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান।

প্রিয় পাঠক ! আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন দিক যাতে আপনার মনে স্পষ্টভাবে বদ্ধমূল হয় সে জন্যই এই কয়টি উদাহরণ দিলাম। চিন্তা-ভাবনার কয়েকটি বিচিত্র রূপ আপনার সামনে তুলে ধরলাম। ইনশাআল্লাহ্ এ কয়টি উদাহরণ দ্বারা এর সমপর্যায়ের আরো উদাহরণ রচনা করে নেয়া আপনার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। সবশেষে ইখওয়ানের এক ভাইয়ের দেয়া আর একটি উদাহরণ পেশ করছি ঃ তিনি বলেন ঃ বসরার জনৈক আলেম একদিন রাতের বেলা তার শিষ্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এমন সময় তার ইচ্ছা হলো যে, তার শিষ্যদেরকে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হতে উদ্বুদ্ধ করবেন—যার সাহায্যে তারা আল্লাহর মারেফাতের সমুদ্রে সাতার কাটতে বা ডুব দিতে পারবেন এবং সেই সমুদ্র মন্থন করে অনেক উপদেশের মুক্তা আহরণ করে আনতে পারবেন। তিনি সকল বাতি নিভিয়ে দিতে বললেন। ঘরটা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রাতের নির্জনতা ও নিস্তব্ধতায় অরণ্যের মত মনে হলো। তারপর বললেন ঃ প্রিয় বৎসগণ ! এই নিস্তব্ধ অন্ধকারে আমরা উর্ধজগত থেকে আমাদের আত্মার কিছু খোরাক সংগ্রহ করতে পারি। আমাদের নির্জীব মনকে কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি দান করতে পারি। তোমরা এ সুযোগটুকু হেলায় হারিও না। তোমরা প্রত্যেকে এখন স্মরণ কর, জন্ম নেয়ার আগে কি ছিলে আর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে দুনিয়ায়

www.pathagar.com

আনার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তোমরা কি হলে। কোন্ জিনিস থেকে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর যেসব স্তর অতিক্রম করে তোমরা বুদ্ধিমান, শক্তিমান ও বিবেচক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছ তার কথা ভাবো। অতপর মৃত্যুর পথে পাড়ি জমিয়ে জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে পৌছার কথাও চিন্তা কর।

অতপর শিষ্যরা সবাই নীরব হয়ে গেলেন এবং চিন্তার সমুদ্রে সাতার কেটে উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণের কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। ওস্তাদ তখন তাদের চিন্তামগ্ন অবস্থা জানতে চাইলেন। তিনি তাদেরকে থেকে থেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন ঃ হে অমুক ! এখন তুমি কোথায় আছ ? একজন বললো ঃ আমি এখন শুক্রের স্তরে আছি। আর একজনকে কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলে বললো ঃ আমি এখন কবরে আছি। কিছুক্ষণ পর আর একজনকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো ঃ আমি এখন পুলসিরাতের ওপর আছি। এদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে শুক্রের স্তরে ভেবে তার কথা ভাবছিল, যে ব্যক্তি নিজেকে কবরে এবং যে ব্যক্তি নিজেকে পুলসিরাতে অবস্থিত বলে ভাবছিল, তারা প্রত্যেকে ঐ অবস্থা সম্পর্কে নিজেদের আবেগ ও অনুভূতির বিশ্লেষণপূর্ণ বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল। তবে আমরা কবর ও পুলসিরাত সংক্রান্ত বর্ণনার উল্লেখ করবো না। কেননা আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, দৃশ্যমান নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা। তাই শুক্রের অবস্থা সংক্রান্ত বর্ণনাটাই শুধু উল্লেখ করবো। ওস্তাদ যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক ! তুমি কি অবস্থায় আছ ? তখন শিষ্য বললো ঃ জনাব, আমি তো এখন শুক্রের স্তরে আছি। এই শুক্র অত্যন্ত খারাপ ঘ্রাণযুক্ত এবং দেখতে ভীষণ বিশ্রী। অত্যন্ত নগণ্য এক ফোটা পানি। আমি তার নগণ্যতা নীচতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। অতপর সেই চিন্তা-ভাবনা নিজের ওপর আবর্তিত করছি। আমিতো আজ শক্তিমান ও বুদ্ধিমান। আমার ঐ পানির অবস্থায় থাকা ও আর আজকের পরিণত অবস্থায় থাকার মধ্যে কি বিস্তর ব্যবধান, তা আমাকে বিস্মিত করছে। আমার বিশ্বাসই হতে চাইছে না যে, আমি একদিন একফোটা শুক্র ছিলাম। মাননীয় ওস্তাদ ! এটি এমন একটি তুচ্ছ বিন্দু, যাকে বিনা যত্নে রেখে দিলে তা বাতাসের সাথে মিলিত হয়ে নষ্ট হয়ে যেত এবং পঁচে যেত। যিনি সেই অবস্থায় আমাকে রক্ষা করেছেন যখন আমি নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিলাম না, তার কী অপার মহিমা ! সে শুক্র বিন্দু এখন আমার চোখের সামনে ভাসছে। তার কোন শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তি নেই। অথচ কী আশ্চার্য যে, একদিন তাকে এত বুদ্ধি দেয়া হবে যে, সে একজন চিন্তাবিদে পরিণত হবে, রকমারি কলাকৌশল ও ষড়যন্ত্র রচনা করতে সে সক্ষম হবে। কে সেই বুদ্ধিদাতা ? কে তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দেবে ? কিভাবে এসব কাজ সম্পন্ন হবে ? এই জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়েই আমার সামনে আল্লাহর এই উক্তির জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـئِدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

"তিনিই সেই (মহান সত্তা) যিনি তোমাদের চোখ, কান ও মন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"–(সূরা আল মুমিনুন ঃ ৭৮)

এই চিন্তা-ভাবনা দীর্ঘায়িত হতে হতে আমাকে আর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন করে ঃ আল্লাহ যদি এই শুক্রকে এই অবস্থাতেই রেখে দিতেন, তাকে চোখ, কান ও বুদ্ধির সৃষ্টি না করতেন, তাহলে কেউ কি নিজেই নিজের বুদ্ধি সৃষ্টি করতে পারতো ? কে তাকে চোখ ও কান দিত ! এসব প্রশ্ন আমার মনকে আলোকিত করে এবং এই আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ

اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ○

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ যদি তোমাদের চোখ ও কান ছিনিয়ে নিতেন এবং তোমাদের মনের ওপর সিল মেরে চিন্তা ও উপলব্ধির অযোগ্য করে দিতেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কে তা ফিরিয়ে দিতে পারে ? আমি কিভাবে নিদর্শনাবলী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি তা একবার ভেবে দেখতো। অথচ তারা সেগুলোকে এড়িয়ে যায়।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ৪৬)

আমি সকল মানুষকে—জ্ঞানী মূর্খ নির্বিশেষে এবং দুর্বল ও সবল নির্বিশেষে সকলকে কল্পনা করছি যেন তারা ঐ এক বিন্দু শুক্রের চার পাশে ভিড় করেছে। তারা একে অপরের সাহায্য নিয়ে সবচেয়ে ক্ষুদ্র একটি হাড় কিংবা সবচেয়ে পাতলা একটি স্নায়ুতন্ত্রী কিংবা একটি মাত্র চুল তাতে উদগত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। আর চারপাশের প্রকৃতি তাদের ব্যর্থতার স্বীকৃতি দিচ্ছে কুরআনের এই আয়াতটি পড়ে ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ

اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـئًا

لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○

"হে মানবমণ্ডলী ! একটি উদাহরণ দেয়া হলো শোন। আল্লাহ ছাড়া তোমরা অন্য যেসব বস্তু বা প্রাণীকে পূজা করছ, তারা সকলে মিলে একটা মাছিও কখনো তৈরী করতে পারবে না, আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয় তবে তা তার কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করতেও পারবে না। আহবায়ক ও আহুত উভয়েই অক্ষম।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৩)

www.pathagar.com

এই চিন্তা-ভাবনা আমাকে আরো কিছুক্ষণ তন্ময় করে রাখলো। এক পর্যায়ে আমার মনে প্রশ্ন উদিত হলো যে, এক বিন্দু তুচ্ছ পানিতে যখন আল্লাহর এত সৃজন কুশলতা, তখন আকাশ ও পৃথিবীর স্তরে স্তরে তার সৃজন কুশলতা কিরূপ ব্যাপক ? বস্তুত এ প্রশ্ন এক অকূল সমুদ্র বিশেষ—যার কূলকিনারা নিরূপন করা এক মাত্র সেই মহিমান্বিত স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব—যার আধিপত্য বিস্তৃত রয়েছে সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এই পর্যন্ত এসেই উস্তাদ তার শিষ্যকে থামিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ থামো, থামো। এটুকুই যথেষ্ট। তুমি প্রকৃত সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছ। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে এ পথের সন্ধান দিয়েছেন, তিনি সন্ধান না দিলে আমরা তার সন্ধান পেতাম না।

প্রিয় দ্বীনি ভাই ! এ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য বাস্তবমুখী বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতার বিচার বিবেচনার নিমিত্ত কতিপয় দিক-নির্দেশিকা দিলাম। আমরা একাধিক জায়গায় বলেছি যে, ইসলামের দিকে আহবান করা যার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তার জন্য এই বুদ্ধিমত্তা অপরিহার্য। এ ধরনের চিন্তাশক্তি ও বিবেচনা শক্তি যদি আপনি কাজে লাগাতে সমর্থ হয়ে থাকেন, তবে সে জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করুন এবং তার কাছে আরো বেশী অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন। আর যদি এর অভাববোধ করেন তাহলে আপনার জন্য কতকগুলো পদ্ধতি বাতলে দিয়েছি এবং নমুনা দেখিয়ে দিয়েছি। সেগুলোর অনুসরণে প্রশিক্ষণ গ্রহণে সচেষ্ট থাকুন, যাতে করে তার কিছু কিছু উপকারী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে নিতে পারেন। প্রচেষ্টাকারীদের প্রতিদান আল্লাহ্ নষ্ট করেন না। প্রচেষ্টার সুফল থেকে ইনশাআল্লাহ বঞ্চিত হবেন না।

www.pathagar.com

সামাজিক আধ্যাত্মিকতা

ভূমিকা

উপরোক্ত শিরোনাম দেখে ভাববেন না যে আপনাকে কোন অস্পষ্ট ধ্যান-ধারণার কুহেলিকায় ঠেলে দেয়া হচ্ছে কিংবা কোন অজানা তেপান্তরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আসলে আত্মা ও আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত আলোচনা পড়া অনেক পাঠকের কাছেই কষ্টকর ও বিরক্তিকর লাগে। ফলে যা তারা বোঝেন না তা পড়া থেকে দূরে সরে থাকতে চান। অনেকের মনে আবার এমন ধারণাও বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, এ জাতীয় আলোচনা বিপজ্জনক ও ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর। কেননা এসব কথা যারা লেখেন তারা আন্দাজ-অনুমানের অথৈ দিগ দিগন্তে হারিয়ে যান—যেখানে সঠিক পথের কোন দিশা পাওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ٥

"তারা তোমার কাছে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও যে, রূহ আল্লাহর নির্দেশ থেকেই উদ্ভূত। (এ ব্যাপারে) তোমাদেরকে খুব সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে।"-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)

বস্তু ও রূহ

এ শিরোনামও আপনাকে সেই ধরনের কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্য উদঘাটনের চেষ্টায় নামানোর উদ্যোগ বলে মনে করবেন না। কেননা আমরা এ শিরোনাম দিয়ে খুব সহজ ও সরল আলোচনা পেশ করতে চাই। অত্যন্ত স্পষ্ট তত্ত্ব তুলে ধরতে চাই। মানুষ বস্তু ও আত্মার সমাবেশে গঠিত। বস্তুর একটা আলাদা নিয়ম আছে, তার বিবরণের আলাদা জগত আছে। রূহ বা আত্মারও আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং তার জীবন ধারণের আলাদা জগত রয়েছে। মানুষকে আল্লাহ সুন্দরতম গঠনে গড়ে তুলেছেন। তার দুই রকম জীবন থাকা চাই। একটা বস্তুগত জীবন —যার মাধ্যমে সে সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে নিজের দেহের প্রাপ্য দেবে। আর একটা হলো আধ্যাত্মিক জীবন যার মাধ্যমে সে তার রূহের প্রাপ্য দেবে। মানুষ যখন তার দেহ ও আত্মা—উভয়ের প্রাপ্য দিতে সক্ষম হবে, তখনই সে তার মনুষ্যত্বের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারবে। আল্লাহর রীতিনীতির সাথে সাযুজ্য ও সংগতি রক্ষা করতে পারবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তিময় জীবনযাপন করতে পারবে। আর যখন এর কোন এক দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং অপরটি থেকে দূরে সরে যাবে, তখন সে নিজের ওপর অত্যাচার

www.pathagar.com

চালানোর দায়ে দোষী হবে এবং নিজের সত্তাকে আল্লাহর বিধান ও রীতিনীতি থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। যে ব্যক্তি নিজের সত্তাকে সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত করবে তার ধ্বংস ও পতন অনিবার্য। বস্তুত এটাই আল্লাহর শাশ্বত বিধি এবং এতে কোন রদবদল নেই।

সুতরাং যে ব্যক্তি এ যুগের অধিবাসীদের মত (নিরেট জড়বাদী ও ভোগবাদী) জীবনযাপন করবে, কেবল অর্থ উপার্জনের মনোযোগী হবে, বস্তুগত প্রতিযোগিতায় ও দেহের চাহিদা পূরণে নিমজ্জিত হবে, অসার পদমর্যদা ও প্রতারণাময় রূপ জৌলুসের মোহে মত্ত হবে এবং এসব বাতিল তথা ক্ষণস্থায়ী সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের গোলাম বানাবে নিজের স্নায়ুবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুভূতিকে, সে নিজের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে উদ্‌ভ্রান্ত এবং জীবনের সারবস্তু তার দৃষ্টির আড়ালে লুক্কায়িত। আল্লাহর শাশ্বত রীতি তার মনুষ্যত্বকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করতে আগ্রহী কিন্তু সে সেই মহিমান্বিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নশ্বর পৃথিবীর দিকে ধাবিত।

আর যে ব্যক্তি তার রূহের চাহিদা পূরণ করতে কৃতসংকল্প, এজন্য সে দিনে রোযা রাখে এবং রাতে নামায পড়ে, পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসন থেকে দূরে থাকে, নিজের পাশবিক প্রবৃত্তির ঔদ্ধত্য খর্ব করার জন্য এবং তার বিনিময় নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে তেজোদ্দীপ্ত করার নিমিত্তে সাদাসিদে ও অপুষ্টিকর খাবার খায়, সেও একজন মূর্খ লোক। জীবনের প্রকৃত স্বরূপ ও চরিত্র সম্পর্কে সে অজ্ঞ। বিশ্বপ্রকৃতিতে আল্লাহর যে বিধান চালু রয়েছে, তা সে জানে না। ফলে সে তার দেহের দাবী ও অধিকার অপূর্ণ রাখে অথবা তার দুই ধরনের দাবীর একটি অপূর্ণ রাখে। এতে করে তার সত্তায় আল্লাহর যে বিধি বলবত রয়েছে তাকে সে সাময়িকভাবে এতটা নিষ্ক্রিয় ও ক্ষতিগ্রস্ত করে যে, তার চেয়ে বেশী নিষ্ক্রিয় ও ক্ষতিগ্রস্ত করা আর হতে পারে না। বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমর ইবনুল আসের পুত্র আবদুল্লাহর বাড়ী বেড়াতে গেলেন। আবদুল্লাহর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অমায়িক আচরণ করতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেমন আছ ? আবদুল্লাহর স্ত্রী বললেন ঃ কেমন আর থাকবো ? আবদুল্লাহ তো দুনিয়াদারী ছেড়েই দিয়েছে। রসূল (সা) বললেন ঃ সে আবার কেমন কথা ? স্ত্রী বললেন ঃ সেসব কিছুই নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছে। সে ঘুমায় না, অবিরত রোযা রাখে। গোশ্‌ত খায় না এবং স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের হক দেয় না। রসূল (সা) বললেন ঃ সে এখন কোথায় ? স্ত্রী বললেন ঃ বাহিরে গেছে। এক্ষুণি হয়তো ফিরে আসবে। তিনি বললেন ঃ ফিরে এলে আমি না আসা পর্যন্ত তাকে কোথাও যেতে দিও না। এই বলে রসূল (সা) বেরিয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ ফিরে এলেন। ক্ষণিক পরে রসূলুল্লাহও (সা) ফিরে এলেন। অতপর বললেন ঃ ওহে আবদুল্লাহ ! তোমার সম্পর্কে এসব কী শুনলাম। তুমি নাকি ঘুমাও না।

আবদুল্লাহ ঃ আমি এর মাধ্যমে পরকালের সেই বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই।

রসূলুল্লাহ (সা) ঃ শুনলাম তুমি নাকি এক নাগাড়ে রোযা রাখ।

আবদুল্লাহ ঃ জ্বি, আমি এর মাধ্যমে জান্নাতের আরো ভালো আরাম লাভ করতে চাই।

রসূলুল্লাহ (সা) ঃ আরো জানতে পারলাম, তুমি নাকি তোমার স্ত্রী ও পরিবারকে তাদের প্রাপ্য দাও না।

আবদুল্লাহ ঃ হাঁ, আমি এর মাধ্যমে দুনিয়ার স্ত্রীদের চেয়েও ভালো স্ত্রী পরকালে পেতে চাই।

রসূলুল্লাহ (সা) ঃ হে আবদুল্লাহ ! আল্লাহর রসূলের কাছেই উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমার জন্য। আল্লাহর রসূল তাহাজ্জুদের নামাযও পড়ে থাকেন। তিনি ঘুমানও, রোযাও রাখেন, আবার পানাহারও করেন, গোশ্‌তও খান, স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের প্রাপ্যও দেন। হে আবদুল্লাহ ! জেনে রাখ, তোমার নিকট যেমন আল্লাহর প্রাপ্য আছে, তেমনি তোমার শরীরেরও প্রাপ্য আছে, তোমার স্ত্রীর এবং পরিবারেরও প্রাপ্য আছে।

বস্তুত এই মৌলিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য সুষ্ঠু ও বিশুদ্ধ জীবনযাপনের পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি অধিকতর ঝোঁক থাকার কারণে হলেও বাড়াবাড়ি নিন্দনীয়। কোন বান্দা আল্লাহর প্রচলিত রীতি লংঘন করে তাড়াতাড়ি তার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে—এটা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

মানুষের আসল সত্ত্বা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, মানুষের দুই ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, দুই ধরনের ব্যক্তিত্ব তাকে প্রতিপালন করতে হয় এবং দুই ধরনের জগতে তাকে বাস করতে হয়। তাই বলে আমি মানুষের দেহের দাবীর ওপরই যে সমধিক উৎসাহ দিচ্ছি তা নয়। কেননা এ দাবী মেটাতেই তো মানুষ মাতোয়ারা ও অন্ধ হয়ে রয়েছে। আমি তাকে ভিন্নতর জীবনের চাহিদা ও দাবী সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই। কেননা অধিকাংশ মানুষই কেবল বস্তুবাদী জীবনকে উপভোগ করার চেষ্টায় রত। একটি মুহূর্তও সে তার পরকালীন

www.pathagar.com

জীবনের জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত নয়। এভাবে নিজের মানবীয় সত্তার হক না দিয়েই সে একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আমি আগেই বলেছি যে, মানুষের জন্য দুই ধরনের কর্তব্য ও মিশন রয়েছে। একটির সাহায্যে সে তার জৈব সত্তা লালন করে। অপরটির দ্বারা সে তার রূহানী বা আধ্যাত্মিক সত্তার দাবী পূরণ করতে পারে—যে সত্তা তার দেহ কাঠামোর অভ্যন্তরে লুকিয়ে রয়েছে। আর এই দুই ধরনের কর্তব্যের মধ্যে তার রূহানী সত্তার লালনে যেটার প্রয়োজন, সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা জৈব তথা পাশবিক সত্তা তার জীবনের এমন একটা দিক —যা মানুষের যেমন রয়েছে তেমনি আল্লাহর অন্য সকল সৃষ্ট জীবেরও রয়েছে।

কিন্তু এই যে উচ্চতর ও মহত্তর সত্তা—এটাই হলো আল্লাহর সেই রহস্যময় দান, যা দিয়ে তিনি মানুষকে ধন্য করেছেন। এই দানের কথাই কুরআনের এই আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

"আমি আদমের বংশধরকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে জলে ও স্থলে যানবাহন দিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি এবং আমার বহু সৃষ্টির ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"—(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)

সুতরাং নিজের আধ্যাত্মিক ও রূহানী সত্তার প্রতি কর্তব্য পালনই মানুষের সবচেয়ে উপযোগী ব্রত। আর এই সিদ্ধান্তের মূলে যে যুক্তি, তার সাহায্যেই আমরা মানুষের বয়সের হিসেব নির্ণয় করে বলতে পারি যে, তার মুহূর্তগুলো কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে। তার পবিত্র ও মহৎ রূহানী সত্তার বিরাটত্বের নিরীখেই তার মূল্যমান নির্ধারণ করতে পারি—জৈবিক ও পাশবিক সত্তার নিরীখে নয়।

অনেক সময় আমরা এ রকম খবর পড়ে থাকি যে, অমুক সাহেবকে (বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে) পাশা উপাধি (আমাদের উপমহাদেশে যেমন স্যার বা নাইট দেয়া হতো—অনুবাদক) দেয়া হয়েছে।[১] চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিচার বা প্রশাসন বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে যে অমূল্য সেবা করেছেন তার স্বীকৃতি স্বরূপ এ রকম উপাদি দেয়ার খবরাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐসব লোক কি তাদের জীবনের হক আদায় করেছেন? যে মৌলিক দায়িত্ব তার

১. উপাধি বিলোপের আগে একথা লিখেছিলাম।—গ্রন্থকার

www.pathagar.com

উপর ন্যস্ত ছিল তা কি তিনি পালন করেছেন ? অপেক্ষাকৃত নিম্নপদের অফিসারদের অবসর দিয়ে পেনশনের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার সময় তাদেরকে তো কোন উপাধি দিয়ে ধন্য করা হয় না। কোন পত্রিকাও তো তাদের মিশন সম্পর্কে কিছুই লেখে না। তাহলে তাদের পরিভাষায় মানুষের রাষ্ট্রীয় চাকুরীর পদোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যাওয়াতেই কি তার জীবনের চূড়ান্ত স্বার্থকতা ও সাফল্য নিহিত ? আর তাই যে মানুষটি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারলো না, সে ব্যর্থ এবং সে ভ্রূক্ষেপের যোগ্য নয় ?

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এসবই অলীক ধারণা এবং ভ্রান্ত মাপকাঠি। মানুষের স্বার্থকতা তার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি তার যথা কর্তব্য পালনেই নিহিত। এটা যখন সে করলো, তখন সে তার জাতির এবং সমগ্র মানবতার সেবা করলো। সে যদি বড় বড় ও উঁচু উঁচু পদের নাগাল না পায়, তবে তাতেও ক্ষতি নেই। আর কর্তব্যকে যদি সে অবহেলা করে তবে তার আর কোন স্বার্থকতা থাকতে পারে না। তার মিশন সফল হতে পারে না। চাই সে দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে যাক না কেন। এসব লোকের মধ্যে অনেকে এমন আছে যে, সে আপন আয়ুষ্কালের ষাট বছর অতিবাহিত করে ফেলেছে, অথচ তার আসল সত্তার বয়স এক মাস বা এক দিন মাত্র। তার দিকে তাকালে তার জৌলুসে হয়তো চোখ ঝলসে যাবে কিন্তু তার অন্তরের পর্দা সরিয়ে তার ভেতরের মানুষটাকে যদি দেখতে পারেন তাহলে দেখবেন যে, তা দুর্বল ও জীর্নশীর্ণ অবস্থায় আছে কিংবা তার আদৌ কোন গুরুত্ব বা ভারত্ব নেই। এখন আমরা দেখবো, মানুষের দুই জগতের অধিবাসী হওয়া এবং তার সত্তার ভেতরে দুই রকমের ব্যক্তিত্ব লালন করার অর্থ কি ? এই বস্তু জগতের জীবনযাপন কি ধরনের হয়ে থাকে, তা সবাই জানে। জৈব সত্তার লালন কিভাবে হয় তাও কারো অজানা নয়। এটা হলো খাদ্য, পানীয়, খেলাধূলা ও রোগব্যাধি থেকে রক্ষার ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দান। এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে ভিন্নতর জগতে বাস যা চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না এমন ভিন্নতর ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার অর্থ কি ? কিভাবে তা গড়া যায়, কিভাবে তাকে খাওয়ানো ও পরিপুষ্ট করা যায় এবং কোথা থেকে সেই খাদ্য ও পুষ্টি আসবে ?

মানুষ নিজের হকের ব্যাপারে কিভাবে ভুল করে

এ প্রশ্নটি আমাদেরকে সেই বিন্দুকে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করে, যেখান থেকে মানুষ জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিতে কিংবা তার বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বনে ভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়া শুরু করে। তার এই ভুলটা যখন আমরা বুঝতে পারবো, তখন কোন্টা সঠিক তাও জানতে পারবো এবং প্রশ্নের জবাবও পেয়ে যাবো।

www.pathagar.com

দেহের খাদ্য হলো এই যে, পৃথিবী থেকে উদগত খাবার ও পানীয়। এই খাদ্য অর্জনের উপকরণ বা হাতিয়ার হলো তার হাত, পা, চোখ, কান, জিহবা এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ক্ষমতা। পক্ষান্তরে তার রূহানী সত্তার খাদ্য হলো আসমান ও জমীনের আসল কর্তৃত্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব তথ্য ও শিক্ষা। আল্লাহর সান্নিধ্যের কুসুমবাগ থেকে মানব হৃদয়ে নেমে আসা সৌরভও তার অন্যতম খাদ্য। আর এই খাদ্য তার উচ্চতর উৎস থেকে আহরণের হাতিয়ার হলো তার সৃষ্টির নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা করা এবং স্রষ্টার গুণাবলী ও তার প্রভাব অবগত হওয়া।

যতক্ষণ মানুষের দৈহিক ক্ষমতাগুলো পৃথিবীতে সঞ্চরণশীল ও তৎপর থাকবে এবং তার হৃদয়ের চিন্তাশক্তি যতক্ষণ সৃষ্টির নিদর্শনাবলী ও স্রষ্টার গুণাবলীকে কেন্দ্র করে সক্রিয় থাকবে, ততক্ষণ সে নিরাপদ। কিন্তু যখন সে তার মনকে সেই কাজে চালিত হতে বাধ্য করবে যা তার আয়ত্বাধীন ও সহজসাধ্য করা হয়নি এবং যখন সে তার উর্ধজগতের পবিত্র জীবিকা থেকে তার কামনা-বাসনা ও আগ্রহকে সরিয়ে নশ্বর পৃথিবীর তুচ্ছ দ্রব্যের দিকে চালিত করবে তখন তার প্রকৃত ও মৌল জীবন রজ্জু থেকে স্বীয় রূহানী সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তখন সে তার রূহানী সত্তাকে তার অযোগ্য ও অরুচীকর খাদ্য খেতে বাধ্য করবে—যা তার জীবনী শক্তির শ্বাস রুদ্ধ করবে। সে খাদ্য হচ্ছে অবৈধ ভোগ লিপ্সা ও ধ্বংসাত্মক ঐন্দ্রিক ও জৈবিক আকাংখা পূরণ। এ খাদ্য গ্রহণের ফলে রূহানী সত্তা শুকিয়ে জীর্ণশীর্ণ ও হীনবল হতে বাধ্য হবে। মানুষের অজান্তে ও অবহেলায় এভাবে রূহানী সত্তা এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে অবস্থান করতে করতে এক সময় শোচনীয় মৃত্যুবরণ করবে। আর মৃত্যু আল্লাহর তরফ থেকে অবধারিত হয়ে আসবে।

সুতরাং ভুলটা হলো মনকে এমন পথে জোরপূর্বক পরিচালিত করা—যা তার আয়ত্বাধীন ও সুগম নয়। সৃষ্টির নিদর্শনাবলী থেকে আহরিত শিক্ষার সম্বল ও স্রষ্টার গুণাবলীর লক্ষণসমূহ থেকে তাকে বঞ্চিত করা এবং পার্থিব জৈব লালসা ও তার অবাঞ্ছিত জৌলুসের প্রতি তাকে আকাংখী করে তোলা। এতে করে মানুষের দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতা তার বহিঃসত্তায় নৈরাজ্য ও বিভ্রাট দেখা দেয় এবং তার ভেতরকার সত্তা বিড়ম্বনার শিকার হয়।

আমরা আগেই বলেছি যে, আল্লাহ তায়ালা দেহকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রকমারি যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়ে ভূষিত করেছেন, যাতে তা পৃথিবী থেকে তার প্রয়োজনীয় পাথেয় আহরণে তৎপর হয়। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি এই কাজে যথেষ্ট না হতো তাহলে তার প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দিতে আল্লাহ কার্পণ্য করতেন না। কেউ কি এমন কথা বলতে পারবে যে, তার হাত,

www.pathagar.com

পা ও অন্য সকল অঙ্গ এবং তা ছাড়া বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিভা ও যোগ্যতা তার জন্য যথেষ্ট নয় ? তা যখন পারবে না তখন এই মানসিক ক্ষমতাগুলোর কর্মক্ষেত্র কি এবং কিভাবে এগুলোকে তাদের ঊর্ধ্বজগত থেকে নীচে নামিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাশাপাশি কাজে নিয়োজিত করবে। তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক যে, মানসিক ক্ষমতাগুলোকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহযোগী বা পরিপূরক হিসেবে দেহের সেবায় নিয়োজিত হবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় যে, আল্লাহ আমাদের আভ্যন্তরীণ রূহানী সত্তার সেবার জন্য যেসব উপকরণ দিয়েছেন তা কোথায় গেল ? তা কি হাওয়া হয়ে গেল ? আর আল্লাহ তায়ালা কি মানব সত্তার শুধুমাত্র দৈহিক অংশের পক্ষপাতিত্ব করেছেন আর অন্য অংশের প্রতি অবিচার করেছেন ?

তিনি কি শুধু জৈব সত্তার কথাই মনে রেখে তাকে সকল প্রয়োজনীয় ক্ষমতায় সমৃদ্ধ করেছেন আর রূহানী সত্তাকে কোন ক্ষমতা ও উপকরণ দেয়ার কথা ভুলে গেছেন ? কখনো নয়। আল্লাহ এ ধরনের ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আমরা চাই, মানুষ তার দায়িত্ব বুঝে শুনে গ্রহণ করুক। আল্লাহ আমাদের ওপর কোন জুলুম করেন নাই। মানুষ নিজেই নিজের ওপর জুলুম করে থাকে। আমরা আরো চাই, মানুষ নিজের মানমর্যাদা যথাযথ দাঁড়িপাল্লা দিয়ে পরিমাপ করুক— যে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে আল্লাহ নিজেও পরিমাপ করে থাকেন।

শরীরকে যদি দুনিয়ার সম্পদ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দেই তাহলে কি তার ওপর জুলুম করা হবে ? তার মনের আবেগ অনুভূতিকে যদি কিছুটা স্বাধীনতা দেই, যাতে করে সে তার অপর সত্তার চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতে পারে, তাহলে কি সেটা তার ওপর অবিচার হবে ? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, আমাদের নিজেদের ও বাস্তবতার প্রতি যথার্থ ন্যায়বিচার করতে হলে বলতেই হবে যে, এতে কোন জুলুম হতে পারে না। তবে ন্যায়বিচারের দাবী পূরণের আর একটা কথা স্বীকার করতে হয়। সেটা এই যে, মানবদেহের জন্য কতটুকু দুনিয়াবী সম্পদ যথেষ্ট, তা নির্ধারণের মানদণ্ড আমাদের জানা নেই। আর দেহ ও মনের শক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী সীমারেখাও অদৃশ্য। এজন্যই আমাদেরকে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, দেহের ন্যূনতম প্রয়োজন কতটুকু এবং কিভাবে আমরা মনের ক্ষমতাকে তার বিশিষ্ট দায়িত্ব পালনের খাতে প্রবাহিত করতে পারি ?

এ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমার দৃষ্টিতে সহজ—যদি আমরা বস্তুসমূহের আসল স্বভাব প্রকৃতি অনুধাবন করি এবং আল্লাহ মানুষকে যে স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সেই স্বভাবের কাছেই যদি পথনির্দেশ চাই। শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে যেটুকু উপকরণ অত্যাবশ্যক, সেটুকুই কি যথেষ্ট নয় ? তার চেয়ে বেশীর কি

www.pathagar.com

দরকার ? তার ন্যূনতম প্রয়োজন হলো ক্ষুধা দূর করার মত খাদ্য এবং দেহ ঢাকার মত পোশাক। যুক্তি ও বিবেকের দাবী অনুসারে এ ছাড়া আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল যে, দুনিয়াতে তার কতটুকু সম্পদ যথেষ্ট ? তিনি বললেন ঃ যতটুকু খাদ্য তোমার ক্ষুধা দূর করতে পারে এবং যতটুকু পোশাক তোমার লজ্জাস্থান ঢাকতে পারে ততটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যদি তোমাকে ছায়া দেয়ার মত একটা ঘর থাকে তবে তাও। আর যদি তোমার একটা যানবাহন জন্তুও থাকে তাহলে তো চমৎকার !

বস্তুত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি কথা বলতে পারতো তাহলে আমাদের কাছে সবিনয়ে আবেদন জানাতো যে, তাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খাদ্য ও পোশাক দিয়ে তাকে কষ্ট দেয়া থেকে যেন আমরা বিরত থাকি। কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা অত্যাবশ্যক উপকরণ দ্বারাই নিশ্চিত হতে পারে। এর চেয়ে বেশী যদি তার ওপর চাপানো হয় তবে তার আজ হোক কাল হোক অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা আছে। এই স্বাভাবিক ও সহজ যুক্তিকে রসূল (সা) তার একটি প্রজ্ঞাময় বাক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "মানুষ যেসব পাত্রকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তার মধ্যে তার পেটই নিকৃষ্টতম। আদম সন্তানের পিঠ সোজা রাখতে যতটুকু খাদ্যের দরকার, ততটুকুই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যদি তার প্রবৃত্তি তার ওপর প্রবল হয়ে পড়ে (এবং আরো কিছু বেশী খেতে বাধ্য করে) তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, আর এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখা উচিত।

দুনিয়ার উপকরণ থেকে এতটুকুই তার দেহের জন্য যথেষ্ট। এবার আসুন, এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করি যে, মনের ক্ষমতাসমূহকে কিভাবে বিযুক্ত করে তার বিশিষ্ট পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট কাজ সমাধা করার সুযোগ দেয়া যায় এবং জীবনের প্রতি মানুষের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে শোধরানো যায়।

মানুষের বেশী বেশী খাওয়া ও পরার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হওয়ার আসল কারণটা কি তা যদি জানতে পারি তাহলেই আমরা উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো। মানুষ যদি শুধু তার স্বভাব ও প্রকৃতির দাবী মেটানোতেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে সে শুধু তার অপরিহার্য চাহিদা মিটিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকতো। কিন্তু এই স্বভাবগত দাবীর চৌহদ্দী থেকে তার বেরিয়ে আসার কারণটা কি, তা আমাদের জানতে হবে। সে যদি শুধুমাত্র দেহকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে খাদ্য গ্রহণ করতো তাহলে তার স্বাস্থ্যগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সঠিক মানে বহাল থাকতো। কিন্তু আসলে সে তো খাদ্য ও

www.pathagar.com

পানিয়ের স্বাদ গ্রহণের নিমিত্তও খায়। সে শুধু দেহ ঢাকবার জন্য কাপড় পরে না, বরং মানব সমাজে সুন্দর সাজসজ্জা সহকারে বিচরণের অহংকার পরিতৃপ্ত করার উদ্দেশ্যেও তা পরে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করা তাকে এই সব বাড়তি চাহিদার দিকে আকৃষ্ট করার দ্বিতীয় উপকরণ। লিপ্সা বা আকাংখা হলো মনের একটা প্রবল ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যখন দ্বিতীয় উপকরণ হয়ে প্রবেশ করে তখন তার দুর্জয় শক্তি নিয়ে প্রথম উপকরণের ওপর আগ্রাসন চালায়। এ জন্য মানুষ এরূপ অবস্থায় তার স্বভাবগত নিয়মের অধীন থাকে না, বরং এই অযৌক্তিক খায়েশের দোর্দণ্ড প্রতাপেরই অধীনতা বরণ করে নেয়। ফলে দেহের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করে সে ক্ষ্যান্ত থাকে না, বরং ভোগবাদী আহবানে সাড়া দিয়ে সে বিলাসিতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

এর অর্থ এই যে, দুনিয়াবী ভোগের লালসাই মানুষকে তুচ্ছ দুনিয়াবী সম্পদের দিকে সবচেয়ে প্রবলভাবে তাড়িত করে এবং সেই সাথে তার বুদ্ধিবৃত্তি তথা মনকে বিশ্বপ্রকৃতিতে বিরাজমান নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণে অক্ষম ও অচল করে দেয়।

প্রকৃতির পরিভাষায় দুনিয়াটা একটা তথ্য কেন্দ্র। কিন্তু এর ওপর উচ্চাকাংখা ঝুলিয়ে রাখার কারণে অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিতে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোগের জায়গা। তথ্য ও ভোগের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। যে ব্যক্তি একে তথ্য কেন্দ্র মনে করবে সে একে নিজের মনকে সঞ্জিবিত করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে প্রার্থিত তথ্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি একে ভোগের জায়গা মনে করবে সে একে নিজের মনের কামনা-বাসনা, উচ্চাভিলাস ও প্রবৃত্তির লালসার কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ সে তার সকল শক্তি দুনিয়ার স্বার্থের জন্যই নিয়োজিত করবে। আর পরকালীন জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুগঠিত করার সকল শক্তি ও উপকরণ থেকে করবে বঞ্চিত ও নিঃস্ব। ফলে সে জীবন এক বিরাণ ও উষর মরুপ্রান্তরের রূপ ধারণ করবে। তথ্য ও ভোগের মাঝখানে যে সীমারেখা বিদ্যমান, সেটা অবিকল সেই সীমারেখাই—যা সেচ্ছাচারিতা ও ন্যায়পরায়নাতার মধ্যে বিদ্যমান। এই সীমা-রেখার ওপর বস্তুবাদী জীবন ও রূহানী জীবনের পার্থক্যসূচক দেয়াল খাড়া করা অবশ্য কর্তব্য। এটা এ জন্য কর্তব্য—যাতে দেহ তার নির্ধারিত গণ্ডীতে তথ্য ও কৃচ্ছ্রতার (আধ্যাত্মিক) ব্যবস্থার আগ্রাসী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে কর্মতৎপর থাকতে পারে, যাতে মন বিচিত্র নিদর্শন পরিপূর্ণ প্রকৃতির বাগিচায় আকাশ ও পৃথিবীর আসল কর্তৃত্ব বিরাজিত জগতের প্রতি পরিপূর্ণ আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে কর্মচঞ্চল থাকতে পারে এবং সেই সাথে তার আসল (রূহানী) সত্তায় আলো ও জ্ঞানের খাদ্য এবং পবিত্র জীবনামৃতের সরবরাহ চালু রাখতে পারে।

www.pathagar.com

মন ও প্রবৃত্তির মাঝে আড়াল স্থাপন জরুরী

একথা সত্য যে, মনকে অত্যন্ত সৌন্দর্য পিপাসু করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সবসময় তার মধ্যে সুখ ও আনন্দের হিল্লোল বইতে থাকুক—এটাই তার কাম্য। বিশেষত প্রাণোচ্ছল মনতো সবচেয়ে বেশী ঈর্ষাকাতর ও ঐশ্বর্যকামী হয়ে থাকে। আর মৃত মন হলো স্থবির, জড়ীভূত, অচঞ্চল ও আবেগ-অনুভূতিহীন। এসবই বাস্তব ব্যাপার। তার মধ্যে যে আবেগ ও উচ্ছাস বিরাজমান তা এজন্য যে, তার মধ্যে যে সৌন্দর্যের প্রবাহ চলে তার স্বাদ যেন সে ভোগ করতে পারে। কিন্তু কোন্ জগত থেকে এই সৌন্দর্যের ধারা প্রবাহিত হয় ? তা কি সেই নিম্নজগত থেকে যেখানে অন্য সকল জীবজন্তুর সাথে একাকার হয়ে তার দেহ বিচরণ করে না, সেই উর্ধজগত থেকে—যা আল্লাহর মারেফাত তথা সৃষ্টির অপরূপ সুন্দর নিদর্শনাবলীর শিক্ষা থেকে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য আহরণ করে ?

বস্তুত দেহের ও মনের আলাদা আলাদা জগত ও আলাদা আলাদা পরিমণ্ডল থাকা অপরিহার্য।[১] এতে করে মানুষ তার দেহের তৎপরতা বাহ্যিক জীবনে এবং মনের তৎপরতা আভ্যন্তরীণ তথা আধ্যাত্মিক জীবনে চালু রাখতে পারে।

ভুলের প্রতিকারের উপায় 'জোহদ'

জীবনের নির্ভুল ও সুষ্ঠু পথে বহাল থেকে মানুষ তার দুই ধরনের জীবনের মাঝে যে ন্যায়সঙ্গত সীমারেখা টানে, তাকে আমরা একমাত্র 'জোহদ' বা কৃচ্ছ্রতা নামেই অভিহিত করতে পারি। মারেফাতপন্থীদের ভাষায় এ নামই দেয়া হয়েছে। যদি কেউ এ ছাড়া অন্য কোন জিনিসকে 'জোহদ' মনে করেন তবে তার এ ব্যাপারটা নিজের মনের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত। এমন আধ্যাত্মিকতা 'জোহদ' হতে পারে না যা মানুষকে দুনিয়ার তৎপরতা থেকে ফিরিয়ে রাখে, মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং পার্থিব জীবনের হালাল ও নির্দোষ ভোগ্য জিনিস থেকে বঞ্চিত করে রাখে। আমরা ইতিপূর্বের আলোচনায় যার বিবরণ দিয়েছি, সেটাই প্রকৃত 'জোহদ'।

ইমাম জুহরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'জোহদ' কি ? তিনি বলেছিলেন : উসকো-খুসকো চুল ও ছিন্ন মলিন বসনে আদিম মানুষের আকৃতি ধারণ করার নাম 'জোহদ' নয়। জোহদ হলো স্বেচ্ছাচারমূলক ভোগ লালসা থেকে নিবৃত্ত ও সংযত থাকা।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হলো : যার কাছে এক হাজার দিনার আছে, সে কি 'জাহেদ' (কৃচ্ছ্রতা সাধনকারী) হতে পারে ? তিনি

১. উল্লেখ্য যে, কখনো কখনো 'মন' শব্দটি বিবেক অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।—গ্রন্থকার

www.pathagar.com

বললেন ঃ হ্যাঁ, হতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ জোহদের লক্ষণ কি? তিনি বললেন ঃ জোহদের লক্ষণ হলো, সম্পদ বৃদ্ধি পেলে আনন্দে দিশেহারা না হওয়া এবং কমলে চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া।

ইবনুছ ছাম্মাক বলেন ঃ জাহেদ হলো সেই ব্যক্তি যে, দুনিয়ার সুখ সমৃদ্ধি তার আয়ত্বে এলে আনন্দে আত্মহারা হয় না এবং আপদ মুসিবতে পড়লে চিন্তায় অধীর হয় না। যখন মানুষের মধ্যে থাকে তখন হাসে আর যখন নিভৃতে অবস্থান করে তখন কাঁদে। অর্থাৎ মানুষের সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করে এবং নির্জন অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু বর্ষণ করে।

হযরত রসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, জোহদ কাকে বলে? তিনি বলেছিলেন ঃ "মনে রেখ, হালালকে হারাম করা এবং সম্পদকে ভোগ না করে নষ্ট করে ফেলা জোহদ নয়। দুনিয়ার জীবনে জোহদ হলো, তোমার কাছে যে সম্পদ রয়েছে তা নিয়ে নিজেকে যতখানি ধনী মনে কর তার চেয়ে বেশী ধনী মনে করবে যা তোমার কাছে নেই, কিন্তু আল্লাহর কাছে আছে, তা নিয়ে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে জোহদের খুবই সুন্দর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ـ

"আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে আখেরাতের সুখ অর্জন করার চেষ্টা কর এবং তা থেকে তোমার দুনিয়ার অংশও নিতে ভুলো না।"–(সূরা আল কাসাস ঃ৭৭)

বস্তুত জোহদ হলো মনের এমন একটা অবস্থার নাম যা মানুষ আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা করতে করতে আল্লাহর যথার্থ পরিচয় লাভ করলে তার অন্তরে সৃষ্টি হয় এবং সেই পরিচয় লাভেই সে সন্তুষ্ট, আনন্দিত, গর্বিত ও তৃপ্ত হয়। অতপর এই অবস্থা তার মধ্যে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং তার সমগ্র মন ও বোধশক্তির ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে দুনিয়া সম্পর্কে সে পূর্ণ পরিতৃপ্তি অনুভব করে এবং দুনিয়ার সকল সম্পদ থেকে উত্তম যে ঐশ্বর্য আল্লাহর কাছে আছে তার প্রতি প্রবলভাবে আগ্রহী হয়।

এটাই হলো সেই সীমারেখা, যার সম্পর্কে একটু আগেই আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম যাতে করে আমাদের কাছে উভয় জীবন—বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই আল্লাহ যে দেখতে চান, আপনি এই দুই রকম জীবনযাপন করুন, আপনার বস্তুগত সত্তাকে বস্তুগত

www.pathagar.com

জীবনে এবং রূহানী সত্তাকে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করুন। এটা জানা ও বুঝার নামই জোহদ। বস্তুগত জীবনে আপনি স্বীয় দেহ এবং দৈহিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা কাজে লাগাবেন, আর রূহানী জীবনে নিজের মন এবং মানসিক ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাবেন, এবং কাজে লাগানোর সময় আপনি আল্লাহর নিকট সঞ্চিত সম্পদ অপেক্ষা দুনিয়ার সম্পদের দিকে বেশী মোহগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন—এটাই আল্লাহর কাম্য।

সুতরাং হালাল জিনিস অবাধে খেতে থাকবেন। আল্লাহ এগুলো এজন্য সৃষ্টি করেননি যে, আপনার এগুলো খাওয়া তিনি অপছন্দ করবেন। তিনি বরং রাসূলদের ও মু'মিনদেরকে এগুলো খাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

يَآيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط

"হে রাসূলগণ ! হালাল জিনিসগুলো থেকে খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক কাজ করতে থাক।"–(সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৫১)

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ـ

"হে মুমিনগণ ! যেসব হালাল জিনিস আমি তোমাদেরকে জীবিকা হিসেবে দিয়েছি, তা থেকে খাদ্য গ্রহণ কর।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭২)

তবে এই খাওয়ার উদ্দেশ্য থাকবে দেহের প্রাপ্য দেয়া—নিছক মজা উপভোগ করা এবং জৈবিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করা নয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

"যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে, তারা পশুর মত খায় ও ভোগ করে। জাহান্নামই তাদের ঠিকানা।"–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১২)

দেহের পুষ্টি এবং মনের পুষ্টির জন্য নির্ধারিত আছে আলাদা আলাদা উপকরণ। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ ○

"তোমরা উপকরণ সংগ্রহ কর। তবে সবচেয়ে ভাল উপকরণ হলো আল্লাহর ভয়। হে বুদ্ধিমানেরা ! একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭)

www.pathagar.com

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক দ্বারা আমাদের সুসজ্জিত হতে হবে। কেননা আল্লাহ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। তিনি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন থাকাকেই পছন্দ করেন। এজন্য আল্লাহ বলেন ঃ

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ

"হে আদমের বংশধর ! যে কোন মসজিদে যাও, সুন্দর বেশভূষা ও সাজসজ্জা নিয়ে যাও।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩১)

তবে এরও উদ্দেশ্য হতে হবে দেহকে ঢাকা ও তাকে রক্ষা করা—নিজেকে মানুষের সামনে জাহির করা ও বড়াই করা নয়। আল্লাহর একথাটা একটু লক্ষ্য করুন ঃ "যে কোন মসজিদে" এ থেকে বুঝা গেল, মসজিদের জন্য সুন্দর সাজসজ্জা গ্রহণকারী এবং ক্লাব ও মজলিসে আড্ডা দেয়ার জন্য সুন্দর সাজসজ্জা গ্রহণকারী একরকম নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সুন্দর বেশভূষা ধারণ করে এবং যে ব্যক্তি মানুষের জন্য মনোরম বেশভূষা ধারণ করে—উভয়ে একই পর্যায়ভুক্ত নয়। ইবাদাতকালে সুন্দর ও মনোরম বেশভূষা অবলম্বনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উৎসাহ দেয়া হয় তা অতি উঁচুমানের উৎসাহ। এ ধরনের উৎসাহের ভিত্তিতে যে সৌন্দর্য চর্চা করা হয় তা মানুষের মনে প্রদর্শনেচ্ছা বা রিয়াকারী ও নিজেকে জাহির করার প্রেরণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র থাকে। কাজেই পোশাক পরার ধরনটা হতে হবে গোছল করা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার মত। মানুষ যখন ওজু গোছল ইত্যাদি করে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, তখন তার মনে প্রদর্শনেচ্ছা থাকে না। এটা শুধুমাত্র দেহের ও মানবীয় মর্যাদার স্বাভাবিক দাবী পূরণ ও অধিকার দেয়ার জন্যই করা হয়। বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ কি ধরনের পোশাক পরবো ? তিনি জবাব দিলেন ঃ যে পোশাক নির্বোধদের দৃষ্টিতে দূষণীয় ও বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় নয়।

যে কোন পোশাক পরা যেতে পারে। কেবল বাড়াবাড়ী বা কৃত্রিমতা না থাকলেই হয় এবং তার প্রতি মনের কোন বিশেষ নজর না থাকলেই হয়। সবসময় মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ দেহের জন্য যত পোশাক সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে রূহই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল ও কল্যাণকর পোশাক। এ আয়াতটি লক্ষ্য করুন ঃ

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ
التَّقْوٰى ٧ ذٰلِكَ خَيْرٌ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

www.pathagar.com

"হে আদমের বংশধর ! আমি তোমাদের ওপর এমন পোশাক নাযিল করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে দিতে সক্ষম। তবে তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। এ হচ্ছে আল্লাহর অন্যতম নির্দশন, যাতে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ কর।"-(সূরা আল আ'রাফ ঃ ২৬)

বিয়ে করা এবং সন্তান প্রজননও জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দাবী। আল্লাহ তায়ালা এ কাজকে শরীয়াতের অঙ্গীভূত করেছেন এবং তা নবী ও রাসূলদের অনুসৃত রীতি বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط

"আমি আপনার পূর্বেও বহু রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তান বানিয়েছি।"-(সূরা আর রাদ ঃ ৩৮)

স্বাধীন বিবেকের রায়ও এই যে, নর-নারীর যৌন আবেদন আল্লাহর তরফ থেকেই অর্পিত। এ আবেদন জীবনের একটা দায়িত্ব পালন করার উপকরণ বিশেষ—নিছক একটা জৈব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নাম নয়। সুতরাং আমাদের বিয়ে করে আল্লাহ যে সন্তান দিতে চান তা জন্মানো উচিত। এর উদ্দেশ্য শুধু নারী দ্বারা ভোগের আনন্দ লাভ ও সন্তান সন্ততির দ্বারা দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার করা হওয়া চাই না। একথাই আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে বলেছেন ঃ

فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص (البقرة : ١٨٧)

"এখন তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) নির্ধারণ করেছেন তা অর্জন করতে সচেষ্ট হও।"

"আল্লাহ যা তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন তা অর্জনে সচেষ্ট হও" এই অংশের তফসির প্রসঙ্গে ইমাম বায়জাবী বলেছেন ঃ অর্থাৎ যে সন্তানের কথা তিনি তোমাদের ভাগ্যে নির্ধারণ ও লওহে মাহফুজে সুরক্ষিত করেছেন, তা অর্জন কর।"

এর মর্মার্থ দাঁড়ালো এই যে, স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য হওয়া চাই সন্তান লাভ। যৌন আবেদন সৃষ্টি ও বিয়ের বিধান চালু করার মূল উদ্দেশ্য এটাই—শুধু কাম চরিতার্থ করা নয়।

স্ত্রী পরীক্ষার বস্তু। সন্তান-সন্ততিতে আছে মাধুর্য। এ দু'টোর কিছু অংশ মনে সঞ্চালিত হতে পারে। তাতে আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়। তার আসল সত্তা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে তার সেই জীবন—যার সাহায্যে তার মূল্যমান ও আয়ুষ্কাল পরিমাপ করা হয়। এ জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে ঃ

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে অনেকে তোমাদের শত্রু। কাজেই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।"–(সূরা তাগাবুন ঃ ১৪)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তোমার শত্রু সে নয়, যাকে তুমি হত্যা করলে তোমার জন্য সে আলোক হবে আর সে তোমাকে হত্যা করলে তুমি জান্নাতে যাবে। বরং তোমার সবচেয়ে বড় দুশমন হলো তোমার ঔরসজাত সন্তান এবং তোমার মালিকানাধীন সম্পদ।"

আপনি পৃথিবীতে ছুটোছুটি করুন। ভ্রমণ করুন। আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ প্রদত্ত জীবিকা ও ফসল ইত্যাদি উপার্জন করুন। এমনভাবে করুন যেন আপনার মন আল্লাহর বিশ্বজোড়া প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে তৎপর থাকে অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে এবং সৃষ্টিজগতে বিরাজমান তার গুণাবলীর প্রভাব ও অবদান নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকে।

আপনি এ দুনিয়াতে কাজ করতে থাকুন। অর্থ উপার্জন করুন। তবে সে কাজ যেন আপনাকে আপনার পরকাল ভুলিয়ে না রাখে। পার্থিব সম্পদ উপার্জনের দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য যেন তা পুঁজি করে রাখা এবং মানুষের কাছে নিজেকে বড় লোক জাহির করা না হয়। কেননা কেবল নিষ্কর্মা নির্বোধরাই এ রকম আকাংখা পোষণ করে থাকে। সম্পদের কারণে মানুষের মনে যে আপদ ঢোকে তাহলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে সম্পদের পূজা করা। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহান পুরস্কার।"–(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৫)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। যে গাফেল হবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" –(সূরা আল মুনাফেকুন ঃ ৯)

অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই আল্লাহর পথে তা ব্যয় করা এবং তাকে তার দ্বীন কায়েমের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা। এভাবেই মানুষ তার উভয় জীবনে নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণিত করতে পারে এবং তার সত্তার উভয় দিকে

www.pathagar.com

—আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত দিকে—তার দায়িত্ব তথা মিশন বাস্তবায়িত করতে পারে। এভাবেই সে জোহদের প্রকৃত মর্ম কার্যকর করতে পারে অথচ অক্ষম প্রবৃত্তি পূজারীদের উচ্চাভিলাস তা করতে সক্ষম হয়নি। আর সক্ষম হয়নি বলেই তারা জোহদকে দূষণীয় মনে করেছে। আসলে কিন্তু এটাই মানবতার ভূষণ এবং তার পরিপূর্ণ বিধান।

জোহদের বাস্তবায়ণে জটিলতা

এখানে আমাদের একথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার যে, এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ণ এত সহজ নয়, যতটা কাগজে লেখা সহজ বলে মনে হয়। কেননা আমরা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে আছি দুনিয়ার নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক জিনিস—যথা অর্থ, স্ত্রী, পদমর্যদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সন্তান সন্ততি ইত্যাদি দ্বারা। এর প্রতিটা জিনিসই এমন আপদ যে, এগুলো পরস্পরে মিলিত হয়ে মানুষের মনের ওপর আপন আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাকে নাকে দড়ি দিয়ে আপন কোলাহলময় পরিমণ্ডলের দিকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে। এর কোন একটিরও যাদুকরী প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতার আয়ত্বাধীন নয়। আর যখন সেগুলোর একত্র সমাবেশ ঘটে, তখন তো মুক্তির পথ আরো দুরূহ হয়ে ওঠে। এর কারণ এই যে, শৈশবকাল থেকেই মানুষ কেবল মজাদার ও আনন্দদায়ক উপকরণাদির ভক্ত। মা-বাপের স্নেহ এবং আত্মীয় স্বজনের আদর সোহাগের ফলে এরূপ হয়ে থাকে। তারা তাকে আনন্দ ও আরামদায়ক জিনিসের দিকেই পথ দেখায়, তাকে নিরন্তর আদর যত্ন করে ও ভালোবাসে। এভাবে ক্রমাগত ইন্দ্রিয়গুলোকে খুশী করা এবং সহজাত প্রবৃত্তি ও মোহকে মিষ্টি মধুর সম্ভাষণ দ্বারা প্রীত করার দরুনই এ ধরনের আয়েশী ও ভোগবাদী স্বভাব গড়ে ওঠে। এভাবেই সে বড় হয় আর তার মন পার্থিব জীবনের চাকচিক্যে মোহাবিষ্ট হয়ে ওঠে।

সেই মোহান্ধ মন ও ভোগলিপ্সু স্বভাব নিয়ে সে যখন এই মায়াবিনী পৃথিবীর সুজলা সুফলা সহাস্য প্রান্তরের বিস্তীর্ণ দীগন্তে দাঁড়িয়ে, তখন তার পক্ষে রূহানী ও বস্তুগত—এই উভয় জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ সাধন কিভাবে সহজসাধ্য হবার আশা করা যায়? রসূলুল্লাহ (সা) এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন এবং একে পরম বাস্তববাদী সর্বজ্ঞ আল্লাহর বিচক্ষণ কর্মকুশলতার অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন: "নিশ্চয়ই দুনিয়াটা শ্যামল ও মিষ্ট। এখানেই আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিনিধি করে পাঠান এবং দেখতে চান তোমরা কেমন আমল কর?" রসূলুল্লাহর (সা) এই শিক্ষা অনুসারে দুনিয়ার সকল জিনিস ও অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, এ সবের সাথে আচরণের বেলায়ও আমাদের বাস্তববাদী হওয়া কর্তব্য।

www.pathagar.com

বিবেক ও মনের সম্পর্ক

রসূলের (সা) আখ্যায়িত এই মিষ্ট ও সবুজ পৃথিবীর ব্যাপারে বিবেকের কি ভূমিকা হওয়া উচিত ? মানুষ যদি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠিত হতো, তাহলে তার দেহের জন্য একটা আলাদা লাগাম থাকতো। সেই লাগাম দিয়ে সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ঘুরাতো ও চালাতো। আর তার মনের জন্য অন্য একটা লাগাম থাকতো—যা মনকে ভিন্ন দিকে পরিচালিত করতো। এর ফলে উভয়ে উভয়কে সন্তুষ্ট করতো ও সন্তুষ্ট হতো।......কিন্তু মানুষ হলো একটা অনুভূতিশীল জীবন্ত সত্তা। আর জীবন হলো প্রবহমান একটা গোপন রহস্য। বস্তুর বাঁধ ও বন্ধন দ্বারা তাকে আটকে রাখা যায় না। সুতরাং দুনিয়ার রূপ জৌলুস ও কামনা বাসনার ব্যাপার মনের কি ভূমিকা থাকবে, সেটাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা কি আশা-আকাংখা ও আবেগ-অনুভূতিকে উপেক্ষা করবো ? না, বাস্তবতার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেব ? আমরা যেরূপ ন্যায় বিচারের অনুসারী, অন্যরাও তেমনি ন্যায় বিচারক হোক—এটা স্বভাবতই আমাদের কাম্য। এখন প্রশ্ন এই যে, সকল মানুষের প্রত্যাশা কি এই যে, মানুষ দুনিয়াতে তার প্রবৃত্তির খেয়াল খুশী অনুসারে অবাধে ও লাগামহীনভাবে চলুক ? না, তার জন্য কিছু শৃংখলা, সংযম ও শর্ত পালন অপরিহার্য ?

মন যদি শৃংখলার হাতিয়ার ও যুক্তির কেন্দ্র হতো যেমন তা শক্তি ও সজিবতার কেন্দ্র, তাহলে সে নিজেই নিজেকে শৃংখলার মধ্যে নিয়ে আসতো এবং তার ভয়ংকর শক্তিগুলোকে যুক্তির লাগামের অধীন করে নিত। যে আদর্শ ও মূলনীতিকে সে ভালো বলে জানে, তার অভিমুখেই সে যাত্রা করতো এবং মনুষ্যত্বের আজ যে অবস্থা, তা থেকে তার ভিন্নতর অবস্থা হতো। কিন্তু আল্লাহ ফায়সালা করলেন যে, শৃংখলার কেন্দ্র মন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করবে এবং তাকে পরিচালনার ককপিট স্থাপিত হবে তার মস্তিষ্কের শীর্ষে। সুতরাং মন হলো মানুষের ইঞ্জিনের বাষ্প তৈরীর বয়লার। আর যুক্তিপন্থী বিবেক হলো ঐ ইঞ্জিনের চালক। বিবেক যে আদর্শের প্রতি ঈমান আনবে, তার সৌরভে মন যখন মাতোয়ারা হবে, তখন বুঝতে হবে যে, চালক তার ইঞ্জিনের পরিচালনার ভার হাতে নিয়েছে এবং তার শক্তিকে যেখানে তার ইচ্ছা নিয়ে যেতে সক্ষম। কিন্তু বিবেক যখন এক আদর্শে বিশ্বাসী হবে আর মন ভক্ত হবে অন্য আদর্শের। তখন জানবেন যে, গাড়ীর হুইল চালকের মুঠোর মধ্য থেকে বেরিয়ে গেছে এবং ইঞ্জিন অন্ধভাবে ছুটে চলেছে। বুঝবেন যে, আরোহী ও চালক সকলেই লাগামহীনভাবে আপন খেয়াল খুশী মত চলছে। আজকের যুগের সকল মানুষের অথবা অধিকাংশ মানুষের অবস্থা ঠিক এ রকম।

www.pathagar.com

আশ্চার্যের ব্যাপার এই যে, মানুষ তার উদর সম্পর্কে প্রখর যুক্তিবাদী। কেননা উদরকে তারা বিবেকের অনুগত বানিয়েছে। বিবেক যখন বলে যে, এই ফল মিষ্টি হলেও বিষাক্ত ও ক্ষতিকর, আর এই শশা উপকারী ও বিপদমুক্ত, তখন সে এই সিদ্ধান্তকেই মাথা পেতে নেবে, এই যুক্তিকেই গ্রহণ করবে এবং ফলকে বাদ দিয়ে শশা খাবে। এ ক্ষেত্রে ফলের মিষ্টতার দ্বারাও প্রতারিত হয়ে সে তার বিষময়তার কথা ভুলে যাবে না। অথচ মনের ব্যাপারে তারা এতটা যুক্তি আশ্রয়ী নয়। কেননা মনকে তারা বিবেকের অধীন করেনি। ফলে তাকে যদি বলা হয় ঃ এই আদর্শটা সুন্দর এবং নৈতিকতার স্বপক্ষে, তাহলে উদর যেমন তাকে যে উপদেশ দেয়া হয় তা মেনে নেয়, মন তেমন মানবে না। তাই বলতে ইচ্ছা হয় যে, উদর যেমন খাদ্য হজম করে তেমনি নীতি ও আদর্শকে হজম করার দায়িত্বটাও যদি সে নিত তাহলে মন্দ হতো না। তাহলে সে উভয় রকমের কল্যাণ—বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক—লাভ করতে পারতো এবং উভয় রকমের খাদ্য—দেহের ও রূহের খাদ্য—তার অভ্যন্তরে সঞ্চালিত হতো। কিন্তু নীতি ও আদর্শের জন্য অন্য রকম একটা উদরও রয়েছে, অন্য রকম একটা মনও রয়েছে। সেটা হলো, বিদ্রোহী উদর এবং হটকারী মন। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, সত্যবাদিতা একটা মহৎ গুণ এবং মিথ্যাবাদিতা একটা জঘন্য দোষ। এমন সুন্দর কথাটাকে কেউ অবিশ্বাস করে না। কিন্তু স্বার্থ যখন সত্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সত্য বলা প্রত্যেকের পক্ষেই দুরূহ হয়ে ওঠে। এরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তির খেয়াল খুশী মোতাবেক যে কোন পথে চলতে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং চালকের (অর্থাৎ বিবেকের) পছন্দের বিপরীত চালিত গাড়ীতেই অর্থাৎ দেহে সওয়ার হয়ে যায়, তার পক্ষে মিথ্যা মিষ্টিই লাগার কথা। অনুরূপভাবে কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করা একটা মহৎ গুণ আর কৃপণতা একটা মারাত্মক দোষ। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেহ রূপ গাড়ী ঠিক তার বিপরীত দিকেই চলে। এর কারণ কি? এটা কি এই জন্য যে, মানুষের বিবেক যে আদর্শে বিশ্বাস করে, সে সেই আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে যুক্তিযুক্ত পন্থায় জীবনযাপন করে, না, এই জন্য যে, তার বিবেক ও আদর্শ রয়েছে এক প্রান্তরে আর তার মন ও কামনা-বাসনা আর এক প্রান্তরে অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী? আমরা মানুষকে ন্যায়বিচারক হবার আহবান জানিয়েছিলাম। এখন তারা কি এ ধরনের জীবনযাপন করা পছন্দ করবে? তারা কি চায় যে, যতক্ষণ ব্যক্তিগত লাভ হতে থাকবে ততক্ষণ সত্য বলা কষ্টকর এবং মিথ্যা বলা মিষ্টি লাগলে সত্য বাদ দিয়ে মিথ্যা বলার অনুমতি আমরা তাকে দেই? আর এই অনুমতি দেয়ার যুক্তি হিসেবে কি একথা বলা যাবে যে, দুনিয়াকে তো শ্যামল সুন্দর ও মিষ্টি করেই সৃষ্টি করা হয়েছে? তারা কি এটা পছন্দ করবে যে, আমরা তার সত্য বলাকে নিন্দা এবং

www.pathagar.com

কার্পণ্য করাকে প্রশংসা করি ? আর এ জন্য এই যুক্তি দেখালে কি চলবে যে, অর্থ সম্পদ হলো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও ভূষণ, আর মানুষ আশৈশব তার অনুগত ও ভক্ত ?

তাই যখন কেউ জিজ্ঞেস করবে যে, এই সুন্দর শ্যামল ও মিষ্ট পৃথিবীর ব্যাপারে মানুষের মনের অভিমত কি ? তখন আমরা তার কাছে আশা করবো যে, সে এই বিরাট পার্থক্যটাকে—যা মানুষের বিবেক ও বিশ্বাস এবং মন ও কামনা-বাসনাকে পরস্পর বিরোধী করে ফেলেছে—তার চোখ, বিবেক ও মন দ্বারা পরখ করে দেখবে। এতে হয়তো এই ঘৃণ্য অবস্থা তাকে সচকিত করবে, সচকিত হয়ে সে ঐ পরস্পর বিরোধী দু'টো অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্যোগ নেবে এবং সামঞ্জস্য বিধানের আরো শ্যামল ও মিষ্ট পৃথিবীর প্রাপ্য নির্ধারণ করবে না।

আসল ব্যাপার এই যে, আমরা এই দুঃখজনক অবস্থার প্রতিকারে একান্ত-ভাবে বাধ্য। প্রতিকার না করে মনের জন্য কোন নীতি বা বিধান নির্ণয় করতে অক্ষম।

এটাই প্রথম শর্ত। এ শর্ত ছাড়া প্রতিকারের কোন উপায় নেই। এখন বিচার্য এই যে, এ অবস্থার প্রতিকার এবং বিরাট পার্থক্যকে কিভাবে নিরসন করা সম্ভব ? সেটাকি বিবেককে মন ও তার কামনা-বাসনার অধীন করে দিয়ে, না মনকে বিবেক ও তার নিটোল আদর্শের অনুগত ও আওতাভুক্ত করে দিয়ে ?

উপরে যে প্রশ্নগুলোর অবতারণা করা হলো তার সবই 'বিবেক' সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মন সম্পর্কে অজ্ঞতার সংমিশ্রণে তৈরী। এ ব্যাপারে যা জ্ঞাতব্য তা অতি সংক্ষেপে এই ঃ মনের প্রকৃতি এই যে, তা আগ্রহ আকাংখা ও ভাবাবেগের উৎপত্তিস্থল। তাই মনে যখন পার্থিব জিনিসপত্রের মোহ, পদমর্যাদার লোভ এবং জৈবিক কামনা ও বাসনা ইত্যাকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঝোঁক ও আবেগ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন মনের যাবতীয় ইচ্ছা ও আকাংখা ঐগুলোর সাথেই সংযুক্ত হয়, ঐগুলো তার ইচ্ছার ওপর চেপে বসে এবং তার অর্থ ও মর্মকে বাহ্যিক জীবনে আচার ব্যবহার, লেনদেন ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে তাগিদ দেয় যে তা কার্যত বিদ্বেষ ও পার্থিব ঐশ্বর্য লাভের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত আত্মম্ভরিতারই সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

তবে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি বিবেককে একটা অন্তর্নিহিত অনুভূতি প্রদান করেছেন—যার অন্যতম কাজ হলো বিশ্ব প্রকৃতির যাবতীয় জিনিস যে আল্লাহর অস্তিত্বের সন্ধান দেয়, তা উপলব্ধি করা। অর্থাৎ সৃষ্টিতে

www.pathagar.com

স্রষ্টার গুণাবলী যথা শক্তিমত্তা, জ্ঞান, কর্মকুশলতা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা, দয়া ও দানশীলতা, মহত্ব ও মহানুভবতা, অনুকম্পা ও ন্যায়বিচার এবং অন্যান্য গুণের কার্যকর প্রভাব উপলব্ধি করা। মানুষের সামনে যখন আল্লাহর এসব গুণের কার্যকর প্রভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গেই তার ছবি তার মানসপটে প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত ছবি তার আল্লাহকে চেনার ফল। কেননা আল্লাহকে চেনা আসলে আল্লাহর গুণাবলী অবগত হওয়ারই অপর নাম। তাছাড়া আল্লাহকে চেনার মাধ্যমেই তাঁর প্রতি মানুষের ঈমান ও আকিদা জন্মে। তবে যে কথাটা আমাদের বিশেষভাবে বুঝে নেয়া দরকার তা এই যে, আল্লাহর গুণাবলীর কার্যকর প্রভাব যখন অন্তরে স্থানান্তরিত হবে এবং মন তাকে ধারণ করবে, তখন অনিবার্যভাবেই তার দ্বারা জৈবিক চাহিদা ও অনুভূতিগুলো অবদমিত হতে হবে, মনের উচ্চাকাংখা ও মহৎ অনুভূতিগুলো আত্মপ্রকাশ করে তার সাথে সংযুক্ত হবে, এবং মানুষের মন উচ্চ ও মহৎ অনুভূতি ও প্রবণতা দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। সেই উচ্চ ও মহৎ অনুভূতি ও প্রবণতা আল্লাহর দয়া, দানশীলতা, মহানুভবতা, ভালোবাসা, অনুগ্রহ, অনুকম্পা, বিচক্ষণতা ও কর্ম-কুশলতা এবং ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হবে। ফলে তার মন বিদ্বেষ, কার্পণ্য ও অন্যান্য খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত হবে, আল্লাহমুখী প্রবণতা তার সকল ইচ্ছা, আকাংখা ও সংকল্পের ওপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিস্তার করবে এবং তাকে ঐসব খোদায়ী গুণাবলী ও প্রবণতার মর্ম বাস্তব জীবনে ন্যায়নিষ্ঠ, দয়া, মহানুভবতা, ভালোবাসা, সদাচার ও সততাপূর্ণ লেনদেনের মাধ্যমে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত করতে প্রবল চাপ সৃষ্টি করবে।

সুতরাং আসল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো অন্তরের শূন্যতা পূরণকারী জিনিসের ধরন, প্রকৃতি ও চরিত্র। এ জিনিসটা যদি আল্লাহর পরিচয় ধারণকারী প্রজ্ঞা ও শিক্ষা হয় তাহলে মনের সকল অনুভূতি ও আকাংখা আল্লাহমুখী হবে। তখন মন হবে উৎকৃষ্টতম মূল্যবোধ, মহত্তম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্যের কেন্দ্র ও আধার। পক্ষান্তরে যখন মানুষের ওপর উদাসীনতা ও গাফিলতি প্রবল হবে অথবা তার মধ্যে এমন কোন অবস্থা বিরাজ করবে যা তার সৃষ্টির নিদর্শনগুলো পর্যবেক্ষণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, আর তার ফলে অন্তর চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি বিশ্বপ্রকৃতিতে বিরাজমান স্রষ্টার নিদর্শনাবলী অবলোকনে সক্ষম হয় না। তখন সেখানে উচ্চতর ও মহত্তর মূল্যবোধের আবির্ভাব প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। তখন সকল রকমের সৎ প্রেরণা তিরোহিত হয়ে শূন্য ও রিক্ত হয়ে পড়বে তার মন। এমতাবস্থায় মনের সেই শূন্যস্থান পূরণের নিমিত্ত প্রবল বেগে ছুটে আসবে জৈবিক চাহিদা ও ইন্দ্রিয়ের স্থূল কামনাগুলো। এভাবে এক মূল্যবোধের তিরোভাবে অন্যটার আবির্ভাব পালাক্রমে ঘটতে থাকবে।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় প্রশ্নকারী যদি পুনরায় এ প্রশ্ন তোলে যে, মিষ্ট ও নয়নাভিরাম শ্যামল পৃথিবীর ব্যাপারে মনের ভূমিকা ও অবস্থান কি হওয়া উচিত, তাহলে আমরা তার জবাবে এই প্রত্যাশাই করবো যে, সে যেন দু'টি অপরিহার্য বিষয় তার চোখ, মন ও বিবেকের সামনে রেখে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেয় ঃ

(১) যে বিরাট ব্যবধান মানুষের জীবনকে এক অপ্রীতিকর অবস্থার মুখে দাঁড় করায়।

(২) মানুষের জৈবিক চাহিদা ও তার মহৎ আদর্শের মধ্যে সমন্বয় ও সম্প্রীতি স্থাপন করত উক্ত ব্যবধান ঘুচানোর প্রয়োজনীয়তা—অর্থাৎ তার জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তির কামনাকে তার মহৎ আদর্শেরই অঙ্গীভূত করা চাই।

একমুখী হওয়া অপরিহার্য

উপরোক্ত দু'টো জিনিস থেকে আমরা এমন একটা সীমাবন্ধনের সন্ধান পাই, যা পার্থিব জীবনে আমাদের মনকে শৃংখলার মধ্যে আনতে সক্ষম। এ সীমাবন্ধনকে যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে একটি একক ও অদ্বিতীয় পথ আমাদের সামনে উন্মুক্ত দেখতে পাই। এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথে মানুষের কল্যাণ ও মর্যাদা লাভের উপায় নেই। সে পথ হলো, মনকে মহত্তম আল্লাহর আদর্শের বিরোধী যে কোন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই বিরোধী ধ্যান-ধারণাগুলো কি এবং তা থেকে মনকে মুক্ত করার উপায়ই বা কি? মনকে পবিত্র করার এই মহৎ কাজটি যখনই শুরু করতে যাবো. তখনই অনিবার্যভাবে এ প্রশ্ন দু'টো আমাদের মন ও বিবেককে বিব্রত করবে। আমাদের পক্ষে এটা মোটেই শোভন হবে না যে, কাজটা শুরু করার স্তরে পৌঁছেই নীরব হয়ে যাবো। তা শেষ করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সহকর্মীদেরকে শুধু এটুকু বলেই ক্ষ্যান্ত হওয়া উচিৎ হবে না যে, মহত্তম আল্লাহর আদর্শের বিরোধী সকল ধ্যান-ধারণা থেকে মনকে মুক্ত করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

বস্তুত অজানা কোন জিনিস থেকে মনকে মুক্ত করা কোন কালেও সম্ভব নয়। যে দায়িত্বের সীমা চৌহদ্দী চিনি না, তা পালন করার সাধ্য আমাদের নেই। সুতরাং সর্বপ্রথম জেনে নিতে হবে যে, সেই খারাপ ধ্যান-ধারণা ও কামনাগুলো কি—যা থেকে মনকে পবিত্র করা দরকার। এ কামনাগুলো এমন কিছু সংখ্যক জৈবিক চাহিদা ও ধ্যান-ধারণার সমষ্টি, যা মানুষের মনে আল্লাহর কোন চেতনা ও তাড়না সৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত কোন বায়ূ সঞ্চালিত হবার সুযোগ দেয় না। কেননা সেটা তার ধাতেই নেই। সেটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সেই চাহিদাগুলো হচ্ছে মানুষের ভেতরে বিদ্যমান পাশবিক,

www.pathagar.com

ঐন্দ্রিক ও পার্থিব লালসা থেকে উদ্ভূত। সেগুলো মাটি থেকেই সৃষ্ট। মাটি থেকেই তা খাদ্য, পানীয় ও পরিবৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করে। তাই সবসময়ই তা দুনিয়াবী বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ উপভোগের জন্য উন্মুখ ও উৎসুক থাকে। তার ইন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক ও অপার্থিব জীবিকা ও সম্পদ কেবল ততটুকুই আহরণ করতে পারে—যতটুকু অন্যান্য জীবজন্তুর ইন্দ্রিয় আহরণ করতে পারে। তাই তার ইন্দ্রিয় ও পশুর ইন্দ্রিয় সমান, তারা উভয়ে একই চারণভূমিতে বিচরণ করে এবং পৃথিবীই উভয়ের খাবারের উৎস। আল্লাহ্ তায়ালা এ জন্যই বলেছেন ঃ

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۝ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا ۝ وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝ (النزعت : ٣٠ ـ ٣٣)

"পৃথিবীকে তিনি বিস্তীর্ণ করেছেন, তা থেকে পানি ও চারণভূমি তৈরী করেছেন। আর উহাতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন জীবিকার সামগ্রী রূপে। তোমাদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য।"-(নাযিয়াত ঃ ৩০-৩৩)

অন্যত্র পৃথিবী প্রসঙ্গে—

فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۝ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۝ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝

وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۝ (عبس : ٢٧ ـ ٣١)

"তাতে রকমারি খাদ্যবীজ, আঙ্গুর, ঔষধি, জয়তুন, খেজুর গাছ, নিবীড় বাগান, ফলমূল ও লতাগুল্ম উৎপন্ন করেছি।"-(আবাস ঃ ২৭-৩১)

বলার পর বলেছেন ঃ

مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝ (عبس : ٣٢)

"তোমাদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য।"-(আবাস ঃ ৩২)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ط فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ۝ كُلُوْا

وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ۝ (طه : ٥٣ ـ ٥٤)

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর তা দ্বারা নানা রকমের উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন করেছি। খাও এবং তোমাদের পশুদের সেখানে চরাও। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

বস্তুত এ দুনিয়া মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাবারের একই উৎস, একই ডাবা। অথবা অন্য যে কোন নাম দিতে পারেন। মূল কথা একই থাকছে। এ

www.pathagar.com

বক্তব্য যদি কারো ক্রোধের উদ্রেক করে তবে আমরা আশা করবো যে, তিনি যেন আমাদের ওপর রাগ না করেন। আমরা তার উদ্দেশ্যে বলেছি যে, আসমানে পৃথিবীর জীবিকা থেকে ভিন্নতর অনেক জীবিকা আছে—যা আল্লাহ মানুষের মনে সঞ্চালিত করেন—পাকস্থলীতে নয় কিংবা পকেটে নয়। তার বান্দাদের মধ্যে যারা ঈমানের গুণে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, কেবল তাদের জন্যই সে জীবিকা তিনি তৈরী করেছেন—কেবল পশুর মত যারা খায় ও ভোগ করে তাদের জন্য নয়। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো দুনিয়ার খাবারের ডাবা থেকে চোখ ওপরে তুলে আকাশের উৎস থেকে খাদ্য আহরণ করা—যদি সে নিজেকে গরু ছাগলের চেয়ে উন্নত বলে দাবী করে।

আল্লাহর এ দু'টো কথা আমরা প্রায়ই পড়িঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا ز

হে মানুষ! জমীনে যেসব হালাল ও পবিত্র দ্রব্যাদি রয়েছে তা খাও।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ - (البقرة : ١٧٢)

"হে মুমিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র জীবিকা খাও।"

ভাবুন তো, এ দু'টো কথায় কতবড় পার্থক্য! 'হে মানুষ' ও 'হে ঈমানদার গণ' এ দু'টো কথায় যেমন বিরাট ব্যবধান, তেমনি "পৃথিবীতে যেসব খাদ্য আছে তা থেকে খাও" এবং "আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য খাও" এ দু'টো কথায় বিরাট ব্যবধান। কেননা শেষের উক্তিতে যে জীবিকার উল্লেখ রয়েছে। তাকে আল্লাহ নিজের দেয়া জীবিকা বলে অভিহিত করেছেন। সকল মানুষকে পৃথিবী থেকে উদগত খাদ্য খেতে বলা এবং ঈমানদারদেরকে বিশেষভাবে নিজের অনুগ্রহে প্রদত্ত পবিত্র খাদ্য খেতে বলায় কত সুন্দর ও সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যের ইংগীত রয়েছে, তা সহজেই বোধগম্য।

অতএব যে ধ্যান-ধারণা মানুষের শুধুমাত্র পাশবিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করে, তা থেকে মনকে মুক্ত করা এবং তার আবীলতা ও অন্ধকার ঘুচিয়ে মনকে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ করাই আমাদের কর্তব্য।

এই ধ্যান-ধারণাগুলোকে মোটামুটি নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ

প্রথমত, সেইসব ধ্যান-ধারণা ও ঝোঁক—যা মনকে দৈহিক চাহিদা ও জৈবিক কামনার এমন অনুগত বানিয়ে দেয় যে, সে কার্যত খাদ্য, পানীয়, নারী এবং রকমারি বিলাস দ্রব্য ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ভোগের উপকরণসমূহের গোলামে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, সেইসব ধ্যান-ধারণা ও ভাবাবেগ—যা মনকে উচ্চ পদমর্যাদার মোহ, আধিপত্য ও প্রভুত্ব লাভের আকাংখা এবং খ্যাতির লোভে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ছাড়ে যে, তা মানুষের মনকে পদলিপসা এবং অন্যান্য মানুষের ওপর কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লাভের উচ্চাভিলাসের গোলাম বানিয়ে ছাড়ে।

তৃতীয়ত, সেইসব ধ্যান-ধারণা ও ভাবাবেগ—যা মানুষের মনে অর্থ ও সম্পদের অদম্য লোভ সৃষ্টি করে এবং সম্পদকে দুনিয়াবী জীবনের সৌন্দর্য সুষমার উপকরণ হিসেবে গ্রহণের আবেদন জানায়। কখনো কখনো উপরে বর্ণিত প্রথম অথবা দ্বিতীয় কিংবা উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যও অর্থ উপার্জন করা হয়। সে ক্ষেত্রে অর্থ হয়ে দাঁড়ায় দেহের চাহিদা পূরণ অথবা পদমর্যাদা ও আধিপত্য লাভের উপায়। কখনো কখনো এমনও মনে হতে পারে যে, অর্থ ও সম্পদ লোভ-লিপ্সা চরিতার্থ করার তৃতীয় উপকরণ নয়। সে কথা মেনে নিলেও এটা অনস্বীকার্য যে, অর্থ ও সম্পদ কোন কোন সময় মৌলিকভাবে একটা কাম্য বস্তু হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন ঘোড়া, গবাদি পশু ও ক্ষেত খামার মানুষের কাম্য হয়ে থাকে—দৈহিক চাহিদা পূরণ কিংবা পদমর্যাদা লাভের জন্য নয় বরং একটা মৌলিক চাহিদা হিসেবে। এ বিষয়টা আল্লাহ তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতে স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝

"যে ব্যক্তি অর্থ পুঞ্জীভূত করে ও গুণে গুণে রাখে। সে ভাবে যে, ঐ অর্থ যেন তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।"-(সূরা আল হুমাযাহ ঃ ২-৩)

প্রিয় ভাই ! এটাই সেই বাতিল বস্তু—যার ধ্যান থেকে আমরা আমাদের মন ও বিবেককে মুক্ত করতে চাই এবং যার পাপ ও বোঝা থেকে তাকে স্বাধীন করতে চাই। এ কাজে যখন সফল হবো, তখন সকল সত্য আমাদের সামনে স্পষ্ট ও নির্ভেজালভাবে প্রতিভাত হবে এবং আমাদের স্বাধীনতা যথার্থ ফলপ্রসূ হবে। তবে প্রশ্ন হলো, আমাদের মনকে তার এই আবিলতা থেকে মুক্ত করার উপায় ও পন্থা কী ? বাতিল ধ্যান-ধারণা তো আমাদের কাছে চিহ্নিত হয়েছে। এখন কথা হলো, মনের ওপর তার বিরাজমান প্রভুত্ব ও আধিপত্য কিভাবে উৎখাত করা যাবে ?

এজন্য কি বিরাট এক সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে এই শত্রুর ওপর এক চূড়ান্ত হামলা চালাতে হবে ? হামলা যে একটা চালাতেই হবে, তাতে সন্দেহ নেই।...অনুপ্রবেশকারী যে আগ্রাসী শত্রু তার রাজ্য গ্রাস করে সেখানে আপন শাসন চালু এবং স্বাধীন মানুষকে অবমাননাকর দাসত্ব ও দারিদ্র্যের নিগড়ে আবদ্ধ করে, প্রবৃত্তির লালসা ও ইন্দ্রিয়ের ভোগ-বাসনা তার সাথে খুবই

www.pathagar.com

সাদৃশ্যপূর্ণ এবং কোন অংশেই তার চেয়ে কম মারাত্মক শত্রু নয়। কোন আগ্রাসী দখলদার শত্রুকে কি বিনা যুদ্ধে অধিকৃত প্রাচুর্যময় উপনিবেশ ছেড়ে যেতে দেখেছেন? তা যদি দেখে থাকেন তাহলে জানবেন, ঐসব সর্বনাশা জৈবিক কামনা এবং ঐন্দ্রিক ভোগ-লিপ্সাগুলোরও বিনা যুদ্ধে ও বিনা সংগ্রামে আপন উপনিবেশ 'মন'কে ত্যাগ করে চলে যাওয়া সম্ভব। যদি কখনো দেখে থাকেন যে, শত্রুর পদানত কোন জাতি শুধুমাত্র স্বপ্নীল আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেই আপন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে, তাহলে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, নিছক নেতিবাচক আশা এবং নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় স্বপ্ন ও অভিলাস পোষণ করেই তার সেই বেপরোয়া দখলদারের হাত থেকে মনকে স্বাধীন করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা যদি আপনাকে একথা বুঝাতে পেরে থাকে যে, ব্যাপারটা কোন তামাসা নয় বরং অত্যন্ত কঠিন ও মারাত্মক এবং মুক্তির জন্য পদানত জাতিকে সর্বশক্তি নিয়ে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া জরুরী, তাহলে আপনার এ বুঝটাই সত্য, যথার্থ ও নির্ভুল। এই ধরনের সর্বাত্মক সংগ্রামই শত্রুকে হটিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে এবং স্বাধীনতা ও স্বাধিকার ফিরিয়ে আনতে পারে। নিকট ও দূরের ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে যদি আপনি এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরে থাকেন তাহলে এটাও জেনে রাখুন যে, আমাদের এই অসাধারণ মূল্যবান মন যদি উপনিবেশে পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে মুক্ত করতেও এ ধরনেরই এক যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কিভাবে এই যুদ্ধ পরিচালনা করবো? কিভাবে তার বাহিনী ও রসদ জোগাড় করবো? কারা তার সৈনিক এবং কী তার অস্ত্র —যা সংগৃহীত হওয়া দরকার?

এর জবাব এই যে, কাজটা অত্যন্ত গুরুতর হলেও এর উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা অত্যন্ত সহজ। মনকে স্বাধীন করার এই যুদ্ধের সৈনিক তার সন্তানরাই তথা মন রূপ উপনিবেশের মালিকরাই। আর মনের সন্তান তারই আবেগ অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

কোন দেশ শত্রুর পদানত হলে তা মুক্ত করার একমাত্র উপায় হলো, তার সন্তান তথা অধিবাসীদেরই মুক্তিযুদ্ধে এগিয়ে আসা। তা না করে সবাই যদি নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহলে তাদের শক্তি ও তেজ নিষ্ক্রিয় ও বিলুপ্ত হবে এবং তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় শত্রুর হটে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আকাশ থেকে যদি কোন অকল্পনীয় ও অলৌকিক সাহায্য আসে তাহলে ভিন্ন কথা। অনুরূপভাবে মন যখন শত্রু দ্বারা দখলীকৃত হবে, তখনও তাকে মুক্ত করতে হলেও তারই সন্তান ও অধিবাসীদের সেই লক্ষ্যে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য। এক্ষেত্রে মনের সকল ভাবাবেগ যদি

www.pathagar.com

যেমন ছিল তেমনই থাকে এবং সকল ধ্যান-ধারণাই যদি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলে, তাহলে তার ইচ্ছাশক্তি লোপ পাবে এবং ঐক্য ছিন্নভিন্ন হবে। এমতাবস্থায় বাতিলের গোমরাহী ও কুসংস্কার থেকে মানুষের মুক্তি সুদূর পরাহত। মনের সৈনিকদেরকে এবং তার রকমারি সংকল্প ও ইচ্ছাকে সুসংহত করা একান্ত প্রয়োজন। মনের আবেগগুলোতে সংকল্পের উপস্থিতি প্রয়োজন অথবা সংকল্প বদ্ধ আবেগ প্রয়োজন। যে আবেগে সংকল্পের উপস্থিতি নেই, তা ক্ষয়িষ্ণু আবেগ ও স্থিতিহীন ধ্যান-ধারণা। এর দ্বারা নেতিবাচক ও স্থবির জীবন ছাড়া আর কিছু অর্জিত হয় না। আর সংকল্পবদ্ধ আবেগ হলো সক্রিয় আবেগ—যা মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সত্তায় ইতিবাচক জীবনের চঞ্চলতা এনে দেয়। একমাত্র সক্রিয় ও সংকল্প দৃঢ় আবেগই মানুষকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্মচঞ্চল ও তৎপর রাখে। এই সংকল্প বর্জিত হলে সে একটা নিরেট বিচরণশীল বস্তু মাত্র। সে আর অন্যান্য প্রাণী তখন সমান। এই সমস্ত সংকল্পহীন ও নিষ্ক্রিয় লোকদেরকেই আমরা আহবান জানাই যে, তারা চেতনা ও সম্বিত ফিরে পাক, মনের আবেগ উচ্ছ্বাস ও ধ্যান-ধারণাকে সংহত করুক এবং তাদের ইচ্ছা শক্তি জড়তা ও স্থবিরতা কাটিয়ে উঠুক। এভাবে কারো সত্তা যখন সংকল্পে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে ; তখন সে ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারবে যে, সৈনিক এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তার অস্ত্র ছাড়া আর কোন জিনিসের অভাব নেই।

প্রিয় ভাই ! যুদ্ধের প্রথম সরঞ্জাম হলো সংকল্পবদ্ধ হওয়া এবং সংকল্পহীন জীবন যাপন থেকে বিরত থাকা। আর এ কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়। মহৎ জীবনযাপন করতে হলে তাতে কি কোন টাকা-পয়সা ব্যয় হতে দেখেছেন কিংবা কোন কঠিন পরিশ্রমের আবশ্যকতা দেখেছেন ? এতে মাত্র একটা জিনিসেরই প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। তাহলো এই যে, ভাবাবেগকে মজবুত ও অটল বানাতে হবে, মনের ধ্যান-ধারণাকে করতে হবে সুসমন্বিত। আর নজর রাখতে হবে নিজের পৌরুষ ও বাহাদুরীর ওপর কিংবা ঐ পৌরুষের উপাদান-গুলো ঠিক থাকে কিনা সে দিকে।

দৃঢ়সংকল্প হতে হবে

এখন দেখতে হবে, মনে যে সংকল্পের সমাবেশ ঘটেছে এবং যা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, সেই সৈনিকের যুদ্ধাস্ত্রটা কী ? তা কি তরবারী, না বন্দুক, না কামান ? হাঁ, সবই। তবে তা লোহার নয় সত্যের ধাতুতে তৈরী তরবারী, আল্লাহর নূরের রশ্মী দ্বারা গুলী হয় এ বন্দুকে, আগুনের শীখা দ্বারা নয়। এটা এমন কামান—যা গোলাগুলী চালিয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি করে না, বরং তা হককে বাতিলের ওপর নিক্ষেপ করে বাতিলের বিনাশ ঘটায়। সুতরাং হক বা সত্যই হলো এই সংগ্রামের সৈনিকদের আসল অস্ত্র। এ ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র

www.pathagar.com

ধারণ করা হলে যুদ্ধটা মনের স্বপক্ষে না হয়ে বিপক্ষে চলে যাবে। ঠিক যেন দখলদার শত্রুর পক্ষে হয়ে মাতৃভূমির বিরুদ্ধে লড়াই করা যা বিশ্বাসঘাতক অপরাধীরাই হানাদারদের দোসর সেজে স্বজাতির বিরুদ্ধে করে থাকে। বস্তুত এই সংকল্পগুলোর নেতৃত্ব যদি হক আপন হাতে না নেয় তাহলে বাতিল তাকে করায়ত্ব ও পদানত করবে এবং ইচ্ছামত আপন উদ্দেশ্য ব্যবহার করবে।

তাই মনকে বাতিলের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার জন্য যারা সংগ্রাম করবে, তাদের হক বা ন্যায়ের অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে। হকই তার ঢাল এবং সেই সাথে তার অস্ত্রও। কাজেই সংকল্পগুলোকে হকের জ্যোতি ও হকের আগুন দ্বারা বলিয়ান হতে হবে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই অস্ত্র তার হাতে তুলে দেয়ার উপায় কী? হক কথা অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত। কেমন করে তা এই সৈনিকদের হাতে সমর্পণ করবো?

স্বভাব ধর্মে প্রত্যাবর্তনই মনের রাহু মুক্তি নিশ্চিত করতে সক্ষম

সুপ্ত বিবেক ও বুদ্ধির গভীরতম স্তরগুলোতেই সত্যের নিভৃত অবস্থান। আমরা আপনাকে বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে, দার্শনিকদের নিগূঢ় দর্শনে কিংবা মগজকে থিতিয়ে দেয়া অন্য কোন ক্লান্তিকর বিদ্যার হাতে সমর্পণ করতে চাই না। বরং আপনারই সত্তার ভেতরে যে স্বভাবধর্ম বিরাজিত, তার হাতেই আপনাকে সমর্পণ করতে চাই। এই স্বভাব ধর্মই (তথা মানবসত্তার আদি, অকৃত্রিম ও মৌলিক প্রাকৃতিক অবস্থানই) সত্যের বা হকের উৎস। এখানেই হকের তীর বর্শা সঞ্চিত। এটাই সত্যের জ্যোতি ও আগুনের জ্বলন্ত চুল্লী। এখান থেকেই সত্যের সৈনিকের সাজ-সরঞ্জাম গ্রহণ করা কর্তব্য। এসব তীর বর্শা দিয়েই সজ্জিত করা উচিত নিজের প্রতিটা সংকল্পকে। সংকল্প একটা ধনুক বিশেষ—যা হকের তীর নিক্ষেপ করলে তা হবে নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধের অব্যর্থ ও চূড়ান্ত মার।

এসব রূপক শব্দের ব্যবহার দ্বারা আমাদের লক্ষ্য শুধু এই যে, সংকল্প দৃঢ় মানব তার মৌলিক স্বভাবগত সত্তায় ও আসল প্রাকৃতিক অবস্থানে ফিরে আসুক। তাহলে জীবনের আসল রূপ সেই আলোকে নিরীক্ষণ করতে পারবে। আমরা চাই, সে এই আসল প্রাকৃতিক অবস্থানের ভেতর দিয়েই প্রতিটা জিনিস দেখুক। আমরা তো কত জিনিসই দেখি। কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপ পুরোপুরি দেখতে পাই না। বরং অনেক সময়ে তার অপ্রকৃত রূপটাই দেখি। কেননা আমরা ঐসব জিনিস চর্মচক্ষু দিয়েই দেখি, অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখি না। এই শেষোক্ত দৃষ্টি দিয়ে যখন সব জিনিস দেখবো তখন তার প্রকৃত স্বরূপটা আলোয়

www.pathagar.com

উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং মনের ওপর যেসব বাতিল ও অস্বচ্ছ ধ্যান-ধারণা ছায়া ফেলেছে, তাকে অপসারিত করবে।

এ থেকে বুঝা গেল যে, মৌলিক প্রকৃতিগত অবস্থান আসলে এমন এক টেলিস্কোপ, যার দ্বারা সকল জিনিসের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা আসল চেহারা ও স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে নজরে আসে। প্রকৃতিগত দৃষ্টি সত্যের নিক্ষিপ্ত তীর বা বর্শা স্বরূপ। এর তীব্র ধারালো ফলা বাতিলের আবরণকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে মনের আসল স্বরূপ ফুটিয়ে তোলে। কাজেই আমাদেরকে দৃঢ় সংকল্পে উজ্জীবিত হতে হবে এবং জীবনের আসল স্বরূপ ও বাস্তবতার প্রতি নজর বুলাতে আমাদেরকে আসল ও প্রকৃতিগত অবস্থানে ফিরে যেতে হবে। এভাবে যখন কোন জিনিস নজরে পড়বে, তখন তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে, তার বাহ্যিক বৈশিষ্টগুলো যাতে আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার না করে এবং আমাদেরকে তার সাথে বা সামনে টেনে নিয়ে না যেতে পারে, সে ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সংকল্পকে সংহত করে মজবুত অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। তার কাছে নিজের মূল স্বভাবটাকে অথবা নিজের সূক্ষ্মদর্শী অণুবীক্ষণটাকে হাজির করুন এবং তার পেছন দিক দিয়ে গভীরভাবে তাকান। কেননা মিথ্যা দৃশ্যাবলী তার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা দ্বারা উৎখাত হয়ে যায় এবং দৃশ্য বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আপনার বিবেক ও মনের সামনে প্রতিভাত হয়।

এমন বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে যার সংশোধন ও প্রায়শ্চিত্ত আমাদের অজান্তেই হয়ে যায় এবং এমন বহু কলংকময় অবস্থা থাকে যার কলংক অজানা। বাহ্যিক চাকচিক্য আমাদেরকে অনেক সময় প্রতারিত করে। অথচ সে প্রতারণাকে আমরা মেনে নেই। অনেক সময় লোকদেরকে ভ্রান্ত মানদণ্ড দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের মান নির্ণয় করতে দেখি এবং নিজেরাও তাদের মতই মান নির্ণয় করি। এ রকম আরো কত কিছু করি। সেসব বিষয় যদি যথার্থ নির্ভুল দৃষ্টিতে দেখি, তা হলে তার মধ্যে কোন্ দিকটা সত্য, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং বাতিলের প্রতারণা ও শঠতা ধরা পড়ে। আমাদের সমগ্র জীবনটাই বলতে গেলে এ জাতীয় মিথ্যাচার ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। মানুষ বাতিলের ভ্রান্ত রূপকে কল্পনায় স্থান দেয়ার জন্য এসব মিথ্যাচারকে মেনে নেয়। এগুলোর কোন উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু পর্যবেক্ষণ করাই যথেষ্ট। এখানে আমি একটা বড় ধরনের মিথ্যাচারের কথা বলবো, বরং সত্য বলতে কি, এটা একটা মারাত্মক বাতিল বক্তব্য। কেননা এর মধ্য দিয়েই মানুষের বিবেকে ও মনে নানা রকমের বেহুদা ধ্যান-ধারণা ও ভোগ-লিপ্সার জন্ম হয়। বাতিল এ পৃথিবীতে অমূলক ধ্যান-ধারণায় পরিপূর্ণ একটা মারাত্মক

www.pathagar.com

বুদবুদ ছুড়ে দিয়েছে। সে বুদবুদ বিস্তীর্ণ ফেনা হয়ে সমগ্র মানবজাতির মন ও বিবেককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অবশ্য মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক এর ব্যতিক্রম যাদেরকে আল্লাহ নিজেই রক্ষা করেছেন। অধিকাংশ মানুষ সেই বিভ্রান্তির ধ্যান-ধারণার বাহ্যিক দীপ্তি ও চাকচিক্যের ওপর নির্ভর করেই চলে এবং তার শঠতাপূর্ণ প্ররোচনা অনুসারেই কাজ করে। সেই বিভ্রান্তিকর মিথ্যা ধারণাটা হলো এই যে, জীবন আর কিছু নয়—কেবল পানাহার, ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি ও বঞ্চনার সমাহার। মানুষের একমাত্র করণীয় হলো কঠোর পরিশ্রম, চেষ্টা-সাধনা, সর্বপ্রকার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সম্পদ ও ভোগের উপকরণ করায়ত্ব করা। দারিদ্র থেকে আত্মরক্ষা ও ধনাঢ্য হবার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, জীবনকে যথাসাধ্য সুখ ও আনন্দে ভরিয়ে তোলা এবং যা কিছু অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর তা থেকে নিজেকে যতটা পারা যায় নিরাপদ ও সুরক্ষিত করা। এ ধারণা অনুসারে মানুষের একমাত্র বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, পৃথিবীতে তার আগমনের উদ্দেশ্য শুধু খাওয়া, পান করা, বংশ বৃদ্ধি করা ও তারপর মারা যাওয়া। এভাবে নিষ্ঠুর ধ্বংস এসে এক সময় তার জীবনের সমগ্র ইতিহাসের যবনিকাপাত ঘটাবে। এই হলো, সেই মিথ্যা ধ্যান-ধারণার বিরাট বুদবুদ বা ফেনা, যা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে এবং এর বাহ্যিক চাকচিক্য ও আলোতে মানুষ প্রতারিত ও বিভ্রান্তি হয়ে মরিচিকার মত তার পেছনে ধাবিত হয়েছে। বংশানুক্রমে মানুষ এ মরিচিকাকে অনুসরণ করে লক্ষহীন পথহারা কাফেলাচ্যুত পথিকের মত কূলকিনারাহীন প্রান্তরে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে প্রশ্ন জাগছে না যে, এ জীবন কী এবং আমরা কেন এ দুনিয়ায় এসেছি ? কোথায় আমরা ছিলাম ? কোথায় আমাদের গন্তব্যস্থান ? এ ধরনের কোন প্রশ্নই তাদের মনে উদিত হয় না। বরং জীবনকে শুধু এ রকমই ভাবা হয় যে, মানুষ মায়ের উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হবে, তারপর এক সময়ে কবরের উদরে যাবে, আর এই দুই উদরের মাঝখানে যে সময়টুকু পাবে তা শুধু নিজের উদরপূর্তির চিন্তা করেই কাটাবে। অথচ সে উদর কখনো পরিতৃপ্ত হবার নয়। এর আগে পিছে যেন তার আর কোন আদি, অন্ত ও গন্তব্য নেই এবং এ জীবনের পশ্চাতে যেন কোন নিগূঢ় রহস্যও নেই। ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা স্ফীত বাতিলের এই বিশালকায় বুদবুদটির বক্তব্য এটাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই বক্তব্য কি সঠিক ? আমরা শুধু খাবো, পান করবো, বংশ বৃদ্ধি করবো, তারপর একদিন মরে বিলীন হয়ে যাবো—এজন্যই কি আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ? আপনার বিবেকের চোখ ও স্বভাবের চোখ দিয়ে কি এটাই দেখতে পান যে, জীবনের এমন তুচ্ছ লক্ষ্য ও এমন প্রহসনমূলক সমাপ্তি আল্লাহর দৃষ্টিতে আদৌ গুরুত্ব পেতে পারে ? আর এ জন্যই কি তিনি মানুষকে এমন সুন্দরতম গড়ন দিয়ে সৃষ্টি করলেন ? আর এহেন সৃষ্টি উপলক্ষে

www.pathagar.com

উৎসবের আয়োজন করতে তিনি কি এমন এক অপূর্ব ও চমৎকার এক বিশ্ব সৃষ্টি করলেন যার নিয়ম ও শৃংখলা সুষ্ঠু ও সুসংহত এবং যার নিদর্শনাবলী ও দৃশ্যাবলী অতুলনীয় ? শুধু খাওয়া ও পান করার কাজ সুসম্পন্ন করতে কি এমন কাব্যময় প্রতিভার অধিকারী, চিন্তাশীল ও অনুগত গড়নের কোন প্রয়োজন ছিল ? অন্য রকমের একটা গড়ন দিয়ে সৃষ্টি করলে কি চলতো না ? এমন তুচ্ছ ও নগণ্য ধরনের কাজ সম্পন্ন করতে তার জন্য এমন চমৎকার ও সম্ভ্রান্ত জগত সৃষ্টি না করে ঐ কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা নগণ্য ও ক্ষুদ্র জগত সৃষ্টি করাই কি যথেষ্ট হতো না ? এটা কি তাহলে আল্লাহর একটা ফালতু কাজ ? না, তারা অন্য কিছু বলতে চান ? তারপরেও কথা হলো, তাকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করলেন ? শুধুই কি পানাহারের জন্য ? পৃথিবীর সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণের কাজ করে তিনি কি বিরক্ত হয়ে গেছেন যে, অবশেষে এই পেটুক প্রাণীটাকে সৃষ্টি করে নিজের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করতে গেলেন ? অথবা তাঁকে কি কোন নেশা বা বাতিকে পেয়েছে যে, এ তামাশা সৃষ্টি করে তার দৃশ্য দেখে চিত্ত বিনোদন করতে চেয়েছেন এবং আবহমান কাল ধরে এভাবেই আপন সৃষ্টি নিয়ে তামাশা করে চলেছেন ? কখ্খনো তা হতে পারে না। বস্তুত এ এমন এক প্রশ্ন, যা মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যা দ্বারা মানুষের বিবেক পাপমুক্ত হয়, মানুষের প্রকৃতিতে নব অভ্যুত্থানের সূচনা হয় এবং সত্যের প্রচণ্ড আঘাত দ্বারা তাকে বাতিলমুক্ত করা হয়। বাতিলপন্থীদের ঐসব ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর অসীম প্রজ্ঞা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এমন একটা বেহুদা উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত হওয়ার বহু উর্ধে। এমন একটা বাজে কাজের জন্য এমন চমৎকার ও অপূর্ব সত্তা সৃষ্টি করাতো দূরে থাক, তিনি এজন্য একটা মামুলী মাছিও সৃষ্টি করতে পারেন না। কেননা তিনি বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ ۝ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَهُ مِنْ لَدُنَّا وَإِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ ۝ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ۝

"আমি আকাশ, পৃথিবী এবং তার মধ্যকার যাবতীয় জিনিস নিতান্ত প্রহসন ও তামাশাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। তামাশাই যদি করতে চাইতাম—তাহলে আমি নিজ থেকেই তা করতাম—যদি সত্যিই তার করার ইচ্ছা থাকতো, আমি তো বরং সত্যকে দিয়ে বাতিলের ওপর আঘাত হেনে থাকি, সে আঘাত বাতিলকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং তা সম্পূর্ণ উৎখাত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তোমরা যেসব অলীক বর্ণনা দিচ্ছ তা তোমাদের সর্বনাশই ডেকে আনবে।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৬-১৮)

www.pathagar.com

কাজেই আপনি যখন সৃষ্টিজগতের নিদর্শনের ওপর স্বাভাবিক দৃষ্টি নিক্ষেপের উদাহরণ চাইবেন, তখন আমরা উল্লিখিত প্রশ্নকেই আপনার সামনে তুলে ধরবো। কেননা এ প্রশ্ন তারই সমপর্যায়ের। আর আপনি এও দেখতে পেয়েছেন যে, এ প্রশ্ন এত সহজ যে এতে আদৌ কোন অস্বাভাবিকতা বা কপটতার অবকাশ নেই। কারণ সে প্রশ্ন উৎসারিত আপনার মন ও বিবেক থেকেই অথবা আপনার অভ্রান্ত স্বভাবগত যুক্তি থেকে। আর যখন সত্যের বহু সংখ্যক তাৎপর্যের মধ্য থেকে যে কোন একটির উদাহরণ চাইবেন, তখন একথা জানবেন যে, সত্য এত সহজ জিনিস যে, তা উপলব্ধি করতে মানুষের বোধশক্তি মোটেই জটিলতার সম্মুখীন হয় না। কাজেই এই যে অব্যর্থ ও প্রবল বোধশক্তি, যা আপনার অন্তরাত্মাকে দুর্জয় শক্তিতে বলিয়ান করে তোলে এবং যার বলে আপনি বুদবুদের মত ভঙ্গুর অসত্য ও তার পাপকে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম, সেটাই আসল সত্য বা হক। সত্য এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।...সত্য সেইসব পুঁথিগত মতবাদ নয় যা বই কিতাবে লিপিবদ্ধ যাকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা শেখে এবং এক জাতি তা দ্বারা অন্য জাতির ওপর বিশিষ্টতা অর্জন করে। বরং মানুষ যখন আপন উদর ও ভোগ-লিপ্সার পরিবর্তে তার স্বভাব তথা আল্লাহপ্রদত্ত অধিকৃত বিবেক ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে নিদর্শনাবলীর ওপর নজর বুলায় তখন যে উপলব্ধি ও চেতনা তার সমগ্র মানস জগতে প্লাবনের মত ছড়িয়ে পড়ে, সেটাই হক—সেটাই মহাসত্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় আদি, আসল ও শাশ্বত সত্যের কিছু অংশ। এর সাথে বাতিলের কোন সংশ্রব বা সংমিশ্রণ কোন দিক থেকেই ঘটতে সক্ষম নয়। বাতিল ধ্যান-ধারণা থেকে মনকে পবিত্র করেই আমরা এর নাগাল পেতে সক্ষম হয়েছি। সত্যের আলোক বিকিরণের পথে মনকে উন্মুক্ত করে তুলে ধরতে পেরেছি বলেই তা আলোকে উদভাসিত হতে পেরেছে। অন্য কথায় বলা যায়, বিকারমুক্ত স্বভাবের দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি বলেই তার সন্ধান পেয়েছি। মানুষ যখন এভাবে নিজের মনকে বিকারমুক্ত ও বাতিলের প্রভাবমুক্ত করে প্রদীপ্ত সত্যের আওতাধীন জীবনযাপন করবে, তখন সে প্রতিটি জিনিসের মধ্য দিয়ে সত্যের লিখনই পড়বে, সে অনুভব করবে যেন প্রতিটি বস্তুর মধ্য দিয়ে তার ওপর একটা রূহ বা আত্মা নাযিল হচ্ছে। ফলে প্রতি মুহূর্তে তার নবজীবন লাভ হচ্ছে, নতুন জাগরণ ও চেতনার সঞ্চার হচ্ছে এবং নতুন নতুন তত্ত্বজ্ঞান আহরিত হচ্ছে।

পদমর্যাদাধারী ও বিত্তশালীদের মনের পরিশুদ্ধির বাস্তব উদাহরণ

সর্বপ্রথম একথা জানা দরকার যে, পদমর্যাদা, রাজত্ব ও ধন ঐশ্বর্যের মোহ থেকে মনকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ এ নয় যে, কোন বৈধ উপায়েও তা অর্জন

www.pathagar.com

করা যাবে না। ইতিপূর্বে 'জোহদ' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে উপায়ের কথা বলেছি, সে উপায়ে অবশ্যই সম্পদ অর্জন করা যাবে। আল্লাহর নবী হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের কথাই ধরুন। তিনি আল্লাহর কাছে এমন রাজত্ব চেয়েছিলেন যা তার পরবর্তীকালে আর কেউ পাবার অধিকারী হবে না। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। তাঁকে যে সাম্রাজ্যের অধিকারী করেছিলেন তার কোন কোন দিক ইতিপূর্বে তাঁর কাহিনীতে উল্লেখ করেছি। তাঁর এ সাম্রাজ্য চাওয়া কি রাজ্য লিপ্সা জনিত ? প্রবৃত্তির তাড়নাই কি তাকে এ প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল ? আর সেই বিশাল সাম্রাজ্য পেয়ে তিনি কি অন্যান্য ভোগবাদী বিলাসপ্রিয় শাসকদের মত তার অপব্যবহার করেছেন ? কখ্খনো নয়। তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে নয়—বরং আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই এবং তাঁর দ্বীনের প্রয়োজনেই তা চেয়েছিলেন এবং আল্লাহর পসন্দনীয় উপায়েই তা ব্যবহার করেছেন। জ্বিনদের মধ্যে অনেকেই অনুগত খাদেম হিসেবে তাঁর সামনে কাজ করতো এবং তা আল্লাহর হুকুমেই করতো শয়তান বা অন্য কোন স্বৈরাচারী বলদর্পীর নির্দেশে নয়। মানুষের অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তাঁর ছিল গোয়েন্দা পাখী। তবে সে পাখী হেদায়াত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যেই গোয়েন্দাগিরী করতো। এসব পাখীকে তিনি কারো ব্যক্তিগত ঘরোয়া অবস্থা জানার জন্য নিয়োগ করতেন না—বরং কেবলমাত্র আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং শুধুমাত্র গোমরাহীর মোকাবিলার জন্যই নিয়োগ করতেন। রাজা-বাদশাদের সাথে তিনি চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও করতেন কিন্তু নিজের নামে নয় এবং নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যও নয়। তিনি কিভাবে চিঠি পাঠাতেন, সে সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ঃ

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَّا تَعْلُوا عَلَىَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (النمل : ٣٠ - ٣١)

"এ চিঠি সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং পরম করুণাময় ও সর্বপ্রদাতা আল্লাহর নামে। তোমরা আমার ওপর পরাক্রান্ত হতে চেষ্টা না করে আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে চলে এসো।"-(আন নাম্‌ল ঃ ৩০-৩১)

তাঁর সেনাবাহিনীও ছিল। তাঁর সমতুল্য কোন সেনাবাহিনী পৃথিবীতে ছিল না। কিন্তু সেই শক্তি কি তাকে স্বেচ্ছাচারী বানাতে পেরেছিল ? সে বাহিনীকে কি তিনি মানুষকে দাবিয়ে রাখবার কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন ? না, শুধু সত্য ও আল্লাহর প্রতি ঈমানকে সমর্থন যোগানোর জন্য তাকে নিয়োজিত রেখেছিলেন ? তাঁর এমন প্রতাপশালী বাহিনীকে কি তিনি 'সাবা' রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন যার মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না ? যেটুকু

www.pathagar.com

ছিটে-ফোঁটা শক্তি প্রয়োগ তিনি করেছিলেন সে তো শুধু এ জন্য যে, তাঁর ঈমানের দাওয়াতের জবাবে সাবাবাসী দরকষাকষির কৌশল অবলম্বন করেছে বলে মনে হচ্ছিল।

বস্তুত এটাই ছিল হযরত সুলায়মানের সাম্রাজ্য প্রার্থনার উদ্দেশ্য। তবে তাঁর কামনা, বাসনা এবং মনের আবেগ ও অভিলাশ সম্পর্কে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাঁর এসবই ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তাঁর কাছে যে উচ্চ মর্যাদার আসন প্রত্যাশা করে থাকে, তিনি শুধু সেটাই প্রত্যাশা করতেন। আমাদের এ উক্তির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে আল্লাহর কাছে তাঁর নিম্নোক্ত বিনীত আকুতির মধ্যে ঃ

رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ

اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ۝

"হে আমার রব ! তুমি যে নিয়ামত দ্বারা আমাকে ও আমার পিতামাতাকে ভূষিত করেছ তার শোকর আদায় করার ক্ষমতা আমাকে দাও। তুমি যে নেক আমলে খুশী হও, তা আমাকে করবার তওফিক দাও এবং তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎ বান্দাদের মধ্যে আমাকে শামিল কর।"

–(সূরা আন নামল ঃ ১৯)

আল্লাহ 'জোহদ' এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য এই বাস্তব উদাহরণটি পেশ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন একজন নেক বান্দা উচ্চ পদপর্যাদা, অসাধারণ প্রাচুর্য, অঢেল বিলাসদ্রব্য ও মোহনীয় উপকরণে পরিবেষ্টিত হয়ে কিভাবে জীবনযাপন করে এবং এমন কঠিন অবস্থায়ও কিভাবে তাঁর মন এসবের চেয়েও উচ্চ ও মহৎ মর্যাদার জন্য উৎসুক হয়, কিভাবেই বা সে তার একচ্ছত্র মালিকানাভুক্ত উচ্চ পদ, ধন-সম্পদ ও শক্তি সামর্থকে সত্যের সমর্থনে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিয়োজিত করে। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আমরা কোন ফালতু ও অলীক বিষয়ের দিকে আহবান করছি না। আমাদের এ পবিত্র দ্বীন জীবনের বাস্তবতা থেকে পিছিয়ে থাকার শিক্ষা দেয় না। কাজেই প্রবৃত্তির গোলামী মেনে নিয়ে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী ও বিপথগামী হয়, তার বিপর্যয় অবধারিত।

সম্পদ ও রাজত্ব যত খুশী কামনা ও অর্জন করুন। তাতে কারো কোন আপত্তি থাকবে না। তবে নিছক ভোগের লিপ্সা, প্রাচুর্যের মোহ এবং অহংকার ও ঔদ্ধত্যের প্রতিযোগিতার অদম্য বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য যে সম্পদ ও ক্ষমতা আসকারা দেয়, আর পৃথিবীকে অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে পবিত্র করা এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যে সম্পদ ও ক্ষমতা প্রেরণা ও উৎসাহ দেয়—এই দুই ধরনের সম্পদ ও ক্ষমতায় দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান।

www.pathagar.com

হযরত ইউসুফের উদাহরণ

আর একটা দৃষ্টান্ত নিন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের। তিনিও উচ্চ পদ চেয়েছিলেন। তবে হযরত সুলায়মানের মত আল্লাহর কাছে নয়। চেয়েছিলেন মিসরের বাদশাহর কাছে। এতে অবশ্য হযরত ইউসুফ (আ) দোষের কিছু করেননি। পরিবেশ অনুসারে কথা বলাই নিয়ম। স্থান কাল পাত্রের বিশেষত্ব বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেই পরিবেশের ধরন ও প্রকৃতির দাবীই ছিল এই যে, আল্লাহ মিসরবাসীকে যে সচ্ছলতা ও সম্মান প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাকে কার্যকর করার জন্য তিনি আল্লাহ প্রদত্ত প্রেরণা ও প্রজ্ঞার আলোকে বাদশাহর কাছ থেকে যথোপযুক্ত সরকারী পদ প্রার্থনা করবেন। অথচ এই পদ লাভের পর আল্লাহর কাছে তিনি কিভাবে সবিনয়ে প্রার্থনা জানান, তা এখানে লক্ষ্যণীয় ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ج

"হে আমার রব ! আপনিই তো আমাকে রাজত্ব দান করেছেন এবং কথার ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ১০১)

এ একটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি। এ দ্বারা পরোক্ষভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত ইউসুফের আসল লক্ষ্য ও কাম্যবস্তু এসব রাজত্ব ও সম্পদের মোহনীয় রূপ নয় বরং এর চেয়ে অনেক উর্ধের জিনিস। আর এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষের কাছে ক্ষমতার মসনদ চাওয়া খোদ্ আল্লাহর কাছে চাওয়ার চেয়ে নিকৃষ্টমানের কাজ নয়। আমি তো আগেই বলেছি যে, সম্ভাব্য সকল বৈধ পার্থিব উপায়ে সম্পদ, পদ ও ক্ষমতার আসনলাভের চেষ্টা করাটা মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। বিশেষত তা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই হবে। উপরোক্ত দু'টো উদাহরণই এ উদ্দেশ্য বর্তমান। হযরত ইউসুফ মিসরের বাদশাহকে বলেন ঃ

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ ج اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ○

"আমাকে মিসরের ক্ষমতার চাবিকাঠি দিয়ে দিন। আমি দায়িত্বশীল এবং অভিজ্ঞ।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ৫৫)

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মগৌরবের কামনায় বিভোর একজন ক্ষমতালোভী গোলাম যেভাবে অত্যন্ত হীন পন্থার আশ্রয় নিয়ে সরবরাহ বিভাগের তদারকীর দায়িত্ব প্রার্থনা করে, হযরত ইউসুফের কথায় কি তার লেশমাত্রও লক্ষ্য করছেন ? তাঁর কথায় বরঞ্চ পূর্ণ সম্ভ্রমবোধের সাথে প্রার্থনা পরিস্ফুট। যে ব্যক্তি নিজের জন্য নয় বরং পরের সেবা ও কল্যাণের জন্য পদ চায়, এমনকি, একটি আসন্ন বিপদ থেকে দেশবাসীকে উদ্ধারের নিমিত্ত নিজের করণীয় দায়িত্ব পালন করতে উদগ্রীব, তার প্রার্থনায় যে আত্মসম্ভ্রমবোধ থাকার কথা, তাই

www.pathagar.com

এখানে প্রতিধ্বনিত। সেই আত্মসম্ভ্রমবোধের মনোভাবটা তার এ উক্তিতে নির্দেশবাচক ক্রিয়া দ্বারা স্পষ্টতই প্রতিফলিত হয়েছে যে, اجْعَلْنِى عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ "আমাকে ক্ষমতার চাবিকাঠি দিয়ে দিন।" পক্ষান্তরে হযরত সুলায়মান (আ) যখন আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা জানান, তখন তিনি কত আদব ও বিনয়ের সাথে জানান, তা লক্ষ্যণীয় ঃ

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لاَّيَنْبَغِى لاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِى ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

"হে আমার রব ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন যা আমার পরে আর কারো হবে না।"-(সূরা সোয়াদ ঃ ৩৫)

সম্ভবত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে আমরা চাকুরী ও পদ প্রার্থনার সম্মানজনক পদ্ধতি কি, তাও শিখতে পারি। আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে নয় বরং বহাল রেখেই তা চাইতে হবে। একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্য নিয়েই এবং একটা শূন্যতা পূরণের মনোভাব নিয়েই চাইতে হবে। অনর্থক কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো এবং জনগণের সম্পদের অপচয়ের উদ্দেশ্যে চাকুরী প্রার্থী হওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া নিজের মধ্যে যথার্থ যোগ্যতা ও প্রতিভা থাকলেই চাকুরী প্রার্থী হওয়া উচিত — তদবীর, সুপারিশ ও স্বজনপ্রীতির ওপর নির্ভর করে নয়। হযরত ইউসুফের "আমি নিশ্চিতভাবে দায়িত্বশীল ও দক্ষ" — এ উক্তিতে সুস্পষ্ট যে, তিনি কোন অসার আস্ফালন না করেই নিজের সত্যিকার দক্ষতার আশ্বাস দিয়েছেন। আমাদের যুগের কর্তারা ও যুবকরা এ শিক্ষাটা অনুধাবন করবেন — এ আশা কি করা যায় ?

রাজার কাছ থেকে তিনি ক্ষমতার উপযুক্ত অংশ লাভ করলেন। আর তার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করলেন। মিসর তার ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষ ও খরার দিনেও ক্ষুধা ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। অথচ এই ক্ষমতার মসনদ তাকে আল্লাহর কথা ভুলাতে পারলো না। তাঁর মনের ক্ষুদ্রতম অংশেও বিলাসিতা ঠাঁই পেল না। সকল অবস্থায় তাঁর অন্তরদৃষ্টি সজাগ রইল এবং আল্লাহর কাছে নেকক্কার লোকদের জন্য নির্ধারিত উচ্চতর মর্যাদার আসনটার প্রতিই উৎসুক ও উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। হযরত সুলায়মানের মতই তিনি মুনাজাতে বললেন ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ ج فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِىّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِى بِالصّٰلِحِيْنَ○

www.pathagar.com

"হে আমার রব ! আমাকে আপনি রাজত্ব দিয়েছেন এবং কথার ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ! দুনিয়া ও আখেরাতে আপনিই আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"–(সূরা ইউসুফ ঃ ১০১)

রসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টান্ত

এবার দেখুন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টান্ত। তাঁর সামনে সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে সংগৃহীত অর্থ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ স্তুপীকৃত। তাছাড়া ফিদিক প্রভৃতি অঞ্চলের ভূমি একান্তভাবে তাঁর নিজের সম্পদ হিসেবে হস্তগত হয় এবং মুসলমান জনগণের তাতে কোনই অংশ ছিল না। তা সত্ত্বেও এসব সম্পদের একটি কণার ওপরও তাঁর মন বসেনি। বরং তাৎক্ষণিকভাবে তাকে তিনি জনকল্যাণমূলক কাজে ও পরোপকার ব্রতে ব্যয় করতেন। কখনো কখনো তিনি তাঁর ক্ষুধার্ত উদরের অস্থিরতাকে শান্ত করার জন্য পেটে পাথর বাঁধতেন। অথচ অভাবের জন্য তাকে ক্ষুধা ভোগ করতে হতো না। প্রাচুর্য সত্ত্বেও তিনি যে কৃচ্ছ্রতার সাধনা করতেন, তার কারণেই ক্ষুধার জ্বালা ভোগ করতে হতো। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ (সা) এক নাগাড়ে তিন দিন কখনো তৃপ্তি সহকারে আহার করেননি। ইচ্ছা করলে আমরা তৃপ্তির সাথে খেতে পারতাম। কিন্তু তিনি নিজের তৃপ্তির ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন।"

একবার রসূল (সা) ওহোদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে নিজের নীতি বিশ্লেষণ করেন এই বলে ঃ "আমার কাছে এই ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ থাকলেও তা থেকে একটি দিনারও একাধারে তিন দিন জমা হয়ে থাকুক—এটা আমার মনপূত হতো না। অবশ্য ঋণ পরিশোধ করার জন্য কিছুটা রাখা যেতে পারে। আমি অবশ্যই সে সম্পদকে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে এভাবে এবং এভাবে (হাত দিয়ে ডানে বামে ও পেছনে ছড়িয়ে দেয়ার ইংগীত করলেন) তা বিলি করতাম।" অতপর তিনি একথা বলতে বলতে প্রস্থান করলেন ঃ "বিত্তশালীরাই কেয়ামতের দিন দরিদ্র হয়ে উঠবে। কেবল তারাই এর ব্যতিক্রম, যারা এভাবে এভাবে ও এভাবে (ডানে বামে ও পেছনে ইংগীত করে) তা বিলি করবে। তবে সে ধরনের মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প।"

এ পর্যন্ত কয়েকটি উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক ও বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করলাম। এগুলো থেকে আমাদের পূর্বেকার সেই বক্তব্যটাই স্পষ্ট ও সমর্থিত হয় যে, তুচ্ছ পার্থিব সম্পদের মোহ থেকে মনকে মুক্ত করার মানে এ নয় যে, তার উপার্জন থেকেই বিরত থাকতে হবে এবং ন্যায়সঙ্গত পন্থায়ও তা অর্জনের চেষ্টা করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, মনকে পার্থিব সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত

www.pathagar.com

করার পর তাতে নেহাৎ আল্লাহর জন্যই কতিপয় চাহিদা ও দাবীর সৃষ্টি হয়। এসব দাবী ও চাহিদার কারণেই সে সম্পদ উপার্জনে সচেষ্ট না হয়ে পারে না। এ চেষ্টায় সে এতটা ব্যগ্র ও উচ্চাভিলাসীও হতে পারে—যতটা হতে পারে দুনিয়ার মোহে উন্মাদ ভোগবাদীরা। এসব দৃষ্টান্ত থেকে টাকা ও অন্যান্য পার্থিব সম্পদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জানা যায় যে, এসব সম্পদ মানুষেরই জন্য। মানুষ এ থেকে নিজের দেহকে বাঁচিয়ে ও টিকিয়ে রাখতে যতটুকু দরকার কেবল ততটুকুই গ্রহণ করবে—তার বেশী নয়। আর বাদবাকী সম্পদ সে সঞ্চিত রাখবে নিম্নের দু'টো উদ্দেশ্যের একটি অথবা উভয়টির জন্য ঃ

১-জনগণের সমস্যার সমাধান করা, তাদের সংকট ও মুসিবত লাঘব করা এবং তদের কল্যাণমূলক কাজ সহজসাধ্য করা।

২-সত্য ও ন্যায়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজয়ের উপায় হিসেবে কিছু না কিছু বস্তুগত শক্তি থাকতেই হয়। সে শক্তি টাকাকড়ি, অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী। সুতরাং এসব উদ্দেশ্য সফল করার কাজে ব্যয় করার জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করা, তা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকা এবং যত রকম জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা-কৌশল ও উপায়-উপকরণ দ্বারা সম্ভব ঐ অর্থকে দুষ্কৃতকারীদের ও তাদের সহযোগীদের হাত থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। বস্তুত সৎলোকের হাতে হালাল টাকা থাকার মত সৌভাগ্যজনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। তাই কোন মানুষের জন্য তার সঞ্চিত সম্পদে খুশী হওয়া যদি বৈধ হয়ে থাকে তবে সেটা তার নিজের সুখের ব্যবস্থা হয়েছে এজন্য নয় বরং সে সত্য ও ন্যায়ের বিজয়ের উপকরণ বৃদ্ধি করতে পেরেছে এই জন্য। এটাই নবীদের কাজ এবং জীবনের বাস্তবতা ও বস্তুর স্বাভাবিক ভূমিকার প্রতি তাদের যথার্থ ও নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গী এটাই।

সামষ্টিক আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্য গুণাবলী

বিষয়টার অধিকতর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের খাতিরেই আলোচনাকে এতবেশী বিস্তৃত করতে হয়েছে। পাঠক পরিষ্কার দেখতে পেয়েছেন যে, মানুষ কেবল সকল ধরনের বাতিল থেকে মুক্ত হতে পারলেই অনায়াসে সত্যের নাগাল পেতে সক্ষম। বাতিলের রাহুমুক্ত হলেই সত্যের সূর্য তার মানসপটে নিরন্তর আলোকরশ্মী ছড়াতে থাকবে। ফলে সত্যের অনুভূতি ও উপলব্ধি তীব্র ও দৃঢ় হতে থাকবে দিন দিন। এভাবে এক সময় মনে সত্য ছাড়া অন্য কিছুর অনুপ্রবেশেরও আর জায়গা থাকবে না। এমনকি, নিজেকে তার আর রক্ত মাংসের সত্তা বলে মনে হবে না—মনে হবে যেন তা শাণিত ও সতেজ সত্যোপলব্ধিরই একটা একক—যার আওতায় একমাত্র সত্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়।

www.pathagar.com

মানুষ যখন এই গুণাবলীর বিকাশ ও বাস্তবায়ণ ঘটাবে, তখনই তার সামষ্টিক আধ্যাত্মিকতাও বাস্তব রূপ লাভ করবে। তখন সেই আধ্যাত্মিকতা নিয়েই সে ইহ-পারলৌকিক উভয় জীবনযাপন করতে পারবে। তার দৈহিক অবয়ব পৃথিবীতে অবস্থান করলেও তার আসল সত্তা বিচরণ করবে উর্ধ আকাশে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্যান্য মানুষের মতই দুনিয়ার সকল জিনিস ধারণ করবে কিন্তু তার আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা দিয়ে সে এমনসব জিনিস করায়ত্ব করবে, যা মামুলী লোকেরা নয় বরং একমাত্র আল্লাহর প্রিয়তম বান্দারাই করায়ত্ব করতে পারে। সে যদিও মানুষের মধ্যেই চলাফেরা করে, কিন্তু তাছাড়া তার আরো একটা গতিবিধি থাকে—যা আল্লাহর সর্বোচ্চ পারিষদবর্গের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীভূত। সে আহার বিহারও করে, বাজারেও যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর বাজারে ভিন্নতর বাণিজ্য নিয়েও ঘোরাফিরা করে। মাঠে-ময়দানে, ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, রাস্তা-ঘাটে ও মসজিদে সে যে কাজ করে, তা অন্যদের কাজের মতই দেখতে। কিন্তু যে কাজ দুনিয়ায় বসেই করা হয় এবং দুনিয়াতেই তার ফল লাভ ঘটে, আর যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে করা হয় এবং আল্লাহ তা নিজের কাছে তুলে নেন—এই দুই ধরনের কাজে বিরাট ফারাক। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করা হয় তার ওপর কস্তুরীর চেয়েও পবিত্র বাণী বর্ষিত হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ط وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ○

"তাঁর কাছেই আরোহণ করে পূতপবিত্র বাণী আর নেক আমল তাকে উর্ধে তুলে দেয়। আর যারা ন্যক্কারজনক চক্রান্তে লিপ্ত, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। বস্তুত তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়।"

-(সূরা আল ফাতের ঃ ১০)

আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহর স্মরণ

একথাটা জেনে রাখা দরকার যে, সকল সময় ও সকল অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ অব্যাহত রাখাই হচ্ছে সবকিছুর মূল কথা। দেহের জন্য বাতাস যেমন, মনের জন্য আল্লাহর স্মরণও তেমনি। দেহ যদি বাতাস ছাড়া বাঁচতে পারে মনে করেন, তাহলে আল্লাহর স্মরণ ছাড়া মন সজীব থাকতে পারে—একথা বিশ্বাস করাও আপনার জন্য সঙ্গত হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন ঃ মানুষের জন্য আল্লাহর স্মরণ মাছের জন্য পানির মত। পানি ছাড়া মাছ কিভাবে বাঁচতে পারে, ভেবে দেখুন।

কল্পনা বিলাসী রূপক কথকরা নয়—বরং তত্ত্বজ্ঞানী মনীষীরা বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"জীবন হলো এক গুপ্ত রহস্য। দেহের স্পন্দন তার লক্ষণ বা আলামত। আর আত্মার জীবনের লক্ষণ হলো আল্লাহর ঘনিষ্ট পরিচয় সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহের অব্যাহত সরবরাহ এবং নিরন্তর সচেতনতা ও সতর্কতা।

শরীরের ক্ষেত্রে একথা সর্বজন বিদিত যে, যতক্ষণ তার মধ্যে জীবনী শক্তির প্রবাহ থাকবে, ততক্ষণ তাতে স্পন্দন থাকবে—থাকবে তৎপরতা ও সক্রিয়তা। এমনকি মানুষ যখন ঘুমায় তখনও তার ফুসফুস ও অন্য কয়েকটি অঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয় না। নিষ্ক্রিয় হলে সেটা হবে তার মৃত্যুর লক্ষণ। মনের ক্ষেত্রেও একই কথা। আল্লাহ সম্পর্কে তার সর্বদাই জাগ্রত, সচেতন ও সতর্ক থাকা চাই। এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায়ও যেন তা সতর্ক ও সচেতন থাকে। এটাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্রান্ত সেই বর্ণনার ব্যাখ্যা—যাতে বলা হয়েছে যে, তাঁর চক্ষুই শুধু ঘুমায়, কিন্তু তার হৃদয় জেগে থাকে। এতে একথারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, নেককার মানুষের স্বপ্ন প্রভাতের আবির্ভাবের মতই ঘটে এবং তা নবুয়াতের ৪৪ ভাগের এক ভাগ। কেননা আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য সুসংবাদ প্রবাহিত করে থাকেন। জাগ্রত মন তা অনুভব করে এবং ধরে রাখে—যেমন নিখুঁত বেতার যন্ত্র ইথারে ভাসমান শব্দকে ধরে রাখে। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আত্মার জীবনী শক্তির বহমানতার আলামতই হলো হৃদয়ের জাগৃতি ও সচেতনতা। সেই জাগৃতি যদি না থাকে এবং তার ঔজ্জ্বল্য যদি নিষ্প্রভ হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় তাহলে শরীরের দৃষ্টান্ত মোতাবেক বুঝতে হবে হৃদয় মরে গেছে। সুতরাং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ অব্যাহত রাখা আমাদের জন্য অপরিহার্য—যাতে আমাদের মন সর্বদা সজীব ও প্রাণবন্ত থাকে।

সৌভাগ্যের কথা যে, আল্লাহর স্মরণের চেয়ে সহজ কাজ মানুষের কাছে আর কিছু নেই এবং তার মনের কাছে এর চেয়ে মিষ্ট ও মজাদার আর কিছু নেই। তাই যখন কারো কাছে নামায কষ্টকর মনে হয়, যখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ওজু করা কারো কাছে দুঃসাধ্য বোধ হয়, যখন দান ও সাদকা করা কারো কাছে ভারী বোঝার মত লাগে, ধন-সম্পদের প্রতি অনাসক্তি দেখানো (জোহদ) যখন কারো কাছে কঠিন মনে হয় এবং জান্নাতের উপযোগী কাজ করা যখন কারো কাছে দুর্গম পার্বত্য পথের চড়াই উৎরাই পার হওয়ার মত দুর্বিসহ লাগে, তখন জেনে রাখবেন যে আল্লাহর সার্বক্ষণিক স্মরণ মানুষের মনে এমন সব গুপ্ত রহস্য এমন সব জ্যোতির প্রবাহ সৃষ্টি করে যে, তাতে সকল জটিলতা ও কষ্ট দূরিভূত হয়ে যায়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাত জাগতে অসমর্থ হয়, টাকাকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য এড়াতে পারে না, ভীরুতার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহসী হয় না—সে যেন আল্লাহকে স্মরণ করে।

www.pathagar.com

(আল্লাহর স্মরণ দ্বারা) যখন এসব কাজ সহজসাধ্য হবে, তখন কাল বিলম্ব না করে মনকে তার অপরিহার্য ও অদম্য কামনার বস্তুসমূহ থেকে যথাযথ অংশ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আগ্রহে অধীর হয়ে উঠতেন, তখন হযরত বিলালকে (রা) বলতেন ঃ হে বিলাল ! নামায দ্বারা আমাদেরকে শান্ত কর। ঠিক যেমন পেটুক লোকেরা তাদের পরিবারের লোকজন ও চাকরবাকরকে হাকডাক দিয়ে বলে ঃ ওগো, তোমরা খাবার দিয়ে আমাদের শান্ত কর। বস্তুত এ দুই ধরনের অস্থিরতার মধ্যে যেটির দৃষ্টান্ত আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল পেশ করেছেন, সেটিই শ্রেষ্ঠ।

জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য কাজগুলো কিভাবে সহজ হয়ে যায়, তা বুঝা যায় রসূলুল্লাহর (সা) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা ঃ

"তোমাদের কারো কারো জন্য জান্নাত তার জুতোর ফিতের চেয়েও নিকটতর।"

আবার যারা আল্লাহর স্মরণে পিছিয়ে আছে তাদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

"জান্নাতের কাজ পর্বতের ওপরের প্রস্তরময় অসমতল জায়গার (চলার) মত দুরূহ।"

প্রথমোক্ত হাদীসটা বলেছেন তাদের জন্য—যারা আল্লাহর স্মরণের মজা ও মাধুর্য উপভোগ করেছে এবং তাকে সহজ ও বরকতময় পেয়েছে।

সুতরাং এ দু'টো হাদীসে কোন বৈপরিত্য নেই।

সকল অবস্থায় আল্লাহর স্মরণের তাৎপর্য

আল্লাহর স্মরণকারীদের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোচ্চ আদর্শ। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের নিজের জন্যও তাকেই সর্বোচ্চ আদর্শ বা নমুনা রূপে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই আমরা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর স্মরণকে কিভাবে বাস্তবায়িত করতে হয়, তার উচ্চাঙ্গের নমুনা দেখতে পাবো। তিনি যখন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতেন তখন আল্লাহকে স্মরণ করতেন, পানাহার যখন শেষ করতেন তখনও আল্লাহকে স্মরণ করতেন। এক কথায়, পানাহারের শুরু ও সমাপ্তি—উভয় অবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতেন। কাপড় পরা এবং ছাড়ার সময় এবং বাড়ীতে ঢোকা ও বাড়ী থেকে বেরুবার সময়ও তিনি কি বলে আল্লাহকে স্মরণ করতেন, সে কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। ঘুমাবার সময় এবং ঘুম থেকে উঠবার সময় ও অন্য যে কোন কথার আগে তার মুখ দিয়ে বেরুতো আল্লাহর স্মরণমূলক কথা। এমনকি রাত্রে মোড় ফিরে শোবার সময়ও তার মনে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কিছু থাকতো না। সফরে যাওয়া ও সফর থেকে ফেরা, জন্তুর পিঠে আরোহণ কিংবা কোন

www.pathagar.com

এলাকায় প্রবেশ-এর সবকিছুই করতেন আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে। নতুন কাপড় পরা অথবা বাজারে ঢোকার মুহূর্তেও তার সামনে আল্লাহ উপস্থিত থাকতেন। ঘুম থেকে কোন আতংকের বশে জেগে উঠলে কিংবা ঘুম না আসলে, কোন জীবিকা উপার্জনের কিংবা আনন্দদায়ক কোন নিয়ামত পেয়ে তা রক্ষা করতে ইচ্ছা করলে, কোন দুশ্চিন্তা বা সংকট নিরসন কিংবা ঋণ পরিশোধ করতে চাইলে, কবর জেয়ারত করলে, অনাবৃষ্টি হলে এবং বৃষ্টি প্রার্থনার ইচ্ছা করলে, বাতাস প্রবাহিত হলে, মেঘ গর্জন করলে, বৃষ্টি হলে বা অতি বৃষ্টি হলে, কিংবা নতুন চাঁদ দেখলে—এসবের প্রত্যেকটি অবস্থায়ই তাঁর মন আল্লাহর স্মরণে সচকিত হয়ে উঠতো এবং সেই সাথে মুখও তাঁর স্মরণে মুখরিত হতো।

রসূলের (সা) মনে স্মরণের প্রকৃতি

এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল অবস্থার উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কেননা তা গুণে শেষ করা যায় না। ঐসব অবস্থার উদ্ভবকালে তিনি কি কি স্মরণমূলক কথা উচ্চারণ করতেন, বর্ণনাকারীরা তার কিছু কিছু বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের কিতাবগুলোতে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এসব বর্ণনায় উল্লেখিত স্মরণ ও আমলের মধ্য দিয়ে রসূলের (সা) গোটা জীবনের একটা ছবি পাওয়া যায়।

আল্লাহর বান্দা হওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধি ছিল অত্যন্ত তীব্র ও ধারালো। তাঁর মন থেকে এ বিশ্বাস কখনো দূর হতো না যে, তিনি আল্লাহর গোলাম, আল্লাহরই রাজত্বে, তাঁরই আকাশের নীচে, তাঁরই জমীনে এবং একমাত্র তাঁরই নামে তিনি কাজ করেন। তাঁর মন ও মগজ থেকে একথা এক মুহূর্তের জন্যও অপসৃত হতো না যে, তিনি মনিবের এমন একজন আজ্ঞাবহ গোলাম, যে মনিবের গোলামীতেই নিজের সম্মান এবং তাঁর স্মরণেই নিজের জীবনী শক্তি নিহিত বলে বিশ্বাস করে। সে জানে যে, এ রাজত্বে তার কণা পরিমাণও অংশীদারী নেই। তাই সে তার ঐ মনিবের স্মরণ ও গোলামী যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে, তা থেকে বিচ্যুত হওয়া বা পিছিয়ে থাকাকে সে নিজের শোচনীয় ধ্বংস বলে মনে করে। তাই সে কেঁদে বলে ঃ আল্লাহ আমাকে তরবারীর ধারালো প্রান্তের ওপর পাঠিয়েছেন। এখান থেকে বিপথগামী হলে আমার ধ্বংস অবধারিত। অতপর সে এই বলে দোয়া করে ঃ "হে আল্লাহ ! আমাকে আমার প্রবৃত্তির হাতে এক মুহূর্তের জন্যও সোপর্দ করো না।"

রসূলের (সা) নীতির অনুসরণ

আল্লাহর স্মরণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতখানি উর্ধে উঠতে পেরেছিলেন, ততখানি কেউ পারবে না। তবে এই মহান রসূলকে (সা)

www.pathagar.com

আপন জীবনের অনুকরণীয় নমুনা বা আদর্শ রূপে গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে তাকে শুধু রসূলের পদানুসরণ করতে হবে. আর কিছু নয়। শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে তার পক্ষে দুঃসাধ্য এমন কিছু করতে তাকে বলা হয়নি। তার করণীয় শুধু এই যে, সে আল্লাহর নৈকট্যলাভের আগ্রহ পোষণ করবে, তাঁর ঐকান্তিক দাসত্ব ও আনুগত্যকে মজ্জাগত করে নেবে এবং তাঁর জন্যই নিজের মনকে নিবেদিত করবে। এর ফলে সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর সামনে জীবন্ত শক্তিমান এবং আল্লাহর অনুপম সৌন্দর্য ও মাহাত্যের প্রভাবে সক্রিয় হয়ে দেখা দেবে। আর সেই সাথে সে নিজেকে দেখবে আল্লাহর অনুগত ও নিবেদিত বান্দা হিসেবে। সে দেখবে যে, জগতে তার নিজের কোনই কর্তৃত্ব নেই—কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। সে যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে তা তাকে বলে দেবে যে, ওটা তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র. তার নিজের কোনই সামর্থ নেই আহার্য গ্রহণের। সে যখন ঝড় ঝঞ্ঝা দেখে, তখন তা তাকে বলেঃ আমাকে একমাত্র আল্লাহই নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনিই প্রবাহিত করেন। এভাবেই প্রতিটি জিনিস তার প্রজ্ঞাকে প্রভাবিত করে। ফলে প্রত্যেক অবস্থাতেই তার মুখে বিশেষ ধরনের কথা উচ্চারিত হয় এবং আল্লাহর তরফ থেকে আগত সুনির্দিষ্ট ধ্যান-ধারণা ঝংকৃত হয়। অন্য কথায় বলা যায় ঃ প্রত্যেক অবস্থায় তার মুখে আল্লাহর স্মৃতিবাহক বচন তথা জিকির চালু হয় তার অন্তরের অন্তস্থলে আল্লাহর সার্বক্ষণিক উপস্থিতিই সেই জিকিরের ভাষা ও বচন নির্ধারণ করে। মনে রাখতে হবে যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে আল্লাহর স্মরণ তথা জিকিরের যে বচন ও ভাষা আমাদের কাছে প্রতিবেদিত ও উপস্থাপিত হয়েছে, সেটাই সর্বোত্তম জিকির বলে বিবেচিত। কেননা তার অন্তরই আল্লাহর সর্বোত্তম স্মৃতিচারক অন্তর। আল্লাহর নেয়ামত ও নিদর্শনসমূহ তাঁর অন্তরেই স্পষ্টতম প্রভাব ফেলতো এবং তাঁর অন্তরেই বিশুদ্ধতম ও নির্ভুলতম ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা কীর্তণ করতো। এসব ভাষা ও বচনের যথার্থতা ও নির্ভুলতা তাকে বাস্তব অবস্থার সাথে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যশীল করে তোলে। তাই বান্দা যখন নতুন পোশাক পরে, তখন সেই নতুন পোশাক পরায় স্বভাবতই কিছু আনন্দ, কিছু অহংকার এবং কিছু মোহাচ্ছন্নতা জড়িত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একজন পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল ও নিবেদিত প্রাণ বান্দার ভূমিকা হবে এই যে, সে ঐ আনন্দ, অহংকার ও মোহাচ্ছন্নতার জাল ছিন্ন করে বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا بِلَاحَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةَ

"আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা—যিনি আমাকে এই পোশাক পরিয়েছেন। অন্যথায় এ পোশাক পরার কোন ক্ষমতা আমার ছিল না।"

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে যখন কোন মুসাফিরকে আপনি বিদায় জানাবেন, তখন জানা কথা যে, মুসাফির নিজের জন্য দুই রকমের পাথেয় সংগ্রহ করেছে। একটি হলো, খাদ্য ও টাকাকড়ির পাথেয়। আর একটি হলো, তার সফরের উদ্দেশ্য পূরণের আশা। এমতাবস্থায় পরিস্থিতির দাবী অনুসারে বিদায় সম্ভাষণকারীর মন থেকে আল্লাহর স্মরণমূলক যে কথা নির্গত হওয়া উচিত তা এই ঃ

زودك الله التقوى ووجهك الى الخير اينما كنت

"আল্লাহ তোমাকে আল্লাহভীতির পাথেয় দ্বারা সমৃদ্ধ করুন এবং যেখানেই থাক, তোমাকে যেন কল্যাণের দিকে চালিত করেন।"

আর যখন এমন একদল লোকের সম্মুখীন হবেন, যাদেরকে আল্লাহর খাতিরেই আপনি অপসন্দ করেন অথবা কোন ভীতিপ্রদ ক্ষমতাশালী লোকের সামনে যাবেন, তখনও যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ রাখে, তার জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কোন পাথেয় থাকতে পারে না। সুতরাং এমতাবস্থায় বলুন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ فِىْ شُرُوْرِهِمْ

"হে আল্লাহ ! আমরা তোমাকে তাদের কণ্ঠের ওপর স্থাপন করছি এবং তাদের অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

বাজার হলো একটা ছোটখাট জগত—যাকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত করা হয়। এটা সব রকমের মন ভুলানো ও উদাসীন করে দেয়ার উপকরণ এবং টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সাজসজ্জার উপকরণে ভরপুর থাকে। তাই বাজারে এসে মানুষ নিজেকে ও আল্লাহকে যতটা ভোলে, ততটা আর কোথাও ভোলে না। তাই আল্লাহকে স্মরণ ও মজবুতভাবে ধারণকারী ব্যক্তি বাজারে ঢুকবার সময় এমন জিকির সাথে নিয়ে ঢুকবে—যা তার উদাসীনতা দূর করে দেবে এবং নশ্বর পার্থিব সম্পদের প্রতি তার আকর্ষণ ও মোহ বিনষ্ট করবে। তাই বাজারের ওপর চোখ পড়া মাত্রই সে বলে ওঠে ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ

وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ O

"আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও একমাত্র তাঁর প্রাপ্য। তিনি বাঁচান ও মারেণ। তিনি চিরঞ্জীব ও মৃত্যুহীন। সকল কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তিনি সর্বশক্তিমান।"

www.pathagar.com

আল্লাহমুখী হওয়ার ডাক

আল্লাহকে স্মরণ করার কি কি বাচনিক রূপ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা সব বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে ব্যক্তি নিজের হীত কামান করেন তাঁর কর্তব্য হাদীসের গ্রন্থাবলীতে এগুলোর সন্ধান করা। তবে যার এতসব দোয়া মুখস্ত করার সাধ্য নেই, কিংবা গ্রন্থাবলী যার নাগালের বাইরে তার উচিত তার সামনে উপস্থিত প্রতিটা কাজ ও অবস্থাকে উল্লিখিত বিনয়ী মন নিয়েই মোকাবিলা করা। একদিকে সে নিজের অসহায় অবস্থার ওপর নজর রাখবে, অন্য দিকে উপস্থিত কাজ বা অবস্থার মুখে আল্লাহমুখী হওয়ার উপযুক্ত বচন পড়ে নেবে। সেই বচনই আল্লাহকে স্মরণ করার সময়োপযোগী রূপ।...এভাবেই মন সজীব ও তৎপর থাকতে পারে এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ও প্রতিভাগুলো জাগ্রত থাকতে পারে। আর এই সদাজাগৃতিই মানুষকে ভেতরে ও বাইরে সজীব ও প্রাণোচ্ছল রাখতে সক্ষম। তার বাহ্যিক জীবন আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে সংযুক্ত হবে। এর প্রত্যেকটি অপরটির ওপর আপন প্রভাব বিস্তার করবে এবং বিশ্বপ্রকৃতির মুক্ত দিগন্তে আপন প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে দেবে। এরূপ ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা উদারতা, প্রফুল্লতা ও অমায়িকতার পোশাকে শোভিত হবে এবং তার সংকীর্ণতা বিরক্তি ও কার্পণ্য ইত্যাকার মানসিক জটিলতা দূরিভূত হবে। অন্য কথায় বললে জনৈক ইখওয়ানী নেতার ভাষায় বলতে হয়ঃ তার সমগ্র পরিমণ্ডল সামাজিক অনাচারের বীজাণু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহমুখিতাই তার জীবাণুনাশক শক্তি হয়ে দেখা দেবে। তার মনই হবে আল্লাহমুখিতার উৎস—যা এই বীজাণুনাশক ওষুধ সমগ্র সমাজে ছিটিয়ে দেবে এবং তাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে তুলবে। সামগ্রিক আল্লাহমুখিতার অর্থ এছাড়া আর কিছু নয়।

দীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতদাতার কর্তব্য এটাই

সাধারণ মানুষ যদি এই উৎকৃষ্ট নীতি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ণে সক্ষম না হয়, তাহলে যিনি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছেন তাকে অবশ্যই আপন জীবনে এ নীতি বাস্তবায়ণ করতে হবে। অন্যদের আগে তাকে উদ্দেশ্য করেই এসব কথা বলা। আমরা একথা বলি না যে, দুনিয়াবী সম্পদের মোহ ও আকর্ষণ থেকে মুক্ত ও বিরত থাকাটাকে তার সহজাত ও স্বতস্ফূর্ত স্বভাবে পরিণত করতে হবে। তার কাছ থেকে শুধু এটুকুই কাম্য যে, তার ভেতরে যেন অটুট, অবিচল ও অনমনীয় সংযমের চেতনা সর্বদা বর্তমান থাকে—যাতে করে সে যে আদর্শের দিকে মানুষকে ডাকে সে আদর্শের ভাবধারার সাথে যেন তার সত্তার নিবীড় সংযোগ ও সম্মিলন ঘটে এবং সে যাদেরকে আহবান করে তাদের চাইতে বিশিষ্টতর ও মহত্তর হয়। এটা কিছুতেই

www.pathagar.com

যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না যে, যে মহত্ত্ব ও সততার দিকে সে মানুষকে ডাকে, তার নিজের ভেতরে তার অভাব অন্য মানুষের মতই অথবা তার চেয়ে বেশী থাকবে। আমাকে আরো একটু স্পষ্ট করে বলতে হচ্ছে যে, এই উঁচুমানের আধ্যাত্মিকতা বা রূহানিয়াতই দাওয়াতদাতার প্রজ্ঞার একমাত্র উৎস এবং তার মধ্যে দাওয়াতের সঠিক উপলব্ধি আসা একমাত্র এই রূহানিয়াতের সাহায্যেই সম্ভব। আল্লাহর দিকে আহবানকারীর জীবনকে সদা তৎপর ও সদা চঞ্চল রাখবার এটাই একমাত্র মোক্ষম হাতিয়ার। তার মধ্যে জজবা ও আবেগের অদম্য শক্তি উৎপাদনের একমাত্র ডায়নামো এটাই। এ ডায়নামো থেকেই তার বিবেক ও মনে আল্লাহর পথনির্দেশের প্রবাহ আসে। তার বক্তৃতা শক্তি, চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রেরণা কতকগুলো সদা চঞ্চল যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এসব যন্ত্র দাওয়াতদাতার বক্তৃতা ও কর্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহর পথনির্দেশের প্রবহমানতাই পরিস্ফুট করে তোলে। তাই রূহানিয়াত থেকে যদি কোন দাওয়াতদাতা বঞ্চিত থাকে তাহলে তার জীবন ডায়নামো শূন্য এবং তার মন বিরাণ হয়ে যায়। সেখানে আল্লাহর নির্দেশের প্রবাহ সৃষ্টিকারী বা তার আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোকে সক্রিয়তা দানকারী কোন শক্তিই আর অবশিষ্ট থাকে না। এই শূন্যতা ও রিক্ততা নিয়ে সে যদি আল্লাহর পথে আহবানকারীদের দলে ঢুকে পড়ে তাহলে সে একজন উদ্ধত অনধিকার প্রবেশকারী ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে আল্লাহর দিকে নয়—নিজের দিকেই সে দাওয়াত দিতে চায় এবং আল্লাহর দ্বীনকে নয় সে নিজেকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রত্যেক দাওয়াতদাতাই এরূপ অবস্থায় পতিত হওয়া থেকে সাবধান হওয়া উচিত।

আসলে এই রূহানিয়াত এবং এই ডায়নামো অর্জন করাটা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়—যদি এই পথে যাত্রা অব্যাহত রাখার সংকল্প অটুট থাকে। তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়ই এই রূহানিয়াত অর্জনের একমাত্র উপায়। আমরা ইতিপূর্বে তাকওয়ার যে বর্ণনা দিয়েছি সেই বর্ণনা অনুসারে অথবা সম্ভব হলে তার চেয়েও উত্তমভাবে তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। এই মহাকল্যাণময় ও সুপরিচিত পথে এক পা বাড়াতে পারলেও আল্লাহ তার সুফল থেকে বঞ্চিত করবেন না। সত্যবাদিতায় যার কোন জুড়ি নেই—সেই মহান আল্লাহই একথা জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নের আয়াতে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

"হে ঈমানদারগণ ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে বাছবিচারের ক্ষমতা দান করবেন, তোমাদের গুনাহর

www.pathagar.com

কাফ্ফারার ব্যবস্থা করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বস্তুত তিনি মহা অনুগ্রহশীল।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ২৯)

এই 'বাছবিচারের ক্ষমতা'টাই হলো হক-বাতিলের পার্থক্য নির্ণয়কারী সেই দিকনির্দেশক রূহ, যাকে আমরা যন্ত্র ও যান্ত্রিক তৎপরতার জগতে ডায়নামোর সাথে তুলনা করেছি।

কতিপয় পথনির্দেশ

উপরে যা কিছু বললাম, তার সাথে আরো কয়েকটি পথনির্দেশ যোগ করতে চাই। এই পথনির্দেশগুলো মানুষের সামনে তার আধ্যাত্মিক জীবনের পথ শুধু স্পষ্ট করে তুলেই ধরবে না, বরং সেই সাথে ঐ পথ তার জন্য সুগমও করবে এবং ঐ পথের যাত্রায় তার যে ক্লান্তি ও অবসাদ আসবে, তাও দূর করতে সাহায্য করবে।

প্রথমত, আল্লাহর কিতাব বেশী বেশী করে অধ্যয়ন করতে হবে। কেননা এই কিতাবই দুর্বল ও ক্ষীণ অন্তর্দৃষ্টিকে সবল ও প্রখর করতে এবং রুগ্ন মনকে রোগমুক্ত করতে সক্ষম। ধীরে সুস্থে ও চিন্তা-ভাবনা সহকারে অব্যাহতভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতে থাকলে মনের গ্রন্থীগুলো খুলে যায় এবং কুরআনের জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র হৃদয় আলোকিত হয়। এ দিকেই আল্লাহ তায়ালা আহবান জানিয়েছেন এই বলে ঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ○

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? না, তাদের মনে তালা লেগেছে?"–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২৪)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় কুরআন পড়তেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন ঃ

"হে আল্লাহ ! তোমার সেই নামের ওছিলায়—যার দ্বারা তুমি নিজের নামকরণ করেছ, যে নাম তুমি নিজের কিতাবে নাযিল করেছ, কিংবা তোমার কোন সৃষ্টিকে শিখিয়েছ, কিংবা তোমার নিজস্ব গায়েবী জ্ঞানে একান্তভাবে নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছ—তোমার কাছে চাই যে, মহান কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত বানিয়ে দাও, আমার চোখের আলো বানিয়ে দাও, আমার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা নিরসনের উপকরণ বানিয়ে দাও।"

বস্তুত কুরআন হচ্ছে সুমিষ্ট ও সুপেয় পানির এক প্রস্রবণ, যেখানে রসূল (সা) তাঁর সাহাবায়ে কেরামের হাত ধরে নিয়ে যেতেন এবং তার আলো ও নিগূঢ় তত্ত্বের সামনে তাদের চোখ খুলে দিতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের চোখকে ইবাদাতে অংশ নিতে দিও।" সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ ! ইবাদাতে চোখের আবার কি অংশ ? তিনি বললেন ঃ কুরআনের প্রতি নজর দেয়া, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং কুরআনের বিস্ময়কর তত্ত্বসমূহ থেকে যথোপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করা।

রসূল (সা) আরো বলেন ঃ লোহায় যেমন মরিচা ধরে, মানুষের মনেও তেমনি মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কিসের দ্বারা এই মরিচা দূর করা যায় ? তিনি বললেন ঃ কুরআন অধ্যয়ন ও মৃত্যুকে স্মরণ করা দ্বারা।

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আল কাহাফে এরশাদ করেন ঃ

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا نِ ۙ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۝

"আমি সেদিন জাহান্নামকে কাফেরদের সামনে তুলে ধরবো—যাদের চোখ আমার স্মরণ থেকে পর্দার আড়ালে ছিল এবং তারা তা শুনতেও অক্ষম ছিল।"–(সূরা আল কাহাফ ঃ ১০০-১০১)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এখানে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা কুরআন অধ্যয়ন এবং তার মর্ম ও তাৎপর্য উদ্ধারের জন্য চিন্তা-ভাবনা করে না।

প্রিয় দ্বীনী ভাই ! কুরআনের মর্ম উদ্ধার করা আপনার জন্য কঠিন কাজ নয় যদি আপনি সে জন্য যথোপযুক্ত উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যদি নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে আপনি তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সেই মূল্য পরিশোধ করেন যা আপনাকে বিবেকবান দাওয়াতদাতাদের কাতারে দাঁড় করাতে সক্ষম। কোন বিনিময় ছাড়াই যদি আপনি এই মূল্যবান সম্পদ গায়ের জোরে ছিনিয়ে আনতে চান তাহলে জেনে রাখুন যে, আল্লাহর কোন দান গায়ের জোরে ছিনিয়ে আনা যায় না। ছিনতাই করা ডাকাতদের কাজ—আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের নয়।

দ্বিতীয়ত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাত অধ্যয়নের মাধ্যমে বেশী করে তাঁর গভীর ও আন্তরিক সাহচর্য লাভে সচেষ্ট হতে হবে। এই সাহচর্য আপনাকে এমন অনুভূতি দেবে যে, তিনি যখন সাহাবায়ে কেরামদের সাথে কোন মজলিশে বসেছেন, তখন আপনি মনে করবেন যেন আপনিও সেখানে বসেছেন। তিনি যখন কোন জন্তুর ওপর সওয়ার, তখন

নিজেকেও তাঁর সাথে সওয়ার মনে করবেন। তিনি যখন কোথাও সফরে বের হয়েছেন, তখন মনে হবে তার সাথে আপনিও আছেন এবং তার তীব্র ধারালো উপদেশ শুনছেন। তিনি যখন গভীর রাতে কিংবা দিনের নিভৃত মুহূর্তে আল্লাহর কাছে মিনতি নিবেদন করেন তখন মনে হবে, তাঁর সেই কাকুতি মিনতি আপনি নিজের অন্তরেও ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। তিনি যখন কারো ওপর রেগে গেছেন অথবা কোন ব্যাপারে আনন্দে উৎফুল্ল হন কিংবা ঔদার্যে ও মহানুভবতায় বিগলিত হয়েছেন, তখন তাঁর আবেগের সাথে আপনার আবেগও যেন মিলে গেছে, যাতে করে তার মহানুভব হৃদয়ের আলোড়ন ও স্পন্দনকে অনুভব করার নিকটবর্তী হতে পারেন। সীরাত অধ্যয়নের ফলে অর্জিত এই মানসিক সাহচর্যে আপনি রসূল (সা)-এর সমসাময়িক মু'মিনদের কাতারে শামিল হবেন, ফলে তারা যখন যে নির্যাতন ভোগ করেছেন, তা আপনিও ভোগ করছেন বলে মনে হবে, তারা যেমন হিজরত করেছেন তেমনি আপনিও করবেন। আপনার আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ও অবচেতন মন আপনাকে তাদের সাথে আবিসিনিয়াসহ আল্লাহর জমীনের বিভিন্ন অঞ্চলে হিজরত করিয়ে আনবে। যখন মদীনাতে জিহাদ পরিচালনা করা তার জন্য আইন সিদ্ধ করা হলো তখন (সেই অধ্যায় পড়ার সাথে সাথে) আপনার মনে হবে যেন আপনিও তাঁর বিজয়ী পতাকা তলে সমবেত। আপনি স্পষ্ট দেখতে পাবেন, রসূলুল্লাহ (সা)-তাঁর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেছেন, যুদ্ধের বর্ম, বর্শা, তরবারী ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়েছেন। তিনি রণাঙ্গনের যোদ্ধা সেনাপতি। তাঁর পবিত্র চোখ দু'টো শীরোস্ত্রানের নীচ দিয়ে যেন ঝিকমিক করছে। তিনি জিহাদী অভিযানে যত চড়াই উৎরাই অতিক্রম করছেন, যত শত্রুর মুখোমুখি হচ্ছেন, সবকিছুতেই আপনি তাঁর সাথে আছেন বলে মনে হবে। তিনি যখন আঘাত হানেন, তখন আপনিও হানেন। তিনি যখন নির্দেশ দেন, তখন আপনি এগিয়ে যান, নিজের যথাসর্বস্ব তাঁর কাছে সমর্পণ করেন এবং আপনার মনের সকল ভালোবাসা ও আবেগ দিয়ে তাঁর অনুগামী হন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এভাবেই পরম গৌরবের সফরসঙ্গী হোন। এটা আপনাকে নবুয়াতের পরিমণ্ডলে ঢুকিয়ে দেবে। অতপর মহানবীর আত্মার স্রোতধারায় আপনার হৃদয় বিধৌত ও বিগলিত হবে। আপনার স্বভাব-চরিত্র বিশুদ্ধ ও নির্মল হবে। আপনার সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতাগুলো শানিত ও সুশৃংখল হবে। জীবনের নির্ভুল পথ ও সর্বোচ্চ গন্তব্য আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত হবে। এসবই সামষ্টিক আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত—যার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে আমরা আহবান জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত, সম্ভব হলে আল্লাহ ও তার দ্বীন সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ নেক্‌কার লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা চাই। তাদের আলামত হলো, তারা অন্যের দোষ অন্বেষণ করার পরিবর্তে আপন দোষ অন্বেষণ করেন, পরম সত্যনিষ্ঠ ও আনুগত্যের সাথে শরীয়াতের আদেশ ও নিষেধ মেনে চলেন। অবিচল ঈমান ও অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কাজ চালিয়ে যান, তাদের চেহারার সদা প্রফুল্লতা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, তারা দুনিয়াবী সম্পদে নয়—রূহানী সম্পদে সমৃদ্ধ এবং তাতেই তারা সুখী এবং মানুষের অনুগ্রহ নয়—আল্লাহর অনুগ্রহেরই তারা প্রত্যাশী।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

"তাই তাদের চোখ ও হাত দুনিয়াবী জীবনের সম্পদ ও সমৃদ্ধির চাকচিক্যে প্রলুব্ধ তার প্রতি ধাবিত হয় না—যা আল্লাহ অন্যদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে থাকেন। তাদের এ ব্যাপারে অবিচল বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহর জীবিকাই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী।"–(সূরা ত্বাহা ঃ ১৩১)

বস্তুত এসব গুণের অধিকারী যারা—তাদের সাহচর্য মনকে বিনীত ও বিগলিত করে এবং পাপ থেকে মুক্ত করে। এ সাহচর্য একটা পূত-পবিত্র পরিবেশ গড়ে তোলে—যেখানে মানুষের মন অত্যন্ত পবিত্র ভাবধারার মধ্যে জীবন ধারণ করে।

চতুর্থত, খারাপ সংসর্গ ও নোংরা পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এবং সে দিক থেকে চোখও ফিরিয়ে রাখতে হবে। কেননা আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন বস্তুবাদের সয়লাব আমাদেরকে এক উৎকট বল্লাহীন নৈতিক উচ্ছৃংখলতার দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত। সমাজে এক শ্রেণীর নারী চরম নির্লজ্জতার সাথে তার সকল সৌন্দর্য ও রূপ সজ্জার প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে মেতে উঠেছে। আর অশ্লীলতার ধারক ও বাহকরা তাদের নৈতিকতা বিবর্জিত উদ্ধত কার্যকলাপগুলো প্রকাশ্যে ও সমাজের সকল মানুষের চোখের সামনে করে চলেছে। প্রচলিত সমাজরীতি তার বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বিদ্রোহ করছে না, বরং কখনো কখনো তাকে স্বাগত জানাচ্ছে ও তা আরো বাড়িয়ে দেয়ার উৎসাহ যোগাচ্ছে। দৃষ্টি হচ্ছে মানুষের মনের কাছে শয়তানের কুপ্ররোচনা পাঠানোর অন্যতম পরিবহন যন্ত্র।

আর খারাপ ও অশ্লীল সংসর্গের দিকে মনের ঝোঁক তার কাছ থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় এবং তার প্রতি অসন্তোষ

www.pathagar.com

ও ঘৃণার মনোভাব প্রশমিত করে। তাই এই জাতীয় নোংরা ও অশ্লীল কাজের কেন্দ্রগুলোকে যদি বয়কট করতে ও তার দিক থেকে নজর ফিরিয়ে রাখতে পারেন তাহলে আপনার চারপাশে এমন এক রক্ষাব্যূহ গড়ে উঠবে যে, তার দ্বারা আপনার মন-মগজ নৈতিক অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতার বিষাক্ত প্রভাব থেকে নিরাপদ ও মুক্ত থাকবে এবং তার ক্রমাগত ঢেউয়ের আঘাত আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

এক ইখওয়ান কর্মী অপর কর্মীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ বস্তুবাদের সয়লাবে আমাদের মন হাবুডুবু খাচ্ছে এবং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকারের উপায় কী? দ্বিতীয় কর্মী জবাব দিলেন ঃ আপনার চারপাশে একটা রক্ষাব্যূহ রচনা করুন, যা দ্বারা এই সয়লাবকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হবে। অতপর এই রক্ষাব্যূহের ভেতরে ঐ সয়লাবের ধ্বংযজ্ঞের যেটুকু চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে তা বাইরে নিক্ষেপ করুন। তাহলেই আপনার পরিমণ্ডল শুকিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে, আপনার মন ডুবন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে এবং পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হওয়ায় শ্বাস নিতে সক্ষম হবে। এই রক্ষাব্যূহ হলো গুনাহর কাজে লিপ্ত লোকদের সংসর্গ বর্জন ও তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়া। আর ভেতরকার ধ্বংসাবশেষ বাইরে নিক্ষেপ করার অর্থ হলো, মানুষের মন-মগজে বদ অভ্যাস ও খারাপ চরিত্রের যে বীজ ঢুকেছে, তা থেকে তাকে মুক্ত করা। এটুকু কাজ সমাধা করা মোটেই কঠিন নয় যদি আপনি নিষ্কলুষ ও একাগ্র মনে আল্লাহর দিকে আহবান জানাতে থাকেন।

পঞ্চমত, কুরআন, হাদীস অধ্যয়ন সাহাবা, তাবেঈন ও নেক্‌কার লোকদের বাণী পাঠ এবং নবীগণের মোজেজা ও সত্যিকার আল্লাহপ্রিয় বান্দাদের অলৌকিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রূহ ও বস্তুর উর্ধের জগত সম্পর্কে বিস্তারিত তত্ত্বানুসন্ধান করুন। এসব চমকপ্রদ গোপন তত্ত্বের একটি বিরাট অংশকে মানুষের কাছে উদঘাটন করে দেয় কুরআন ও হাদীস, সাহাবা, তাবেঈন ও নেক্‌কার মনীষীদের বাণীতে এবং নবী ও অলীদের অলৌকিক ঘটনাবলীতে নিহিত তাত্ত্বিক গুণবৈশিষ্ট্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাবলী।

রসূলের (সা) মেরাজ ভ্রমণ ও তার আশ্চার্য ঘটনাবলী, ইবরাহীমের (আ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ও শান্তিময় হয়ে যাওয়া —ইত্যাকার যেসব রহস্যময় ও আলোকোজ্জ্বল ঘটনা কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের সময় আপনার সামনে উপস্থিত হবে—এসবই উর্ধ জগতের বিস্ময়কর তত্ত্বের বাস্তব প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং বিশ্বজগতের এসব নিগূঢ় তত্ত্বে যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, সেটা গ্রহণ করাই আপনার কর্তব্য। সাবধান! এর কোন একটির বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক কারণ দর্শানোর কিংবা প্রচলিত

www.pathagar.com

তর্কশাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। কেননা এসব ঘটনা নিছক আল্লাহর নির্দেশেই ঘটেছে। আর আল্লাহর নির্দেশে অস্বাভাবিক যা কিছু ঘটে তা প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধে। সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারে যে তর্কশাস্ত্রীয় যুক্তি খাটে, এখানে তা প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

"তোমাদেরকে খুব সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)

হাদীস বিশারদগণ এ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তা পড়তে আপত্তি নেই। তবে তা দ্বারা বিভ্রান্তিতে না পড়েন, সে ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। যেখানে যা কিছু পড়বেন, তাকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিচার করবেন। যা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল তা সত্য এবং যা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী তা বাতিল। আর যে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্ নীরব, তাকে নিজের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যাচাই বাছাই এর আওতাধীন রাখতে পারেন।

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে বস্তু ও প্রকৃতির ঊর্ধের যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তা অধ্যয়নের ফলে রূহ সহ আল্লাহর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য তত্ত্বের প্রতি ঈমান আনার প্রেরণা জন্মে। এসব তত্ত্ব যুক্তিতর্ক বা বৈজ্ঞানিক সূত্র দ্বারা নয়, শুধু মন দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব। এই উপলব্ধি ও ঈমানের ফলে মানুষের অন্তর প্রশস্ত হয় এবং তার আভ্যন্তরীণ তথা আধ্যাত্মিক সত্তায় রূহানী জীবনের স্পন্দন জাগে।

ষষ্ঠত, নামায, রোযা ও অন্যান্য বহুবিধ আনুষ্ঠানিক ইবাদাত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়সমূহ অবলম্বন। জিকির ফিকির তথা আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কথা তো আগেই বলেছি। এবার বলছি আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের কথা। নামায হলো মহামহিম আল্লাহর সামনে ইহকালীন জীবনে বান্দার সবচেয়ে গৌরবময় ও সম্মানজনক অবস্থান। প্রতিদিন পাঁচবার এই অবস্থান গ্রহণ আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম। এটা বান্দাকে আল্লাহর অনেক প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ করে তোলে। নামাযকে এভাবে আল্লাহর সাথে বান্দাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আপনি যখনই আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং অনুভব করবেন যে, তিনি আপনাকে দেখছেন আপনার সবকিছুই জানছেন, আপনার চারপাশের গোটা মেহরাব জুড়ে তিনি আসীন, আর তা অনুভব করতে পেরেই আপনি আনতমস্তকে তার সামনে দাঁড়াবেন ঠিক যেমন গোলাম তার মনিবের সামনে দাঁড়ায়। আপনার এ অবস্থান যে কত

www.pathagar.com

বড় এক সত্তার সামনে, তা বুঝতে পেরেই আপনার মন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর সাথে এভাবে যোগাযোগ করলে আপনি যে সজীব হৃদয়ের অধিকারী হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই সজীব হৃদয় থেকেই আপনার মধ্যে স্ফুরণ ঘটবে আল্লাহমুখিতার। আর এর মাধ্যমেই আপনি যোগ্যতা অর্জন করবেন আল্লাহর পথের আহবায়ক হিসেবে এবং তার সম্পর্কে সুদক্ষ আলোচক হিসেবে—এমন আলোচক যে নিজের মন-মগজে বক্তব্যের উপাদান আগে থেকেই সজ্জিত দেখতে পায়। কিন্তু এই যোগাযোগ যদি না ঘটে, তাহলে আপনার নামায সুষ্ঠুভাবে পড়া হবে না, আর পড়া হলেও তার প্রতি অবহেলা দেখানো হবে। কাজেই আপনি আল্লাহর পথের দাওয়াত-কারী হবার আগে খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোন দাওয়াতদাতা পাওয়া যায় কিনা আপনাকে সঠিক পথে আনার জন্য।

একজন দাওয়াতদাতাকে বিভিন্ন ইবাদাতের ক্ষেত্রে কিছু নফলও আদায় করতে হয়। নফল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্যলাভের চেষ্টা করতে হয়। এ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

ولا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه - فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به -

"আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করতে করতে আমার প্রিয়পাত্রে পরিগণিত হয়। আর আমার প্রিয়পাত্র যখন হয় তখন আমি তার চোখ, কান, হাত ও পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, শোনে, ধরে ও চলে।"-(হাদীসে কুদসী)

আর সর্বাধিক পরিমাণ নফল নামায, দোয়া ও চিন্তা-ভাবনা করা উচিত গভীর রাতে। আল্লাহর দিকে আহবানকারীর জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, আহবানকারীরা সাধারণ মানুষের চেয়ে উচ্চতর স্তরের আদর্শ স্থানীয়। তাই তাদের জন্য নফলগুলো ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত। বহু সংখ্যক বিজ্ঞ আলেম নিজ নিজ গ্রন্থে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণ সম্বলিত অধ্যায় রচনা করে বলেছেন যে, রসূল (সা)-এর জন্য নফলগুলো ছিল ফরজ। যেমন আল্লাহ নির্দেশ দেন ঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ق

"নিজের জন্য বাড়তি হিসেবে রাতে তুমি তাহাজ্জুদ আদায় কর।"
-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯)

এ জন্যই তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা অনুসারে রাত্রে এত নামায পড়তেন যে পা দু'খানা ফেটে যেত।

www.pathagar.com

আল্লাহর ভয় ও রাতকালীন নামাযের এ পাথেয়ই হচ্ছে দাওয়াতদাতার দাওয়াতের কঠিন সফরে অত্যাবশ্যকীয় সম্বল। পাথেয় বা সম্বল ছাড়া কি কেউ পথ চলতে পারে?

কেউ কেউ হয়তো বলবেন : এতসব কড়াকড়ি পালন করার কি দরকার? আমি বলি : এতসব কড়াকড়ি আরোপেরও আমাদের কোন দরকার নেই, আপনারও এসব পালন করার দরকার নেই। আপনি তো আল্লাহর পথের আহবানকারী হতে চান। তাই এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য অপরিহার্য কয়েকটি কর্তব্য আপনাকে জানিয়ে দিলাম। এগুলো যদি আপনার সাধ্যাতীত মনে হয়, তাহলে যতটা পারেন করুন। যা পারবেন না, তার জন্য তো আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার মত অক্ষমদেরকে বাধ্য করেন না। সে ক্ষেত্রে আপনি বরং অক্ষম ও দুর্বলদের দলভুক্ত থাকলেই পারেন। এমন কঠিন কাজ সম্পাদনকারীদের কাফেলায় আসার ব্যাপারে আপনার উচিত আল্লাহর কাছে জবাবদিহির কথা মনে করে সতর্ক হওয়া।

অতপর আর একটি কথা জেনে নিন। রাত হচ্ছে নেককার লোকদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছার যানবাহন। বিশেষ করে রাতের শেষাংশ হচ্ছে আল্লাহর প্রেমিকদের ওড়ার ডানা স্বরূপ। হাদীসে আছে : বান্দা তার মনিবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সিজদায় থাকাকালে। হাদীসে আরো আছে : আল্লাহ্ তার বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন গভীর রাতে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝

"রাতে আল্লাহর সামনে সিজদা কর এবং রাতের দীর্ঘ সময় ব্যাপী তাঁর তাসবীহ্ কর।-(সূরা আদ্দাহর : ২৬)

সূরা আততূরের শেষ আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝

"রাতে আল্লাহর তাসবীহ্ পড়—বিশেষত নক্ষত্রগুলোর বিদায় হবার মুহূর্তে।"-(সূরা আত্তুর : ৪৯)

সামষ্টিক আধ্যাত্মিকতা বনাম রুহানিয়াতের নিভৃত সাধনা

ইতিপূর্বেও আমরা ইংগীত দিয়েছি এবং এখন আবার সাবধান করে দিচ্ছি একটা জরুরী সূক্ষ ব্যাপারে। যে সামষ্টিক আধ্যাত্মিকতার কথা আমরা এ যাবত আলোচনা করলাম তা যিনি সামষ্টিক আধ্যাত্মিকতার সাধক আর যিনি তা নন —উভয়ের জন্যই সমানভাবে অপরিহার্য। এরপর আসে নিভৃত আধ্যাত্মিকতার

www.pathagar.com

সাধনার কথা। এটা মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং তাঁর ফলে তার সাথে সাধারণ মানুষের কোন যোগাযোগ থাকে না। যিনি এ সাধনায় লিপ্ত তিনি যেমন এটা সাধারণ জনগণকে শেখান না জনগণও তাঁর কাছ থেকে শেখে না। আসলে এটা হলো দুর্বল ও স্বার্থপরদের আধ্যাত্মিকতা। দুর্নীতি ও অন্যায়ের সামনে যারা একাত্ম হয়ে টিকে থাকতে সক্ষম হয় না এটা তাদেরই রূহানী সাধনা। টিকে থাকতে না পারার কারণেই তারা নির্জনতার দিকে পালান এবং নির্জনেই এ সাধনায় লিপ্ত হন। এটা সেইসব স্বার্থপরদের আধ্যাত্মিকতা যারা কেবল নিজেদের সুখ শান্তিই কামনা করে। এ ধরনের আধ্যাত্মিকতার পথ ও পন্থা যতই আকর্ষণীয় এবং এর লক্ষ্য যতই উঁচু হোক না কেন, আসলে তা এ ধরনের ব্যধি ছাড়া কিছু নয়।

আপনি একজন শক্ত, সমর্থ ও সুঠাম যুবককে একটি সুন্দর আসবাবপত্রে সজ্জিত নয়নাভিরাম প্রাসাদে রেখে আসুন। অতপর তাকে সেখানে প্রতিদিন উপাদেয় খাদ্য সরবরাহ করতে থাকুন। তাকে ঐ ভোগবিলাসে মত্ত থাকতে দিন কিন্তু ব্যায়াম, খেলাধূলা ও শারীরিক কসরত করার অনুমতি দেবেন না।

এতে যুবকের অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায় দেখুন। যুবক প্রাসাদের ভোগবিলাসে মত্ত থাকবে, খাবেদাবে, তার দেহ বাড়বে মাংসপেশী স্ফীত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে একথা নির্বিবাদে সত্য যে, তার সেই মাংস হবে নরম থলথলে। সে মাংস স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থের লক্ষণ নয় বরং রোগের লক্ষণ বলে বিবেচিত হবে।

কিন্তু যুবক যদি যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করতো তারপর বাইরে এসে ব্যায়াম, হাটাচলা ও কাজকর্ম করতো এবং তার জীবনটাকে প্রাসাদ ও বহিরাঙ্গনে এবং খাওয়া-দাওয়া ও কর্মতৎপরতার মধ্যে ভাগ করে নিত, তাহলে তার শরীরের অবস্থা সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হতো এবং তা স্বাস্থ্যসম্মত নিয়মে বাড়তো। কাজ না করে শুধুই খাওয়া এবং না খেয়ে শুধুই কাজ করা—দু'টোই সমান ক্ষতিকর এবং রোগের পূর্বাভাস। যে ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাকওয়া ও ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নিভৃত স্থানে চলে যায় আর ভাবে যে, এই মহোপকারী পন্থায় সে আপন রূহের উৎকর্ষ সাধন করতে পারবে, তার অবস্থাও এমনি। নিসন্দেহে তাঁর অন্তরের প্রশস্ততা আত্মার প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হবে, তবে তার যে, নরম অকেজো ও জরাগ্রস্থ প্রবৃদ্ধি, তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সেটা উন্নতি স্বাস্থ্য ও শক্তির ইঙ্গিতবহ হতে পারে না। দেহের মতই রূহ ও খাদ্য গ্রহণ করে, পুষ্টি লাভ করে এবং তার সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আবার দেহের মত রূহেরও জরাব্যাধি আছে। দেহ পরিপুষ্টি লাভ করে পার্থিব খাদ্য দ্বারা আর রূহ পরিপুষ্টি লাভ করে উলুহিয়াতের খাদ্য দ্বারা। দেহ

www.pathagar.com

ভোগতৃপ্ত ও পেলব কাণ্ড হয় উপাদেয় খাদ্য খেয়ে এবং নরম তুলতুলে বিছানায় শুয়ে। আর রূহেরও ভোগতৃপ্তি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ইবাদাতের অনুপম খাদ্য পেয়ে এবং নির্জনতার মজাদার আবাসে আশ্রয় নিয়ে। শরীরের ভোগ-বিলাস যেমন তাকে রোগাক্রান্তির দিকে নিয়ে যায় তেমনি রূহের ভোগতৃপ্তিও তাকে ঠেলে দেয় পাল্টা জরাগ্রস্থতার দিকে।

প্রাকৃতিক জীবনের বিধান এই যে, তা আপনাকে খাদ্য সরবরাহ করবে যাতে করে বিনিময়ে আপনি তাকে কাজ ও তৎপরতা দেন এবং প্রকৃতির উপাদানগুলোর মধ্যে আপনি একটা ফলদায়ক ও উপকারী উপাদানে পরিগণিত হন। এভাবেই প্রকৃতির অগ্রগতি ও গঠন প্রক্রিয়া চলে আর এভাবেই আপনারও স্বাস্থ্য ও সুখ নিশ্চিত হয়। প্রকৃতি আপনাকে খাদ্য দিল আর আপনি তাকে তার বিনিময়ে দিলেন অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা ও স্থবিরতা। এতে আপনি প্রকৃতির নিয়ম লংঘন করলেন এবং নিজেকে তার নিষ্ঠুর ও রূঢ় শক্তির অসহায় শিকারে পরিণত করলেন। যে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা নিজেকে আল্লাহর বিধানের কাছে সমর্পণ করে তার ধ্বংস অনিবার্য।

আত্মার পরিশুদ্ধিতে আত্মনিয়োগ সংক্রান্ত একটা বিধান এই যে, প্রকৃতি আপনার রূহকে খাদ্য দেয় যাতে করে আপনি তাকে কাজ ও তৎপরতা দিয়ে সমৃদ্ধ করেন। আর রূহের সমৃদ্ধির উপযোগী কাজ ও তৎপরতা হলো ভালো কাজের আদেশ দান এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কিংবা কোন বাতিল বা অন্যায়ের উচ্ছেদ অথবা কোন জালেম স্বেচ্ছাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অথবা কোন ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা—যা দ্বারা সৎ গুণাবলীর লালন ও স্থিতি লাভ হয় এবং সম অধিকার ও সহানুভূতি বাস্তবায়িত হয়। এমন যদি হয় যে, আপনাকে তো রূহানী খাদ্য দেয়া হলো কিন্তু আপনি তার বিনিময়ে দিলেন নিভৃতবাস ও বিচ্ছিন্নতা—তাহলে আপনি আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সমান তালে চলতে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে নষ্ট করলেন এবং এই পিছিয়ে পড়ার অনিবার্য ফল হিসেবে জরা ও ব্যাধির কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে তাল মিলিয়ে ও খাপ খাইয়ে চলার মধ্যেই নিরাপত্তা। আর তার থেকে পিছিয়ে থাকা ও তার বিরুদ্ধাচারণ করার পরিণতি দুর্বল হওয়া, জরাগ্রস্থ হওয়া এবং বিশৃংখলা ও অরাজকতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কিছু নহে।

তাই আল্লাহর পথে আহবানকারী যখন অনুভব করবে যে, তার মন নির্জনবাসের প্রতি তীব্রভাবে ঝুঁকছে, তখন তার উচিত তার প্রতিরোধ করা এবং তার রূহের সমুদয় ঝোঁক ও পুণ্যাভিসারী প্রবণতা সহকারে জনসাধারণের

www.pathagar.com

কাছে চলে যাওয়া, তাদেরকে শিক্ষাদান, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ, তাদেরকে পথ দেখানো, জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের মন-মগজে উপলব্ধির সঞ্চার করা, নিষ্ঠাপূর্ণ আল্লাহর ইবাদাত আনুগত্যে নিজের দৃষ্টান্ত ও নমুনা প্রদর্শন, উত্তম উপদেশ দান, সততাপূর্ণ পাস্পরিক আচরণ ও লেনদেনে নিজেকে আদর্শস্থানীয় বলে প্রতিপন্ন করা এবং জনকল্যাণমূলক পথনির্দেশ দান। এ ধরনের তৎপরতার মাধ্যমে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তির প্রসার ও নিজেকে পূর্ণাঙ্গ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর কর্তব্য।

মনে রাখবেন, একজন আদর্শ দাওয়াতদাতা হিসেবে আপনার প্রভাবাধীন জনমণ্ডলী সম্পর্কে আপনি দায়িত্বশীল। আপনি যদি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকেন তাহলে সেটা হবে আপনার দায়িত্বহীন কাজ। এতে করে আপনি আপনার জনগণকে বাতিলপন্থীদের কুপ্ররোচনা ও শয়তানের বিভ্রান্তিকর পরামর্শের শিকার বানাবেন। আপনি আল্লাহর সাথে নিভৃতে মিলনের শুভ কামনায় তাদের কাছ থেকে তফাতে সরে গিয়েছেন—এ ওজর দ্বারা ঐ ভয়াবহ পরিণতি এড়ানো যাবে না। আমরা পবিত্র কুরআনে পড়ে থাকি যে, এ ধরনের একটা কাজ মূসা আলাইহিস সালামও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সে জন্য আল্লাহ্ তাঁর কাছে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন। কেননা তাঁর অনুপস্থিতিতে পুরো একটা জাতি গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেছিলেন ঃ

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ○ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ○ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ○ فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۗ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ○

"(হে মূসা !) তোমার জাতিকে ছেড়ে চলে আসতে তুমি এত তাড়াহুড়ো করলে কেন ? মূসা বললেন ঃ তারা তো আমার পিছনে পিছনেই আসছিল। হে আমার রব ! আমি আগে আগে তোমার কাছে চলে এসেছি যেন তুমি খুশী হও। আল্লাহ বললেন ঃ তবে শোন ! তোমার চলে আসার পর তোমার জাতিকে আমি পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি এবং সামেরী তাদেরকে বিপথগামী করে ছেড়েছে। মূসা তৎক্ষণাত তাঁর জনগণের কাছে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফিরে গেলেন।"-(সূরা ত্বহা ঃ ৮৩-৮৬)

www.pathagar.com

কিন্তু সর্বকালের সকল আহ্বায়কের শীরোমনি শেষ নবী (সা)-এর জীবনী পড়লে আমরা দেখি, দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশলাভের পর তিনি একবারও এ ধরনের বিচ্ছিন্নতার পথ অবলম্বন করেননি। সবসময় তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে থেকেছেন। কী মসজিদে, কী বাজারে, কী ময়দানে, কী ফলমূলের বাগানে—সকল ক্ষেত্রে তিনি তাদের সাথে থাকতেন। যুদ্ধে ও হজ্জে তাদের সাথে থাকতেন, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে দেখা করতেন। রোগীকে দেখতে যেতেন, মৃত ব্যক্তির জানাজায় এবং তাকে কবর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পথে তাদের সঙ্গী হতেন, তাদের ভালোমন্দের খোঁজখবর নিতেন, সহানুভূতি জানাতেন, সৌহার্দ প্রদর্শন করতেন এবং তাদের ভালোমন্দের অংশীদার হতেন। প্রতিটি ব্যাপারে তিনি সাথে থেকে তাদের দিক নির্দেশ দিতেন, তাদের মন ও আত্মার খাদ্য সরবরাহ করতেন এবং আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথে তাদের আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করতেন। একথা সত্য যে, তিনি রমযানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফে বসতেন। কিন্তু কোথায় ? মদিনার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত নিজেরই মসজিদে। আর সে মসজিদে যেমন তাদের ইবাদাতের ঘর ছিল, তেমনি তা ছিল তাদের পরামর্শ ভবনও। দিনে ও রাতের কোন সময়ই সেখানে মানুষের প্রবেশ বন্ধ ছিল না। সে ই'তেকাফ—মেলামেশার সাথেই সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। আর সে মেলামেশা নির্জনতারও সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল। কিন্তু যাই হোক না কেন, সে ই'তেকাফ তাঁকে মানুষের কাছ থেকে এবং মানুষকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।

একবার এক ইখওয়ানী ভাই তার অন্য ভাইকে অভিযোগের সুরে বললেনঃ ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সংগঠনে প্রবেশ করার আগে আমি বহু ইবাদাত করতাম, কত রাত জাগতাম, নির্জনে ও নিভৃতে থেকে আল্লাহর ইবাদাতের তখন কি যে স্বাদ উপভোগ করেছি, তা আজও ভুলতে পারি না। সেই দিনগুলোর দিকে মন বড্ড ঝোঁকে, আবার সেই অবস্থায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, এই দাওয়াতী কাজ কারবার আমাদের কত ক্ষতি করেছে, ইবাদাতের উৎসাহ উদ্দীপনা আমাদের দুর্বল করে দিয়েছে এবং আল্লাহর থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে ? তার সহকর্মী বললেন ঃ না ভাই, আপনার আজকের দিনগুলো সাবেক সেই দিনগুলোর চেয়ে উত্তম। আপনি আগের সেই অবস্থার মধ্যে বন্দী ছিলেন। এখন আপনি স্বাধীন ও মুক্ত। আপনার রূহ নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে আটকা পড়েছিল। এখন তা কর্মতৎপর। কর্মই হলো নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতিক। বন্দীদশায় আটকা পড়ে আপনার রূহ খাদ্য গ্রহণ করতো এবং আলসেমী ও নিষ্ক্রিয়তাতেই স্বাদ অনুভব করতো। কিন্তু এখন সে খোলা ময়দানে আহার্য গ্রহণ করে এবং আহার্যের মূল্য পরিশোধ করে। আপনি বলতে পারেন যে, রূহের খাদ্য বন্দীদশায় বেশী ছিল। আর আজ

www.pathagar.com

তা খুবই কম। আমরা বলি ঃ হোক কম। তাতে কোন ক্ষতি নেই। স্বল্প খাদ্য যদি বিরাট কল্যাণময় কাজ সমাধা করে তবে তা সেই বিপুল খাদ্যের চেয়ে ভালো যা কোন উল্লেখযোগ্য ফল প্রসব করে না। কাজ ছাড়া খাওয়া এবং খাওয়া ছাড়া কাজ—উভয়ই সমানভাবে ধ্বংসের প্রতিক। কাজেই ফেলে আসা দিন আর চাইবেন না। আল্লাহ আপনার সামনে এই মহিমান্বিত দাওয়াতের ময়দান উন্মুক্ত করেছেন। আমি আপনার জন্য যা আশা করি এবং যার জন্য আপনাকে উপদেশ দেই তাহলো, কাজের পরিমাণ দ্বিগুণ করুন—যাতে করে আপনার রূহের ক্ষুধা প্রবলতর হয় এবং ইবাদাতের দিকে আপনার ঝোঁকও বাড়ে।

সামষ্টিক রূহানিয়াত আমরা যতটুকু বুঝেছি এবং নিভৃত তথা বৈরাগ্যবাদী রূহানিয়াতের ওপর আমাদের যেটুকু আপত্তি ও বিরোধিতা, তা এখানে বিবৃত করলাম। নিভৃত রূহানিয়াতের যারা ভক্ত তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হবেন না। এ যুগে যদি কোন বৈরাগ্যবাদী রূহানিয়াতের ভক্ত পান এবং তাদের যদি কারামাত বা অলৌকিক কর্মকাণ্ড জাহির হয় তবু তাদের এ গুনাহ অখণ্ডনীয় যে, তারা সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব অবহেলা করে চলেছে এবং যখন প্রত্যেক মু'মিনের ওপর জিহাদ প্রায় ফরযে আইন হয়ে পড়েছে তখন তারা জিহাদের কর্তব্য পালনে নিষ্ক্রিয় রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক মুসলমানদের একটি জিহাদের ঘাটিতে পাহারাদারীর কাজ করতেন। সেই সময় তাঁর বন্ধু ফজীল বিন ইয়াজ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মক্কায় মসজিদুল হারামে নিভৃত ইবাদাতে মশগুল হন। আবদুল্লাহ তাকে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখে পাঠান ঃ

"হে হারামাইনের তাপস, তুমি যদি আমাদের দেখতে, তাহলে বুঝতে যে, তুমি ইবাদাত নিয়ে খেলায় মশগুল হয়েছ। যে ব্যক্তি অশ্রু দ্বারা চেহারা ভেজাচ্ছে, সে যেন জেনে রাখে যে, আমাদের বুক রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। যার ঘোড়া বিনা কারণে ক্লান্ত হচ্ছে, সে জেনে রাখুক যে, আমাদের ঘোড়া যুদ্ধের দিনে ক্লান্ত হচ্ছে। কস্তুরী সুগন্ধী তোমাদের জন্য। আমাদের কস্তুরী হলো (রণাঙ্গনের) পবিত্রতম ধূলোবালি।"

ইবনুল মোবারক একথাগুলো তার বন্ধুকে যখন লিখেছিলেন, তখন জিহাদ ফরযে আইন ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর ইবাদাতকে তিনি খেলা বলে অভিহিত করেছেন। অথচ সে ইবাদাত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল পৃথিবীর পবিত্রতম জায়গায়। যদি সেদিন জিহাদ ফরযে আইন হতো, তাহলে ইবনুল মুবারক তার বন্ধুকে কী লিখতেন একবার ভাবুন তো। আর সে ইবাদাত যদি মসজিদুল হারামে না হয়ে অন্য কোথাও হতো তাহলেই বা তিনি কি বলতেন ?

www.pathagar.com

বস্তুত আল্লাহর পথে আহবানকারীর পক্ষে নিভৃত ইবাদাতের দিকে আকৃষ্ট হওয়া মোটেই সঙ্গত নয়—তা তার উদ্দেশ্য ও উপায় উপকরণ যতই চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর হোক না কেন। আহবানকারীর দাওয়াতী ময়দানই হলো তার সাধনার স্থান। মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করাই হলো তার সেই মসজিদ—যেখানে সে আল্লাহর হেদায়াত ও সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা ময়দানে কর্মরত বান্দাদের ওপর মসজিদ ও খানকায় ইবাদাতকারীদের তুলনায় উত্তম অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। প্রিয় ভাই ! যে ব্যক্তি একটি দল সাথে নিয়ে কেয়ামতের ময়দানে হাজির হবে এবং যে ব্যক্তি একাকী উঠবে—এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কত পার্থক্য ভেবে দেখুন তো।

দাওয়াতের কাজে ও দাওয়াতদাতার জীবনে এই রূহানিয়াতের অবদান

সব শেষে আমরা দাওয়াতদাতার জীবনে এই রূহানিয়াতের উপকারিতা কি কি তা বর্ণনা করবো।

প্রথমত ঃ দাওয়াতকারী এমন এক চিকিৎসক—যিনি মানবতাকে তার সবচেয়ে মারাত্মক রোগ থেকে মুক্ত করার জন্য চিকিৎসায় নিয়োজিত। সে রোগটি এমনই ভয়ংকর যে, অন্য সকল রোগও তার ভিতর দিয়েই অনুপ্রবেশ করে। জানা কথা যে, এ রোগের ওষুধ কোন কৃষি ক্ষেতে জন্মে না, খনিতেও উৎপন্ন হয় না, কোন ফার্মেসীতেও তা তৈরী হয় না। মু'মিন বান্দার অন্তরে তা আল্লাহ প্রদত্ত রূহ ছাড়া আর কিছু নয়। এই রূহ তাকে আল্লাহর অনুগত বানায়। তাই এই রূহই হয়ে দাঁড়ায় তার নিরাময়ের উপকরণ। আল্লাহর অনুগ্রহ, নূর, শক্তি, সন্তুষ্টি, উৎফুল্লতা, অবিচলতা ও নেক আমলের উৎস। তাই এই জীবন্ত প্রশস্ত হৃদয় হলো 'আল্লাহর চিকিৎসালয়' বিশেষ এবং এ হৃদয় থেকে যে কথাই নির্গত হয় তাকে একটা 'ওষুধের বাক্স' বলা যায়, যাতে যাবতীয় রোগের নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত দাওয়াতকারীর কথাবার্তা ও কার্যকলাপ তার রূহানী সত্তা থেকে নির্গত না হবে কিংবা তার বস্তুতান্ত্রিকতার বাইরের যে জীবন, তা থেকে উৎসারিত না হবে, ততক্ষণ সে সব কথাবার্তা থেকে আল্লাহর নূরের ঝলক আসবে না এবং তা মানুষের মনকে রোগমুক্ত করার যোগ্যতা ধারণ করবে না। একথা ঠিক যে, কখনো কখনো কোন কোন বক্তা খুবই অলংকারমণ্ডিত ও চটকদার কথা বলে ভাবাবেগের ঢেউ তুলে থাকেন এবং বাহবা কুড়িয়ে থাকেন। কিন্তু সে বাহবা কৃত্রিম। কথার মায়াজাল বিস্তার করে মানুষকে বিহবল করে দিয়ে এই বাহবা কুড়ানো হয়। এতে মানুষের মনের রোগমুক্তির যথার্থ কোন উপাদান থাকে না। একজন রোগীকে যদি ওষুধ শূন্য ওষুধের বাক্স দেয়া হয় তবে তাতে তার

www.pathagar.com

রোগ সারে না। ওষুধের বাক্সটা যদি সোনা দিয়ে মোড়ানোও হয় কিংবা মূল্যবান পাথর, হাতির দাঁত বা মুক্তা খচিত হয় তবুও কিছু এসে যায় না।

বস্তুত সত্যিকার আল্লাহমুখী হওয়াই প্রকৃত ওষুধ। দাওয়াতকারীর কথা ও কাজে যদি তার আল্লাহমুখিতার প্রতিফলন না ঘটে তবে তাতে কোন কল্যাণ হবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ দাওয়াতকারীর রূহানিয়াতের এই স্তরে পৌছতে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। তিক্তকর বঞ্চনা, কষ্টকর চেষ্টা-সাধনা এবং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়নের ছবর এর অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়। আর আল্লাহর বিধানের প্রতিটা খুঁটিনাটি নিজের ব্যক্তি সত্বায়ও ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত নিখুঁত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করতে হয়। এতে কোন রকমের শৈথিল্যের প্রশ্রয় দেয়া তো চলেই না, অধিকন্তু আল্লাহর বিধানকে মজ্জাগত বানাতে হয় ও স্বভাবে পরিণত করতে হয়। এ স্তর অতিক্রম করার পর সে যখন কোন ভালো কাজের দিকে ডাক দেবে, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে কিংবা উচ্চতর ও মহত্তর জীবনের স্বাদ বর্ণনা করবে, তখন তার সে বর্ণনা হবে সুনিশ্চিত জ্ঞান, বিশ্বাস এবং আপন অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুস সাক্ষ্য থেকে উদ্ভূত। তখন পরীক্ষিত সত্য ছাড়া অন্য কিছু তার কথায় স্থান পাবে না। কথা বলার উপাদান ও বিষয়বস্তু তার মন ও মগজেই বিদ্যমান থাকবে, তাকে কোন বই কিতাব ঘাটতে হবে না। কেননা তখন সে নিজেই এই মহাসত্যের একখানা গ্রন্থ। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সে নিজেই একখানা কিতাবে পরিণত হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অভিজ্ঞতার তিক্ততা ও বাস্তবায়নের প্রাণান্তকর ধৈর্য তার যে প্রবৃত্তিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে এবং তাকে তার আল্লাহমুখী আত্মার সাথে একাকার করে দিয়েছে, সেটা তার চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে, হাতের ইশারায় এবং কপালের উজ্জ্বলতায় অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও বাঙময় হয়ে ফুটে ওঠে। ফলে এগুলো তার মুখের কথার চেয়েও বেশী প্রাঞ্জলভাবে ও দক্ষভাবে জনগণের সাথে কথা বলে। এমনকি এই ভাষার শব্দ ও সুর এতবেশী শাণিত ও ক্ষুরধার হয় যে, তা মানুষের মনে মুখের কথার চেয়েও অনেক তীব্র প্রভাব বিস্তার করে। হাসানুল বান্না (র) যখন কথা বলতেন বা বক্তৃতা করতেন তখন কি তার মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করেছেন ? তাঁর চোখ, তাঁর মুখের পেশী, তাঁর স্বর থেকে টপকে পড়া স্নেহসুধা, তাঁর বিনীত উচ্চারণ ভঙ্গী এবং হাতের ইশারা কি দেখেছেন ? এই মহান আদর্শ নেতা (র) যখনই কথা বলতেন, নতুন কিছু বলতেন না, কেননা তিনি তো আল্লাহর শাশ্বত বাণী দিয়েই কথা বলতেন। কিন্তু মুখের অভিব্যক্তি, উচ্চারণ ও চোখের চাহনি ছিল অভিনব। তার এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ছিল সত্য ভাষণের এক একটি ধারালো জিহবা এবং তাঁর

www.pathagar.com

বক্তৃতার সাথে এগুলোও মুখর ও সোচ্চার হয়ে উঠতো। ফলে পুরানো কথা তাঁর মুখে নতুন শোনাতো। কেননা সে সব কথা উচ্চারিত হতো পরীক্ষার প্রচণ্ডতা থেকে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে এবং সাধনা ও বঞ্চনার তীব্রতা থেকে। তিনি যখন ব্যক্তিগত জীবনে ঐসব নিগূঢ়তম গুণের অনুশীলন ও প্রয়োগ করতেন এবং নিজের ও স্বজনদের জীবনে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেন তখন সেই মহান সাধক পুরুষের ঘরের দেয়ালগুলোও তা প্রত্যক্ষ করতো। আমি এই মহান নেতার জীবন থেকে আর বেশী সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে চাই না। কারণ হিংসুক লোকের অভাব নেই। একগুঁয়ের সংখ্যা তো আরো বেশী। এ দুই শ্রেণীর কোনটাকেই এ সুযোগ দেয়া আমরা প্রয়োজন মনে করি না তারা আমাদের ওপর ব্যক্তি পূজা কিংবা ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করার অপবাদ আরোপ করতে পারে। সুতরাং আসুন, আমরা বক্তব্যের স্বপক্ষে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন থেকেই স্বাক্ষ্য ও দৃষ্টান্ত পেশ করি। তিনি যাদের কাছে অচেনা, তাদের সাথেও যখন কথা বলতেন, তখন তারা বেএখতিয়ার বলে উঠতো ঃ "আল্লাহর কসম, এই চেহারা আর এই কণ্ঠস্বর কোন মিথ্যাবাদীর হতে পারে না।" এর অর্থ হলো, তারা তাঁর ভাষা ও কথার চেয়ে তার চেহারা ও কণ্ঠস্বর দ্বারা বেশী প্রভাবিত হতো। এর ব্যাখ্যায় আমরা ইতিপূর্বে যা বলেছি, তা ছাড়া আর কিছু বলার অবকাশ নেই।

প্রিয় ভাই ! নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে এরূপ একদল বক্তা হিসেবে পেতে কি আপনি আগ্রহী ? যারা আপনার সাথে সাথেই আপনার বক্তব্যে সোচ্চার হবে ? প্রত্যেকটি অঙ্গকে এমন এক একটি সত্যভাষী জিহ্বা হিসেবে কি পেতে চান যে, আপনি যা বলেন তাই বলতে থাকবে এবং আপনাকে সমর্থন ও সত্যায়ন করে যেতে থাকবে ? তাহলে একটি কষ্ট সহিষ্ণু মন, কঠোর অধ্যবসায়ী আত্মা এবং তিক্ত মিষ্ট সবরকমের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হৃদয় চাই আপনার। সেই হৃদয়ের তেজস্বিতাই আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আপনার সহবক্তায় পরিণত করবে, তাকে বানাবে আপনার সহযোগী স্বোচ্চার কণ্ঠ।

অনেকে অনুযোগ করেন যে, এ এক কঠিন দায়িত্ব ও কষ্টসাধ্য পরিকল্পনা এবং পীড়াদায়ক পর্যায়ের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য—যা দাওয়াতদাতার ওপর চাপানো হচ্ছে। এ অনুযোগের জবাবও এসেছে অন্য সহযোগীর পক্ষ থেকে। জবাবটা এরূপ ঃ এটা অপরিহার্য। কারণ আপনার মিশন বা ব্রত আরো কঠিন। সম্পাদ্য কাজটা আরো ঝুঁকিপূর্ণ। আর যে পণ্য আপনি এর বিনিময়ে লাভ করবেন তা আরো বেশী লাভজনক। যে মর্যাদায় আপনি ভূষিত হবেন তা অতি উচ্চ ও মহান। আর এসবের লক্ষ্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাতো সবচেয়ে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ।

www.pathagar.com

আমি তো বলেছি যে, আপনি দাওয়াতদাতাদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মিশন ও নবীদের মিশন একই। এমন দুর্লভ মঞ্জিল বিনা কষ্টেই অতিক্রম করতে চান কিভাবে?

তৃতীয়ত ঃ দাওয়াতদাতা একজন অধিনায়ক। অধিনায়ক যদি নিজের আত্মার তেজস্বিতা ও মনের প্রাবল্য ও প্রাধান্যের জোরে অধিনায়কত্ব না করতে পারে, তাহলে সে একজন দুর্বল ও প্রভাবহীন নেতা ছাড়া কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে আশপাশের মানুষের মন জয় করা নিছক ক্ষমতাশালীর চাপিয়ে দেয়া আইন বা নির্দেশের জোরে কিছুতেই সম্ভব হবে না। দাওয়াতদাতার অন্তর্নিহিত সত্তা ও তার ভেতরের মানুষটিই পারে চারপাশের লোকদের মন জয় ও আকৃষ্ট করতে। আর সামষ্টিক রূহানিয়াতের এই উদ্যানেই বিকশিত হয় সেই অন্তর্নিহিত সত্তা, তরতাজা ও বলিষ্ঠ হয়ে বেড়ে ওঠে সেই ভেতরের মানুষটি।

চতুর্থত ঃ সামষ্টিক রূহানিয়াত দাওয়াতদাতাকে সেই প্রাকৃতিক জ্ঞানের সম্পদে সমৃদ্ধ ও তার জ্যোতিতে দীপ্ত করে যা জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে তার সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরে এবং তার উপলব্ধিতে ও পর্যবেক্ষণে তার কোন ভুল হয়ে থাকলে তা শুধরে দেয়। আর সেই আলোতেই সে জীবনের কঠিন ও জটিল সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পায়। এই জ্ঞানের আলো প্রসঙ্গেই আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ○

"আল্লাহ যাকে আলো দেননি, তার আর কোন আলোই নেই। (অর্থাৎ পথের সন্ধান লাভের আর কোন উপায় তার থাকে না।)

-(সূরা আন নূর ঃ ৪০)

একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের মন অত্যন্ত প্রশস্ত, তার পরিধি ও পরিমণ্ডল বিস্তৃত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এর একটা সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে যা তাকে বস্তুকেন্দ্রিক ও দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্য ভিত্তিক ধ্যান-ধারণার খাঁচায় বন্দী করে রাখে। তাই সে বাতিলের অসার কল্পনা বিলাসে মত্ত ও ফাঁপা বুদবুদের চোখ ধাঁধাঁনো সৌন্দর্যে প্রতারিত হয়। আর এর ফল দাঁড়ায় এই যে, জীবনকে হৃদয়ঙ্গম করতে এবং জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে গিয়ে সে ঐসব বাতিল ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রভাবিত হয় বলেই তার সিদ্ধান্তে ভ্রান্তি এবং পরিমাপে ও মূল্যায়নে পদস্খলনের মাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু তার মনে যখন আল্লাহমুখিতার সূর্য উদিত হয়, তখন তার সমগ্র অন্তরাত্মা আলোয় উদ্ভাসিত হয়। মনের সকল দিগন্তে

www.pathagar.com

আলোর বন্যা বয়ে যায়। আর এর ফলে দেখা যায় সেই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পরিমণ্ডল এক বিস্তীর্ণ পরিসরের রূপ ধারণ করেছে। আর নতুন নতুন তত্ত্ব তথ্য ও অনুভূতি—যা ইতিপূর্বে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল তা উদঘাটিত হতে শুরু করেছে। এখন দেখা যাবে, আমরা নতুন বোধশক্তি নিয়ে বস্তুনিচয়কে দেখতে আরম্ভ করেছি। নতুন মানদণ্ডে সবকিছু যাচাই করতে শুরু করেছি।

একবার এক ইখওয়ানী ভাই তাঁর সাথীকে জানালেন যে, আপনার অমুক সাবেক ছাত্র মার্কনীকে ইমাম গাজ্জালীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে রায় দিয়েছে। কারণ মার্কনী তো মানুষের উপকারার্থে আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেছেন। আর গাজ্জালী মানবজাতির কি উপকারটা করেছেন? সাথী বললেন ঃ ঐ সাবেক ছাত্রটি তার আসল সত্তার পরিচয় পায়নি। তাই তার চারপাশের জগতে বস্তু ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব সে টের পায়নি। মানুষকে সে ভেবেছে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ সর্বস্ব প্রাণী। নশ্বর পার্থিব বস্তুগুলো নিয়ে আনন্দ উপভোগ করাতেই সে জীবনের স্বার্থকতা মনে করে। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্ভ্রম যদি সে উপলব্ধি করতো তাহলে এসব ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো এবং জীবনের ভিন্নতর পরিমণ্ডলে অন্য রকমের মান মর্যাদা অন্বেষণ করতো। জীবনের সেই ভিন্নতর পরিমণ্ডল তার উচ্চতর আকাংখার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতো এবং মানবোচিত ধ্যান-ধারণার লালন করতো। আর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্ভ্রমবোধ তার জন্য আলো ও প্রজ্ঞার উৎস হয়ে দেখা দিত। সেই আলো ও প্রজ্ঞা তার সত্তার প্রকৃত স্বরূপ তার সামনে উদঘাটন করে দিত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তার পরম সম্মানের আসনটি দেখিয়ে দিত। অধিকাংশ মানুষ জড়বাদী সভ্যতার যে চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের প্রতারণার শিকার, সাবেক ছাত্রটিও তার শিকার হয়েছে। অধিকাংশ মানুষেরই অবস্থা এই যে, তারা দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী এবং রকমারী খাদ্য পানীয়তেই সন্তুষ্ট আর এসব দৈহিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করে তাদের ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করাকেই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। অথচ মানবতার উন্নতি ও প্রগতি এর দ্বারা কিছুমাত্র সাধিত হয় না। মানুষের সৃষ্টি তত্ত্ব অনুসারে তা হওয়ার কথাও নয়। মানুষের উন্নতি ও প্রগতি নিশ্চিত হতে পারে শুধু একটি পন্থায়। তাহলো এই যে, তার কামনা-বাসনা ও আবেগকে ইতর প্রাণীর স্তর থেকে ঊর্ধে উঠতে হবে, তার জৈবিক চাহিদাকে পরিশীলিত ও সুবিন্যস্ত করতে হবে, তার আদর্শিক ও গুণগত সত্তাকে উৎকর্ষ ও পূর্ণতা দান করতে হবে এবং তার মানসিক শক্তিগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর কাছে রক্ষিত নিয়ামতসমূহ লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত করতে হবে। মানুষকে যদি 'পশু' বলে সম্বোধন করা হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ ও মারমুখী হয়ে ওঠে। কেন তা হয়? অথচ সে নিজে যখন পশুর মত জীবনযাপন করে তখন তার নিজের ওপর ক্ষোভের উদ্রেক হয় না কেন?

www.pathagar.com

কোন মানুষই একথা মনে করে না যে, সে পশু থেকে পৃথক হয়েছে শুধু এই জন্য যে, সে গমকে রুটী বানিয়ে খায়, আর পশু আস্ত গম খায়। সে এ জন্য পশু থেকে আলাদা মর্যাদা লাভ করেনি যে, সে শীম বরবটী ইত্যাদি রান্না করে খায়, আর পশু রান্না করে খায় না। সে জন্যও পশুত্বের উর্ধে ওঠেনি যে, সে কাপড় দিয়ে দেহ আবৃত করে এবং বিছানা পেতে শোয়। কিন্তু পশু আল্লাহ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই রয়ে গেছে। তাহলে মানুষ এই আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত কেন ? কেনইবা শুধুমাত্র দেহসেবার ও ইন্দ্রিয়সেবার উন্নতিকে উন্নতি মনে করা হয় ? আগে শুধু রুটী খেত, এখন আরো উন্নত মানের খাদ্য খায়, আগে শুধু সিদ্ধ বা ভুনা গোশত খেত, আর এখন গোশতের তৈরী রকমারি জিনিস খায়, আগে আঙ্গুল দিয়ে ধরে খেত এখন কাটা চামচ দিয়ে খায়, আগে উটে চড়তো আর এখন গাড়ীতে চড়ে, আগে দূত দিয়ে খবর পাঠাতো আর এখন বৈদ্যুতিক তারে বার্তা পাঠায়, আগে নিকট থেকে ছাড়া কথা শুনতে পেতনা এখন রেডিও ও টেলিফোন দ্বারা দূরে বসে কথা শুনতে পায় ইত্যাদির জন্যেই কি সে নিজেকে উন্নত ও প্রগতিশীল মনে করে ? তাকে 'পশু' বললেই যখন তার ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং উন্নতমানের খাবার খাওয়ার কারণেই সে পশু থেকে আলাদা হয়নি বলে যখন মনে করে, তখন কি কারণে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সেবা ও বিলাসিতায় বাড়াবাড়িকে উন্নতি ও প্রগতি মনে করা হবে ?

মানুষকে 'পশু' বললে তার যে রাগ হয়, সেটা অত্যন্ত শুভ রাগ। এই রাগ ততটা জোরদার হওয়া চাই যে, তার ইচ্ছা আকাংখাকে অনেক বুলন্দ করে দিতে পারে এবং তাকে নেহাৎ ইতর প্রাণী সুলভ সংকীর্ণ জৈবিক দাবীর মধ্যে সীমিত ও সংকুচিত হয়ে থাকতে না দেয়। সে রাগ যেন তার মর্যাদা ও জীবন যাপনের স্তরকে আরো উর্ধে তুলে দিতে পারে এবং তার মানবিক সত্তা ও পাশবিক সত্তায় কি বিরাট ব্যবধান তা তাকে দেখিয়ে দিতে পারে। এ জন্য তার কর্তব্য হলো, পশুত্ব থেকে কত উর্ধে উঠলো তা মেপে দেখবে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কতখানি অর্জিত হলো তা দ্বারা—তার ইন্দ্রিয়ের ভোগস্পৃহা তৃপ্তির জন্য কত কি আবিষ্কার করতে পারলো তা দ্বারা নয়।

বস্তুত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তৎপরতা বৃদ্ধি ও উন্নতির সম্প্রসারণ ছাড়া শুধুমাত্র বাহ্যিক উন্নতির জন্য যে চেষ্টা-সাধনা করা হবে, সে চেষ্টা দ্বারা মানুষের নগণ্য পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া এবং ইতর প্রাণীর স্তরে থাকা বা তার চেয়েও নীচে নেমে যাওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। আর যে চেষ্টা আসমানী হেদায়াতের সাহায্যে মনকে উজ্জীবিত করা ও মানসিক ক্ষমতাগুলোকে ফলপ্রসূ করার কাজে নিবেদিত, সেটা যথার্থ কল্যাণকর প্রচেষ্টা বলে বিবেচিত। এ ধরনের প্রচেষ্টা তার উচ্ছৃংখল ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা প্রসমিত করতে

www.pathagar.com

এবং মানুষকে ইতর প্রাণীর স্তরের জীবনযাপন থেকে মুক্ত করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও আর্শীবাদপুষ্ট উঁচু মানের জীবনযাপনের পরিমণ্ডলে উন্নীত করতে সহায়তা করে। এটা সেই মহিমান্বিত পরিমণ্ডল যেখানে মানুষের মুনষত্ব উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভ করে। তাই এটাই মানুষের রোগ মুক্তি, আল্লাহর অনুগ্রহ ও আর্শীবাদ লাভ এবং হেদায়ত লাভের সর্বোচ্চ সোপান। মানুষকে এই সুমহান গন্তব্যে পৌছিয়ে দিতে যার কোন অবদান আছে, সে-ই মানবতার প্রকৃত বন্ধু। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এবার ভেবে দেখুন, মানবতার সেবায় মার্কনীর স্থান বা কোথায়, গাজ্জালীর ভূমিকাই বা কি ? মার্কোনীর জগত আর গাজ্জালীর জগত সম্পূর্ণ আলাদা দুই জগত। এ দুই জগতের মধ্যে কোন্‌টি মানবতার ওপর বেশী কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা সহজেই বোধগম্য।

ইমাম গাজ্জালী সর্বদাই নিজ বিবেকের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ থাকতেন। যখন নির্জনে থাকতেন, তখন জিকির ফিকির আর নামাযে মশগুল থাকতেন। আর যখন জনগণের কাছে আসতেন তখন ওয়াজ নসীহত ও দ্বীনের শিক্ষাদানে লিপ্ত হতেন, মানুষকে আযাব থেকে সর্তক করতেন, আখেরাতের জবাবদিহির কথা স্মরণ করাতেন, মানুষের মনকে নরম করে দেয় এমন কথা বলতেন, শ্রতাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত জজ্‌বার সৃষ্টি করতেন। আর এ সবের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভের চেষ্টা করতেন। এই ওয়াজ নসীহত শেষে বই লেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, লেখনীর মাধ্যমে মানুষের মনের ব্যাধি বিশ্লেষণ করতেন, মনের নানা অবস্থার উল্লেখ করে উপযুক্ত ওষুধ নির্বাচন করতেন, ঈমানের তাৎপর্য বর্ণনা করতেন এবং মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌছার পথ দেখাতেন। তার সেসব লেখা আজও মানুষের মনে প্রাণশক্তি সঞ্চারের উৎস এবং তার জৈবিক চাহিদা ও স্বভাবকে সংহত ও মার্জিত করার উপকরণ রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আর মার্কোনী ? মানবিক উন্নতির ক্ষেত্রে সে কতটুকু অবদান রেখেছে ? সে একটা বা কয়েকটা প্রাকৃতিক নিয়মকে আবিস্কার করেছে। এর চেয়ে বেশী কিছু করেনি। সে সব প্রাকৃতিক নিয়ম চালুই ছিল, সে শুধু তাকে খুঁজে বের করেছে। এই হলো তার অনুগ্রহ ও অবদান। আজ আমরা মার্কোনীর আবিস্কার ব্যবহার করছি। কিন্তু তাতে আমাদের স্বভাব প্রকৃতি ও জৈবিক তাড়না কতখানি পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়েছে ? কতটুকু আল্লাহর নৈকট্য আমরা তা দ্বারা লাভ করতে পেরেছি ?

বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইমাম গাজ্জালীর অবদান কতটুকু আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করেছে ? সহকর্মী জবাব দিলেন ঃ কিছুই সাহায্য করেনি। কিন্তু কেন করেনি জান ? কারণ আমরা তা কাজে লাগাইনি, প্রয়োগ

www.pathagar.com

করিনি। আমরা কাজে লাগিয়েছি মার্কোনীর অবদানকে। গাজ্জালীর অবদানকে নয়। তুমি চিন্তা করলেই দেখতে পাবে যে, মার্কোনীর অবদানের প্রতি আমরা যতখানি মনোযোগী হয়েছি, ততখানি যদি ইমাম গাজ্জালীর প্রতি হতাম, তাহলে মনুষ্যত্বের মান ও মর্যাদা কত বৃদ্ধি পেত এবং মানুষের আবেগ ও আত্মার কত বড় উৎকর্ষ সাধিত হতো।

বন্ধুটি আবার বললো ঃ মানবজাতির মধ্যে কিছু আবিষ্কারক তৈরী হোক, তা কি আপনি নিষিদ্ধ করতে চান ?

সহকর্মী বললেন ঃ না, আমি তা বলিনি। আমি শুধু এইটুকু চাই যে, মানুষের মান নির্ণয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমানের মানদণ্ড ব্যবহার করা হোক এবং তার কাজকর্মের মূল্যায়ন করা হোক তার বাহ্যিক উন্নতিতে শুধু নয় বরং তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সে কতটুকু সাহায্য করেছে তার নিরীখে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইমাম গাজ্জালীর একটা রজনী সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে মার্কোনীর সমগ্র জীবনের চেয়ে বেশী ভারী। মার্কোনী যত কিছু আবিস্কার করেছে, তা সর্বসাকুল্যে ইমাম গাজ্জালীর 'ইহয়াউল উলূম' গ্রন্থের এক পৃষ্ঠার সমানও গুরুত্ব রাখে না। আমার এ উক্তির এক বর্ণও ভুল নয়। তার প্রমাণ এই যে, একজন প্রগতিশীল মানুষের বিবেককে যদি আপনি দুইটি কাজের একটি করার এখতিয়ার দিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ করেন যে, হয় সে মার্কেনীর সমস্ত আবিস্কারকে নিশ্চিহ্ন করবে, নয়তো 'ইহয়াউল উলুমে'র একটি পৃষ্ঠায় যতগুলো মহৎ দৃষ্টান্ত, উৎকৃষ্ট মানের চিন্তাধারা ও খোদায়ী প্রাণশক্তির বর্ণনা আছে, তাকে নিশ্চিহ্ন করবে, তাহলে সে এমন ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে অস্থির হয়ে যাবে এবং এমন ক্ষতিকর চুক্তি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে।[১]

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ উপলব্ধি আমাদের মধ্যে আসবে কবে ?

বস্তুত একমাত্র আল্লাহমুখী চিন্তাধারাই বহু বিকৃত চিন্তাধারা ও ভুল ধারণার সংশোধন করতে সক্ষম। সত্যের অনির্বাণ শিখাকে আমরা প্রোজ্জ্বল দেখতে পাই তার মধ্যে।

পঞ্চমত ঃ সামষ্টিক রূহানিয়াত দাওয়াতকারীর মনকে বিগলিত করে। ফলে তা জাগ্রত ও তেজোদ্দীপ্ত হয় এবং কুরআনী প্রাণশক্তির প্রবাহ তাতে প্রেরণার জোয়ার আনে। এতে কুরআনের এমনসব সূক্ষ্ম ইংগীত তার হস্তগত হয়, যার দিকে অন্যদের নজরই পড়ে না। যে দাওয়াতকারী কুরআনকে তার

---

১. মার্কেনীর আবিস্কারকে নষ্ট করতে তার বিবেক ক্ষত বিব্রত বোধ করবে না, যতটা বিব্রত বোধ করবে গাজ্জালীর লেখাকে নষ্ট করতে। শেষেরটা যে প্রথমটার চেয়ে বেশী মূল্যবান, তা আধুনিক প্রগতিবাদী মানুষের বিবেকও স্বীকার করে।—অনুবাদক

www.pathagar.com

সাহায্যের সবচেয়ে বড় উৎস মনে করে, তার জন্য এটা অত্যন্ত অপরিহার্য। একথা ঠিক যে, সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা স্বাধীনভাবে কুরআনকে বুঝা সম্ভব নয়। কেননা কুরআন স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক দুরন্ত ঐশী শক্তি। কুরআন শুধু কতকগুলো শব্দ ও মর্মের সমাবেশ নয়। বুদ্ধি যদি তার শব্দগুলোকে বুঝতে এবং তার সমস্ত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো (আসলে তা সে কখনো পারে না), তাহলেও তার মধ্যে বিরাজমান আল্লাহ প্রদত্ত প্রাণশক্তির প্রবাহকে সে কখনো অনুধাবন করতে পারতো না। কেননা সেটা অনুধাবন করা মনের কাজ—বুদ্ধির নয়। বস্তুত এই অনুধাবন ও উপলব্ধির ক্ষমতাটাই ভাষার আড়ালে ও শব্দের নেপথ্যে যে সূক্ষ্ম ইশারা ও নিগূঢ় তত্ত্ব থাকে তাকে উদঘাটন করে থাকে। আর এ ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই আছে, যাদেরকে আল্লাহ তা বিশেষ ব্যবস্থাধীনে প্রদান করেছেন।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে সামনে বসাতেন। কেননা পবিত্র কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে তার যে বিশেষ দক্ষতা ছিল, তা তিনি জানতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বদর যুদ্ধের প্রবীণ যোদ্ধাদের সাথে হযরত ওমরের দরবারে প্রবেশ করতেন। এই প্রবীণ মুজাহিদদের একটা আলাদা মর্যাদা ও অগ্রাধিকার স্বীকৃত ছিল। ওমর অনুভব করলেন যে, তাদের কেউ কেউ একটু ক্ষুণ্ন হয়েছেন। একজন তো বলেই ফেললেন ঃ এই যুবক আমাদের সাথে সাথে ঢোকে কেন ? ও তো আমাদের ছেলের বয়সী।

ইবনে আব্বাস বলেন ঃ পরবর্তী কোন একদিন ওমর আমাকে ডাকলেন এবং সেইসব মুরব্বীর সাথে বসালেন। আমার স্পষ্টতই মনে হলো যে, তিনি ঐদিন আমাকে ডেকেছেন শুধু প্রবীণদেরকে একটা কিছু দেখানোর জন্য। ওমর প্রবীণদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা এই সূরাটির ব্যাখ্যা করুন ঃ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি দেখবে যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে তখন তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পড় এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল।"
—(সূরা আন নাছর ঃ ১-৩)

অনেকেই কিছু না বলে চুপ থাকলেন। কেউ কেউ বললেন ঃ 'এর মাধ্যমে আমাদেরকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন আমাদের ওপর আল্লাহর সাহায্য

www.pathagar.com

আসবে এবং আমরা বিজয়ী হব, তখন আমরাও যেন তাসবীহ পড়ি ও ক্ষমা প্রার্থনা করি।' আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, এ তাফসীর সঠিক। কিন্তু হযরত ওমর ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যার মুখে ও মনে আল্লাহ হকের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। তিনি এ আয়াতগুলোর শব্দের আড়ালে একটা গোপন সূক্ষ্ম ইংগীত দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই তিনি ইবনে আব্বাসের দিকে তাকালেন। বললেন ঃ ইবনে আব্বাস। তুমিও কি এই কথাই বলতে চাও? ইবনে আব্বাস বললেন ঃ না।

ওমর ঃ তাহলে তোমার বক্তব্য কি?

ইবনে আব্বাস ঃ এটা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার সংবাদ। আল্লাহ তাকে ব্যাপারটা এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন সেটা তোমার ওফাতের পূর্বলক্ষণ মনে করবে। তাই তোমার প্রভুর তাসবীহ পড়তে থাক ও ক্ষমা চাও। তিনি ক্ষমাশীল। হযরত ওমর বললেন ঃ আমার মতে এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। ভাবুনতো দেখি, শব্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই সূক্ষ্ম ইংগীতটা কোন্ বুদ্ধির চোখে পড়লো? বুদ্ধি নয়—এটা সেই সজিব হৃদয়ের উদ্ভাবন যা আল্লাহর আসল বক্তব্যকে সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা রাখে।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে, এই ব্যাখ্যাকে আমরা কিভাবে সঠিক বলে ধরে নেব এবং কোন্ কারণে এ ব্যাখ্যাকে অন্য সব সাহাবীর মতের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করা সমিচীন?

এর জবাব এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাস্তব কার্যধারাই এর কারণ। সহীহ মুসলিম শরীফে আছে যে, ইন্তিকালের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা) ঘন ঘন এই দোয়া পড়তেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ এই যে নতুন কথাগুলো আপনাকে উচ্চারণ করতে দেখছি, এগুলো কি?

তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে আমার জন্য একটি আলামত তৈরী করা হয়েছে। সে আলামতটি যখনই দেখি, তখন এই দোয়া পড়ি।" অতপর তিনি সূরা আন নাছর সম্পূর্ণ পড়ে শোনালেন।

কখনো কখনো কোন কোন আয়াতের তাৎপর্য স্পষ্ট থাকে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিমত্তায় তা ধরা পড়ে না। কুরআনে বুৎপত্তি সম্পন্ন মনীষীরা তা বুঝতে

www.pathagar.com

পারেন অতপর তা প্রকাশ করেন এবং তার এমন সুন্দর ব্যাখ্যা দান করেন যে তার অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যায়। কতিপয় লোক আছেম বিন জিয়াদ সম্পর্কে হযরত আলীর নিকট অভিযোগ করলো যে, তিনি (আছেম) ভালো কাপড় পরা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত মোটাসোটা কাপড় পরেন। ভালো কাপড় পরা এতে তার স্ত্রী ও সন্তানরা মর্মাহত। হযরত আলী বললেন ঃ তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস। আছেম (রা) যখন এলেন, তখন তাকে দেখে হযরত আলীর মুখমণ্ডলে অসন্তোষ ফুটে উঠলো। তিনি বললেন ঃ হে আছেম ! তোমার অবস্থা দুঃখজনক। তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ তোমার জন্য যেসব নেয়ামত হালাল করেছেন, তা তুমি গ্রহণ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন ? তুমি এসব নেয়ামতের তুলনায় আল্লাহর কাছে কুরআনের এ নগণ্যতর আয়াত কি তুমি শোননি ?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

"দুইটি সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন যেন পরস্পর মিলিত হয়। তা সত্ত্বেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে আছে, যাকে সমুদ্র দু'টি অতিক্রম করে না।.......এসব সমুদ্র থেকে মণিমুক্তা ও প্রবাল বের হয়।
-(সূরা আর রহমান ১৯-২২)

আল্লাহর কসম, বেশী করে ব্যবহার ও প্রয়োগ দ্বারা আল্লাহর নিয়ামতকে মানুষের সামনে জাহির করা আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় বেশী কথা বলে জাহির করার চাইতে। তুমি নিশ্চয়ই এ আয়াতও শুনেছ ঃ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ। এ আয়াত আমরা তো কতবার পড়েছি। এখানে এক চমৎকার পার্শদৃষ্টির উদাহরণ বিদ্যমান। তবে যারা অত্যন্ত সজাগ মনের অধিকারী একমাত্র তারাই এ ধরনের পার্শদৃষ্টি দিতে পারে। وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "আর তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতকে প্রকাশ করতে থাক।"-(সূরা আদ দুহা ঃ ১১)[১]

কিন্তু এর মধ্যে তেমন কোন তাৎপর্যের সন্ধান পাইনি। অথচ হযরত আলী পেলেন এবং ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন ঃ "তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ এই সমস্ত নিয়ামত তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং হালাল করেছেন, অথচ তুমি এগুলো ব্যবহার করবে তা তিনি অপছন্দ করবেন ? মনে রেখ, তুমি এসব নেয়ামতের তুলনায় আল্লাহর কাছে নগণ্যতর।"(অর্থাৎ তুমি এগুলো ব্যবহার করবে তাতে আল্লাহর কিছু এসে যায় না।)

১. এখানে আমি হযরত আলীর বক্তব্যকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করেছি।"—গ্রন্থকার

www.pathagar.com

এ ধরনেরই বরং এর চেয়েও চমৎকার ব্যাপার হলো সেই প্রাপ্ত মুহূর্তটি —যখন তার মন সূরা রহমান থেকে সূরা আদ দুহার দিকে ত্বরিত গতিতে নজর ফেরালো। তারপর সূরা আর রহমানের আয়াত يَخْرُجُ এবং সূরা আদ দুহার আয়াত وَأَمَّا بِنِعْمَةِ এর মধ্যে সর্বোচ্চ দ্রুত গতিতে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করলো। এমন সমন্বয় সাধন করলো যে, সাধারণ তফসির বেত্তার তা ধারণায়ও আসে না। এ দু' আয়াতের সমন্বয় সাধন করেই তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আল্লাহর নেয়ামত ব্যবহার করার মাধ্যমে জাহির করাই মৌখিক কথার দ্বারা জাহির করার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশী পসন্দনীয়। লোকেরা (হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস প্রমুখের মধ্যে) এরূপ চমকপ্রদ ও মূল্যবান জ্ঞানের সমাবেশ দেখে বিস্মিত হতো এবং ভাবতো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো তার বংশীয় লোকদেরকে বিশেষভাবে কিছু জ্ঞান দান করেছেন। তাই কেউ কেউ বললো ঃ হে আবুল হাসান [আলী (রা)], আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, রসূলুল্লাহ (সা) কি আমদেরকে বাদ দিয়ে আপনাদেরকে (অর্থাৎ স্ববংশীয়দেরকে) আলাদাভাবে কোন জ্ঞান শিখিয়ে দিয়ে গেছেন? হযরত আলী বললেন ঃ না, যিনি বীজ বিদীর্ণ করে তার মধ্য থেকে অংকুরোদগম করেন এবং যিনি প্রাণীকূল সৃষ্টি করেন, সেই আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, তিনি আলাদাভাবে কিছু শেখাননি। তবে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে কিছু ব্যুৎপত্তি (লাভ করেছি) যা স্বয়ং আল্লাহই তার বান্দাদের মধ্য থেকে কোন বান্দাকে দিয়ে থাকেন।

অনেক সময় আয়াতের অর্থ স্পষ্টই থাকে। কিন্তু দৃঢ় সংকল্প ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব, পার্থিব জীবনের রূপ জৌলুসের প্রতি আকর্ষণবোধ এবং শয়তানের কুপ্ররোচনায় কর্ণপাত করার কারণে আমরা সে আয়াত পড়লেও তাতে আমাদের নিজস্ব খেয়ালখুশী মাফিক কথা ছাড়া অন্য কিছু পাই না। এর দৃষ্টান্ত অনেকই আছে, তবে এখানে তার মাত্র কয়েকটাই উল্লেখ করতে চাই ঃ

(ক) আল্লাহ বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদেরকে শামাল দাও। তোমরা যদি হেদায়াত লাভ কর তাহলে যারা গোমরাহ হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৫)

অধিকাংশ মানুষ এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করে যে, সকল মানুষের কর্তব্য হলো শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা। অন্যের গোমরাহ হওয়াতে তার কিছু এসে যায় না। শুধু যে গোমরাহ হয় তারই ক্ষতি হয়।

www.pathagar.com

আয়াতটির এ তাফসির শয়তানের কুপ্ররোচনা এবং আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব থেকেই তৈরী। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে বলার যেসব নির্দেশ এসেছে, এ তাফসির স্পষ্টই তার পরিপন্থী। কুরআনের একাংশ অন্য অংশের পরিপন্থী হতে পারে না।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ○

"তবে এ কুরআন যদি আল্লাহর কাছ থেকে না এসে অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে তাতে বহু পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সন্নিবেশিত থাকতো।" —(সূরা আন নিসা ঃ ৮২)

একজনের গোমরাহীতে আর একজনের ক্ষতি হয় না—এ ধারণাটাও কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা খণ্ডিত ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ

"সেই বিপর্যয় থেকে সাবধান হও যা শুধুমাত্র তোমাদের দুষ্কর্মকারীদের ওপরই আপতিত হয় না।" —(সূরা আল আনফাল ঃ ২৫)

উল্লিখিত তাফসিরকে খণ্ডন করে এমন কতিপয় হাদীসও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে আমরা শুধু এই বৈপরীত্যটার কথা উল্লেখ করেই ক্ষ্যান্ত থাকতে চাই। সেই সাথে আয়াতটির তাফসির এমনভাবে করতে চাই যাতে করে এর প্রকৃত তাৎপর্য তার শব্দের মধ্য থেকেই আপনা আপনি বেরিয়ে আসে এবং কোন প্রকারের বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে না।

আয়াতটা ব্যাকরণের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে একটা নির্দেশবাচক উক্তি ও তার প্রতিক্রিয়া দ্বারা গঠিত। নির্দেশবাচক উক্তিটা হলো এই عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেদেরকে সামাল দাও অর্থাৎ শুধরে নাও। এর প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে ঃ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ "যে গোমরাহ হবে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।"

কথাটার তাৎপর্য এই দাঁড়াচ্ছে যে, আত্মশুদ্ধির যত উপায়-উপকরণ আমাদের নাগালের মধ্যে আছে তা অবলম্বন করে আমাদের আত্মশুদ্ধি করতে হবে। আর এই আত্মশুদ্ধি আমাদের শত্রুদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করতে একটা দুর্গের ভূমিকা পালন করবে। ফলে গোমরাহ শত্রুরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আয়াতটার যে তাফসির সচরাচর করা হয় তা একটা বিকৃত ব্যাখ্যা ছাড়া কিছু নয় এবং সে ব্যাখ্যা তারা কোত্থেকে

www.pathagar.com

পেলেন তা তারাই জানেন। আয়াতটা আপনি বারবার পড়ুন। দেখবেন আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা তার সাথে খাপ খায় না। সোজা কথায়, আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেন নিজেদের চরিত্র সংশোধনে মনযোগী হয় এবং কোন রকম অবহেলা না করে। যেভাবেই চরিত্র মজবুত এবং নির্মল করা সম্ভব সেভাবেই যেন তা করে এবং কোন প্রকার ঢিলেমি ও গড়িমসি না করে। এ নির্দেশ যদি তারা পালন করে, তাহলে শত্রুরা তাদের কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে না।

উল্লিখিত আয়াতে মু'মিনদেরকে সামগ্রিকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল ও উম্মত হিসেবে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদেরকে সামাল দাও বা শোধরাও। ব্যক্তিগতভাবে বলা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে বলা আর সমষ্টিগত বা দলগতভাবে বলায় অনেক পার্থক্য। সমগ্র উম্মতের করণীয় আর ব্যক্তির করণীয় নির্দেশ করায় বিরাট ব্যবধান।

কাজেই আয়াতটির বক্তব্য দাঁড়াচ্ছে এই যে, মু'মিনদের কর্তব্য হলো সমগ্র উম্মতের মুক্তির উপায় নির্দেশ করা, তাদেরকে নিরাপত্তার দুর্গ গড়ে দেয়া এবং সমসাময়িক যুগ ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল অত্যাবশ্যকীয় প্রতিরক্ষা ও পরিশুদ্ধির ওপকরণাদি নির্দেশ করা, সকল যুগেই এই উপকরব নিম্নলিখিত মৌলিক উপকরণের বাইরে যেতে পারে না ঃ

(১) নামায ও যাকাতসহ ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রতিষ্ঠা। কেননা এর দ্বারা রূহানী শক্তি সঞ্চিত হবে। আর অন্য সকল শক্তির আগে রূহানী শক্তি সঞ্চয়ই জরুরী।

(২) বিজ্ঞান, গোলা-বারুদ ও যুদ্ধাস্ত্রের শক্তি। আল্লাহর নির্দেশ–

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ –

"যতবেশী সম্ভব শক্তি এবং ঘোড়ার পাল প্রস্তুত করে রাখ যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীতসন্ত্রস্থ করতে পারবে।

–(সূরা আল আনফাল ঃ ৬০)

আর এই রণ প্রস্তুতির পূর্ণতালাভের জন্য প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির তীর চালনা থেকে শুরু করে যাবতীয় সমর কৌশলের প্রশিক্ষণ নেয়া একান্ত অপরিহার্য। মু'মিনদের দল যদি নিজেদের এভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও এরূপ আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে যত্নবান হয়, তাহলে তাদের সবচেয়ে মারাত্মক দুশমনও তাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। এখন তাহলে ভেবে দেখুন, আয়াতটির

www.pathagar.com

যে ব্যাখ্যা মুসলিম জাতিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন কতকগুলো ব্যক্তি রূপে বিবেচনা করে—যারা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে ভাবে না, আর কাউকে গুরুত্ব দেয় না—সে ব্যাখ্যার সাথে এ ব্যাখ্যার কত বড় পার্থক্য। এরূপ ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ মানসিকতার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত !

(খ) ইখওয়ানের এক সদস্যের একবার তার সরকারী অফিসের জনৈক সহকর্মী বন্ধুর সাথে দেখা হলো। তিনি বন্ধুকে বললেন ঃ আপনাকে আমি তিরস্কার করি। কেননা আপনি আমাদের সাথে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হচ্ছেন না। অথচ আল্লাহ আপনাকে যেমন দিয়েছেন পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞান, তেমনি দিয়েছেন প্রচুর সহায়সম্পদ, স্বাস্থ্য ও যৌবন। বন্ধুটি বললো ঃ আসলে আমরা যে সরকারী চাকুরী করি, সেটা তো আল্লাহর দিকে দাওয়াতেরই কাজ। এ কাজটা যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করি, আর আল্লাহ আমাদেরকে তা সুচারুভাবে সম্পন্ন করার শক্তি দেন, তাহলে ওটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

ইখওয়ানের সদস্য বললেন ঃ যে সরকারী চাকুরীটা আমরা করি তাতো অনেকগুলো বিধিনিষেধের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তা শুধু কক্ষসমূহের মধ্যে ও চার দেয়ালের বেষ্টনীতে সীমিত। সাধারণ মানুষ তা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে না। আমরা চাই, সে মুক্ত স্বাধীন কণ্ঠস্বর, যা চার দেয়ালের মধ্যে নয়—সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে ধ্বনিত হবে এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সরকার আরোপিত দায়িত্ব হিসেবে নয়—বরং একমাত্র আল্লাহর আরোপিত দায়িত্ব হিসেবে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করবে। বন্ধুটি বললো ঃ এটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ তো বলেছেন ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ যতটা পার আল্লাহকে ভয় কর।

ইখওয়ান সদস্য বললেন ঃ এ আয়াত আপনার পক্ষে নয়—বিপক্ষে। এর অর্থ এ নয় যে, যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই আল্লাহকে ভয় কর। এর অর্থ এও নয় যে, যেনতেন প্রকারে আল্লাহকে ভয় কর। এর একমাত্র অর্থ হলো ঃ আল্লাহ ভীতির দাবী পূরণ করতে যতটা শ্রম, সময়, জ্ঞান ও অর্থ ব্যয় করা তোমার সাধ্যে কুলায়, ব্যয় কর এবং তার এক বিন্দুও বাকী রেখ না। এ ক্ষেত্রে যদি সাধ্য থাকা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্রও চেষ্টা বাকী থাকে তাহলে আল্লাহর নির্দেশ পালনে অবহেলা ও তাকে ভয় করার দাবী পূরণে ঢিলেমি করা হলো। আচ্ছা ভাই, আপনি فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (যতটা পার আল্লাহকে ভয় কর) একথাটা বেশ মনে রেখেছেন। কিন্তু اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (আল্লাহকে যেভাবে ও যতখানি ভয় করা উচিত, ভয় কর) একথাটা ভুলে গেলেন কেন ?

এ পর্যন্ত শুনে বন্ধুটি একটু মুচকি হাসলেন এবং প্রস্থান করলেন।

www.pathagar.com

বস্তুত অনেকেই ঐ ভুল তাফসিরে বিভ্রান্ত হয়েছেন। ঠিক এ ধরনেরই আর একটি বিভ্রান্তিকর ব্যাপার নিম্নোক্ত আয়াতটিকে কেন্দ্র করে ঘটেছে ঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ তায়ালা কাউকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না।" শয়তানের প্ররোচনা এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে ঢিলেমি ও গড়িমসির মানসিকতার কারণেই উল্লিখিত দু'টো আয়াতকে এ ধারণার স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল ও অক্ষম সাব্যস্ত করেন এবং অলস ও শিথিল বান্দাদের যথকিঞ্চিৎ চেষ্টাকেও তিনি কবুল করেন।

(গ) অনেক সময় আমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীরা যখন মানুষকে সম্পদ ও সন্তানের অগ্নি পরীক্ষা সম্পর্কে সাবধান করি, তখন কেউ কেউ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا "সম্পদ ও সন্তানেরা নিকৃষ্টতম (পার্থিব) জীবনের ভূষণ"—এই আয়াতকে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিজের সাফাই দিতে চেষ্টা করেন। তারা ভাবেন, এ আয়াতে এমন অকাট্য যুক্তি আছে যা দাওয়াতকারীকে লা জওয়াব করে দিতে ও চুপ করিয়ে দিতে সক্ষম। অথচ এ আয়াতে যে যুক্তি আছে, তা তার পক্ষে নয়—বিপক্ষে। কাজেই আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য যদি সে সত্যিকারভাবে সংকল্পবদ্ধ হতো তাহলে এ আয়াতের পার্শে অন্য দু'টি আয়াতও দেখতে পেত। সে দু'টি হলো ঃ

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ

"তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যেও তোমাদের শত্রু আছে। তাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাক।"-(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৪) এবং

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۭ

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তানেরা পরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়।"
-(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৫)

কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের সাথে তার শিথিল সম্পর্ক শুধু ঐ একটি আয়াতের ওপরই এনে তার গতি স্তব্ধ করে দেয়। ফলে এ আয়াতের মধ্যে সে একটা নরম তুলতুলে বিছানা দেখতে পায় এবং তাতে আলতোভাবে গা এলিয়ে দিতে উৎসুক হয়ে পড়ে।

তাছাড়া এ আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলেও তা থেকে সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রশংসা বুঝা যায় না এবং এগুলোর জন্য উদগ্রীব হবার প্রেরণাও পাওয়া যায় না। বরঞ্চ এতে এগুলোর প্রতি নিরাসক্তি সৃষ্টির চেষ্টাই অধিকতর লক্ষ্যণীয়। এই নিরাসক্তি সৃষ্টি যদি আয়াতের প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ উক্তি

www.pathagar.com

নাও হয়ে থাকে তথাপি একথা তো অনস্বীকার্য যে, আয়াতটিতে সম্পদ ও সন্তানকে নিকৃষ্টতম ও নশ্বর জীবনের ভূষণ বলা হয়েছে—উৎকৃষ্টতম ও চিরস্থায়ী জীবনের ভূষণ বলা হয়নি। আর এ দু'টিতে যে কত ব্যবধান, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আসলে এ আয়াতটির মধ্য দিয়ে আপনার সামনে এক অতি পবিত্র, তীব্র ও তেজস্বী রূহ প্রতিভাত হয়। সে রূহ নিন্দায় সোচ্চার ঐসব লোকের বিরুদ্ধে —যারা নিজেদের মনকে উৎকৃষ্ট ভূষণ থেকে বঞ্চিত ও বিরাণ করে রাখাকেই পছন্দ করে এবং শ্রেষ্ঠতর সৌন্দর্যের উচ্চাকাংখা পোষণ করে না, বরং অন্তসার শূন্য পার্থিব রূপ জৌলুসকেই যথেষ্ট মনে করে। এসব অসার রূপ জৌলুস তাদেরকে কেবল শিশুদের মেলাতে বিক্রির পুতুল বানিয়ে হাজির করে। সম্ভবত একেবারে নিরেট আহাম্মক খরিদ্দারও এসব বড় বড় পুতুলের প্রতি আগ্রহী হবে না।

সে যাই হোক, আমরা যে আয়াতটি নিয়ে আলোচনা করছি, তার শেষ পর্যন্ত পড়লে দেখতে পাই যে, তার শেষাংশ প্রথমাংশের মর্ম নির্ধারণে সহায়তা করছে। জনৈক ইখওয়ান সদস্য একবার এই পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন। এক ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াত উল্লেখ করে যখন তার বক্তব্য খণ্ডনের চেষ্টা করলো তখন তিনি বললেন ঃ এর পরবর্তী অংশটুকু পড়ুন ঃ

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً ۝

"তবে তোমার প্রভুর নিকট চিরস্থায়ী নেক আমলগুলো অধিকতর পুণ্যময় ও আশাপ্রদ।"-(আল কাহাফ ঃ ৪৬) এতে লোকটি নিরুত্তর হয়ে গেল।

কেউ কেউ আবার-

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ـ

"তোমার দুনিয়ার হিসসাটা ভুলে যেও না।"-(সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭)

এ আয়াতকে ওজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তির নসীহত অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে থাকে। এ ধরনের লোককে আয়াতটির প্রথমাংশ শুনিয়ে দিয়েই লা জয়াব করে দিতে পারেন ঃ

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ ـ

"আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে আখেরাতের সুখ-শান্তি আহরণের চেষ্টা কর।"-(সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭)

www.pathagar.com

এভাবে আপনি তাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সাহায্য করতে পারেন। আয়াতের প্রথমাংশ ও শেষাংশের মধ্যে তুলনা করে উভয়ের পার্থক্য তাকে দেখিয়ে দিন।

এখানে আমাদেরকে একটি জিনিসকে গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হচ্ছে এবং অপর একটি জিনিস ভুলে যাওয়া থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। আয়াতটি যাদেরকে সম্বোধন করছে তাদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করছে যে, উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর পুণ্যময় কাজগুলোর প্রতি তার সুবিবেচনা এতবেশী এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের আগ্রহ তার এত প্রবল যে, তাদেরকে তাদের পার্থিব প্রাপ্য অংশ ভুলিয়েও দিতে পারে। তাই সে তাদেরকে ঐ প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে সতর্ক করে দিল। আর যেহেতু সেই অংশটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও নগণ্য, তাই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হালকা ভাষায় তাকে সতর্ক করলো। বললো ঃ তোমার দুনিয়ার হিসসাটা ভুলে যেও না।

বস্তুত আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকদের সকল ভ্রান্ত ধারণাগুলো যদি উল্লেখ করতে যাই তাহলে আলোচনা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। আসলে এসব ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনের একমাত্র হাতিয়ার হলো মনের সচেতনতা ও জাগৃতি এবং আল্লাহমুখিতার জ্যোতি দ্বারা মন দীপ্ত ও জ্যোতির্ময় হওয়া। ইসলামী দাওয়াত যার ব্রত তাকে এ হাতিয়ারে সুসজ্জিত হতেই হবে।

ষষ্ঠত ঃ ইসলামের আহবানকারী যখন একই সাথে সংস্কারক এবং সংগঠকও অথবা একজন পূর্ণাঙ্গ পরিচালকও, তখন তাকে এই সামষ্টিক রূহানিয়াত অর্জন করতেই হবে। কেননা এটা আল্লাহর নির্দেশ।

সংস্কারক বলতে আমরা বুঝি, মুসলিম উম্মতের ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিধ্বস্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জাতিসত্তার পুনর্নির্মাণকারীকে। আর সংগঠক বলতে বুঝি, যিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নমুনা মোতাবেক একটা রাষ্ট্র গঠনে ব্রতী হন—যদিও তার কোন নজির ইতিপূর্বে স্থাপিত হয়নি। আর পূর্ণাঙ্গ পরিচালক বলতে বুঝি, যিনি নিজেকে এমন একটি জাতি গঠনের কাজে নিয়োজিত করেন, যে জাতি বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে মর্যাদাসম্পন্ন আসন অলংকৃত করে। কিন্তু তার পূর্ণতা লাভের উচ্চাভিলাস তাকে আরো উচ্চ লক্ষ্যে উন্নীত করে। সত্য দ্বীনের এসব আহবায়কের জন্য সামষ্টিক রূহানিয়াত অর্জন করা অত্যাবশ্যক। তারা এর মধ্য দিয়ে সেই মহাসত্যকে অর্জন করেন যা কখনো আর হারাবার নয়। এই সামষ্টিক রূহানিয়াত ছাড়া ইসলামের আহবায়ক নিছক পার্থিব গৌরবের পূজারী ও

www.pathagar.com

সাধকে পরিণত হয়। এ ধরনের সাধকেরা পাগলের মত যে কোন ভ্রান্তি ও বিপর্যয়ে পতিত হয়ে থাকে।

ঈমানদার মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। পৃথিবীকে অন্যায় ও অসত্য থেকে পবিত্র করার জন্য সে আল্লাহর মনোনীত সৈনিক। আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত এ দায়িত্ব পালন করতে তাকে অন্যায়ের মোকাবিলা করতে হবে, অন্যায় ও অসত্যের ঘাঁটিগুলোকে চিনতে হবে এবং তার সংঘটিত মর্মান্তিক ঘটনাগুলো অবহিত হতে হবে। মানুষ যতক্ষণ জাগ্রত হৃদয় এবং স্বচ্ছ অনুভূতি ও প্রজ্ঞার অধিকারী না হবে, ততক্ষণ সে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ তা উপলব্ধি করতে পারবে না। পারবে না দুর্বলতা কোথায় কোথায় আছে এবং তার চিকিৎসা ও প্রতিকারের উপায় কি, তা জানতে। সুতরাং আসল সমস্যা হলো অনুভূতি, চেতনা ও প্রজ্ঞার সমস্যা, সংবেদনশীল উপলব্ধি ও সচকিত আবেগের সমস্যা। সংগঠিত বিবেক যখন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা তৈরীর সমস্যার সম্মুখীন হবে, তার আগেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এই অনুভূতি ও আবেগের সমস্যা। আর যখনই অনুভূতি স্বাভাবিক স্বচ্ছতা লাভ করে, তখন আল্লাহর সাথে তার সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধারিত। শুধু অবধারিতই নয়, এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্যও বটে। নচেৎ সেখানে মাথা তুলবে মূর্খতা, নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তি।

সত্যের এ সৈনিকের অবশ্য কর্তব্য তার সর্বোচ্চ পরিচালক আল্লাহ তায়ালার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক ও সংযোগ অব্যাহত রাখা। বস্তুত আল্লাহর আদর্শই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। তাই নিজের মনকে সর্বদা আল্লাহর জন্য উন্মুখ ও উন্মুক্ত রাখাই তার কর্তব্য। আর মহাবিশ্বে আল্লাহর তরফ থেকে আগত যেসব ইংগীত ও হুঁশিয়ারী ভেসে বেড়ায়, তা মনের কান দিয়ে শুনবার জন্য তাকে দীর্ঘক্ষণ কান পেতে থাকতে হবে। তার মনে রাখা উচিত যে, তার মন শুধু যে কোমল তাই নয়, বরং তা আলোক বিকীরণকারীও। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দিকনির্দেশ ক্রমে তা সর্বদাই চঞ্চল ও কম্পমান। "তীব্র অনুভূতি"র হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে সে এই পরিবেশেই চলাফেরা করে। যখনই কোন বিশৃংখলা ও অকল্যাণের লক্ষণ দেখতে পায়, অমনি তার অনুভূতির হাতিয়ার সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সেই বিশৃংখলার সম্ভাবনাকে ঝেটিয়ে দূর করে। আর যখনই দেখতে পায় শৃংখলা ও কল্যাণের লক্ষণ, তখন সে হাতিয়ার হয় শান্ত ও নিস্তব্ধ। এসব লক্ষণ দেখে আপনার মনের একমাত্র প্রতিক্রিয়া এই হবে যে, বিশৃংখলা দূর করার চেষ্টা করতে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হবে এবং সমাজকে ন্যায় ও কল্যাণের ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণের সংকল্প জন্মাবে। প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই আপনার মনে হতে থাকবে যেন, আপনার মনের গভীরে কোন অদৃশ্য বক্তা আপনাকে ডেকে কিছু

www.pathagar.com

বলছে এবং সকল কাজকর্মের মধ্য থেকেও তার দিকে মনোযোগ না দিয়ে আপনার উপায় থাকছে না।

একটা কথা আমরা ভূমিকাতেই বলে দিয়েছি। ইসলামের দাওয়াতদাতা তার নিজস্ব পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে কখনো রাজনীতিক, কখনো জননেতা, আবার কখনো আপন অনুসারীদের জন্য চিন্তানায়ক। অর্থাৎ দাওয়াতদাতার কর্মক্ষেত্রের পরিধি কখনো এত প্রশস্ত হয় যে, সে সমগ্র জাতির নেতা ও আদর্শিক মুরব্বীতে পরিণত হয়। আবার কখনো তা এত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হয় যে, সে আঞ্চলিক বা গ্রাম্য নেতায় পরিণত হয়। সে ক্ষেত্রে সে তার ক্ষুদ্রতর পরিমণ্ডলে নিজ চিন্তাধারা অনুসারে এবং আল্লাহর সাথে তার সংযোগ ও সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত দিকনির্দেশনার আলোকে কাজ করে। একথা এ জন্য বলছি, যাতে কেউ ধারণা করতে না পারে যে, সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রশস্ততার পরিসরে কর্মরত বড় বড় নেতারাই পেয়ে থাকেন।

সারকথা এই যে, কর্মচঞ্চল এই বাস্তব ক্ষেত্রটির গুরুত্ব ইসলামের আহবায়ককে একথা খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেয় যে, আল্লাহর প্রতি তার মনের তীব্র আকর্ষণ থাকা অপরিহার্য এবং তার আধ্যাত্মিক জীবনকে যথাসাধ্য পরিপাটি করে সংগঠিত করতে হবে।

সপ্তমত ঃ এই রূহানিয়াত তার সর্বোত্তম মানসিক গুণাবলী ও ভাবাবেগগত শক্তির জোরে তাকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করায়। একটি উচ্চ পর্বত শৃঙ্গ থেকে নজর দেয়ার মতই সে তখন সাধারণ মানুষের প্রতি নজর দেয়। সে দেখতে পায় যে, তাদের দেহ যেন ক্ষুদ্র হতে হতে পিগমীর আকার ধারণ করেছে। তাদের সকলের আঙ্গিক লাবণ্য ও ঔজ্জ্বল্য যেন লোপ পেয়েছে। সে একই রকমের নগণ্য দৃশ্যে সবাইকে দেখতে পায় এবং সবাইকে একই স্তরের বলে মূল্যায়ন করে। তাদের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট তার সামনে মুখ্য হয়ে ধরা পড়ে ঃ

এক—তার সামনে তারা সবাই দুর্বল। কেউ কারো ক্ষতি বা উপকার করতে সক্ষম নয়। তাদের কারো হাতেই কোন ক্ষমতা নেই। তাই সে কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না, কাউকেই সে ভয় পায় না—চাই তাদের ভেতরের ক্ষমতাশালীরা যতই ক্ষমতা ও পদমর্যাদার প্রভাব প্রয়োগ করুক না কেন। সে তাদের থেকে এত ঊর্ধে প্রতিষ্ঠিত যে, তাদের ক্ষুদ্র ও দুর্বল ধ্যান-ধারণা দ্বারা তার কিছুমাত্র প্রতারিত হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই সে হয়ে ওঠে এক অসম সাহসী নির্ভিক বীর। আল্লাহর শক্তিতে সে হয় সর্বাধিক শক্তিমান তার দিলে আল্লাহর তরফ থেকে যে রূহানী খাদ্য সরবরাহ হয়, তার বলে সে হয়

www.pathagar.com

বিত্তশালী। তার নিজের ওপর ও আপন মনিবের ওপর তার থাকে পূর্ণ নির্ভরতা। এসবই হলো একজন প্রকৃত দাওয়াতকারীর সবচেয়ে জরুরী গুণাবলী।

দুই—নিজের সর্বোচ্চ অবস্থান ও সুপরিসর প্রীতিময় পরিমণ্ডল থেকে সে মানুষের প্রতি যথাযথভাবে মনোযোগী হয়। একজন মহানুভব ব্যক্তি যেমন শিশুদের দোষত্রুটির ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হয়, তেমনি সেও মানুষের দোষত্রুটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। নম্রতা ও উদারতার মনোভাব নিয়ে, বিচক্ষণতা ও মধুর উপদেশ দ্বারা তাদের চিকিৎসায় ব্রতী হয়। তাদের অজ্ঞতার জন্য তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না বা অসহিষ্ণুতা দেখায় না। তাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, সর্বোচ্চ উদারতা ও নম্রতা প্রদর্শন করে এবং তাদের ওজর আপত্তি ও আশা আকাংখার সাথে তালমিলিয়ে চলে। কারো মধ্যে কোন দোষত্রুটি সংশোধনের অতীত হলে তার প্রতি এমন সদয় ও ব্যথিত হয় এবং এত মর্মাহত ও চিন্তাযুক্ত হয়—যেমন কোন সহানুভূতিশীল চিকিৎসক তার রোগীর রোগ নিরাময় না হলে তার ওপর ব্যথিত ও চিন্তাযুক্ত হয়। বস্তুত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জাতির ওপর এভাবেই ব্যথিত ও চিন্তাযুক্ত থাকতেন এবং তাদের হেদায়াতের জন্য এতই উদগ্রীব হতেন যে তাদের প্রতি আক্ষেপের দরুন তার প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হতো।

এই মহৎ গুণবৈশিষ্টই একজন দাওয়াতদাতাকে আল্লাহর দিকে আহবানের দুর্লভ সম্মানের যোগ্য করে তোলে। তার স্নেহপ্রীতি হয় বিশ্বজনীন এবং তার মন হয় সর্বতোভাবে আল্লাহমুখী। তার দৃষ্টি তার অনুসারী ও বিরোধী উভয়ের প্রতি উদার থাকে। তার প্রীতি ভালোবাসা থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। পার্থক্য শুধু এই যে, আপন অনুসারীদের প্রতি তার যে প্রীতি ও ভালোবাসা, তা এক ধরনের উৎফুল্লতা ও তৃপ্তিবোধ এবং একাত্মতা বোধে পরিপূর্ণ থাকে। আর বিরোধীদের প্রতি তার যে প্রীতি ও ভালোবাসা, তা থাকে দরদ, অনুকম্পা ও বেদনাবোধে সিক্ত। সে প্রীতি ও ভালোবাসায় সংমিশ্রণ ঘটে সর্ব পন্থায় তাদের রোগ নিরাময়ের বাসনার এবং তাদের পরকালীন সুখ-শান্তি লাভের আকাংখার। এমনকি তার এই দরদ ও অনুকম্পা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমিত থাকে না —বরং ইতর প্রাণীময় জড় পদার্থ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ইতর প্রাণীর প্রতি সে দয়ার্দ্র হয় এবং তার কল্যাণের জন্য সে সবাইকে তাগিদ দেয়। আর জড় পদার্থের প্রতিও সে নিজের কর্তব্য পালন করে এবং তার জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার জন্য সে সমব্যথী হয়—যেমন রসূল (সা)-এর জীবনীতে আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

প্রিয় ভাই! এই হলো সামষ্টিক আধ্যাত্মিকতা বা সামাজিক রূহানিয়াত। বৈরাগ্যবাদ ও লোকসংশ্রব বর্জন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজেকে এই

www.pathagar.com

রূহানিয়াতের সাঁচে গড়ে তুলুন এবং এর মানদণ্ডে নিজেকে ওজন করে নিজের অবস্থা জেনে নিন। তাহলে বুঝতে পারবেন, এ জিনিস থেকে আপনি কতদূর আছেন এবং এ জিনিস আপনার নাগাল থেকে কতদূর আছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি আমার ও আপনার যাবতীয় দুর্বলতা, দোষত্রুটি, অক্ষমতা ও অসম্পূর্ণতা দূর করুন এবং আমাদেরকে তার অনুগ্রহ ও বিচক্ষণতা দান করেন। সব ক্ষমতা ও তৌফিকের মালিক একমাত্র তিনিই। তিনিই শ্রেষ্ঠতম অনুগ্রহের উৎস।

---

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের সহজাত প্রেরণা

রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতা আল্লাহর সাথে মানুষের সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহর প্রেরিত বাণীর মর্ম, উদ্দেশ্য ও উদ্দীপক কি তা তাকে জানিয়ে দেয়। আর বাস্তবায়নের সহজাত প্রেরণা বা ঝোঁক তাকে তার বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত করে যাতে করে সে আল্লাহর ঐ বাণীর অন্তর্নিহিত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হিতকর কাজ সম্পাদন এবং সুষ্ঠু তামাদ্দুনিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

এ দু'টো জিনিস (রূহানিয়াত এবং তার বাস্তবায়নের সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রেরণা) হলো ঈমানের দু'টো উপাদান। মু'মিনের দিলে এ দু'টোরই সমাবেশ জরুরী। সে যদি রূহানিয়াতের দাবীদার হয় কিন্তু বাস্তব জীবনে তার কোন তৎপরতা নেই বা বাস্তবায়নের উদ্যোগ ও উদ্দীপনা নেই, তাহলে সেটা অসম্পূর্ণ ঈমান, বরং তা অচল ও অস্থিতিশীল ঈমান। আর যদি দেখা যায় যে, বাস্তব জীবনে তার তৎপরতা আছে, কিন্তু তার তেমন কোন নিখুঁত আধ্যাত্মিক জীবন নেই যা তাকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে, তাহলে এ ধরনের লোক যে তার জীবনের লক্ষ্যের ব্যাপারে উদভ্রান্ত এবং তার বিবেক যে হেদায়াতের আলোক থেকে বঞ্চিত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

রসূল (সা) এ বিষয়টাকে এই বলে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ "ঈমান শুধু আশা ও বাসনা পোষণ করার নাম নয়—বরং এটা হচ্ছে মনের অভ্যন্তরে বদ্ধমূল সেই বিশ্বাসের নাম, যাকে যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করে তার সত্যতার প্রমাণ দেয়া হয়।

ঈমানের কতিপয় বৈশিষ্ট

পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ ঈমান—যা মনে বদ্ধমূল হয়ে মু'মিনকে কাজে আত্মনিয়োগের উদ্দীপনা যোগায়, সে ঈমানের কয়েকটা বৈশিষ্ট রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়টি হলো ঃ

(১) আল্লাহর বাণী সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি,

(২) তার শিক্ষাকে ভালোবাসা এবং তার সৌন্দর্যের প্রতি মনের তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি,

(৩) তার সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সম্ভ্রমবোধ ও তীক্ষ্ণ সতর্কতাবোধ।

১–উপলব্ধি

আমরা এই উপলব্ধি দ্বারা একথা বুঝাচ্ছি না যে, আল্লাহ প্রেরিত আদর্শের সবকয়টি উপাদানকে বুদ্ধির আয়ত্বে আনতে হবে এবং তার নির্দেশ তথা

www.pathagar.com

আদেশ, নিষেধ, হালাল ও হারাম বুঝতে হবে। এগুলো তো সাধারণ বোধশক্তি এবং শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া দ্বারাই আয়ত্বে আনা সম্ভব। ইয়াকীন বা প্রত্যয় এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত আমরা যে উপলব্ধিতে বুঝাচ্ছি তাহলো ভাবাবেগ-মূলক উপলব্ধি এবং হৃদয়গত প্রত্যয়। এ প্রত্যয় এমন এক অনুভূতি—যা মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তায় আবির্ভূত হয় এবং তার সমগ্র মন-মগজ ও বিবেককে দখল করে নেয়। এর ফলে সে ঐ অনুভূতির সাহায্যে আল্লাহর অর্পিত দায়িত্বের এমন সব নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, যা সাধারণ বিবেকের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি বা অনুভূতির সবচেয়ে স্পষ্ট আলামত এই যে, সে একমাত্র আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর নির্দেশকেই সত্য মনে করে আর সবকিছুকেই মনে করে মিথ্যা ও বাতিল। এর দ্বারাই সে হক ও বাতিলের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যেমন আমাদের যে কোন একজন স্বপ্নে দেখা কিম্ভুতকিমাকার দৃশ্য এবং জাগ্রত অবস্থায় চামড়ার চোখ দিয়ে দেখা দৃশ্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে সহজেই। এখন কেউ যদি হক ও বাতিলের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে হৃদয় দিয়েই সঠিক তত্ত্ব উপলব্ধি করেছে এবং তার দ্বারা উক্ত ভাবাবেগমূলক উপলব্ধি সম্পন্ন হয়েছে। এখন মু'মিনদের দলভুক্ত হতে তার আর কোনই অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি ঠিক এভাবে উপলব্ধি না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে এখনো পরিপক্কতা লাভ করেনি চাই তার বয়স ষাট কিংবা সত্তর বছরই হোক এবং যত উচ্চ ডিগ্রীই সে লাভ করুক না কেন। এই উপলব্ধি অর্জিত হবার সুস্পষ্ট আলামত হলো এই যে, তাকে এই চোখ ধাঁধাঁনো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, নিরাসক্ত ও তা থেকে দূরে থাকতে দেখা যাবে আর আসক্ত দেখা যাবে চিরস্থায়ী আখেরাতের প্রতি। কেননা দুনিয়া বাতিল আর আখেরাত হক। সে মৃত্যুকে আলীঙ্গন করার আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবে। আর উপলব্ধি না হবার লক্ষণ এই যে, সে আখেরাতকে এড়িয়ে চলবে, দুনিয়াবী কুসংস্কারের প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হবে। কেননা দুনিয়াকে সে একটা বিরাট কিছু মনে করে। তার অবস্থা সেই উদভ্রান্ত বেকুফের মত যে, স্বপ্নে এক ব্যক্তির সাথে এক পাউণ্ড খুচরা করেছিল। লোকটি তাকে বললো : আমি তোমাকে ৯৯ পয়সা দিচ্ছি, পাউণ্ডটা আমাকে দাও। সে জবাব দিল : না, আমি ১০০ পয়সা না হলে দিব না। উভয়ে জিদ ধরেছে। এমতাবস্থায় এই বেকুফের ঘুম ভাঙলো। দেখলো, তার হাতে কিছুই নেই। সে অনন্যোপায় হয়ে আবার চোখ বুজলো এবং স্বপ্নের জগতের দিকে হাত বাড়িয়ে তার কল্পিত লোকটিকে বলতে লাগলো : ঠিক আছে, আমি রাজী। ৯৯ পয়সাই দাও। আমাদের চোখের পর্দা যদি সরানো হয় এবং আমরা যদি ঈমানদার ও সমঝদার হই, তাহলে দেখবো, দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যের প্রতি ঐ বেকুফের মতই লালায়িত।

www.pathagar.com

সুতরাং হে আল্লাহ ! সত্যকে আমাদের চোখে সত্য করে দেখাও এবং তা অনুসরণের ক্ষমতা দাও। আর বাতিলকে বাতিল করে দেখাও এবং তা এড়িয়ে চলার তওফিক দাও।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ○

"হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে একবার যখন হেদায়াত করেছ, তখন এরপর আর আমাদেরকে গোমরাহ করো না। তোমার সান্নিধ্য থেকে রহমত দাও আমাদেরকে। নিশ্চয়ই তুমিই শ্রেষ্ঠ দাতা।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮)

২–আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষাকে ভালোবাসা বা আল্লাহর আদর্শ প্রীতি

যে উপলব্ধির কথা আমরা এতক্ষণ বললাম, তা আমাদেরকে সত্যের যথার্থ মূল্যমান হৃদয়ঙ্গম করার ও তার উপযুক্ত কদর করার যোগ্য বানায়। কিন্তু যে ইতিবাচক শক্তি মানুষের মধ্যে তার আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শ ও তার অর্পিত দায়িত্বের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও আসক্তি জন্মায়, সে শক্তিটা ঐ উপলব্ধির মধ্যে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। তাই আল্লাহ মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে তার নাযিল করা আদর্শের প্রতি ভালোবাসার নিগূঢ় রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন। আর এই ভালোবাসাকে ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট হিসেবে গণ্য করেছেন। মু'মিনের জীবনের জন্য আল্লাহ যে লক্ষ্য ও ব্রত নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যে বাণী ও বার্তা তার কাছে পাঠিয়েছেন, (অন্য কথায় আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা যা রসূলের মাধ্যমে এসেছে) তার মধ্যে এমন এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য আছে, যা একমাত্র ভালোবাসার আবেগ দ্বারাই অনুভূত করা যায়। অনুরূপভাবে তাতে এমন এক দুর্লভ চমৎকারিত্ব আছে, যা কেবল উপলব্ধি দ্বারাই আয়ত্ব করা যায় এবং বুঝা যায়।

এই ভালোবাসার দাবী এই যে, মানুষ আল্লাহর অবাধ্য যে কোন শক্তি তথা তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং বাতিলকে ঘৃণা করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই ভালোবাসার গুরুত্ব ও বিশেষত্ব সম্পর্কে বলেন ঃ

"তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি যে বিধান এনেছি তার সমগ্র আদত অভ্যাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি, রুচি ও প্রবৃত্তি সবকিছু সেই বিধানের অধীন ও অনুগত হবে। আর তাগুতকে ঘৃণা করা সম্পর্কে বলেন ঃ তিনটে জিনিস যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের

www.pathagar.com

যথার্থ স্বাদ পাবে ঃ ....তার একটি হলো, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যতটা অপসন্দ করে, কুফরির দিকে ফিরে যাওয়াকে ততটা অপছন্দ করবে।" এই উভয় জিনিস—ঈমানের তথা আল্লাহর বিধানের প্রতি ভালোবাসা এবং তাগুত ও বাতিলকে অপসন্দ ও ঘৃণা—আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতে বর্ণনা করে নিজের বান্দাদের প্রতি তার অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছেন ঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ط

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা এবং কুফরি, নাফরমানী ও পাপাচারের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত (যাদের মধ্যে এটা জন্মিয়েছেন) তারাই প্রকৃত সদাচারী ও সুপথপ্রাপ্ত। এটা শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত হিসেবেই জন্মে থাকে।"–(সূরা আল হুজুরাত ঃ ৭-৮)

এই ভালোবাসার একটি প্রকাশ্য আলামত হলো এই যে, যে ব্যক্তির মনে তা জন্মেছে, সে স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষকে নিজের অনুসৃত আদর্শের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল ও গভীর আন্তরিকতা নিয়ে এবং নিজ সত্তার ওপর ও আপন পরিবার ও পরিজনের ওপর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে সে আদর্শ বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে এই দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যায়। নচেৎ যে ব্যক্তি সেই আদর্শ বাস্তবায়নে অলসতা দেখায় এবং এর জন্য যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয় তাকে পসন্দ করে না, সে ব্যক্তি ঐ আদর্শকে ভালোবাসে, একথা কেমন করে বলা বা বিশ্বাস করা যায়?

৩–আল্লাহর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও সম্ভ্রমবোধ

আল্লাহর নাযিল করা আদর্শ ও তার শিক্ষার প্রতি গভীর নিষ্ঠা সম্ভ্রমবোধ ও মমত্ববোধ তার প্রতি তার আন্তরিক ভালোবাসারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। কোন জিনিস যখনই মানুষের নিকট প্রিয় হবে, যখনই তা হবে তার অন্তরের পরম কাম্য বস্তু, তখন তার কাছে তার মর্যাদা ও নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দেখা দেবে এবং তার সম্ভ্রমবোধই তার চতুর্সীমায় পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, যাতে কেউ তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে ও তার সীমানা মাড়াতে না পারে।

সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে সম্ভ্রমবোধ আল্লাহর একটা গুণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কখনো কখনো আল্লাহ তা'য়ালার অভিমান ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়। তিনি যা হারাম করেছেন, মু'মিন যখন সেই হারামে লিপ্ত হয় তখন তিনি অভিমানী ও ক্ষুব্ধ হন।"

www.pathagar.com

মু'মিনের সম্ভ্রমবোধের আলামত এই যে, যখন আল্লাহর নিষেধ লংঘন করা হয় তখন সে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়। যখন সে কোন অন্যায় দেখতে পায় তখন তা উৎখাত করার জন্য সে মরিয়া হয়ে ওঠে। আয়েশা (রা) বলেন ঃ একবার রসূল (সা) এক সফর থেকে বাড়ী ফিরলেন। আমি একটি পর্দা দিয়ে জানালা বন্ধ করে রেখেছিলাম। সেই পর্দায় কিছু ছবি ছিল। রসূল (সা) তা দেখা মাত্রই ছিড়ে ফেললেন। তাঁর চেহারা ক্রোধে বিবর্ণ ছিল। তিনি বললেন ঃ "হে আয়েশা ! যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে নকল করার চেষ্টা করে তারাই কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাবে ভুগবে।" মু'মিনের সম্ভ্রমবোধ ও আদর্শ নিষ্ঠার আর একটা আলামত এই যে, তার আদর্শ ও মিশন স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় থাকবে কিংবা অন্য কোন আদর্শের কর্তৃত্বের অধীন হয়ে থাকবে, তা সে বরদাশত করতে পারে না। এ জন্যই আমরা একজন সত্যিকার মু'মিনকে এবং নিষ্ঠাবান দাওয়াতকারীকে দেখতে পাই যে, সে তার আদর্শ ও মিশনের জন্য সব রকমের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত শক্তি সঞ্চয় করে—যা তাকে অন্য সকল আদর্শের ওপর বিজয়ী ও আধিপত্যশীল করার নিশ্চয়তা দেয়।

বাস্তবায়নের সহজাত প্রেরণার তাৎপর্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই যে, ঈমান শুধুমাত্র একটা নেতিবাচক রূহানী ধারণা নয়—যা শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়। বরং তা এমন একটা ইতিবাচক শক্তিও যা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করে, কাজের উদ্দীপনা ও প্রেরণা যোগায়। অথবা বলা যায় যে, তা এমন একটা নিগূঢ় আল্লাহ প্রদত্ত রহস্য, যা দাওয়াতকারীর মনে ও সমগ্র স্নায়ুতে একটা জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত উপাদান হয়ে অবস্থান করে এবং তার আদর্শকে বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে জীবনের প্রতিটা জিনিস দাওয়াত ও তার শিক্ষার পথে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত তার মন ও স্নায়ু শান্ত হয় না। এই পরিচালনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াই হলো যথার্থ নিষ্ঠাপূর্ণ আমল—এটাই সেই অমিততেজা জিহাদ, যা মু'মিনকে তার মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছিয়ে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করা অথবা এই পথে তাকে নিঃশেষ করে দেয়ার আগে থামে না।

এই সুপ্ত জ্বালাময়ী আল্লাহ প্রদত্ত উপাদানটিতে আপনি তিনটে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট দেখতে পাবেন ঃ

প্রথমত, তা একটি জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত—যা থেকে দাওয়াতকারী কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা আহরণ করে থাকে এবং দাওয়াতের প্রতি চরম ও পরম নিষ্ঠা ও সম্ভ্রবোধ অর্জন করে থাকে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, তা একটি উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক শক্তি। দাওয়াতকারী এর সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারে যে, একটা অপরিহার্য জিনিসের বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া তার জন্য অনিবার্য ও অবধারিত হয়ে উঠেছে। অথবা সে এরূপ উপলব্ধি করে যে, একটা মানসিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কাজের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে সে একটা বিরাট রকমের প্রশান্তি ও গভীর স্বাদ অনুভব করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাতে সাড়া দেয় ও কাজে নিয়োজিত হয়। আর যদি সে তাতে সাড়া না দেয়, কাজে ব্রতী না হয় এবং বাস্তবায়নে তৎপর না হয় তাহলে প্রশান্তির পরিবর্তে এক কঠিন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সম্মুখীন হয়। বস্তুত একেই আমরা সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতা বা প্রেরণা নামে অভিহিত করে থাকি।

এই সুপ্ত উপাদানটা না থাকলে দাওয়াতকারী অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই একজন মানুষে পরিণত হয়—যাদের মাথায় সমাজ সংস্কারের রকমারি উদ্ভট চিন্তা কিলকিল করে। তারা জাতির উপকার ও সেবার ব্যাপারে বড়জোর এতটুকু করতে পারে যে, একটা নিবন্ধ লেখে অথবা একটা বক্তৃতা দেয়। আর এটুকু করেই এ ধরনের লোকেরা ভাবে, পাঠক বা শ্রোতারা তাকে 'অভিনন্দন' জানাতে ছুটে আসবে। এতেই তারা প্রচুর আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং ভেতরে গর্ব নিয়েও এক ধরনের বিনয়ের ভড়ং দেখায়। আমি কিন্তু এই 'অভিনন্দন'কে আনন্দ বা তৃপ্তির উপকরণ মনে করি না বরং ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক জিনিস মনে করি। একজন নিবেদিত প্রাণ দাওয়াতদাতা যদি শোনে যে, তার দাওয়াতী কাজের প্রতিদান হিসেবে জনগণের প্রশংসাই শুধু তার প্রাপ্য, তাহলে দুঃখে ও ক্ষোভে তার কলিজা ফেটে যাবে। কেননা সে এসবের কিছুই চায় না। নিজের প্রশংসা তার কখনো কাম্য নয়। এই চাটুকার বেকুফেরা তার লেখা পড়ে বা বক্তৃতা শুনে নির্বিকারভাবে আপন আপন নিষ্ক্রিয় জীবনে ফিরে যাবে—এই দৃশ্য দেখাও তার পক্ষে অসহ্য হয়ে থাকে।

উক্ত সুপ্ত উপাদানটা অনুপস্থিত থাকলে দাওয়াতদাতা স্রেফ একজন লোক দেখানো অসার ভাড়াটে সেবকে পরিণত হয়। বিনিময়ে খাদ্য লাভের আশা করা যেমন ভাড়াটেপনা, তেমনি প্রশংসার আশায় থাকাও ভাড়াটে স্বভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত এই উপাদানটার অধিকারী হওয়া একজন যথার্থ দাওয়াতদাতার সহজাত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট। আমরা তাই বলে একথা বলতে চাই না যে, দাওয়াতদাতা এ বৈশিষ্টের অধিকারী না হলে তার অতপর বিশ্রাম নেয়া উচিত এবং স্বভাব বিরুদ্ধ কাজে জড়িত না থাকা উচিত। আসলে আমাদের কর্তব্য এই যে, আমরা যেন সেই সব বড় বড় দাওয়াতদাতার দিকে নজর দেই এবং তাদের গুণ ও বৈশিষ্টকে যতটা পারি আয়ত্ব করি—যাদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে

www.pathagar.com

সমাজ গঠন ও নির্মাণের কাজের জন্য পাঠিয়েছেন। তাদেরকেই এ কাজের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও নমুনারূপে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। যেসব দাওয়াতদাতা দুনিয়াতে সমাজ সংস্কারের কাজ করতে আগ্রহী তারা তাদেরই অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকেন। আর সেই সমাজ নির্মাতাদের কথা বলতে আমি আল্লাহর নবী ও রসূলদেরকেই বুঝিয়েছি। বরং প্রকৃতপক্ষে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই বুঝিয়েছি। কেননা প্রচারক ও সংস্কারকদের সকল দুর্লভ ও উঁচুমানের গুণাবলীর সমাবেশ একমাত্র তাঁর মধ্যেই ঘটেছিল। তিনিই লাভ করেছিলেন সকল দাওয়াতদাতার মানসিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। তাঁকে যদি দাওয়াতী কাজের নমুনা ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে যেসব স্বাভাবিক গুণবৈশিষ্ট্য থেকে আমরা এখনো বঞ্চিত আছি, তার বহুলাংশ ক্রমাগত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ এবং বাস্তব অনুশীলন দ্বারা অর্জন করতে পারবো।

কিভাবে স্বাভাবিক বাস্তবায়ন প্রেরণা অর্জন করতে পারি ?

যিনি মানুষের কল্যাণ সাধন ও কল্যাণের দিকে দাওয়াত দিতে আগ্রহী, তার একমাত্র করণীয় হলো রসূলুল্লাহ (সা)-এর দাওয়াতী জীবন চরিত সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করা এবং কুরআন থেকে তাঁর আনীত আদর্শের মৌল ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করা, সৌভাগ্যের কথা যে, আল্লাহ তাঁয়ালা কতিপয় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন মূলনীতির মধ্য দিয়ে এই আদর্শকে একত্রিত করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঐসব মূলনীতিকে আদেশ ও নিষেধের আকারে জারী করে পাঠককে বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে দিয়েছেন। এরপর তার কাজ শুধু এতটুকু বাকী থাকে যে, সে বাস্তবায়নের কাজ সামনে এগিয়ে নেবে এবং শুধুমাত্র অন্ধ অনুসারী হিসেবে নয় বরং দাওয়াতদাতা হিসেবে আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলোকে কার্যকরী করবে। এতে করে সে অচিরেই অনুভব করবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে তার অন্তরের অন্তস্থলে স্বাভাবিক বাস্তবায়ন প্রবণতার এক পবিত্র অগ্নিশীখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে।

আল্লাহ থেকে দূরত্ব পরিত্যাজ্য

এখানে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই যে, বাস্তবায়নের এই সুপ্ত জ্বলন্ত প্রেরণাকে অবশ্যই সার্বক্ষণিকভাবে দাওয়াতদাতার রূহানিয়াতের সাথে পূর্ণ সংযোগ বজায় রেখে চলতে হবে। সেই রূহানিয়াতের উৎস থেকে সর্বদা প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ গ্রহণ করতে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে এমন যে কোন লোকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে যে অত্যন্ত রগচটা স্বভাবের, যে আল্লাহর নির্দেশের পরোয়া এবং অনুসরণ না করেই সামাজিক ব্যবস্থা ও কার্যকর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে মানুষের বিকৃত স্বভাবকে মনোরম

www.pathagar.com

সাজে সজ্জিতকারী মতাদর্শের দিকে আহবান জানায়। আদর্শবাদী উদারচেতা বিশ্বমানবতাকে আমরা এ ধরনের মানুষের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি দিতে চাই। অবশ্য যারা নিজ নিজ সংকীর্ণ জাতীয়তা ও ভৌগলিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, সেই জড়বাদী মানবতাকে নয়।

সামষ্টিক রুহানিয়াতের আলোচনায় আমরা বলেছি যে, আল্লাহর পথে দাওয়াতকারীদের যে মহান গোষ্ঠীটি জাতি গড়া ও সমাজ সংস্কারের ব্রত অবলম্বন করেছেন, তারা এই রুহানিয়াতকে অবলম্বন না করে কিছুতেই পারবেন না। এই রুহানিয়াত থেকেই তারা সেই মহাসত্যের সন্ধান পাবেন, যা হস্তগত হবার পর আর কখনো হাতছাড়া হয় না। এ রুহানিয়াত ছাড়া দাওয়াতদাতা নিছক কাল্পনিক গৌরব ও মর্যাদার প্রতিই আকৃষ্ট থাকতে পারবেন এবং উদভ্রান্ত লোকেরা যেসব ভ্রান্তি ও বিপর্যয়ে পতিত হয়, তারা তাতেই পতিত হবেন।

এই বিকৃত ও প্রগলভ গোষ্ঠীর সংস্রব থেকে আমরা মুক্ত থাকবো এবং তরুণ প্রৌঢ় সকলকেই তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলবো, যেন তারা তাদের দ্বারা প্রতারিত না হন। কেননা এ গোষ্ঠী আল্লাহ থেকে দূরে এবং সত্য থেকে বিচ্যুত। এ গোষ্ঠী নিজের এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য আপদ স্বরূপ। তরুণ সমাজকে এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতকারীদেরকে সতর্ক করে আমরা বলতে চাই যে, তারা যেন সবার আগে আল্লাহর সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করেন। তারা যেন একথা মনে না করেন যে, যৌবনের অদম্য শক্তি তাদের মধ্যে রয়েছে এবং গৌরব ও মর্যাদার জ্বলন্ত আকাংখ্যাই তাদেরকে তাদের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। না, তা নয়। প্রিয় তরুণ ও দাওয়াতদাতাগণ ! আপনাদের পথ চলার জন্য সেই নূর অপরিহার্য—যা আপনাদের পথকে আলোকিত করবে। সেই আল্লাহ প্রদত্ত জ্যোতি থেকেই প্রতি মুহূর্তে পথনির্দেশ লাভ করে আপনারা কাজ করতে পারবেন। নচেৎ আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত কত লোক যে দিশেহারাভাবে পথ চলতে গিয়ে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

দাওয়াতদাতাকে আগে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে

এবার আমাদের এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে যে, দাওয়াতদাতা বলতে আমরা কাকে বুঝবো এবং তার অবশ্য করণীয় কি ?

বস্তুত দাওয়াতদাতা আমরা তাকেই বলবো যে, আপন আদর্শের মূলনীতি ও শিক্ষাকে নিজের বুকের মধ্যে ও চিন্তাধারার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে সামাজিক তামাদ্দুনিক ও বাস্তব প্রাণচঞ্চল ব্যবস্থার আকারে সংঘটিত

www.pathagar.com

করে—যাতে করে তা দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক ও পারলৌকিক জীবন নিখুঁত ও নিষ্কলুষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের এ বক্তব্যটা অবশ্য অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এ দ্বারা মনের কোন ব্যাধি নিরাময় হবে না এবং কোন মলীনতাও সাফ হবে না। প্রশ্ন এই যে, আপন আদর্শকে কিভাবে এবং কিসের ভিত্তিতে সে এরূপ সংগঠিত করবে? যিনি সহজাত দাওয়াতী প্রতিভার অধিকারী, তাঁর এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় না। নিজের বুঝ এবং আল্লাহপ্রদত্ত প্রজ্ঞার আলোকে তার পথ আলোকিত। কিন্তু যে দাওয়াতদাতা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি, তাকে অবশ্যই আমাদের সাথে সত্যের আলোর সন্ধানে ব্যাপৃত হতেই হবে। সেই আলোর সন্ধান পেলেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ

বাস্তবায়ন ও কর্মতৎপরতার ময়দানে দাওয়াতদাতাকে নিজের লক্ষ্য জানতে ও তা যথাযথভাবে বুঝতে হবে। এটা যখন সে জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবে তখন সে নিজের সহজাত বুদ্ধিমত্তা দ্বারাই আপন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় ও উপকরণ উদ্ভাবন করতে পারবে।

ইহলৌকিক জীবনে মুসলিম অমুসলিম এবং প্রাচ্যবাসী ও পাশ্চাত্যবাসী নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনের লক্ষ্য যা, দাওয়াতকারীর জীবনের লক্ষ্যও তাই। সে লক্ষ্য হলো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তাই প্রত্যেক দাওয়াতকারী এবং প্রত্যেক মানুষের সর্বপ্রথম যে কথাটা জানা দরকার তা হচ্ছে এই যে, সে আল্লাহর সৃষ্টি এটাই প্রথম কথা এবং এটাই শেষ কথা। কোন হিসেবেই সে আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে সৃজিত হয়নি। আমি বুঝি যে, একথাটা তেমন কোন চিত্তাকর্ষক মায়াবী কথা নয়। বস্তুবাদী সভ্যতার চকচকে, চোখ ধাঁধাঁনো রূপ জৌলুসে যারা মোহিত, চলতি দুনিয়ার জীবনধারাও ঘটনাপ্রবাহ যাদের বিবেকবুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেই চটপটে তরুণ ও ভাবালু প্রৌঢ় সমাজকে একথা আকৃষ্ট করে না। তাদেরকে মোহান্ধ করে শুধু অর্থবিত্ত, শিল্প, যুদ্ধ ও রাজনীতির জগতে ব্যক্তিসত্তার গৌরবময় ভাবমূর্তি অর্জনের দুর্দম বাসনা। তাদেরকে আকৃষ্ট করে ক্ষমতার শীর্ষে ওঠা ও সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার দ্বারা রাষ্ট্রীয় খ্যাতি ও সুনাম প্রতিষ্ঠা। এক কথায় বলা যায়, ব্যক্তি সত্তার সুনাম ও জাতির সুখ্যাতি—এই দু'টো জিনিসই তাদের দৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। আর যে কথা তাদেরকে এই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে হাতছানি দেয়, এর দিকে আগুয়ান হওয়ার উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগায়। সে কথাই যথার্থ আকর্ষণীয়, মোহনীয় ও মায়াবী কথা। তাদের প্রবঞ্চিত মনের কাছে সেই বচনই একমাত্র মিষ্টি মধুর বচন।

www.pathagar.com

কিন্তু আসলে তা নয়। মানবজাতিকে আল্লাহ এসব ভাবালু কল্পনাবিলাসে মত্ত থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। তার প্রকৃত গৌরব এবং পরিপূর্ণ গৌরব একমাত্র তার জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সাফল্যেই নিহিত। কাজেই এই সর্বোচ্চ লক্ষ্যের সন্ধান দেয়া কথায় যদি মোহনীয়তা না থাকে, সে কথায় যদি আলোর ঝলকানী চোখে না পড়ে, তবে তাতে কিছুই এসে যায় না। কেননা এ কথায় আর কিছু না থাক মানুষের স্বভাবগত বিবেকবুদ্ধির উপযুক্ত যুক্তির খোরাক আছে। সে যুক্তির অকাট্যতা মানব মনকে বিনয়াবনত ও তার তীব্র কষাঘাত মানব মনকে বশীভূত করে দিতে সক্ষম। বস্তুত এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমরা আল্লাহরই সৃষ্টি—চাই তা আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। আবার আল্লাহর কাছে আমাদের ফিরে যেতেই হবে—চাই স্বেচ্ছায় যাই বা অনিচ্ছায় যাই। তবে যেখানে না যেয়ে উপায় নেই সেখানে সম্মানের সাথে যাওয়াই ভাল বাধ্য হয়ে ও অবমাননাকরভাবে যাওয়ার চাইতে। ইতিপূর্বে আসমান ও জমীন আল্লাহর অজেয় শক্তি ও কর্তৃত্বের সামনে মাথা নুইয়েছে। আসমান ও জমীন যখন ধুঁয়ার কুণ্ডলীর আকারে ছিল, তখন আল্লাহ সেদিকে মনোনিবেশ করলেন এবং উভয়কে বললেন ঃ

ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ০ (حم السجدة : ١١)

"ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তোমরা আমার কাছে এসো। তারা বললো ঃ এই নিন, আমরা স্বেচ্ছায়ই এলাম।"

যার ওপর অহংকারী শয়তান চড়াও হয়েছে, তার মনে রাখা উচিত যে, তাকে অচিরেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতেই হবে। তখনই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, যে সত্যকে সে এতদিন অগ্রাহ্য করে এসেছে তা কত অকাট্য ও ধ্রুব। তখন সে গভীর অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু তখন আর অনুশোচনার কোন অবকাশ থাকবে না। নিজের ওপর তার আরো বেশী ধিক্কার আসবে এ জন্য যে, বিবেক-বুদ্ধিহীন জড়পদার্থ যা দেখতে পেয়েছে ও বুঝতে পেরেছে, সে বিবেকবান ও বুদ্ধিমান হয়েও তা দেখলো না ও বুঝলো না। আসমান ও জমীন তো জড়পদার্থই। তারাই বলেছিল ঃ "আমরা স্বেচ্ছায় এলাম।" সেই অনুশোচনার দিন আল্লাহর নির্ধারিত বক্তা তাকে তিরস্কার করে বলবে ঃ

"لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ"

"তুমি তো আজকের এই বদলা সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। আজ তোমার চোখ থেকে পর্দা উঠিয়ে দিলাম। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি তিক্ষ্ণ ও ধারালো হয়ে উঠেছে।"–(সূরা আল ক্বাফ ঃ ২২)

www.pathagar.com

সূরা আল আনআমে আল্লাহ বলেন :

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ ط حَتّٰى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا لا وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ط اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ ○

"যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেছে, তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একদিন যখন আকস্মিকভাবে তাদের বদলা পাওয়ার মুহূর্তটা এসে পড়বে, তখন তারা বলবে : হায় আফসোস ! এই মুহূর্তটা সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম। সে সময়ে তারা নিজেদের পিঠের ওপর তাদের পাপের বোঝা বহন করতে থাকবে। কী জঘন্য তাদের বহন করা সে পাপের বোঝা।"-(সূরা আল আনআম : ৩১)

এভাবে যখন দাওয়াতদাতা তার লক্ষ্য ও মনজিলে মকসুদ কি, তা বুঝতে পারবে, তখন সে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য কি তাও জানতে পারবে। সে বুঝবে যে, তার সকল আকাংখা ও সংকল্পকে এবং তার সকল মানসিক, দৈহিক ও ভাবাবেগগত চেষ্টা সাধনাকে সেই লক্ষ্যে পৌছার কাজে নিয়োজিত করাই তার কর্তব্য। বস্তুত আল্লাহ তার নবী-রসূল ও ওলীদের প্রতি যে জীবন বিধান এবং যে ওহি ও জ্ঞান নাযিল করেছেন, সে সবের কেন্দ্রবিন্দু এটাই। এসব আল্লাহর বাণী, ওহি ও জ্ঞানকে যদি কেউ একটি মাত্র কথার মধ্যে সন্নিবেশিত দেখতে চায়, তবে তাকে এই নিগূঢ় সত্যের প্রতি নজর দিতে হবে। কেননা তাহলে সে দেখতে পাবে, ঐগুলোর (আল্লাহর বাণী, ওহি ও জ্ঞান) সবই এর মধ্যে কেন্দ্রীভূত এবং এর চারপাশে সমবেত।....একথা আমাদের মনগড়া নয় কিংবা আল্লাহর প্রেরিত বাণী নিয়ে আমরা নিছক ধৃষ্টতা দেখানোর জন্য একথা বলছি না। বরং এটা স্বয়ং আল্লাহরই নির্দেশ এবং স্বীয় রসূলকে (সা) তিনি নিজেই একথা বলেছেন :

قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا

"হে রসূল ! আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরকে শুধু একটা কথার উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা একা একা ও দু'জন দু'জন মিলে দাঁড়াও অতপর চিন্তা-ভাবনা কর।"-(সূরা সাবা : ৪৬)

এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, মু'মিনের মনজিলে মকসুদ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা কথা ও কাজের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আমাদের চিন্তা ও কাজ একমাত্র আল্লাহর

www.pathagar.com

সন্তুষ্টিলাভের লক্ষ্যেই পরিচালিত হওয়া উচিত। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ হতে হবে সুগম নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। দ্বীনের দাওয়াতদাতার জন্য তার নিজের ও সাধারণ মানুষের প্রতি এটাই কর্তব্য। (অর্থাৎ এই পথকে সুগম বানানো) আর এ কর্তব্যটাই পালন করার দায়িত্ব আমরা দিয়ে থাকি বাস্তবায়নের সহজাত বা স্বভাবগত প্রবণতাকে।

হৃদয়ের পুনরুজ্জীবন

এক্ষণে প্রশ্ন হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ সুগম, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ করার অর্থ কি? আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছার জন্য সফর শুরু করেছি। এ সফরের স্তরগুলো অতিক্রম করে যখন আমরা তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পৌছবো, তখন পরবর্তী প্রভাতেই আমরা অগ্রবর্তী দল হিসেবে আল্লাহর প্রশংসা করে তার অনুগ্রহধন্য গন্তব্যস্থলে সফরের সমাপ্তি ঘটাবো। আর সে গন্তব্যস্থল হলো আখেরাত।

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

"বস্তুত আখেরাত হলো মৃত্যুহীন জগত। যদি তারা জানতো।"

–(সূরা আনকাবুত ঃ ৬৪)

কিন্তু এই গন্তব্যস্থলে পৌছার সফর গাড়ীতে বা ট্রেনে সম্পন্ন করা যায় না। এ সফর সম্পন্ন করতে হয় মন দ্বারা। মনই এ ক্ষেত্রে সবকিছু। এই মন দ্বারাই মানুষ তার গন্তব্যকে তথা আল্লাহকে দেখতে পায়। হযরত ওমর (রা) একথাই বলেছিলেন। মানুষ যতক্ষণ তার লক্ষ্য বা গন্তব্যকে চিনতে না পারে ততক্ষণ তার কাছে পৌছার পথও চিনতে পারে না এবং তাতে কোন সৌন্দর্য্যও দেখতে পায় না। মন দিয়েই সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ চিনে নিতে পারে। তবে শর্ত এই যে, মন হওয়া চাই জীবন্ত। জীবন্ত মন যাদের আছে তাদের সামনে গন্তব্য পথের প্রতিক ফলকগুলো সুস্পষ্ট থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ ـ

"যে মৃত ছিল, অতপর তাকে আমি জীবন্ত করেছি এবং মানুষের মধ্যে চলাফেরার জন্য তাকে নূর বা জ্যোতি দিয়েছি, সে কি অন্ধকারে পতিত ও অবরুদ্ধ লোকের সমান হতে পারে?"–(সূরা আল আনআম ঃ ১২২)

এই পথের প্রতীক ফলক আর কিছু নয়—শুধু ন্যায় ও অন্যায়, পবিত্র ও অপবিত্র, ভালো ও মন্দ, উপকারী ও অপকারী এবং হালাল ও হারাম।

www.pathagar.com

এই মনই মানুষের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কামনা ও বাসনাকে তীব্রতর করে, তার আকাংখা ও সংকল্পকে উজ্জীবিত করে, আর যখনই সে অবসাদ বা উদ্বেগে ভারাক্রান্ত হয় তখন চিরস্থায়ী শান্তির নিকেতন থেকে তার সামনে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করে। ফলে তার সংকল্পের পুনরুত্থান হয় নতুন আকাঙক্ষা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয় তার সত্তায়। জনৈক কবির ভাষায় ঃ

"তোমার স্মৃতিবাহী কিছু কথা মনে জাগ্রত হয় এবং তা তাকে খাদ্য ও পাথেয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ করে তোলে।" "যখন সে সফরের বিবরণ নিয়ে অভিযোগ মুখর হয়, তখন নবযাত্রার স্পৃহা তাকে সাবধান করে দেয়। ফলে মন যথাসময়ে আবার জীবনীশক্তি ফিরে পায়।"

সুতরাং এই অনন্ত ও কালজয়ী সফরে মনই সবকিছুর মূল এবং চাবিকাঠি। মানবজীবনে মনের গুরুত্বই সর্বাধিক। দেহ কেবল তার বাহন বা সংরক্ষণ পাত্র। ইতিপূর্বে একাধিক বার বলা হয়েছে যে, মানুষ বলতে তার মনকেই বুঝায়। 'দাওয়াতকারীর শক্তির উৎস' সংক্রান্ত অধ্যায়ে একথা আলোচিত হবে যে, দাওয়াতকারীর কর্তব্য যে কুরআন অধ্যয়ন তার প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য হলো মনকে সজীব করা এবং তাকে আল্লাহর স্মরণ দ্বারা উদ্বেগমুক্ত ও শান্ত রাখা। আর একথাও সেখানে বলা হবে যে, রসূলের সুন্নাহ সম্পূর্ণরূপে এই উদ্দেশ্যকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সিদ্ধ করে। আমরা অল্প আগেই বলেছি যে, এ জাতীয় কথার তেমন কোন মোহনীয় বা যাদুকরী আকর্ষণ নেই। তাই বলে কি ঐসব প্রবঞ্চিত লোকেরা মনে করে যে, কুরআন শুধু দেহের সেবার ব্যবস্থায় সুশৃংখল ও পরিশীলিত করার জন্য নাযিল হয়েছে? আর রসূলের সুন্নাহ কি আমাদেরকে শুধু একথাই শেখায় যে, এই দেহরূপ বাহনের জন্য কিভাবে খাদ্য ও রসদ জোগাড় করা যাবে? আর মানুষ বলতে যদি তার ভদ্রতা ও মহানুভবতার আদর্শে সমৃদ্ধ মনকেই না বুঝায়। তার পরোপকার ও সহানুভূতির মনোভাবকেই না বুঝায় এবং আল্লাহর ভীতি ও আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অর্জিত মনের প্রশান্তভাবকেই না বুঝায়, তাহলে কি তারা এ দ্বারা শুধু খাদ্য ও পোশাক সর্বস্ব দেহ এবং ক্ষুধা ও লোভ সর্বস্ব জৈব কামনাকেই বুঝে?

সুতরাং দাওয়াতদাতার লক্ষ্য ও গন্তব্য চিনে নেয়ার পর একমাত্র কর্তব্য দাঁড়ায় মনকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে তার পৌছার পথ সুগম করা তাকে শান্ত ও নিরাপদ করা—যাতে তার মনকে নির্জীব করে দেয়ার উপকরণগুলো এসে তাকে দেউলে এবং হৃদয়হীন করে দিতে না পারে। আমার মতে এ উদ্দেশ্যটা পূর্ণ হতে পারে নিম্নের দু'টো উপায় দ্বারা ঃ

www.pathagar.com

প্রথম উপকরণ ঃ আল্লাহর স্মরণ

প্রথমত, সার্বক্ষণিকভাবে আপন গন্তব্যের কথা তথা আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। এই স্মরণ এতটা শক্তিশালী ও প্রবল হওয়া চাই যে, তা যেন মানুষকে পুরোপুরি আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন ও ব্যস্ত করে দেয় ও তার দিকে পুরোপুরিভাবে মনকে রুজু করে দেয়। এই লক্ষ্যকে জানা, চেনা এর প্রতি অনুরক্ত হওয়া ও এর চিন্তায় মগ্ন হওয়ার মত উজ্জীবক উপকরণ মনের জন্য আর কিছুই নেই। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর "অতপর চিন্তা-ভাবনা কর" এই উক্তিটাই এই বিজয়ের সাথে আমাদেরকে সবিশেষ পরিচিত করে তোলে।

এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে এই সার্বক্ষণিক স্মরণ দাওয়াতকারীর সহজলভ্য হতে পারে ? এ ব্যাপারে পয়লা কথা এই যে, আল্লাহ আমাদের ওপর নামায ফরয করেছেন নামাযের মধ্যে আল্লাহর সাথে যে কথোপকথন, তার প্রশংসা, শেষ বিচারের দিন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং নির্ভুলপথ সিরাতুল মুসতাকীমের অনুসন্ধানের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তার মাধ্যমে নামাযকে তিনি আমাদের জন্য বাস্তব শিক্ষার আধারে পরিণত করেছেন। তাছাড়া দাওয়াতকারীকে তিনি মসজিদ নির্মাণে অনুপ্রাণিত করেছেন—যা আল্লাহমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। সেখানে তার শিক্ষার্থীরা তারই ইমামতিতে ও নেতৃত্বে এসব শিক্ষা গ্রহণ করবে।

এ হলো আল্লাহর পথনির্দেশ ও বাস্তব নমুনা—যা আল্লাহ দাওয়াতকারীর সম্মুখে স্থাপন করেছেন যাতে করে সে এই নমুনার আলোকে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে এগুবার ও তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার দিকদর্শন লাভ করে। তাই দাওয়াতকারীর একটা বড় কর্তব্য হলো মানুষকে নামায কায়েমে উৎসাহ দেয়া, মসজিদগুলোকে রূহানিয়াত ও আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতালাভের উপকরণে সমৃদ্ধ করা, মসজিদ সংলগ্ন শিশু মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা যাতে করে সেগুলো শিশুদের জন্য মূল লক্ষ্যের স্মরণিকা ও নির্দেশিকা হয় এবং তা শিশু ও বড়দের মনে মু'মিনের জীবনের মূল লক্ষ্যের বীজ বপণকারী হয়। সেই সাথে দাওয়াতকারীকে নাটক, সিনেমা, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারাও কাজ নিতে হবে এবং আরো নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এমন অবস্থা যেন কোন ক্রমেই দেখা না দেয় যে, এই সমস্ত কার্যকর উপকরণ কেবলমাত্র বাতিল কথাবার্তা ও ক্ষতিকর মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং বাতিল ও লক্ষ্যহীন জীবনের দিকে ঠেলে দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকবে আর সত্য দ্বীনের দাওয়াতকারীরা এমনভাবে অবস্থান করবেন যেন কিছুই দেখেন না, শোনেন না এবং এ যুগের জ্যান্ত মানুষের মধ্যে যেন তারা বাসই করেন না।

২০—

www.pathagar.com

দ্বিতীয় উপকরণ ঃ মনকে বিবিধ ক্ষতিকর ও প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব থেকে রক্ষা করা।

একথা যখন স্বীকৃত হলো যে, মনই আল্লাহর পথের সফরের একমাত্র উপকরণ অথবা গন্তব্যের প্রধানতম দিশারী, পথের প্রধানতম আলোকবর্তিকা, সংকল্পের প্রধান উজ্জীবক এবং আবেগ ও আকাঙক্ষার প্রধান উদ্দীপক—তখন আমাদের কর্তব্য এই যে, তাকে এতটা প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা দান করি যা তাকে অব্যাহত স্মরণ ও চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন রাখতে সক্ষম এবং তাকে নিরুদ্বেগ ও শান্তভাবে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারে। আমার মতে, মনকে যখন নিত্যকার প্রতিকূল ও ক্ষতিকর জিনিস ও অবস্থার প্রভাব থেকে রক্ষার যাবতীয় উপকরণে সমৃদ্ধ করা হবে, তখন তা নির্ভুলভাবে সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপর দিয়ে আপন লক্ষ্যের দিকে অবাধে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। দাওয়াতকারী এসব প্রতিকূল ও ক্ষতিকর প্রভাবের উৎসগুলোকে নিম্নরূপ তালিকাভুক্ত করতে পারেন।

(ক) অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার প্রভাব

একথা অবিসম্বাদিত রূপে সত্য যে, জীবন ধারনের উপকরণসমূহ এবং অর্থনৈতিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন সমস্যা মানুষের মনের ওপর অত্যন্ত প্রবল ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ঃ দারিদ্র, বার্ধক্য, রোগ কিংবা অন্য কোন কারণে বেকারত্ব, ঋণগ্রস্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কিংবা আগুন লাগার ঘটনার শিকার হওয়া, ইয়াতিম কিংবা বিধবা হয়ে যাওয়া বিশেষত পরিবার প্রধান যখন কোন সম্পদ না রেখেই মারা যায় এবং এ ধরনের যেসব সমস্যা মানুষের মনকে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তায় হতবুদ্ধি করে তোলে। এসব সমস্যা মানুষের মনকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত ও ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ফলে সে স্বাভাবিক শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে কোন কিছু ভাবতে পারে না।

ইসলামের দাওয়াতদাতাকে এসব সমস্যা ও তার প্রভাব মানুষের মনে কি রকম দাঁড়ায় তা বুঝতে হবে। অতপর মনকে এগুলো থেকে রক্ষা করা এবং সে যাতে অব্যাহত শান্তির পরিবেশে থাকতে পারে, চিন্তা ও স্মরণের উপযোগী প্রাচুর্যময় পরিমণ্ডলে বাস করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা তার কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে আমরা একথাটা পুনরায় উল্লেখ করতে চাই যে, মনের শান্তি এমন কোন বিলাসিতার ব্যাপার নয়—যার ব্যাপারে উদাসিনতা দেখানোর অবকাশ থাকতে পারে। এতটুকু প্রাচুর্যকে তার আয়েশী জীবনের কোন বাড়তি দাবী পূরণের সহায়তা বলে বিবেচনা করা চলে না। আসলে এটা প্রাথমিক প্রয়োজন—যার অভাবে জীবন অচল হয়ে যেতে বাধ্য। এটুকু তার

www.pathagar.com

মুক্তির জন্য অপরিহার্য। এছাড়া তার ধ্বংস অনিবার্য। একথাটা একমাত্র সে-ই বুঝতে পারে যে, বিশ্বাস ও উপলব্ধি করে যে তার দুনিয়ার জন্য নয়—বরং আখেরাতের জন্যই এ নিয়ামত সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব সমস্যা ও প্রতিকূলতার উল্লেখ করার অর্থ হলো, আমরা তার ধ্বংসের অন্তত একটা কারণ চিহ্নিত করছি। বস্তুত মানুষ ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হলে তা আর পরিশুদ্ধির সুযোগ থাকে না। তখন চিরস্থায়ী জান্নাত অথবা চিরস্থায়ী জাহান্নাম—এ দু'টোর একটাই তাকে বেছে নিতে হয়। মানুষের দেহকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রোগ মহামারী প্রতিরোধে যখন সরকার ত্বরিত পদক্ষেপ নিয়ে থাকে, তখন যেসব সমস্যা মানুষের মনকে দুশ্চিন্তা ও সমস্যার করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করে থাকে, তার প্রতিরোধে ত্বরিত এগিয়ে আসা তার আরো বড় কর্তব্য। এসব সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে পানাহ চাই —তোমার কাছে ঋণের অসহনীয় বোঝা ও মানুষের দাপট ও দৌরাত্ম থেকে রেহাই চাই।" তিনি আরো বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে কুফরি ও দারিদ্র থেকে নিষ্কৃতি চাই।" মানবজাতির মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামের চেয়ে বেশী দৃঢ়চেতা ও কষ্টসহিষ্ণু কেউ নেই। তা সত্ত্বেও তিনি এত ব্যাকুলভাবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থী হয়েছেন ও এ সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছেন শুধু এ জন্য যে, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ঋণের বোঝা ও দারিদ্রের পীড়ন মানুষের মনকে গুনাহ ও প্রবৃত্তির লোভ-লালসার মতই ধ্বংস করে দিয়ে থাকে। তিনি এসব সমস্যা দেখে এজন্য ঘাবড়ে যাননি যে, এগুলো তাকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে দেবে এবং তাকে প্রয়োজনীয় পার্থিব সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টা করতে দেবে না। অবশ্য দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ মানুষের উচ্চাকাঙক্ষা ও উচ্চাভিলাসের ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করে এবং বস্তুগত জীবনে এর কি ধরনের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা রসূল (সা)-এর উপরোক্ত দোয়া থেকে অনুসন্ধান করে বের করা একজন সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষকের কাজ। এ কাজ তার পক্ষে শুধু বৈধই নয়, বরং প্রশংসনীয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকল্পের দৃঢ়তা ও উচ্চতা এবং উর্ধজগতের তত্ত্ব অনুধাবনে তার নিখুঁত ও নিষ্কলুষ ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা যতটা জানি, তাতে আমাদের এ বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয় যে, তিনি এ দ্বারা তার মনের নিরাপত্তা ও প্রশান্তিই সর্বাগ্রে কামনা করেন। কেননা মনই হলো দুনিয়া ও আখেরাতে সজীবতা ও প্রাণশক্তির উৎস।

সুতরাং এই অর্থনৈতিক কার্যকারণগুলো ও মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ওপর তার প্রভাবকে চিহ্নিত করা দ্বারা আমরা শুধু তার ক্ষুধা নিবৃতকারী

www.pathagar.com

খাদ্যের গ্রাস ও লজ্জা ঢাকার কাপড়ের ব্যাপারেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করছি না যেমন দারিদ্র ও বেকারত্বের সমস্যা নিয়ে আলোচনাকারী অন্যরা করে থাকেন। বরং আমরা এ সীমানার বাইরে গিয়ে তার হৃদয়ের ওপরে এর যে কুপ্রভাব পড়ে, সেটা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছি। দারিদ্র প্রভৃতি সমস্যার দরুন তার মনে যে দুশ্চিন্তার অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়, মনকে সে অন্ধকার থেকে মুক্ত করার, তার চতুর্পার্শ্বের পরিবেশকে নিষ্কলুষ ও নির্মল রাখার এবং তার মনের শান্তি ফিরিয়ে আনার পক্ষেও আমরা বক্তব্য রাখছি। কেননা এভাবেই সে তার গন্তব্যে পৌঁছার অভিযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম। ক্ষুধার কারণগুলো উপস্থিত থাকা সত্বেও যদি ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সেটা হবে অতি উঁচুদরের সাধক মহাপুরুষদের কাজ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় ক্ষুধার্ত থাকতেন, কিন্তু সে ক্ষুধা তাকে বিচলিত ও অবদমিত করতে পারতো না। অনেক সময় তার গৃহে খাদ্য থাকতো না। কিন্তু তিনি সে জন্য কারো সামনে দুর্বলতা প্রকাশ কোন মানুষের অনুগ্রহ প্রার্থী হতেন না, এমনকি এতে তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা উদ্বিগ্নও হতেন না। বরং পেটে পাথর বাঁধতেন। আর কাছে যেসব সাহাবী থাকতেন তাদেরকে বলতেন ঃ "শুনে রাখ, দুনিয়াতে এমন বহু লোভী লোক আছে, যে খাদ্য ও পোশাকের দিক দিয়ে তৃপ্ত, কিন্তু কেয়ামতের দিন ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকবে। শুনে রাখ, অনেকে আজ নিজেকে সম্মানে ভূষিত করছে, কিন্তু পারলৌকিক বিচারে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করছে। পক্ষান্তরে অনেকে আজ নিজেকে লাঞ্ছিত করছে মনে হলেও আসলে নিজেকে সম্মানিতই করছে।"

তবে রসূলুল্লাহর (সা) মত দৃঢ়চিত্ততা ও সর্বোচ্চ মানের সেই মনোবল ও হিম্মত আমরা কোথায় পাবো ? যে বাঁধা ও প্রয়োজন সাধারণ মানুষকে দমিয়ে ফেলে, তাতো তাঁকে দমাতে সক্ষম ছিল না।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা একথাই বলতে চেয়েছি যে, আর্থিক সচ্ছলতা এবং খাদ্য ও পোশাকের প্রয়োজনীয় সরবরাহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আমরা মানুষের যে জীবনমান চিহ্নিত করেছি, তা সীমিত ও সংকীর্ণ বুদ্ধির লোকদের নির্ধারিত জীবনমান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই সবসময় আমরা বস্তুগত সরবরাহের সাথে রূহানী সরবরাহের সহাবস্থানের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছি। এ দু'য়ের একত্র সমাবেশ তার মনোবলকে দৃঢ় করবে। দারিদ্রের কষাঘাত কখনো বিব্রত করলেও রূহানী সরবরাহের পেলব পরশ তাকে উৎফুল্ল করবে এবং আল্লাহ তাকে যেটুকু সম্পদ দেন তাতেই তাকে সন্তুষ্ট হতে উৎসাহিত করবে। আমাদের নীতি এবং এ যুগের অন্যান্য বড় বড় সংস্কারকদের নীতিতে এটুকুই পার্থক্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই প্রলয়কাণ্ড চলতে থাকা

www.pathagar.com

অবস্থাতেই ইংরেজ সরকার পানীয় প্রস্তুত প্রকল্পের সুসংবাদ দিয়েছিল। আর সে উদ্যোগটাকে সারা দুনিয়ার মানুষ একটা উন্নয়নমুখী ও প্রগতিবাদী ঘটনা বলে স্বাগত জানিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের গুরুত্বের সাথে ভাবতে হবে যে, আমাদের নীতি নিয়ে আমরা গর্ববোধ করবো কি করবো না এবং দুনিয়াবাসীকে তার সুসংবাদ দেব কি দেব না। তারও আগে আমাদের ভাবা দরকার যে, আমরা নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখবো কিনা এবং আমাদের ঈমান আকিদা নিয়ে গর্ববোধ করবো কিনা।

এবারে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তব্যে আবার ফিরে যাই। মানুষের জৈবিক প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক উপকরণগুলোর অভাব দ্বারা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় যে অস্থিরতা ও অশান্তি দেখা দেয়া অনিবার্য, সেটা আমরা এজন্যই স্বীকার করেছি যে, দাওয়াতকারী ঐসব আপদের প্রতিকারে গড়িমসি করার অবকাশ যে নেই, তা যেন উপলব্ধি করে। কেননা মানুষের ধ্বংস ও বিপর্যয়কে একমাত্র এমন লোকেরাই নীরবে বরদাশ করতে পারে, যারা মনকে অস্বীকার করে এবং যারা অনুভূতির দিক দিয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সত্যের দাওয়াতদাতাদের স্বভাবে এ বৈশিষ্ট থাকা অনুচিত। দাওয়াতদাতাকে এটাও অনুধাবন করতে হবে যে, নিজ সংগঠনের মধ্যে সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা তার অন্যতম কর্তব্য এবং সে কর্তব্যটা তার নীতিগত অবস্থানের প্রয়োজনেরই অপরিহার্য দাবী। সংগঠনের সকলকে ঐ নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় আনা তারই দায়িত্ব। ইসলাম যাকাতকে ফরয করেছে। একে নফল হিসেবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের ওপর ছেড়ে দেয়নি। এই কার্যকর ইতিবাচক ফরয কাজটি দ্বারা দাওয়াতকারীর সামনে একটা বিরাট ব্যবস্থার দুয়ার খুলে দিয়েছে। একে তার আন্দাজ-অনুমানের ওপর সমর্পণ করেনি। যারা যাকাত দিতে সক্ষম, তাদের সকলকে তা দিতে বাধ্য করার নির্দেশ দিয়েছে তাকে। যদি না দিতে চায় তবে তরবারী দ্বারা হলেও তাদেরকে তা দিতে বাধ্য করতে হবে। এ রকম স্পষ্ট নির্দেশ দেয়ার পর দাওয়াতদাতার সামনে এর বাস্তবায়ন ছাড়া আর কোন পথ নেই। প্রয়োজনে তাকে বিস্তারিত বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন ও আইন রচনা করে সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এভাবে যাকাতকে একটা বাস্তব ও কার্যকর বিধানের রূপ দিতে হবে।

এখানে ইতিপূর্বে ইশারা ইংগীতে বলা একটা বিষয়ে সর্বশেষ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করতে চাই। তা হচ্ছে এই যে, দাওয়াতকারীর দায়িত্ব এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবায়নেই শেষ হয়ে যায় না। বরং এ ব্যবস্থাকে দাতা ও গ্রহীতা সকলের কাছে এতটা প্রিয় করে তুলতে হবে যেন সকলেই এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ও

www.pathagar.com

গর্বিত হয় এবং একে নিজেদের সবার জন্য সমান কল্যাণকর মনে করে। বাহ্যত যদিও মনে হয় যে, এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র দুস্থদের কল্যাণে নিবেদিত। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা হৃদয়ের ওপর দারিদ্রের দংশন সম্পদের লোভ ও মোহের দংশনের মতই মারাত্মক। এর ব্যাখ্যা বুঝা সেই ব্যক্তির পক্ষে খুবই সহজ—যিনি একথা বিশ্বাস করেন যে, সর্বক্ষণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে মগ্ন থাকাই হৃদয়ের সজিবতা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ধ্যানে মগ্ন হওয়া এবং আল্লাহর ধ্যান থেকে বিচ্যুত হওয়াতেই হৃদয়ের মৃত্যু ও ধ্বংস নিহিত। দারিদ্রজনিত দুশ্চিন্তা যখনই মনের একাগ্রতা নষ্ট করে, তখনই মন আল্লাহর ধ্যান থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য। অনুরূপভাবে ধনাঢ্য হওয়া ও অধিক সম্পদ আহরণের আকাঙক্ষাও মনকে আল্লাহর ধ্যান থেকে একইভাবে বিচ্যুত করে থাকে। এই বিচ্যুত কিসের জন্য এলো, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হলো বিচ্যুতি এবং তা কিভাবে রোধ করা যায়। দাওয়াতদাতা যখন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা[১] বাস্তবায়িত করলো এবং তার দাওয়াতের পথ সুগম ও তার বাহ্যিক উপায়-উপকরণগুলোকে হস্তগত করলো, তখন সে শুধু একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থাই কায়েম করলো। সে ব্যবস্থা হয়তো শুধু গরীবের কাছেই ভালো লাগবে—ধনীর কাছে ভালো লাগবে না। এটা রূহানিয়াতের আলো থেকে বঞ্চিত এ যুগের সংস্কারকদের কাছে ভালো ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু ইসলামী সংস্কারকের কাছে তা সুষ্ঠু ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হবে না। কেননা সে তো আল্লাহর হেদায়াতের আলোকেই সবকিছু বিচার-বিবেচনা করতে অভ্যস্ত। তার সনদ ও দিকদর্শন হলো কুরআন। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط

"হে নবী ! আপনি তাদের সম্পদের একাংশ ছদকা হিসেবে গ্রহণ করুন—যা দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদেরকে অগ্রসর করবেন। অতপর তাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩)

এরপর ফরযকে শক্তি ও তরবারী দ্বারা বাস্তবায়িত করার প্রশ্ন। এ ব্যবস্থা মানুষকে বিদ্রোহ ও অমান্য করার সুযোগ গ্রহণের প্রবণতা থেকে ফিরিয়ে রাখে। এটা দাওয়াতের কাজের যেমন দাবী, তেমনি জনগণের ন্যায্য অধিকার

১. ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা একটা জরুরী স্বাভাবিক ব্যবস্থা। এর মূল কথা এই যে, সমস্ত সম্পদ আল্লাহর এবং তা আল্লাহর কাছ থেকে সমাজের কাছে আসে পরস্পরের অভাব অভিযোগ পূরণ করার জন্য। এ সম্পর্কে আমার প্রণীত "ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

www.pathagar.com

যে, উল্লিখিত আয়াতের ভাব ও ভাষার প্রতি আপনি তিক্ষ্ণ ও গভীর দৃষ্টি দেবেন। কেননা এ প্রসঙ্গে যা কিছু বলা বা করার অবকাশ আছে, তার সবকিছুই এ আয়াতটাতে বলা হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন ঃ

১-"তাদের সম্পদের একটা অংশ সাদকা হিসেবে গ্রহণ কর।" এটা হলো দরিদ্রের প্রাপ্য অংশ। তাই এটা আইনেরই বিধান। তরবারীর জোরে হলেও একে কার্যকর করা চাই।

২-"সে সাদকা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করবে।" প্রথম শব্দটির মূল হলো "তাওহীদ" (পবিত্র কর) এবং দ্বিতীয়টির মূল "তাজকিয়া" (উৎকর্ষ সাধন) প্রথমটির চাইতে দ্বিতীয়টি উন্নততর। দু'টোর একটিও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এখানেই মনের দাবী নিহিত। মনের এ দাবী নিছক সাদকা গ্রহণেই মিটতে পারে না। সে দাবী মিটতে পারে তা গ্রহণের পন্থা ও পদ্ধতি এবং তাকে নির্ধারিত খাতে খরচ করা দ্বারা। সে পদ্ধতিটা হলো নরম ভাষায় উপদেশ দান। এর দ্বারাই ঐ সাদকা ইবাদাত ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের উপকরণে পরিণত হতে পারে। এর দ্বারাই তা আখেরাতের মুক্তির উপায় হয়ে দেখা দিতে পারে। সে পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত এটাও যে, গোটা শাসনব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে অনুভব করতে পারে যে, রাষ্ট্র তার প্রতিপালনের দায়িত্বে নিয়োজিত, নাগরিকের সুখে-দুঃখে সে জবাবদিহি করতে বাধ্য, সে যদি কোন সম্পদ না রেখে মারা যায় তাহলে তার সন্তানরা সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকবে, এ তত্ত্বাবধান এমন এক সদয় ব্যবস্থা যে তাতে নিষ্ঠুরতার কোনই অবকাশ নেই, তা এমন সম্মানজনক ব্যবস্থা যে তাতে বিন্দুমাত্রও লাঞ্ছনা ভোগের অবকাশ নেই। এ তত্ত্বাবধান এমন এক ব্যবস্থা যে, তা সর্বাবস্থায় আল্লাহর করুণা ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকে এবং নিজের জন্য কোন প্রকারের বস্তুগত উপকার বা পদমর্যাদালাভের আশাও করে না। সে পন্থা হলো মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার ও সকল মানুষের অধিকারের সমতা এমনভাবে নিশ্চিত করা, যাতে জুলুম থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায় এবং সকলে অনুভব করতে পারে যে, রাষ্ট্রের যা কিছু কল্যাণকর তা সকলের ভোগে আসবে, এক সম্প্রদায় বাদ পড়বে, অন্য সম্প্রদায় ভোগ করবে, তা কক্ষণো হবে না। সে পন্থা হলো বেচাকেনায় দান ধ্যানে ও সকলের স্বার্থ সহজলভ্য করার কাজে উদার নীতি অবলম্বন। এ পদ্ধতিটা রাষ্ট্রই চালু করে, তার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র জনগণের সাথে লেনদেন করে এবং জনগণের পারস্পরিক লেনদেনও এরই ভিত্তিতে চলে। এতে কেউ কাউকে শোষণ করতে বা কারো প্রতি অবৈধ লোভ বা অভিলাস পোষণ করতে পারে না, কোন সুদ, প্রতারণা বা একজনের সম্পদ আর একজন অন্যায়ভাবে আত্মসাত করে না। বস্তুত তা হয়ে দাঁড়ায় এক সর্বাত্মক উদার ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা মানুষকে তার নিজের দেহের

www.pathagar.com

সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে এবং নিজের রকমারি উচ্চাভিলাস ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতায় জর্জরিত ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডল থেকে বের করে তার দিগন্ত জোড়া হৃদয় জগতে ও আখেরাতের অনন্ত সম্পদের দিকে নিয়ে যায়। এই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াতেই মানুষের মন কোমল হয় এবং তার সকল অর্গল খুলে যায়। এভাবেই সদকা ও দান তার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুফল দ্বারা জগতবাসীকে সমৃদ্ধ করে।

وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط

৩–"আর তাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩)

এ অংশে বলা হচ্ছে যে, তাদের কল্যাণ কামনা করুন এবং তাদের প্রতি আপনার হৃদয়ের জ্যোতি ও স্নেহের বারীধারা বর্ষণ করুন। কেননা এটা তাদেরকে রকমারি ফেৎনা-ফাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক তৎপরতা থেকে নিরাপত্তা ও নিষ্কৃতি দেবে।

উক্ত "তাদের" সর্বনাম দ্বারা যদি কেবল ধনিকদের প্রতিই আয়াতটার ইংগীত করা হয়ে থাকে তাহলে এ থেকে বুঝা যায় যে, সাদকার উপকারিতা স্বয়ং সাদকাকারীদের দিকেই ফেরত আসে এবং তার দ্বারা তারাই পাল্টা লাভবান হয়। এ বক্তব্য কুরআনের অন্য একটি আয়াত দ্বারা আরো দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়। তা হচ্ছে ঃ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط

"তোমরা যেটুকু সম্পদই দান করবে তা তোমাদেরই কল্যাণে আসবে।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২)

এ থেকেই স্পষ্ট হলো যে, সম্পদ যারা দান করে, তারাই পবিত্রতা অর্জন করে, তারাই যথার্থ উৎকর্ষ ও উন্নতি লাভ করে। তাদের সাদকাকে আল্লাহ তায়ালা স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং তাকে এত বাড়িয়ে দেন যে, শেষ পর্যন্ত তা এক হাদীসের বক্তব্য অনুসারে—পর্বতের মত রূপ ধারণ করে। আর দরিদ্ররা এ দান থেকে কি লাভ করলো? রুটী? কাপড়? নগদ টাকা? রুটী, কাপড় ও নগদ টাকা দিয়ে গরীবকে কিসের পবিত্রতা দান করবেন? দরিদ্র মিসকিন ব্যক্তি অপবিত্র হয়েছিল কখন, যে তাকে সাদকা দিয়ে পবিত্র করবেন? সত্যিকার অপবিত্র হয়েছিল তো সেই বিত্তশালী, যার মনে সম্পদের মোহ ঢুকে তার মনের শান্তি নষ্ট করেছিল এবং তার তাকওয়া ও পরহেজগারীকে বিকৃত করেছিল। দরিদ্র ব্যক্তির ওপর শুধু এটুকু দুর্যোগ নেমে এসেছিল যে, একটা

www.pathagar.com

বাধা তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তার পথ থেকে সেই বাধা দূর করতে সাহায্য করেছি। তার অগ্রগতির অন্তরায়কে অপসারিত করেছি।

যদি কেউ ধারণা করে যে, দানের রুটী খাওয়া ও দানের কাপড় পরা দ্বারা গ্রহীতা পবিত্রতা অর্জন করে থাকে তাহলে দানশীল ধনিকরা যে সমাজের অধিকতর পবিত্র লোক, তাও তাকে মেনে নিতে হবে। কেননা তারা সবার চেয়ে বেশী খায় ও পরে আবার দানও করে।

মনে রাখা দরকার যে, সদকা ও দানের আসল গ্রহীতা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনি নিজেই একথা ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۝

"তারা কি একথা জানে না যে, আল্লাহই বান্দার কাছ থেকে তাওবা কবুল করেন তিনিই সদকা গ্রহণ করেন এবং তিনিই দয়াশীল ও ক্ষমাশীল।"
–(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৪)

এই শেষোক্ত আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াতটিকে সুষ্ঠুভাবে বুঝবার জন্য একটি পথনির্দেশ স্বরূপ। আল্লাহর পথে দানের গোটা কাজটি এ আয়াতের বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি সংগতিশীল। এতে কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নেই। এই সাথে এ আয়াতটি দরিদ্র লোকদেরকে এক বিশেষ সম্মানের আসনে বসিয়েছে। তাদেরকে দাতাদের কৃপাধন্য করে দেখানো হয়নি। বরং দেখানো হয়েছে এই যে, দাতাদের লেনদেন হয় স্বয়ং আল্লাহর সাথে। এসব দান সদকা দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদের দানকে তিনিই বাড়িয়ে দেন। তিনিই এর প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। বস্তুত এটা আল্লাহর কিতাবের একটি অন্যতম মহান শিক্ষা। কারো কারো মতে ...... خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ "তাদের সম্পদ থেকে একাংশ গ্রহণ করুন, যা তাদেরকে পবিত্র করবে ....এখানে 'তাদের' সর্বনাম দ্বারা ধনি দরিদ্র সবার প্রতিই ইংগীত করা হয়েছে। এ মতের স্বপক্ষে তারা যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহলো এই যে, কুরআনে সমস্ত সম্পদকে আল্লাহর সম্পদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর বিশ্বের সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি। কাজেই তারা সবাই আল্লাহর সম্পদে অংশীদার। প্রত্যেকের হিস্‌সা নির্ধারিত আছে। একথাও আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার আলোকে কথাটা এই রকম দাঁড়ায় যে, সদকা ধনী ও গরীব উভয়কেই পবিত্র করে। ধনীকে পবিত্র করে সম্পদের মোহ ও কৃপণতা থেকে এবং আরো বহু সামাজিক দুষ্কর্ম ও চারিত্রিক দোষ থেকে। আর গরীবকে মুক্ত করে দারিদ্র থেকে নয়—বরং বিত্তশালীদের দাসত্ব ও হীনতা থেকে। এই উভয় ব্যাখ্যার পক্ষেই কুরআনের সমর্থন রয়েছে।

www.pathagar.com

উভয়টিতেই কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। আসলে আমরা কোন্‌টি অনুসারে কাজ করি, সেটা নিয়েই কথা। আল্লাহ্ আমাদেরকে নেক আমলের তৌফিক দিন।

মানুষের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হতে যে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো বাধার সৃষ্টি করে এবং যে সমস্যাগুলো তার চিন্তাকে উদ্বেলিত ও বিক্ষিপ্ত করে, সে সম্পর্কে একথাগুলো আমার মনে এসেছিল এবং এগুলোই এতক্ষণ বললাম। একজন ইসলামের দাওয়াতদাতা ভালো করেই জানে যে, ইসলাম তার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় ও মৌলিক, তার কোনটাই চিহ্নিত করতে বাদ রাখেনি। কাজেই বাস্তবায়নের প্রতি আগ্রহী ও দৃঢ়সংকল্প হওয়া ছাড়া তার আর কোন কিছু করণীয় নেই। এই সংকল্প ও আগ্রহ তার মধ্যে কার্যত তখনই বিরাজ করবে যখন সে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির অনুভূতিতে উজ্জীবিত হবে।

(খ) মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকূলতার প্রভাব

মানুষের জৈবিক দাবীর সাথে যেসব কার্যকারণের সম্পর্ক সেগুলোই মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকূলতার আওতায় পড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো —যৌন আবেদন ও আকর্ষণ এবং অর্থের মোহ। এ দু'টোর যেটাই কারো ওপর চড়াও হোক, তার বিবেক-বুদ্ধি ও মনের মহৎ ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে ঝড়ের সামনে পড়া খড়কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে দেয়। আল্লাহর দিকে মানুষের বা তার মনের অভিযাত্রাকে সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে অব্যাহত রাখতে হলে অবাধ্য এই যৌন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং তার তীব্রতা ও বিদ্রোহকে দমন করতে হবে। এর অর্থ এ নয় যে, ঐ প্রবৃত্তিকে একেবারেই প্রতিহত ও খতম করে দিতে হবে। বরং তার প্রচণ্ডতাকে প্রশমিত করতে ও মনের অভ্যন্তরে অবস্থিত তার কুপ্ররোচক শয়তানগুলোকে এমনভাবে দাবিয়ে দিতে হবে, যাতে করে তা সভ্য, শান্ত ও ভদ্র হয়ে যায়। আর সেটা হতে পারে একমাত্র সর্বাগ্রে প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রয়োগ দ্বারা। সে চিকিৎসা দেহের প্রকৃতি ও সহজাত প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় এবং তার জৈব স্বভাবের ওপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন হওয়া চাই। আল্লাহ যেসব বিজ্ঞানসম্মত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রোযা ফরয করেছেন, দেহের উক্ত চিকিৎসা তারই অন্যতম একটি। বস্তুত দৈহিক ও জৈবিক আবেদনের প্রচণ্ডতা প্রশমন এবং তার বিদ্রোহাত্মক শক্তি খর্ব করার ক্ষমতা রোযার রয়েছে। এর একটি প্রমাণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসে লক্ষ্যণীয়ঃ

"হে যুবক সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্যে যারা বয়োপ্রাপ্ত তাদের বিয়ে করা উচিত। বিয়ে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও যৌন অঙ্গকে সংযত রাখার সর্বোত্তম

www.pathagar.com

উপায়। কিন্তু সেটা যার ক্ষমতায় না কুলায়, সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার জন্য কশাঘাত স্বরূপ।"[১]

যিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত, মানুষের গোপন অবস্থার ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কে রোযা রেখেছে আর কে রাখেনি তা জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা রোযা বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার একটা একান্ত গোপনীয় ব্যাপার। প্রকাশ্যে খাওয়া-দাওয়া করতে দেখা ছাড়া কারো পক্ষে অন্যের অবস্থা জানা সম্ভব নয়। অনেকেই ফরয রোযা ভেঙ্গে ফেলে অথবা রাখে না। ফলে তাদের জৈবিক চাহিদা যেমন নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তেমনি থেকে যায়। কখনো তা অন্যের সম্মতির প্রতি, কখনো অন্যের সতিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার জন্য ইসলাম বিধান রেখেছে কঠোর শাস্তির—যা নৈরাজ্যবাদী শয়তানদের তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধ ও দমন করে এবং তার উৎপাত ও ঔদ্ধত্য থেকে মানুষের মনকে নিশ্চিন্ত করে। চোরের জন্য রয়েছে হাত কাটা এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু দণ্ড।

জৈবিক দাবীকে বাগে রাখার এই কার্যকর ব্যবস্থাকে শক্ত হাতে চালু করা ও রাখা ছাড়া দাওয়াতদাতার এ ব্যাপারে আর কিছু করার নেই। আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে কোন অপরাধী বা অপরাধিনীর প্রতি দয়া দেখানোর কোন অবকাশ নেই। একমাত্র এই প্রক্রিয়া চালু রেখেই মানুষের জানমাল ও ইজ্জত আবরুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং প্রবৃত্তির প্ররোচক শয়তানদেরকে দমন করে বোতলের মধ্যে পুরে রাখা যেতে পারে। এভাবেই মনের চারপাশের পরিবেশ আবিলতামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হয় এবং তার শান্তি ও জীবনীশক্তি বহাল হয়।

(গ) সামাজিক প্রতিকূলতার প্রভাব

সামাজিক প্রতিকূলতা বলতে আমরা সেসব কার্যকারণকে বুঝাচ্ছি, যা সম্ভ্রম, সতিত্ব ও শালীনতা সংক্রান্ত প্রচলিত সামাজিক আচার ও মূল্যবোধের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর জিনিসটা হলো নারীর অশালীনভাবে প্রকাশ্যে চলাফেরা, আপন সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাকে প্রদর্শনের প্রবণতা এবং প্রকাশ্যে অপরাধজনক ও অশ্লীল কার্যকলাপ করা। আমি এখানে প্রকাশ্য রাস্তাঘাটে কিংবা নাচ ও মদের আসরে সংঘটিত কিংবা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথাকথিত প্রগতি ও সংস্কৃতির লেবেল আটা কার্যকলাপের বিবরণ দিতে চাই না। আমি শুধু একথাই বলতে চাই যে, এসব কাজ মানুষের মনের ওপর দুর্ধর্ষ

---

১. হাদীসের মূল শব্দটি হলো وجاء, যার আভিধানিক অর্থ হলো ঘাড়ের ওপর আঘাত করা বা প্রহার করা।

www.pathagar.com

ডাকাতি ও রাহাজানি সংঘটিত করে থাকে এবং তার শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। বেগানা স্ত্রীর প্রতি তাকানো বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ এবং তা মানব মনের কাছে শয়তানের বার্তা প্রেরণের নামান্তর। নারী যখন বেপর্দা হয়ে বাইরে আসে, তখন শয়তান তার ওপর সওয়ার হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষের জন্য সবচেয়ে ক্ষতির যে আপদটি রেখে গেছেন তাহলো নারী। এ জিনিসটা থেকে আমরা সবসময় সতর্ক করে চলেছি। কেননা এটা একটা ধ্বংসের উপকরণ এবং সে কথা আমরা একাধিকবার বলেছি। দাওয়াতদাতার কর্তব্য হলো সাধ্যমত সকল উপায় উপকরণ কাজে লাগিয়ে পরিবেশকে মনের জন্য ক্ষতিকর যে কোন অনাচার ও কদাচার থেকে পরিচ্ছন্ন ও মুক্ত করা। ইসলাম এর উদ্যোগ নিয়েছে। সে নারীকে বেপর্দা হয়ে বেরুতে নিষেধ করেছে ও মদখোরের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছে। এরপর রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে কিংবা আধুনিক যুগের উদ্ভাবিত অন্য কোন অভিনব শক্তির সাহায্যে পরিবেশকে রুচিকর ও মার্জিতভাবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও নির্মল করার কাজ সম্পন্ন করার ভার সে ইসলামের দাওয়াতদাতার হাতে অর্পণ করেছে। নারীর রূপ প্রদর্শনেচ্ছা ও বেপর্দা চলাফেরা ছাড়া আরো কয়েকটা ব্যাপার আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। যা মানুষের নিকৃষ্টতম ও কদর্যতম জৈবিক লালসাকে উস্কিয়ে দেয়ার কাজে নিয়োজিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নৈতিক কুরুচীপূর্ণ ও নিম্নমানের পত্র-পত্রিকা, নাচগানের আসর ও যৌন আবেগে সুড়সুড়ি দানকারী ও বিপথে চালিতকারী দেয়াল ছবি। দাওয়াতকারীর জানা দরকার যে, এগুলো তার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু এবং এগুলোকে নির্মূল ও উৎখাত করা তার সবচেয়ে জরুরী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

পাশ্চাত্য থেকে আমাদের কাছে একটা চরম নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ অসার ধূয়া রপ্তানী হয়ে এসেছে। সে ধূয়াটা হচ্ছে এই যে, নারী তার ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীন। সে যা খুশী তাই করতে পারে, জনগণের সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ রক্ষায়, সামাজিক কার্যকলাপ সম্পাদনে ও চাকুরী করায় তার কোন ত্রুটির সমালোচনা করার অধিকার কারো নেই। আমাদের মধ্যে যারা প্রবৃত্তির খায়েশের পূজারী এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবঞ্চনার শিকার, তারা এ শিশুসুলভ ধূয়াকে গ্রহণ করেছে। আর সাধারণ জনগণের একটা বিরাট অংশ এ ব্যাপারে তাদের অনুসারী হয়ে গেছে। আপনি যখন কারো সমালোচনা করে বলবেন, অমুক মদ খায়, জুয়া খেলে, মেয়েদের সাথে উদ্বাহু হয়ে নাচে—ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন আপনাকে বলা হবে ঃ এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার। এসব নিয়ে কথা বলা আপনার ঠিক নয়। যদি কিছু বলতে চান, তবে তার সামাজিক কার্যকলাপ ও পরিকল্পনাদি নিয়ে বলুন, অথবা রাজনীতি সাহিত্য বা অর্থনীতি

www.pathagar.com

ইত্যাদির ব্যাপারে তার ধ্যান-ধারণা ও মতামতের সমালোচনা করুন। দাওয়াতকারীকে এ বালসুলভ ধারণার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। তার জানা দরকার যে, মানুষের গোটা সত্তা ও জীবন একটা অবিভাজ্য একক। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন তার বিচ্ছিন্ন নয়। জীবনের একাংশ নষ্ট হলে আর এক অংশ ভালো থাকতে পারে না। জীবনকে বিভাজ্য ও বিচ্ছিন্ন মানার এই ন্যক্কারজনক প্রবণতা ও ধারণাকে গ্রহণ করার অর্থ হলো জীবনের যা কিছু মহৎ সুন্দর, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা। আর অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা তাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করারই শামিল।

এই নির্বুদ্ধিতার বিচার বিশ্লেষণ ও যারা এর খপ্পরে পড়েছে তাদেরকে এর অসারতা প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার কোন দায়দায়িত্ব আমাদের নেই। কেননা যে ব্যাপারে আল্লাহর সুস্পষ্ট আদেশ ও নিষেধ ঘোষিত সে ব্যাপারে আর কোন বিতর্কে লিপ্ত হওয়া ও ইতস্তত করার অবকাশ নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন —এটুকুই যথেষ্ট। এরপর এ ব্যাপারে অমান্যকারীর ঔদ্ধত্যকে শায়েস্তা করা, উদাসীনকে সচকিত করা এবং সকল মানুষকে ভারসাম্য ও আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহর বিধানের আওতায় নিয়ে আসার জন্য কঠোর শাস্তিবিধি চালু করাই একমাত্র বিধেয় ও করণীয়।

এবার আমরা এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যাব। আগেই বলেছি যে, লক্ষ্য অবগত হওয়ার পর দাওয়াতদাতার প্রধান কর্তব্য হলো মনকে উজ্জীবিত করা, আল্লাহর দিকে তার অগ্রযাত্রাকে নিরাপদ, সহজ ও বাধামুক্ত করা—এমনভাবে বাধামুক্ত করা যে, অতপর আর তাকে নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার মত কোন পরিস্থিতি দেখা না দিতে পারে। আমরা এও বলেছি যে, সাফল্যের সাথে এ কর্তব্য পালন করার উপায় দু'টো ঃ

১–আল্লাহর আনুগত্যের কথা ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিতে থাকা।

২–সততাপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ পরিবেশ মানুষের আয়ত্বে আসা। সে পরিবেশ এমন হওয়া চাই যে, তাকে অর্থনৈতিক সমস্যা উদ্ভূত দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে রক্ষা করবে, তার জৈব দাবী ও চাহিদাকে মার্জিত পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত করবে এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের স্বপক্ষে সেখানে স্বতস্ফূর্ত জনমত গড়ে ওঠবে ও সাধারণ মনোভাব ও মূল্যবোধ প্রচলিত হবে।

একটি বিকারগ্রস্ত ও দুর্নীতিদুষ্ট সামাজিক পরিবেশে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। অথবা নিদেন পক্ষে একথা বলা যায় যে, তাতে কোন লাভ বা ফায়দা হবে না। গোটা সমাজ যখন দুর্নীতিদুষ্ট ও অপরাধ প্রবণ হয়ে যাবে, তখন সেখানে হরেক রকম মতের হৈহুল্লোড় শুরু হয়ে যাবে। প্রত্যেকে

www.pathagar.com

নিজ নিজ মতকেই শ্রেষ্ঠ মনে করবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়ালখুশী মত চলতে থাকবে এবং তথাকথিত ব্যক্তি স্বাধীনতার ধুয়া তুলে উচ্ছৃংখলতার ও অরাজকতার শেষ সীমান্তে গিয়ে পৌঁছুবে। এ ধরনের পরিবেশে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার দ্বারা লাভটা কি হবে ? দুর্নীতিদুষ্ট পরিবেশ কেবল স্বেচ্ছাচার ও বল্গাহীনতার দিকেই হাতছানি দেয়। এমতাবস্থায় যিনি হক ও সত্যের বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়ার কাজে নিয়োজিত তার হাতে যদি অবাধ্য পাপাসক্তদেরকে পাকড়াও করার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব না থাকে, তাহলে তার সমগ্র কর্মকাণ্ড নিষ্ফল হয়ে যেতে বাধ্য। এ জন্যই সর্বাগ্রে যেটা জরুরী তাহলো, সততাপূর্ণ ও ন্যায়-নীতি বিরাজিত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এ ধরনের সুস্থ ও নির্মল পরিবেশের জন্য যে নীতিমালা ইসলাম দিয়েছে, তার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। এক্ষণে ইসলামের দাওয়াতদাতার কাজ হলো তার ইপ্সিত সেই পরিবেশ গড়ার প্রক্রিয়াটা শুরু করা। তাকে ঃ

প্রথমত, তার পরিবেশে ইপ্সিত নৈতিক মতাদর্শ ঢুকাতে ও তার উপযুক্ত বাস্তব পরিস্থিতি গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সেই পরিবেশে বিরাজমান যা কিছু তার অপছন্দনীয় তাতে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করতে হবে।

তৃতীয়ত, সে যে সত্যের দাওয়াত দেয়, তার বিপরীত যে কোন চিন্তাধারা ও পরিস্থিতিকে সেখান থেকে উৎখাত করতে হবে। এটাই হলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অন্যথায় ওয়ায়েজদের ওয়াজের প্রভাব জনগণের মধ্যে কেবল ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তারা তাদের খানকা বা মসজিদে অবস্থান করেন। যখনই তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যান, অমনি সমাজ জীবনে শয়তান ও তার চেলাচামুণ্ডাদের গড়া গোমরাহী ও অনাচারের এক দুরন্ত সয়লাব তাদের মনমগজের ওপর এসে চড়াও হয়।

সমস্যা সমাধানে নম্রতা অবলম্বনের আবশ্যকতা

জনৈক ইখওয়ানী ভাই প্রশ্ন করেছিলেন ঃ কথাটা তো যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এর বাস্তব রূপ দেয়া সহজ নয়। প্রশ্ন হলো, তার পরিবেশে যে অবস্থা বিরাজমান, তাতে করে কিভাবে সে নম্র আচরণ করবে ? তার সামনে বহু সমস্যা। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান রীতিনীতিকে মহানন্দে মেনে নিয়েছে। সেখানে রয়েছে এক বিমোহিত, প্রবঞ্চিত ও গর্বিত সংস্কৃতি—যা আপনার দাওয়াতকে স্বীকার করে না। সেখানে রয়েছে এমনসব আইন, যাকে চ্যালেঞ্জ করলে আপনার জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। প্রচলিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখায় যাদের অনেক সুবিধা—সেই কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহী গোষ্ঠীও সেখানে

www.pathagar.com

রয়েছে। আপনি তাদেরকে সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবেন জেনেও আপনাকে তারা সাদরে ডেকে নিতে পারে না। এমতাবস্থায় কিভাবে তাদেরকে আপনার দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করবেন ? জবাবে তাঁর সহকর্মী বললেন ঃ উপায় আছে। অত্যন্ত স্পষ্ট পথ। তবে তা বন্ধুর ও দীর্ঘ। সে পথটা হলো এই যে, আপনি মানুষকে নিজের মনোনীত আদর্শের দাওয়াত দিতে থাকবেন এবং তাদের ভ্রান্ত মত ও পথ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে থাকবেন। অতপর কি কি সমস্যা আপনার সামনে আসে তার ওপর নজর রাখবেন। প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করবেন নিজের বিবেকের ফায়সালা ও আল্লাহর তরফ থেকে আসা বিচারবুদ্ধি দ্বারা। আমি আপনার জন্য কোন পরিকল্পনা তৈরী করে দেবো তার অপেক্ষায় থাকবেন না। দাওয়াতাদাতা কোন যন্ত্র নয় যে, অন্যের ইচ্ছামত কোন কিছুর বাস্তবায়ন করবে। তার তো একটা জীবন্ত ও জাগ্রত মন রয়েছে। রসূল (সা) তাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি দিয়েছেন। সে জীবন পদ্ধতিকে কিভাবে কার্যকর করবে, তার বিস্তারিত পথনির্দেশ রসূলের কাছ থেকেই নেবে এবং লোকেরা যাই বলুক না কেন, সে নিজের বিবেকের ফায়সালা অনুসারেই কাজ করবে। মনে রাখবেন, ধৈর্য ও স্থিরতাকে পরিত্যাগ করে তাড়াহুড়োর নীতি যদি অবলম্বন না করেন, তাহলে উক্ত প্রক্রিয়ায় আপনি ইপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবেনই।

নম্রতার নীতির সাফল্যের দৃষ্টান্ত

জেনে রাখবেন, একজন শক্তিমান মু'মিন দাওয়াতকারী পর্বতের শীর্ষ থেকে নেমে আসা পানির ঢলের মত। তার ভেতরে যেমন তার আপনা আপনি সক্রিয় হয়ে ওঠার অদম্য ক্ষমতা রয়েছে, তেমনি তাতে রয়েছে সাধারণ মানুষের কল্যাণের সুপ্ত উপকরণ। তবে সেই ঢল পাহাড়ের উঁচু কিংবা সমতল জায়গাগুলোর দিকে এগুতে ও তা ছিন্নভিন্ন করতে তাড়াহুড়ো করে না। বরং তা উঁচু জায়গাগুলোর চারপাশ দিয়ে ঘুরতে থাকে ও সেগুলোকে ঘেরাও করে। স্রোতের পানি উঁচু জায়গাগুলোর পেছনের দিকে চলে যায় এবং সেগুলোকে পাহাড়ের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এরপর ধীরে ধীরে পানি বাড়তে থাকে ও তার স্তর উঁচু হতে থাকে। ক্রমে পাহাড়ী ঢলের পানি পাহাড়ের কিনারাগুলো ছাপিয়ে উঠতে থাকে এবং এক সময় তার চূড়াগুলোকে ডুবিয়ে দিতে আরম্ভ করে। অবশেষে পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়াও বন্যার পানির কাছে হার মানে।

এ উদাহরণও যদি আপনি বুঝতে না পারেন, তাহলে শুনে রাখুন, আপনার জীবনের ব্রত বা মিশন পাহাড় থেকে নয়। (তারও বহু উর্ধের) আকাশ থেকে নেমে এসেছে। আর এর স্বয়ংক্রীয় ক্ষমতা ও তার সুপ্ত কল্যাণ আপনার

www.pathagar.com

অন্তরের মধ্যেই নিহিত—অন্য কোথাও নয়। নিজের দাওয়াতকে পাহাড়ী ঢলের পানির মত সর্বত্র নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আপনারই। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি দেখেন, প্রচলিত কোন আইন কিংবা কোন আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিত্ব আপনার পথ আগলে দাঁড়িয়ে, তাহলে বানের বেগবান পানির মতই তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যান। তাকে বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার সাথে ডাকুন এবং মিষ্ট ভাষায় নছিহত করুন। কিন্তু তার কাছে থেমে থাকবেন না। থেমে যাওয়াটা মূর্খতা ও স্বাভাবিক নীতির বিরুদ্ধাচরণেরই নামান্তর। আপনি বরং পাহাড়ী ঢলের প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন। তার চারপাশ দিয়ে চক্কর দিতে থাকুন এবং তাকে পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে চলে যান। আশপাশের মানুষকে দাওয়াত দিতে থাকুন, যাতে করে সেই আল্লাহদ্রোহী প্রতিকূল আইন বা শক্তি আশপাশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফায়সালার প্রচণ্ডতা তাকে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে বাধ্য করে কিংবা আল্লাহর গায়েবী সাহায্য তাকে দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য ও বিলীন করে দেয়। এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, একমাত্র দাওয়াতদাতার সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতাই আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিভাবে ও কেন, সে কথা বিশ্লেষণে আমরা অপারগ। তবে দাওয়াতের বহিরাঙ্গনে যে আলামতগুলো এই সহজাত প্রবণতার সাফল্য ও তার খোদায়ী সাহায্যপ্রাপ্তির ইংগীত দেয় এবং যেই মনস্তাত্ত্বিক গুণ ও বৈশিষ্টগুলো দাওয়াতকারীর ব্যক্তি সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়, তার কতকগুলোর উল্লেখ করা এখানে আমি অপরিহার্য মনে করি।

বাহ্যিক পরিমণ্ডলে দাওয়াতের সাফল্যের শর্তাবলী

১–আন্দোলন

আমরা আগেই বলেছি যে, বাস্তবায়নের সহজাত প্রবণতা এমন একটা প্রবল ও প্রচণ্ড শক্তিধর উপাদান—যার অমিত তেজা শক্তি কোন সীমা বা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না।

এ উপাদানটার একটা বড় গুণ এই যে, এটা যার মধ্যে বিরাজ করে তাকে সে একটা সদা তৎপর অপ্রতিহত আন্দোলনী শক্তিতে রূপান্তরিত করে ছাড়ে। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দাওয়াত থেকে বিরত হতে দেয় না এবং কোন অবস্থাতেই তাকে নিষ্ক্রিয় হতে দেয় না। এক্ষুণি সে একজনের সাথে দাওয়াতী সাক্ষাত সেরেছে তো এক্ষুণি সে আবার নতুন আর একজনকে দাওয়াত দিতে শুরু করেছে। আবার পর মুহূর্তেই তৃতীয় একজনের সাথে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। কখনো সে ক্লাবে ক্লাবে, মজলিশে মজলিশে ঘুরছে, আবার কখনো সে নিজেই বিরাট অনুষ্ঠান বা ভোজসভার আয়োজন করে ফেলছে। যাকেই

www.pathagar.com

সামনে পায় তাকেই সে ইসলামের দু' কথা শুনায়। আর যদি কোন সময় কখনো কোন উৎসব উপলক্ষে জনসমাবেশ ঘটতে দেখে তাহলে সে তাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের সাথে নিঃসংকোচে দেখা করে ও দাওয়াত পেশ করে। দাওয়াত যার জীবনের ব্রত, সে কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ায় না। শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে—সর্বত্র সে ঘুরতে থাকে। একটুও বিশ্রাম নেয় না। পরিশ্রমেই তার বিশ্রাম এবং দাওয়াতেই তার সুখ। প্রচণ্ড আল্লাহমুখী ভাবাবেগ বা হৃদয়ে বিরাজমান সুপ্ত সেই খোদায়ী উপাদান ছাড়া কি কারো পক্ষে এতটা সক্রিয় ও তৎপর হওয়া সম্ভব মনে করেন ?

কেউ বলতে পারবে না যে, আমার মধ্যে এ ধরনের আবেগ ও অনুভূতি নেই। কেননা কল্যাণের আকাংখী মাত্রেরই শক্তি সঞ্চয় করা, নিজের মধ্যে নবোত্থানের জাগরণ সৃষ্টি করা, সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া, ব্যাপক তৎপরতার মাধ্যমে নিজের মধ্যে উজ্জীবনী আগুন প্রজ্জ্বলিত করা এবং নিজের মনকে আলোড়িত করার ক্ষমতা রয়েছে। আর প্রত্যেক উত্থান প্রচেষ্টা নবতর উত্থানের শক্তি জন্মায়। আর প্রত্যেক উদ্যম ও উচ্চাকাঙক্ষা আল্লাহর ইচ্ছায় অধিকতর উদ্যম ও উচ্চাকাঙক্ষায় উন্নীত হয়। কিন্তু যেসব দাওয়াতকারী নিষ্ক্রিয় ও নিস্তব্ধ মজলিশগুলোতে এবং নিশ্চল আসনগুলোতে বসে বসে কেবল ঠোঁট নেড়ে দায়সারা নছিহত খয়রাত করেই ক্ষ্যান্ত থাকতে চান এবং এর চেয়ে কোন কষ্টকর তৎপরতায় জড়িত হতে চান না, তাদের জন্য আমরা শুধু এই দোয়াই করতে পারি যে, আল্লাহ যেন তাদেরকে উত্তম পথনির্দেশ দিয়ে জাগিয়ে তোলেন এবং যে গুনাহর মধ্যে তারা নিমজ্জিত আছেন তাথেকে তাদেরকে উদ্ধার করেন।

২–দাওয়াতী কর্মসূচী নিয়ে মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ করা

দাওয়াতের প্রাথমিক সাফল্য এই যে, দাওয়াতকারী তার দাওয়াতী কর্মসূচী নিয়ে মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করবেন। কেননা কথা বলতে পারলেই দাওয়াতকারী হওয়া যায় না এবং ঘনঘন যাওয়া-আসা ও ঘুরাফেরা করলেই দাওয়াতের সাফল্য আসে না। মানুষের জীবনের গভীরতম প্রদেশে দাওয়াতকে নিয়ে যেতে পারাটাই যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ সাফল্য। যে আদর্শের প্রতি দাওয়াত দেয়া, তা জনগণের হৃদয়ের গভীরে এবং স্নায়ুমণ্ডলীতে ঢুকিয়ে দিতে পারাতেই দাওয়াতের স্বার্থকতা। তাদের জীবনের বহিরাঙ্গনে নিছক একটা লেজুড়ের মত অবস্থান করাতে কোন স্বার্থকতা নেই। আপনার দাওয়াতকে সমাজের একটা জ্বলজ্যান্ত উত্তপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করবেন—যেন তা নিয়ে তাদের আলোচনা মজলিশ সরগরম থাকে। বন্ধুবান্ধবের সাথে বৈঠকাদিতে এবং

www.pathagar.com

নিজেদের বাড়ীতে পরিবার-পরিজনের সাথে সর্বদা যেন তাই নিয়েই আলোচনা মুখর থাকে। বিষয়টা নিয়ে একটু ভালো করে ভাবুন। একটা সভার আয়োজন করলেই কিংবা একটা বক্তৃতা ঝেড়ে দিলেই দাওয়াতের সাফল্য সূচিত হয়ে যায় না। গ্রাম থেকে গ্রামে এবং শহর থেকে শহরে সফর করলেই দাওয়াত স্বার্থক হয় না। দাওয়াতের সাফল্য তখনই আসবে, যখন এই দাওয়াতই হবে সমসাময়িক সমাজের সবচেয়ে আলোচিত, সবচেয়ে আলোড়ন ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী বিষয়। পথে ঘাটে এক বন্ধু আরেক বন্ধুর দেখা পেলেই এই বিষয় নিয়ে তার সাথে কথা বলবে এবং এটাই হবে তাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। যে কোন আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হবে এই দাওয়াত ঠিক যেমন দেশের জন-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে তারা সবসময় চিন্তা-ভাবনায় বিভোর থাকে।

দাওয়াতকে জনগণের মন-মগজের প্রধান বিবেচ্য ও চিন্তা-ভাবনার প্রধান আকর্ষণ বানানোর এটাই মর্মার্থ। এভাবেই তাকে গণমুখী ও সার্বজনীন বানাতে হয়। এটা জরুরী নয় যে, এই দাওয়াত সমাজে রাতারাতি ব্যাপক প্রশংসা, সমর্থন ও জনপ্রিয়তা লাভ করবে। জরুরী শুধু এতটুকু যে, লোকেরা যেন যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে তা নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করে। যখন দেখবেন, সমাজে অনেকে আপনার দাওয়াতের সমর্থক এবং অনেকে বিরোধী হয়ে গেছে, কেউবা প্রবল বিরোধিতা করছে এবং কেউবা জোরদার সমর্থন দিচ্ছে, তখনই বুঝবেন, দাওয়াত তার যথার্থ সাফল্যের স্তরে পৌঁছে গেছে। মক্কার অধিবাসীদের অতি অল্পসংখ্যক লোকই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে গ্রহণ করেছিল এবং বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ তাকে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু মক্কার সমাজ জীবনের সর্বত্র এ দাওয়াতই ছিল একমাত্র চলতি আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয়। মু'মিন ও অমু'মিন নির্বিশেষে সকলেরই চিন্তা-ভাবনা ছিল এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রভূত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের একটি মুহূর্তও দাওয়াত থেকে নিবৃত থাকতেন না। আর মক্কাবাসীদের এমন একটা মুহূর্ত কাটতো না যখন এ নিয়ে তারা—সমর্থনে কিংবা বিরোধিতায় মুখর থাকতো না। মু'মিনদের ওপর অনবরতই নির্যাতন ও নিপীড়ন চলতো। নিপীড়ন চলতো কথার, হাতের, বেত্রাঘাতের, আগুনে দগ্ধ করার এবং বর্শা ও বল্লমের আঘাতের। আবার ইসলাম পরিত্যাগ করলে বিপুল পারিতোষিকের প্রলোভনও দেয়া হতো দেদার হস্তে। প্রলোভন দেয়া হতো নগদ টাকার, ক্ষমতা ও প্রতাপ লাভের, কিংবা সুন্দরী সম্ভ্রান্ত নারীর পানি গ্রহণের অথবা অনুরূপ আরো কত কিছুর। মা-বাবারা নতুন আদর্শে দীক্ষিত তাদের ছেলেমেয়েকে সর্ব প্রকারের আদর সোহাগ দিয়ে এবং সবরকমের ফন্দিফিকির দিয়ে তাদের প্রাচীন ধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাতো। প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঢুকছিল বিতর্ক, ঝগড়া, কলহ ও রেষারেষী।

www.pathagar.com

ভিন্নমত ও ভিন্ন রুচি আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়ের বিচ্ছেদ, বন্ধুর সাথে বন্ধুর বিভেদ ঘটিয়ে চলছিল ক্রমাগতভাবে। এসব সত্ত্বেও দাওয়াত যথার্থ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একনিষ্ঠভাবে ও অবিচলিতভাবে দাওয়াত পৌছানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কঠিন পরিশ্রম ও অব্যাহত সাধনার দ্বারা তিনি তার দাওয়াতকে মানব জীবনের গভীরতম ও নিভৃততম এলাকাতেও ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। দাওয়াতকে তিনি জীবনের একটা নিষ্ক্রিয় লেজুড় করে রেখে দেননি।

সত্যের দাওয়াত সফল হওয়ার জন্য তার মানব জীবনের গভীরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হওয়াই যথেষ্ট। মানুষের মন-মগজে ও ভাবাবেগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়াই তার স্বার্থকতা—চাই ঢুকে যাওয়ার পর তার প্রতি জনতার শত্রুতা বা বন্ধুত্ব—যাই সৃষ্টি হোক না কেন। আমরা একথা এজন্য বলছি না যে, আপনি এখন থেকেই মানুষের শত্রু হয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যাবেন আর তাদেরকে আপনার বিরুদ্ধবাদী বানিয়ে ফেলবেন এবং একে আপনার সাফল্যের লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করবেন। আপনাকে অবশ্যই বিচক্ষণ ও কুশলী হতে হবে এবং উপদেশ দানে মিষ্টভাষী হতে হবে। আপনার দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতির ত্রুটির জন্য এবং ব্যবহারের দোষে যেন কেউ শত্রু হয়ে না যায়, সে ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক হবেন। যারা আপনার বিরোধী হবে তাদেরকে আপনার দাওয়াতের মূল বক্তব্যের বিরোধী হতে দিন। সে ক্ষেত্রে তারা আপনার নয় —সত্যের বিরোধী, আল্লাহর দ্বীনের দুশমন। শত্রু ও বন্ধু সকলের মন-মগজে প্রবেশ করার চেয়ে বেশী কোন আকাংখা বা দাবী সত্যের নেই। কেননা সত্যকে জানা ও চেনার পরেই তারা সত্যের দুশমন হয়ে যাবে। সত্যকে তারা শুধু এজন্যই অস্বীকার করে যে, তা তাদের অবৈধভাবে প্রাপ্ত পদমর্যাদা ও কায়েমী সুযোগ সুবিধা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে। অনুরূপ অন্যান্য সাময়িক বিচার-বিবেচনা ও প্রবৃত্তির ভোগ-বাসনার তাগিদেই তারা এরূপ বিরুদ্ধবাদী অবস্থান গ্রহণ করে থাকে। বস্তুত সাময়িক চাহিদা ও তাড়নার কারণেই তারা সত্যকে অগ্রাহ্য করে। যখন পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হবে এবং এই সমস্ত সাময়িক চাহিদার বিলোপ ঘটবে, তখন শত্রু রূপে বিবেচিত ঐ সত্য ছাড়া আর কিছুই হৃদয়ে স্থান পাবে না। সত্য তখন অনায়াসে পরম মিত্রে পরিণত হবে।

পক্ষান্তরে দাওয়াতকে সমাজের নিছক লেজুড়ে পরিণত করার জন্য যে চেষ্টা চলে, সেটা নির্জীব তামাশাকারী কিংবা প্রদর্শনেচ্ছুদের চেষ্টা মাত্র। তারা যেমন আত্মবিশ্বাসহীন, তেমনি আপন দাওয়াত ও আদর্শের প্রতিও আস্থাহীন। যে দাওয়াত খোদ দাওয়াতদাতার মন-মগজ ও আস্থাকে আয়ত্বে আনতে পারলো না, সে দাওয়াতে অন্য লোকদের অনুপ্রাণিত হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

www.pathagar.com

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আমাদের একমাত্র অনুকরণীয় নুমনা হওয়া চাই খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দাওয়াতকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে থাকুন এবং তার জন্য নিজেকে আপন কর্মক্ষেত্রের গ্রাম-শহর কিংবা জাতির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত করুন। সকল মজলিশে ও সকল আলোচনা সভায় ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপন করুন। এর জন্য উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকুন। প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত অনৈসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষ থেকে জনগণ প্রতিনিয়ত যে জুলুম, নির্যাতন ও আপদ-বিপদের শিকার হচ্ছে, তার বিবরণ দিয়ে সত্যের দাওয়াত পেশ করুন। কেবল বেহেশত ও দোযখের বিবরণের মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। কেয়ামত, হিসাব-নিকাশ, মন ও দেহ নিয়েই শুধু কথা বলবেন না। সমাজে প্রচলিত বিকার ও অনিয়ম-তান্ত্রিকতা, মাত্রাতিরিক্ত লোভ-লালসার কুফল, নৈতিক উচ্ছৃংখলতা এবং তাগুত ও যুলুম-নিপীড়নের শিকার জনগণ সম্পর্কে যে আলোচনা রাখবেন, সে আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে কেয়ামত ও বেহেশত দোযখ ইত্যাদির বর্ণনাকে ছড়িয়ে দেবেন। বক্তৃতা, বিবৃতি, আলোচনা ও সফরের পাশাপাশি লেখনীর সদ্ব্যবহার করতেও ভুলবেন না—যাতে এসব চেষ্টার সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসেবে জনমনে আপনার দাওয়াত জাগ্রত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এতে আপনার তৎপরতা দেখে কেউ খুশী হবে, কেউ বা ভীতসন্ত্রস্ত হবে। কিন্তু একথা সত্য যে, আপনার উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে সকলে সবসময় আপনাকে নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হবে।

সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতার এটা একটা নিগূঢ় রহস্য। দাওয়াতকারীর মধ্যে এ মহান গুণটা থাকলে সে দাওয়াতের ব্যাপারে চরম ও পরম নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে। একে কোন অবস্থাতেই হেলার যোগ্য মনে করে না। সে নির্ভিক হয়, বাস্তববাদী হয় এবং অবাস্তব কল্পনা বিলাস পরিহার করে। মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়। সমাজে সে এমন এক সূরের মূর্ছনা ছড়ায়, যার প্রভাবে কেউ ভীত, কেউ আশাবাদী, কেউ খুশী, কেউ নাখোশ, কেউ কর্মতৎপর এবং কেউ নিষ্ক্রিয় হয়। বস্তুত এভাবে আল্লাহপ্রদত্ত এই মহান বাণী ও ব্রতকে সে যদি মানুষের মনমগজে ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বত্র বিস্তৃত না করে, তাহলে সে যে এই আদর্শ দিয়ে সমগ্র মানবজীবনকে উদ্ধার করে সজিবতার দিকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত, সে কথার আর স্বার্থকতা কি থাকে ?

৩—সংগঠন ও সংঘবদ্ধ করণ

যার সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতা পরিপক্কতা লাভ করেছে, সে তৃতীয় একটি বিষয়ের দিকে অনিবার্যভাবে মনোযোগী হয়। সেটা হলো সংগঠিত করা ও সংঘবদ্ধ করা। অর্থাৎ যারা দাওয়াতকে গ্রহণ করে তার সমর্থক ও সহযোগী

www.pathagar.com

হবার জন্য এগিয়ে আসবে তাদেরকে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করা। এটা শুধু তার বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনা বা আদর্শিক ইজতিহাদ প্রসূত ব্যাপার নয়। বরং এটা তার মনের এক অস্থির আকুতি ও সুতীব্র উদ্বেগের অনুভূতি যার দরুন সে সমর্থকদেরকে জীবনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সংগঠনহীন ও শৃংখলাহীনভাবে বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

দাওয়াতকারীকে সংগঠন ও সংঘবদ্ধকরণে অনুপ্রাণিতকারী এই যে অনুভূতি ও উদ্বেগের কথা বললাম, এর উপাদানগুলোর দার্শনিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই। অনুরূপভাবে সমমনা ও সমমতাবলম্বী লোকেরা যখন একটি নির্দিষ্ট আদর্শ বা মতবাদের জন্য কাজ করতে সংঘবদ্ধ হয় তথা জামায়াত গঠন করে, তখন সে জামায়াতের গুণ-বৈশিষ্ট কি রকম হয়, সে সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করতে চাই না। আর মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে সংঘবদ্ধ করার জন্য ইসলাম যে রকমারি ইবাদাতের বিধান দিয়েছে, সেগুলোর ফিরিস্তিও আমরা দিতে চাই না। আমরা শুধু নীতিগতভাবে একথাটা বলতে চাই যে, সংঘবদ্ধ করণের আগ্রহ বাদ দিয়ে অথবা কার্যত সংঘবদ্ধ করণের প্রক্রিয়া শুরুর প্রস্তুতি না নিয়ে শুধুমাত্র প্রচারের যে চেষ্টা করা হয়, তা একটা অবাস্তব ও কেতাবী চেষ্টা মাত্র। সে চেষ্টা অচিরেই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে এই বিষয়ের দিকেই ইংগীত করা হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কাউকে কোন বড় বা ছোট বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে যেসব নছিহত করতেন তার মধ্যে এটাও থাকতো ঃ মুশরিকদের মধ্য থেকে কোন শত্রুর সম্মুখীন হলে তাকে তিনটে জিনিসের দাওয়াত দিও। এর মধ্যে কোন একটিও যদি সে মেনে নেয় তবে তা গ্রহণ করবে এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বিরত থাকবে। প্রথমত, তাকে ইসলামের দিকে ডাকবে। যদি মেনে নেয় তবে তাকে গ্রহণ করবে এবং অস্ত্র প্রয়োগে বিরত থাকবে অতপর তাকে নিজ বাসভূমি থেকে মোহাজেরদের বাসভূমিতে স্থানান্তরিত হবার আহবান জানাবে। তাদেরকে বলবে যে, তারা যদি স্থানান্তরিত এ আহবান মেনে নেয় তাহলে মোহাজেরদের সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষয়ক্ষতিতে তারা সমান অংশীদার হবে।"

এখানে স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম গ্রহণকারীকে মোহাজেরদের বাসভূমি মদিনায় স্থানান্তরের আহবান জানানোকে কতখানি গুরুত্ব দিতেন। এর কারণ কি ?

এ ব্যাপারে আপনার চিন্তা-ভাবনা করা উচিত এবং এই সংঘবদ্ধ করণের বাস্তব গুণ-বৈশিষ্ট খুঁজে বের করা উচিত। অনুসন্ধান করা উচিত যে,

www.pathagar.com

মু'মিনদেরকে এভাবে দাওয়াতের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্রে জমায়েত করার হেতুটা কি? তাই বলে আমরা একথা বলছি না যে, আধুনিক যুগে একজন দাওয়াতকারী তাঁর দাওয়াতের সমর্থক ও সহযোগীদেরকে তাদের নিজ নিজ গ্রাম ও শহর থেকে সরিয়ে এনে নিজের চারপাশে সমবেত করবেন। আমরা শুধু একথাই বলতে চাই যে, রসূল (সা) কত নিখুঁতভাবে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করতে চাইতেন, তা ভেবে দেখার মত। আজকের যুগের কোন দাওয়াতকারী ও তার সহযোগীরা যদি হুবহু এই প্রক্রিয়ায় সংঘবদ্ধ হতে ইচ্ছুক হন, তাহলে তা অবশ্যই হওয়া উচিত। কেননা এটাই রসূল (সা)-এর অনুসৃত রীতি ও প্রক্রিয়া। অন্যথায় এ যুগে ডাক, তার, স্থল ও আকাশ পথে যোগাযোগের যেসব সুবিধে বিদ্যমান, সে সব সুবিধের সদ্ব্যবহার করে খোদ দাওয়াতকারী তার সমর্থকদের আবাসস্থলে সশরীরে পৌঁছে কিংবা নিজের মতামত ও নির্দেশাবলী পাঠিয়ে এমনভাবে সংঘবদ্ধ করণের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন যে, সর্বত্রই তার নেতৃত্বের সঠিক প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল থাকবে এবং সে দল তারই নির্দেশে বেপরোয়াভাবে কাজ করবে।

রসূল (সা) তাঁর নিকট সমবেত হতে ও তাঁর কাছে হিজরত করতে অক্ষম লোকদেরকে নিজ নিজ আবাসস্থলে থাকবার অনুমতি দিতেন এবং তাদের কাছে নিজের প্রতিনিধি পাঠিয়ে দাওয়াতের সম্প্রসারণ ও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব সম্পাদনের ব্যবস্থা করতেন।

নিকট অতীতে একটি ইসলামী সংস্কারমূলক দাওয়াতের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেটি ছিল প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তাদের শক্তিতে বলীয়ান একটি মজবুত আন্দোলন। কিন্তু আজ সে আন্দোলন এবং তার চিহ্নও আর পরিদৃষ্ট হয় না। আমাদের যুগের কাছাকাছি এ আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদেরকে বর্তমান বংশধরেরা পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করে থাকে। তাদেরকে উস্তাদ, ইমাম ও নেতা মানে। কিন্তু সে দাওয়াতের কি ফল হয়েছে? ঐ আন্দোলনের নেতাদের জ্ঞান ও প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। উভয় দিক দিয়েই তারা ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু সাংগঠনিকতা ও সংঘবদ্ধতার গুরুত্ব তারা উপলব্ধি করেননি। এলাকায় এলাকায় প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন গড়ে তোলার আবশ্যকতা তারা বোঝেননি—যা শহর ও গ্রামে দাওয়াতের প্রসার ঘটাতে পারতো।

বহু বিচারপতি, আইনজীবী, বড় বড় সরকারী কর্মচারী, লেখক, বুদ্ধিজীবী, ধনিক এবং এমনকি ক্ষমতাসীনদেরও অনেকে সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল মূলত একটি সমাবেশ—সংগঠন নয়। সর্বোপরি তা ছিল সমর্থকদের এমন একটি সমাবেশ ওস্তাদের গুণমুগ্ধ ছাত্রদের উপস্থিতিই ছিল

www.pathagar.com

যার প্রধান বৈশিষ্ট। সেখানে সমর্থকরা অধিনায়কের নির্দেশে উঠাবসা করা সৈনিক ছিল না। সমর্থকরা ছিল উস্তাদের জ্ঞান ও প্রতিভায় মোহিত, তার ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা প্রভাবিত অথবা ইমামের পদমর্যাদার গুণ-গরিমায় উদ্দীপিত। সত্যিকার সংস্কারবাদী মন্ত্রে দীক্ষিতদের সংখ্যা ছিল সেখানে নিতান্তই অল্প। সে আন্দোলনের আহবায়করা কেবল সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দীপনা জাগাতে প্রবলভাবে সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু দেশের সর্বত্র সেই উচ্চকণ্ঠ সংস্কার প্রচেষ্টাকে সাংগঠনিক রূপ দিতে চেষ্টা করেননি।[১]

সেই অসাধারণ মনীষীদের দাওয়াতী প্রচেষ্টা যেটুকু অগ্রগতি লাভ করেছিল, তার চেয়ে বেশী অগ্রগতি লাভ না করার কারণ যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, তাদের অসাধারণ মনীষা ও আল্লাহর প্রতি অবিচল ভক্তি থাকা সত্ত্বেও দাওয়াতী তৎপরতার ক্ষেত্রে তার একটা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছিলেন—প্রজ্ঞাজাত প্রক্রিয়া অবলম্বন করে নয়। তারা হৃদয়ের পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তির ফসলের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতেন। মানুষের মন-মগজকে সক্রিয় ও সচকিত করার প্রতি তারা যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন তবে তা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও আধুনিক নিবন্ধাদির মাধ্যমে—ঈমানী বৈশিষ্টগুলোকে জাগ্রত করার মাধ্যমে নয়। আধুনিক মানুষের নবোত্থান সম্পর্কে তাদের খুবই ভালো ধারণা ছিল। আর সেই নবোত্থানই তাদের আধ্যাত্মিক জাগরণ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মোটকথা, দেশটি একটি নির্জীব ও নিস্তব্ধ দেহে পরিণত হয়েছিল। অতপর তাদের চেষ্টায় তার মস্তিষ্কে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হলো। ফলে বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হলো এবং জিহ্বা কথা বলতে শুরু করলো। কিন্তু হৃদয়ে স্পন্দন এল না, দেহে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা বহাল হলো না। আমরা ইচ্ছা করলে বলতে পারি যে, তারা দেশের সকল এলাকায় যাননি এবং আগে যেভাবে বলেছি—সেভাবে নিজেদের দাওয়াতকে জনজীবনের গভীরে নিয়ে যেতে পারেননি। জনতার সমুদ্রের তলদেশে জাতীয় শক্তির যে অমূল্য রত্ন লুকিয়ে আছে, তার সন্ধানে তারা নামেননি। বরং সমুদ্রের ওপর দিয়েই ভেসে বেড়িয়েছেন এবং ভালো মন্দ যা হাতের কাছে পেয়েছেন তাই সংগ্রহ করেছেন।

আমরা এর অন্য ব্যাখ্যাও দিতে পারতাম। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর আমাদের ইচ্ছা নেই। আমরা শুধু এই সিদ্ধান্তটিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যে, ইসলামী দাওয়াতের গ্রহীতা ও সমর্থকদের সংঘবদ্ধ করা এক অপরিহার্য কর্তব্য। এটা হবে আপনার দাওয়াতী প্রচেষ্টার অর্জিত ফসলকে ধরে

১. সমর্থকদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা যে তারা কিছু না কিছু করেছিলেন সে কথা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু যখনই এ ক্ষেত্রে বাঁধাবিপত্তি আসতে লাগলো, অমনি তারা সে চেষ্টা ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

রাখার বাস্তব পদক্ষেপ। সংঘবদ্ধ করার কাজটা যদি না হয় তাহলে আপনার অবস্থা হবে সেই মৎস্য শিকারীর মত, যে প্রথমে পানিতে জাল ফেললো, অতপর হাতে জালের যে রশী ছিল তাও ছুড়ে ফেলে দিল এবং জালকে পানিতেই ফেলে রাখলো যাতে মাছ তার মধ্যে অবাধে আসা-যাওয়া করতে পারে। আমাদের এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে হাদীসে দলীল রয়েছে। ঐ আন্দোলনের মহান নেতৃবৃন্দের আন্দোলন থেকে সরে যাওয়ার কারণে তাদের দাওয়াতের যে পরিণতি হয়েছিল, সে পরিণতির মধ্য দিয়েও আমাদের এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত। যে লোকগুলো তাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিল সংঘবদ্ধ করণের অভাবে তারাও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা হয়েছিলেন সৈন্যহীন সেনাপতি আর জনগণ হয়ে পড়েছিল সেনাপতিহীন সৈন্য।

সংঘবদ্ধ করণের মূলনীতি

সংঘবদ্ধতা প্রসঙ্গে একটা কথা বলা খুবই জরুরী। তা হচ্ছে এই যে, ইসলামের দাওয়াত বা আন্দোলন যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাদের ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা বা শারীরিক শক্তির বলে জয় লাভ করে না—জয় লাভ করে শুধু তাদের হৃদয়ের শক্তির বলে। আপনার দাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে কেউ যদি আপনার কাছে এগিয়ে আসে, তাহলে সে ধনী না গরীব, প্রতাপশালী না সাধারণ মানুষ, তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। তার মনটা পাওয়াই আপনার জন্য যথেষ্ট। কেননা দাওয়াত হলো একটা মহাকল্যাণময় বীজ—যার অংকুরোদগম হয় শুধুমাত্র ঈমানদার অন্তরে। বাহ্যিক জৌলুস বা উচ্চ শিক্ষাগত বা অন্য কোন ধরনের ডিগ্রী যেন আমাদেরকে প্রতারিত না করতে পারে, সে ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। কোন ব্যক্তি সম্পর্কেই উদাসীনতা প্রদর্শন করবেন না—চাই সে যত নগণ্য মানের লোকই মনে হোক না কেন। কেননা প্রতিটি ব্যক্তিরই কিছু না কিছু গুণ-বৈশিষ্ট থাকে। আল্লাহ এমন অবিচারক নন যে, যে কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন রকমের উঁচু মানের যোগ্যতা ও প্রতিভা না দিয়েই সৃষ্টি করবেন। এই প্রতিভা ও যোগ্যতার সন্ধান পাওয়া এবং তাকে উত্তমরূপে কাজে লাগানোই হলো আসল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ ধরনের লোকদের কারো কারো মধ্যে অভিনব ও ব্যতিক্রমধর্মী কোন সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকাও বিচিত্র নয়। তাই আপনার চারধারে যাকেই পান, তাকেই কোন না কোন কাজ দিন। যে বিষয়ে যার ঝোঁক ও আগ্রহ আছে, সেই বিষয়েই তাকে নিয়োজিত করুন —যাতে করে সে অনুভব করতে পারে যে, আন্দোলনটা তো তারই নিজস্ব জিনিস এবং সে এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার প্রতিটি প্রতিভাকে কাজে লাগান।

অন্য যে কথাটা আপনাকে বলতে চাই তা এই যে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি সংগঠনে ভর্তি করুন—যার বাহ্যিক হাবভাব দেখে মনে হবে যে, সে আপনার

www.pathagar.com

সাথে কাজ করতে প্রস্তুত এবং আল্লাহর বিধানের ওপর সে অবিচল থাকবে। নিজের তরফ থেকে তাকে পাপাসক্ত লোক মনে করে কোন অবস্থাতেই অগ্রাহ্য করবেন না। কেননা আপনি তো আর তার মন চিরে দেখেননি। অতীতে সে কেমন ছিল, তার ভিত্তিতে কোন ধারণায় উপনীত হবেন না। এমনও তো হতে পারে যে, সে চূড়ান্ত তওবা করেছে—যা শুধু আল্লাহ্ এবং স্বয়ং সে ছাড়া আর কেউ জানে না। আপনার কাজ শুধু এতটুকু যে, প্রতিনিয়ত উপদেশ ও নছিহত দ্বারা তাকে সততার প্রতি কৃতসংকল্প করে তুলুন। রসূলের (সা) শিক্ষাকে সে নিজের ও অন্যদের জীবনে কার্যকর করতে মোটেই শৈথিল্য না করে, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। এ ছাড়া সবরকমের শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভাকে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করা এবং সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন যেন দু'টো মৌলিক উপাদানের প্রাধান্য বজায় থাকে ঃ

প্রথমত ঃ শৃংখলা

আইন ও নেতার আনুগত্য হলো শৃংখলা রক্ষার জন্য সবচেয়ে জরুরী জিনিস। প্রত্যেকে যদি নিজের বিবেক-বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যা মনে চায় তাই করতে থাকে, যা তার করণীয় নয় তাতে নাকগলায় এবং যে ব্যাপারে তার কোন বিশেষ দক্ষতা ও দায়িত্ব নেই, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় ও কাজ করে, তাহলে তাকে নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আর এ ধরনের নৈরাজ্য যে কোন সংগঠনকে ভেঙ্গে দিতে ও তার বিলোপ ঘটাতে সক্ষম। শৃংখলার সবচেয়ে ভালো আলামত হলো, যে কোন নির্দেশকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ ও তার নিঃসংকোচ আনুগত্য। এই আনুগত্যের বৈশিষ্ট কি কি, প্রত্যেক সংগঠনে তার অবদান ও প্রভাব কি রকম এবং কুরআন ও হাদীসে তার স্বপক্ষে কি কি বক্তব্য আছে, তা নিয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই না। তবে একথা বলা দরকার মনে করি যে, আনুগত্য কখনো কারো সম্মান ও মান-মর্যাদার হানি ঘটায় না। এ ব্যাপারে সকলকে সাবধান হতে হবে। একথা জানা দরকার যে, এটা সংগঠন বা জামায়াতকে ছিন্নভিন্ন করার ব্যাপারে শয়তানের একটা অন্যতম প্রবেশদ্বার। আমরা সবাই একমাত্র আল্লাহর জন্যই কাজ করি। যারা কাজ করে তাদের পদমর্যাদা আল্লাহ্ দেখেন না এবং সে অনুপাতে কাজের মূল্যায়ণও করেন না। মূল্যায়ণ করেন শুধু তাদের নিয়ত অনুসারে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যের নিষ্ঠা অনুপাতে। অনেক সময় আল্লাহ্ সবচেয়ে পেছনের সারির লোকের আমল কবুল করেন—অথচ সেই একই আমল নেতৃস্থানীয় লোকের কাছ থেকেও কুবল করেন না। আল্লাহ্ নেতার আনুগত্যকে শরীয়াতের বিধান হিসেবে প্রবর্তন করেছেন এজন্যই—যাতে করে সাংগঠনিক শৃংখলা গড়ে ওঠে, তার ভিত্তিতে মু'মিনরা সংঘবদ্ধ হতে পারে এবং তাদের আমল আল্লাহর নিকট পৌছে। এই সাংগঠনিক শৃংখলার যেটুকুই আমরা কার্যকর করতে পারি,

www.pathagar.com

সেটুকু কার্যকর করা গোটা জামায়াত বা সংগঠনেরই দায়িত্ব। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আনুগত্যকে আমরা কেবল আদর্শ হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়েই পসন্দ করবো। বরং সবকিছুর আগে তার ভাবাবেগগতভাবে পছন্দ করতে হবে এবং আমাদের সকল কার্যকলাপ এর কল্যাণময় ফলাফলের সত্যাসত্য নিরূপণকারী ও বাস্তব রূপদানকারী হওয়া চাই। সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সুশৃংখল স্বল্প সংখ্যক লোকের সংগঠন বিশৃংখলাপূর্ণ বিপুল সংখ্যক লোকের সংগঠনের চেয়ে উত্তম। একটা সংঘের প্রত্যেক সদস্য অন্য সদস্য থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং মনে করবে যে, সে একাই পূর্ণ সত্যের ওপর বহাল আছে, এমন সংঘের চেয়ে সেই সংগঠন ঢের ভাল, যার সকল সদস্য পূর্ণ ঐক্য ও সংহতি সহকারে সত্য ও কল্যাণের কিছু অংশ বাস্তবায়িত করতে পারে। সুতরাং আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো আনুগত্যের সুফল নিশ্চিত করা। এরপর আমরা দেখবো নেতৃত্বের কি অবস্থা। যদি আমাদের কাছে মনে হয় যে, নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তির বংশ মর্যাদা ও পদমর্যাদা বা অনুরূপ অন্যান্য দিক তেমন আকর্ষণীয় নয়, তাহলে আমাদের এরূপ মনোভাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইতে হবে এবং এসব ধ্যান-ধারণাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। আর যদি দেখতে পাই যে, তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব আছে, অসততা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভ্যাস আছে, কাজ-কর্মে অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্য আছে, অথবা ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী অনুসারে কাজ করার প্রবণতা আছে, তাহলে ব্যাপারটাকে একটা ব্যাধি ধরে নিয়ে বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার সাথে তার চিকিৎসা করতে হবে। এ ক্ষেত্রের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এই যে, গোটা সংগঠন যাতে বিপন্ন ও সংকটাপন্ন না হয়, সে ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যথায় চিকিৎসা যদি সংগঠনের ভাঙ্গনের হুমকি সৃষ্টি করে তাহলে এ ধরনের চিকিৎসা বন্ধ রাখতে হবে। সে অবস্থায় চিকিৎসা চালু রাখাই হবে অপরাধ।

দ্বিতীয়ত ঃ পর্যাপ্ত সৌভ্রাতৃত্ব

একাত্ম ও ঐক্যবদ্ধ ভাইদের মধ্যে যে সৌভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান থাকে, ইসলামী সংগঠনগুলোতেও তা বজায় থাকা অত্যন্ত জরুরী। এই সৌভ্রাতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো, সাম্য, সম্প্রীতি ও মমত্ববোধ এবং সুখে ও দুঃখে ন্যায় ও কল্যাণের কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা।

যখন দেখবেন, ভাই ভাই হিসেবে সমবেত হয়েও দলের লোকদের মধ্যে ভালোবাসা ও প্রীতির সম্পর্ক নেই, তাহলে বুঝতে হবে যে, তাদের সম্পর্ক নষ্ট করার মত কিছু একটা আপদ তাদের ওপর এসেছে। আর যখন দেখবেন, তাদের একজন আর একজনের কাছে নিজের সামাজিক মর্যাদার বড়াই করছে, কিংবা সম্পদের প্রাচুর্যের গর্ব করছে, কিংবা নিজের প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রশাসনিক

www.pathagar.com

ক্ষমতার দোহাই দিয়ে নিজের বড়ত্ব জাহির করছে, তাহলে বুঝতে হবে তাদের মধ্যে বিকৃতি দেখা দিয়েছে এবং সে বিকৃতি বহাল রেখে সৌভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আর যখন দেখবেন, একজন আর একজনকে সাহায্য করতে কুণ্ঠাবোধ করছে, তখন বুঝবেন তাদের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে ইসলামী দাওয়াতের কাফেলায় সমবেত ভাইদেরকে আমরা দু'টো গুণের অধিকারী হওয়ার উপদেশ দেই ঃ

প্রথমত, সমমর্মিতা ও সহানুভূতিশীলতা ঃ আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার এই মহান কাজে প্রত্যেক ভাইকে তার অপর ভাই-এর প্রতি বিনয়ী ও বিনম্রচারী হতে হবে। যেমন একটা প্রচলিত প্রবাদবাক্যে বলা হয় ঃ "তোমার ভাই যখন তোমার ওপর দাপট দেখায় তখন তুমি বিনয় দেখাও।" আমার প্রত্যাশা প্রত্যেক ইসলামী সংগঠন যেন এ নীতিকে তার কার্যকর রীতিতে পরিণত করে। নিছক তাত্ত্বিক ও আদর্শিক পর্যায়ে সীমিত না রেখে একে যেন বাস্তব ও নৈমিত্তিক আচরণের রীতি হিসেবে গ্রহণ করে। আসলে এ ধরনের মহান নীতি ও মতাদর্শের বাস্তবায়নকে পাশ কাটিয়ে চলাটাই হলো একটা মস্ত আপদ। আমরা যদি এ নীতিকে কষ্টকর মনে হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে অনুশীলন করি ও এর বাস্তবায়নে অভ্যস্ত হই, তাহলে নিসন্দেহে একটা বিরাট ও চমৎকার বিজয় লাভ করতে পারবো। আর শয়তানকেও করতে পারবো লাঞ্ছিত। এ লাঞ্ছনা তার প্রাপ্যও বটে। কেননা ইজ্জত, মান-মর্যাদা ও আত্মসম্ভ্রমের কথা বলে সে-ই তো অহংকার সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। বস্তুত এ জন্যই রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "বান্দা যত রকমের ঢোক গিলে থাকে—তার মধ্যে যে ঢোক গিলে সে রাগ দমন করে তার চেয়ে প্রিয় ঢোক আল্লাহর কাছে আর কিছু নেই। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বান্দা যখনই রাগ দমন করে তখনই আল্লাহ তার হৃদয়কে ঈমান দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন এবং বুকের মধ্যে সেই ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে।"

তাই আমাদের সংগঠনের ভাইদের সাথে মেলামেশার বেলায় অবাধ্যতার ভাব দেখেও যদি আমরা নম্রতার নীতি অবলম্বন করি, তাহলে আশা করতে পারি যে, বিভেধ, বিচ্ছিন্নতার কারণ অনেকটা দূর হয়ে যাবে।

এখানে একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, আমরা যে নম্রতার কথা বলছি, সেটা শক্তিমানের সামনে দুর্বলের নম্রতা নয়, ধনীর সামনে দরিদ্রের বিনয় নয়, বংশ ও পদমর্যাদায় উচ্চতরের সামনে নিম্নতরের নমনীয়তা নয়, আর তা পরাক্রান্ত শত্রুর সামনে পর্যুদস্ত মানুষের বিনয়ও নয়। বস্তুত নম্রতা ও বিনয়ের এ নীতিই হলো সত্যিকার ন্যায়নিষ্ঠ নেতৃত্ব। একজন নিগ্রোও যদি এ নেতৃত্বের পতাকাবাহী হয় তবে ইসলাম তাও মেনে নেয়ার শিক্ষা দেয়। তবে মনে

www.pathagar.com

রাখতে হবে যে, বিনয় যতক্ষণ দুর্বলতা ও হীনতার পর্যায়ে নেমে না যায়, ততক্ষণই তা ন্যায়নিষ্ঠ থাকবে। ধনীর সামনে দরিদ্রের পরাক্রান্তের সামনে পরাজিতের, শক্তিমানের সামনে দুর্বলের এবং প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালীর সামনে নগণ্য অক্ষম মানুষের যে বিনয় ও নম্রতা, আমরা তা অর্জনের জন্য উপদেশ দিচ্ছি না। বরং এগুলো হলো এমন নোংরা ও অপবিত্র জিনিস, যা থেকে আমরা নিষ্কৃতি চাই আল্লাহর কাছে। আসলে আমরা যে বিনয় ও নম্রতার উপদেশ দিচ্ছি তাহলো মু'মিনের প্রতি নম্রতা, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের বিনয় এবং যারা আল্লাহর শুদ্ধির দাওয়াতের অধীন সংগঠিত ও সাম্যের বন্ধনে আবদ্ধ তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বিনয়। এসব লোকের জন্য পরস্পরের প্রতি নম্র ও বিনয়ী আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তা যদি তারা না করে, তাহলে তারা গুনাহগার হবে এবং কার্যত শয়তানের ক্রীড়নক হয়ে ইসলামকে ধ্বংসের চেষ্টায় নিয়োজিত বলে বিবেচিত হবে—যদিও শয়তান তাদেরকে এই বলে নিশ্চিত করে যে, তারা সুস্পষ্ট ও নির্ভুল পথের ওপর আছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়া এমন একটা মারাত্মক জিনিস যা গোটা দ্বীন ইসলামকেই ধ্বংস করে দেয় এবং তার চিহ্নকে পর্যন্ত মুছে দেয়। কাজেই কোন মু'মিন যদি ইজ্জত ও সম্মানের আপন প্রাপ্য অংশ পাওয়া জরুরী মনে করে, তাহলে সে যেন আল্লাহদ্রোহিতা, আগ্রাসন ও তাগুতের প্রতিনিধিদের দিকে তাকায় এবং দেখে যে, তারা তার প্রতি কি মনোভাব ও অবস্থান গ্রহণ করেছে। এটা দেখার পর কোন জিদ বা ক্ষোভ যদি তাকে তাদের মোকাবিলায় দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে তাহলে সেটাই হবে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদার কাজ। আর যদি তেমন উদ্বুদ্ধকারী কোন ক্ষোভ তার মধ্যে সৃষ্টি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আসলে তার মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা বলতে কিছু নেই—চাই তার সামনে মাথা নোয়ানো মানুষের সংখ্যা যতই হোক না কেন। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য এটাই ঃ

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز

"তারা মু'মিনদের ওপর নম্র, কাফেরদের ওপর কঠোর।"

-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৪)

সুতরাং এ নম্রতা ও বিনয় হলো সহৃদয়তার ও আপন ভাইকে আপন করে রাখার আগ্রহের সূচক। সেই সাথে এ বিনয়ের মধ্যে একটা পরাক্রম ও আধিপত্যের ভাবও রয়েছে। আর এ জন্যই হয়তো আল্লাহ এ বাক্যটিতে উচ্চতার ভাব সূচক শব্দ 'আ'লা' (ওপর) ব্যবহার করেছেন এবং 'কাফেরদের ওপর কঠোর' কথাটা বলে প্রকারান্তরে মু'মিনদের ওপর নম্র হওয়ার উদ্দেশ্যটাই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু অবস্থাটা যদি এর বিপরীত হয় (অর্থাৎ মু'মিনদের ওপর কঠোর এবং কাফেরদের ওপর নম্র) তাহলে সেখানে এমন এক বিকৃতি দেখা

www.pathagar.com

দেবে—যার সাথে বিশুদ্ধতার সহাবস্থান আশা করা যায় না। জনৈক কবি বলেন ঃ

كبرا علينا وجبنا عن عدوكم

لبئست الخلتان الكبر والجبن

"তুমি আমাদের ওপর বাহাদুরী আর নিজের শত্রুর সামনে কাপুরুষতা দেখাচ্ছ। এ ধরনের বাহাদুরী ও কাপুরুষতা অত্যন্ত জঘন্য।"

এ ক্ষেত্রে কারো এরূপ ধারণা হওয়া চাই না যে, নিজের ভাই এর সাথে বিনয়ের আচরণ আগ্রাসী স্বভাবের মানুষকে বাড়াবাড়ি করা ও ঔদ্ধত্য দেখানোর স্পর্ধা যোগাতে পারে। কেননা নম্রতা ও বিনয় কোন সার্বক্ষণিক রীতি নয়। আমরা ইতিহাসে দেখেছি যে, একবার হযরত আবু জর (রা) একটা ভুল কাজ করে ফেলেছিলেন। তিনি হযরত বিলালকে (রা) এই বলে লজ্জা দিয়েছিলেন যে, তাঁর মা কৃষ্ণাঙ্গ। এতে হযরত বিলাল (রা) তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ করলেন। আবু জর ভীষণ অনুতপ্ত হলেন। তিনি মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে কসম খেলেন যে, বিলাল এসে তার মুখমণ্ডল পা দিয়ে মাড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত তিনি উঠবেন না। সত্যি সত্যি বিলাল তার মুখে পা না দেয়া পর্যন্ত তিনি উঠলেনই না।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মু'মিন হলো অনুগত উটের মত।" যার পরাক্রমশালী হওয়ার ইচ্ছা আছে, তাকে নম্র ও অনুগত উট হতেই হবে। হযরত বিলাল ও আবু জরের দৃষ্টান্ত তার চোখের সামনে রাখতে হবে। অসংযত আচরণ, উগ্রতা, কঠোরতা, কর্কশতা, ঔদ্ধত্যের জবাবে পাল্টা কঠোর ও নির্মম কথা বলা—এসবই হলো অসার নির্বোধ লোকদের স্বভাব—যারা আল্লাহর হেদায়াতের নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ হয়নি এবং যারা আখেরাতের প্রতিদান লাভের আশা পোষণ করে না। ভালো-মন্দের বাচ-বিচার ও পরিণাম চিন্তা যাদের নেই তারাই এ ধরনের আচরণ করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, বিবাদ ও বিতর্ক এড়িয়ে চলা ঃ আন্দোলন ও দাওয়াতের যে যে স্তরে বিবাদ ও বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয় এবং তা বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা, বিভেদ ও অন্যের দোষ অন্বেষণের পর্যায়ে উপনীত করে, সে সব স্তরের বিস্তারিত বর্ণনা আমি দিতে চাই না। আমি শুধু দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ভাইদেরকে চিরস্থায়ী ও সুনিশ্চিত লাভের সন্ধান দিতে চাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত বক্তব্যের অধিকারী হয়েও তর্ক পরিহার করে, আমি তার জন্য জান্নাতের ঠিক মাঝখানে একটা ঘর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আর যে ব্যক্তি ভুল বক্তব্যের অধিকারী,

www.pathagar.com

কিন্তু তর্ক এড়িয়ে চলে, আমি তার জন্য জান্নাতের প্রান্তদেশে একটা ঘর লাভের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।" কাজেই সত্য আপনার পক্ষেই থাকুক বা বিপক্ষে, আপনি সর্বাবস্থাই জেনে রাখবেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার প্রতি এই "নিশ্চয়তার" হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ "ক্রমাগত তর্ক চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই ঘরটাই তোমার জন্য শ্রেয়।" এখন ভেবে দেখুন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর বাড়িয়ে দেয়া এই হাতকে কি প্রত্যাখ্যান করবেন এবং তার দেয়া নিশ্চয়তাকে কি অগ্রাহ্য করবেন ? যদি তাই করতে চান, তাহলে আর রসূলের (সা) পতাকাবহনকারীদের কাফেলায় শামিল থাকবেন কোন্ কারণে ? আর যদি তা না করতে চান তাহলে তর্ক ও তার যাবতীয় উপকরণকে শয়তানের মুখের ওপর ছুড়ে মারুন এবং আল্লাহর রসূল যে মহান নিয়ামতটি আপনাকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন তাকে সাদরে গ্রহণ করুন।

বস্তুত তর্ক ও ঝগড়া একটা অত্যন্ত নোংরা ও অশুভ শক্তি। প্রীতি ভালো-বাসার বিনাশ ঘটাতে এবং জামায়াতী জীবনের ধ্বংস সাধনে এর প্রভাব খুবই তীব্র ও প্রবল। অথচ জামায়াত হলো ইসলামের সারকথা এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা হলো শির্কের মূল। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে মূর্তি পূজার পরেই সর্বপ্রথম যে জিনিস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তাহলো তর্ক ও ঝগড়া। নিজের মত যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও তা নিয়ে তর্ক থেকে বিরত থাকা এমন কঠিন কাজ নয়। কেউ হয়তো বলবেন ঃ মতটা যখন সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, তখন তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করা জরুরী। আমি বলি ঃ প্রত্যেকেরই একটা মত আছে। সে যদি তার মতকে যথার্থ মনে করে তাহলে নিজে সে অনুসারে কাজ করলেই হলো। মনে রাখবেন, আপনার মতটা জামায়াতের চেয়ে বেশী মূল্যবান ও প্রিয় নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ـ

"তুমি যদি সারা পৃথিবীর সম্পদও ব্যয় কর তবু মু'মিনদের মনে সম্প্রীতি ও একাত্মতা গড়তে পারবে না।"-(সূরা আল আনফাল ঃ ৬৩)

এবার ভেবে দেখুন, আপনার মতকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করতে গিয়ে জামায়াত তার বিনিময়ে কোন্ জিনিসটা খোয়াতে যাচ্ছে। আমি তো বলবো ঃ যে সত্য বিতর্কিত তা অস্পষ্ট ও ঝাপসা সত্য। কেননা বাতিলের অনেকগুলো আবরণ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কাজেই তা নিয়ে তত্ত্বানুসন্ধান স্থগিত রেখে বা বর্জন করে অবিসম্বাদিত সত্যকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাতে কোন অসুবিধা

www.pathagar.com

নেই। সকল মানুষের কাছে যা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তা-ই তাদের সুখ ও সৌভাগ্যের সমধিক নিশ্চয়তা দিতে এবং আল্লাহর পথে তাদেরকে অধিকতর নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম।

এগুলোই হলো দাওয়াতকারীর সাফল্য এবং বাহ্যিক পরিবেশে তার সামর্থের চাবিকাঠি। আর যেসব মানসিক গুণ-বৈশিষ্টের ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, সেগুলো সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতা ও মেজাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ তার বর্ণনা নিম্নে দিচ্ছি ঃ

সবর তথা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু সংকট-সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। তিনি ও তাঁর সহচরগণ অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করেছেন। হত্যা ও দেশান্তরের হুমকি সহ বহু রকমের নিপীড়ন তাদের ভোগ করতে হয়েছে। এ সবের প্রতিকারে তিনি সবচেয়ে বড় যে ওষুধটি প্রয়োগ করেছেন তা ছিল ছবর। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ۝

"(হে নবী !) আপনার পূর্বের বহু নবীকেও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। তারা সেই অগ্রাহ্য করাকে ও নির্যাতনকে সহ্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহর বাণীকে বদলাবার ক্ষমতা কারো নেই। রসূলদের খবরাদি তো আপনার কাছে এসেছেই।"

—(সূরা আল আনআম ঃ ৩৪)

আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ নবীদেরকে সবরের জন্য যত তাগিদ দিয়েছেন, তত তাগিদ আর কোন কিছুর জন্য দেননি। এখানে সবরের অর্থ হীনতা ও দুর্বলতা দেখানো বা দাওয়াতের কাজ ত্যাগ করা নয় কিংবা যারা নিরীহ মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে তাদের প্রতিকার ও প্রতিরোধের চিন্তা ত্যাগ করাও নয়। এখানে সবরের অর্থ হলো ঃ

১—জনতার পক্ষ থেকে যত উপেক্ষা, ঔদ্ধত্য, হুমকি ও নির্যাতন আসবে, দাওয়াতকারী তা এমনভাবে বরদাশত করে যাবে, যেন এসব বাধা-বিপত্তি তার পথ আগলাতে পারছে বলে মনেই হবে না। একটা অপ্রীতিকর গ্রাস গিলে ফেলতে এসব বাধা-বিপত্তির কাঁটা তার কণ্ঠনালীকে আটকে দিচ্ছে বলে সে অনুভবই করবে না। কেননা তাহলে তো সে অস্থির ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে এবং এর প্রতিকারে কোন সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়ার কথা ভাববার অবকাশ পাবে

www.pathagar.com

না। তাকে বরং এতটা সহিষ্ণু ও ঠাণ্ডা মেজাজের হতে হবে যে, এসব কিছুকে সে অবাধে হজম করে ফেলবে। যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনায় নার্ভাস তথা বিচলিত ও হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়ার মানে হবে এই যে, তার কণ্ঠনালীতে গ্রাস আটকে গেছে। দাওয়াত ও দাওয়াতকারীর পক্ষে এ অবস্থা মোটেই সঙ্গত নয়। তাকে হতে হবে চরম ও পরম সহিষ্ণু। যে কোন কঠিন অবস্থাকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এবং যারা অজ্ঞতা বশত তার প্রতি মূঢ়ের মত আচরণ করছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

২—সময়ের আবর্তন ক্রমে যেসব অবস্থার উদ্ভব হয়ে থাকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, মহাকালের গর্ভে বহু আকস্মিকতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রচ্ছন্ন থাকে, যা নির্দিষ্টক্ষণে হাজির হতে কারো অপেক্ষার ধার ধারে না। সময়ের আবর্তনে আল্লাহ এমন বহু ঘটনা ঘটান, যা বাধা-বিপত্তিকে হালকা করে দেয় কিংবা বিলুপ্ত করে দেয়। দাওয়াতকারীকে সতর্ক থাকতে হবে শুধু এই ব্যাপারে যে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তার উদ্যম ও উদ্দীপনায় যেন ভাটা না পড়ে। যেসব অপ্রীতিকর জিনিসকে সে হজম করে এসেছে, তাকে সম্বল করে নিজের মনের প্রচ্ছন্ন শক্তি ও সুপ্ত জাগরণের জোয়ারকে অপ্রতিরোধ্য সয়লাবে পরিণত করতে সচেষ্ট হতে হবে। এটুকু সতর্কতা ও প্রস্তুতি বজায় থাকলে তার দাওয়াত কালক্রমে আরো শক্তিমান ও দুর্জয় হয়ে উঠবে।

৩—বাধা-বিপত্তি যে পথ দিয়ে ও যেদিক থেকে আসে, আন্দোলন ও দাওয়াতকে তা থেকে ভিন্নতর পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাধা-বিপত্তির চারপাশ দিয়ে চক্কর কেটে তার পশ্চাত দিকে চলে যেতে হবে। দাওয়াতের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে। মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকতে হবে, নিজের পাশে সহযোগী ও সমর্থকের বাহিনী সংগ্রহ ও সংগঠিত করতে হবে এবং বিভিন্ন রকমের জনসেবামূলক, জনকল্যাণমূলক ও পরোপকারমূলক তৎপরতার মাধ্যমে মানুষের মনকে জয় করতে ও সহানুভূতিশীল বানাতে হবে। তার চোখের সামনে অনেক দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি সংগঠিত হচ্ছে—আইন তার প্রতিরোধ করতে পারছে না। অথচ সেগুলো বহাল থাকাতে কারোই ভালাই নেই। সেসব অন্যায় ও অপকীর্তির প্রতিকার ও উচ্ছেদ সাধনে তাকেই তৎপর হতে হবে এবং মানুষকে তা থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে আসতে হবে।

এ ক্ষেত্রে কতকগুলো মৌলিক গুণ ও নীতি আছে—যা দাওয়াতকারী ও তার অনুগামীদের ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তবায়িত করাতে এবং তার বাস্তব নমুনা হয়ে আবির্ভূত হওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। এসব নীতি ও গুণের কল্যাণকারিতা

www.pathagar.com

মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দেয়া এবং মানুষকে এসব গুণে ভূষিত হওয়ার উপদেশ দেয়া তার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। এর মাধ্যমে সে তার দাওয়াতের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং ইসলামের কোন কোন শিক্ষা বাস্তবায়নের পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র তৈরী করতে পারবে। এতে মানুষকে কল্যাণের পথ নির্দেশের একটা শক্তিশালী উপকরণ যেমন তার হস্তগত হবে, তেমনি এতে যে ভুল-ভ্রান্তি হবে, তা থেকেও সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

এ ধরনের যাবতীয় প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা তার কর্তব্য। কেননা সত্যের দাওয়াতের স্বার্থে যে কোন প্রচেষ্টাই সে করবে, তা তার দাওয়াতের প্রতিক্ষিত সাফল্যের সম্ভাবনাকেই শুধু বাড়িয়ে তুলবে। সে যদি নিষ্ক্রিয় ও স্থবির হয়ে বসে থাকে আর ওজুহাত দেখায় যে, কেউ তার কথা শুনছে না কিংবা বাধাবিপত্তির দরুন পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে পড়েছে, তাহলে তার সাফল্য ও বিজয়ের সম্ভাবনাই নস্যাৎ করে দেবে। একথা কোন মতাদর্শগত ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে বলছি না, কিংবা রূপক কথা দ্বারা বাক্যকে অলংকৃত করার জন্যও বলছি না। আসলে এটা সন্দেহাতীত সত্য কথা এবং এটাই বাস্তব। আল্লাহ বলেছেন ঃ

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ج

"তোমাদের মধ্যে পুরুষ কিংবা নারী যে কাজই করুক না কেন, আমি তাকে বৃথা যেতে দেই না।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

"আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করতে চান না। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াশীল।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

এ বক্তব্যের বিশ্লেষণ আমি একটু পরেই করবো। এখানে শুধু এতটুকু বলে রাখতে চাই যে, বিশেষ বিশেষ যেসব ক্ষেত্রে কিছু কাজ করলে কোন ক্ষতি নেই সেসব ক্ষেত্রে কাজ করা থেকে বিরত থাকা চাই না। এর দ্বারা নিজের বিজয় ও সাফল্যকেই নিশ্চিত করা হবে। দাওয়াতকারীর বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গানোর জন্য যে সবর প্রয়োজনীয়, তার কিছু মর্ম এখানে বিশ্লেষণ করা হলো।

আল্লাহ তায়ালা তার রসূলকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই নীতিটা উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঃ

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন বয়োপ্রাপ্ত হন, তখন বনী ইসরাঈলের ওপর মিসরীয়দের যুলুম-নির্যাতন দেখে মর্মাহত হন। মূসা তখন একজন

www.pathagar.com

তরুণ। তিনি তাঁকে রিসালাতের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। স্বভাবতই তিনি ছিলেন তীব্র অনুভূতিশীল। যুলুমকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং যুলুম-নিপীড়ন দেখলেই তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। একদিন তিনি সংগোপনে নগরীতে ঢুকলেন। এর পরবর্তী ঘটনা কুরআনের ভাষায় শুনুন ঃ

فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ق هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ
فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ لا فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى
فَقَضٰى عَلَيْهِ ق قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ○
قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ ○ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ○
فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ
يَسْتَصْرِخُهٗ ط قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ○ فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ
يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا لا قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا
قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ ق اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا
تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

"তিনি দেখলেন দুই ব্যক্তি মারামারি করছে। একজন মূসার নিজ গোত্রীয়। আর একজন তাঁর শত্রুপক্ষীয়। তাঁর গোত্রের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে মূসার সাহায্য চাইল। মূসা তাঁকে একটি চপেটাঘাত করেই মেরে ফেললেন। অতপর নিজেই বলে উঠলেন ঃ (যে কাজটা করলাম) এটা একটা শয়তানী কাজ। শয়তান প্রকাশ্য গোমরাহকারী শত্রু। তিনি বললেন ঃ হে প্রতিপালক ! নিশ্চয় আমি নিজের ওপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে যথার্থই ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি দয়াশীল ও ক্ষমাশীল। তিনি বললেন ঃ হে আমার মনিব ! আপনি আমার ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি (ওয়াদা করছি যে,) আমি কখনো অপরাধীদের সহায়তাকারী হব না। সকাল হলে মূসা (আ) ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন সেই লোকটি যে গতকাল তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিল, তাঁকে

www.pathagar.com

সাহায্যের জন্য ডাকছে। মূসা তাকে বললেন ঃ তুমি একটা প্রকাশ্য বেয়াড়া লোক। অতপর তিনি যেই উভয়ের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এক ব্যক্তিকে ধরতে গেলেন, অমনি সে বললো ঃ হে মূসা ! গতকাল যেমন একজন লোককে হত্যা করেছ, তেমনি আমাকেও আবার হত্যা করতে চাও না কি ? তুমি তো দেখছি, দুনিয়াতে একজন স্বৈরাচারী হতে চাও। তুমি কোন সংস্কারক হতে চাও না।"-(সূরা আল কাসাস ঃ ১৫-১৯)

এ ব্যাপারে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই যে, জুলুম একটা অপরাধ—যার উচ্ছেদ সাধন অপরিহার্য। মূসা আলাইহিস সালাম রসূল হয়ে এসেছিলেন বনী ইসরাঈলকে জুলুম থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্যই। এখন দেখতে হবে যে, এই দুষ্কৃতি দূর করার তিনি যে কাজ করেছিলেন তা কি সঠিক পদ্ধতি অনুসারী ছিল? আগ্রাসী মিসরীয়কে হত্যা করায় বনী ইসরাঈলের কী উপকার হয়েছিল ? এতে কি জুলুমের বিলোপ ঘটেছিল এবং অত্যাচার দূর হয়েছিল ?

মিসরীয় লোকটি যে বনী ইসরাঈল গোত্রীয় লোকটিকে প্রহার ও জুলুম করছিল তার পেছনে তার একটা কিছু ওজর বা ওজুহাত থেকে থাকতেও পারে। কেননা এ কাজটা করতে গিয়ে সে মিসরের ক্ষমতাসীন ফেরাউনের প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত রীতির অনুসরণই করছিল। কাজেই আমরা যখন অন্যায়ের সঠিক প্রতিকারে উদ্যোগী হব, তখন ব্যক্তিগত ঘটনাবলীর প্রতিকার দ্বারা সে লক্ষ্য কখনোই অর্জিত হবে না। সেটা হতে পারে শুধুমাত্র দেশের প্রচলিত রীতি প্রথা ও আইনের পরিবর্তন ও বিলোপ সাধন দ্বারা—যা খোদ ফেরাউন কর্তৃক প্রচলিত ছিল। একজন বা কতিপয় ব্যক্তি বিশেষকে হত্যা করা —যা মূসা (আ) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল—তা প্রকৃত সংস্কারমুখী পদক্ষেপ ছিল না। মূসা (আ) নিজেই এ কাজকে শয়তানী কাজ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

উপরন্তু ব্যক্তিগত দুষ্কৃতির ঘটনাবলীর প্রতিকারের মাধ্যমে দুষ্কৃতি ও অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা আইনানুগ শাস্তি বা প্রতিশোধের শিকার হতে পারে। এ ধরনের চেষ্টা উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে রুষ্ট করতে পারে। কেননা প্রচলিত রীতি-প্রথা অব্যাহত থাকাতেই প্রশাসনের স্বার্থ নিহিত। এমতাবস্থায় দাওয়াতকারী আইনের শাসন ও স্বৈরাচারী শাসকদের পাকড়াও এর শিকার হতে পারে। ফলে সে কাজ তার আসল লক্ষ্যের কোন উপকার সাধন করবে না।

তাই বলে আমরা তো একথা বলছি না যে, দাওয়াতকারীর দুর্বল ও কাপুরুষের ভূমিকা পালন করাই বাঞ্ছনীয় হবে। আমরা যা প্রত্যাশা করি তা

www.pathagar.com

হলো এই যে, দাওয়াতকারীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আরো প্রশস্ত হোক। এতে করে সে রোগের উৎস ও মূল কারণের চিকিৎসা ও প্রতিকারে উদ্যোগী হবে। আর তাতে সে যথার্থ বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন এবং প্রতিকার প্রত্যাশী ব্যাপারগুলোর আগাগোড়া উত্তম রূপে ভেবে দেখবার সুযোগ পাবে। এটাই হলো অন্যায়ের প্রতিকারের যথার্থ ও স্বাভাবিক পন্থা। ব্যক্তিগত ঘটনাবলী ও বিচ্ছিন্ন দুষ্কৃতিগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া নিতান্ত সরলমনা, অপরিণামদর্শী আবেগপ্রবণ লোকদেরই কাজ। এ কাজ তারাই করতে পারেন, য়ারা বৃহত্তর ও মহত্তর কাজের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে ইচ্ছুক নন।

এ ভুল কাজ অনেকে একান্ত সদিচ্ছা নিয়েও করে বসতে পারে যেমন মূসা (আ) করেছিলেন তাঁর তারুণ্য জনিত ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে। এ কাজের অনিবার্য ফল এই হয়েছিল যে, ফেরাউনের উচ্চ পারিষদবর্গ এই তরুণটির বিপজ্জনক সম্ভাবনার ব্যাপারে সচকিত হয়ে উঠেছিল এবং তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে কৃতসংকল্প ছিলেন। মূসাকে (আ) তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কাজে নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তিনি দেখলেন, এই তরুণ তার তারুণ্যের উচ্চমার্গে উপনীত হয়েছে। তাঁর ঈমানী জজ্‌বা পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা তখনো পরিপক্কতা লাভ করেনি, তিনি বুঝতে পারলেন যে, মূসা (আ) এসব অত্যাচারমূলক ঘটনাবলী যতই ঘটতে দেখবে, ততই সে বেশী করে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে যেতে থাকবে। তিনি এটাও বুঝলেন যে, ঐ তরুণ সংস্কারককে গ্রেফতার বা হত্যা করে তার পথ চিরতরে রুদ্ধ করাটাই ফেরাউনের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই মহাকুশলী আল্লাহ এরূপ কৌশল অবলম্বন করলেন যে, তাকে দূরবর্তী কোন জনবসতিতে পাঠিয়ে কোন বিজ্ঞ সৎলোকের তদারকীতে রেখে পরিপক্কতা অর্জনের সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ জন্য তাঁকে নগরী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি একথা মূসার গোচরীভূত করালেন যে, পারিষদবর্গ তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। ফলে মূসা (আ) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নগরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

দাওয়াতকারীর কৌশল নিরূপণের সুবিধার্থে আল্লাহ এ উদাহরণ পেশ করেছেন। এ উদাহরণ যথার্থ শিক্ষামূলক, গভীরভাবে প্রনিধানযোগ্য ও সুষ্ঠু পথনির্দেশে পরিপূর্ণ। কিছুকাল পর যখন মূসার পরিপক্কতা অর্জিত হলো, নবুয়াতের বয়সে যখন পদার্পণ করলেন, তখন ফিরে এলেন জুলুম ও দুষ্কৃতির শীরোমনি ফেরাউনের কাছে। তাঁকে তিনি কোমল ও বিনম্র বচনে ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ সহকারে বুঝালেন। এ সময় দুষ্কৃতির সেই বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী—যা ইতিপূর্বে তাকে ভুল পদক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করতো—তার দিকে আর ভ্রূক্ষেপও

www.pathagar.com

করলেন না। দাওয়াতের পথের এই সর্ববৃহত বাধা (আল্লাহদ্রোহী শাসক) সরাতে দাওয়াতকারীর কর্তব্য শুধু এতটুকুই যে, সে আপন মর্যাদাকে সুমুন্নত রাখবে, ক্ষমতা ও প্রতাপকে সুসংহত করবে, আপন প্রতিপালককে মজবুতভাবে আকড়ে ধরে রাখবে এবং নিজের ব্রত ও কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য দেখাবে না। আল্লাহর বিধানের দিকে দাওয়াত দেয়া থেকে কখনো বিরত হবে না। একদিন দেখতে পাবে যে, এই মহান ব্রতের সয়লাবে ঐ বাধা খড়কুটোর মত ভেসে যাবে যেমন ফেরাউনকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই যে, এই ঘটনা দ্বারা তার মনোবল দৃঢ়তর হয়েছিল। তাই তিনি ব্যক্তিগত দুষ্কর্মের প্রতিকারে তাড়াহুড়ো করেননি। অনেক সময় মধ্যরাতেও তিনি কা'বা শরীফে নামায পড়তেন। মূর্তিগুলো তখনো সেখানে বিদ্যমান ছিল এবং তাদের অচঞ্চল রোষ কষায়িত চোখ দিয়ে যেন তাকিয়ে থাকতো তাঁর দিকে। তিনি সেগুলোর দিকে হাত বাড়াননি বা অন্য কাউকেও তাদের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেননি। সে সময়ে তিনি যদি তাদের দিকে হাত বাড়াতেন তবে কেউ দেখতো না। তবে তার ফলটা কি হতো ? মূর্তিগুলো আগে যেমন ছিল পুনরায় তেমনি অবস্থায় বহাল হতো। হয়তো বা আরো ভালো অবস্থায় ফিরে আসতো। আর রসূলুল্লাহর (সা) ওপর নির্যাতনের সময়টা একটু এগিয়ে আসতো। তিনি জানতেন যে, প্রতিকারের পদ্ধতি এটা নয়—অন্যটা। সেটা হলো সবর এবং অবিরতভাবে দাওয়াত দিতে থাকা, সেই সাথে সমর্থকদের সংগঠিত করা, শক্তি সংহত ও সমবেত করা, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস মানুষের মন-মগজে প্রতিষ্ঠা করা এবং মানবীয় বিচার-বুদ্ধির নিকট আবেদন জানাতে থাকা। অবশেষে যখন আল্লাহ প্রতিশ্রুত বিজয়ের দিন সমাগত করলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সা) হাতের একটা লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোর প্রতি ইংগীত দিয়ে শুধু বললেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

"সত্য সমাগত এবং বাতিল পরাভূত।"

সঙ্গে সঙ্গেই মূর্তিগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো। আমরা জানি, রসূলুল্লাহর (সা) আন্দোলনের প্রাথমিক সঙ্গী নওজোয়ানরা অনেক সময় তাঁর কাছে এসে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো এবং শত্রুদের ওপর সর্বাত্মক হামলা চালানোর অনুমতি দেয়ার জন্য অধীরভাবে কাকুতি মিনতি করতেন। তিনি তাদের শান্ত করতেন এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলতেন। মক্কায় থাকাকালেই সশস্ত্র জিহাদ শুরু হওয়ার আগেই তাঁরা জানতেন যে, একদিন তারা অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি পাবেন—এ ওয়াদা আল্লাহ দিয়েছেন। মক্কী সূরায় তারা পড়তেন ঃ

www.pathagar.com

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى لا وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ
مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ لا وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ز

"আল্লাহর জানা আছে যে, অচিরেই তোমাদের মধ্যে কেউ থাকবে রোগী, কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে সফরে বের হবে, আবার কেউবা আল্লাহর পথে লড়াই করবে।"–(সূরা মুজ্জাম্মিল ঃ ২০)

এর ফলে তারা ভুল করে ঐ সময়েই লড়াই করার বাসনা করতেন। কিন্তু রসূল (সা) ঐ তরুণদের তাড়াহুড়োতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাড়াহুড়ো করতেন না এবং তাদের মত হালকা মনোভাব পোষণ করতেন না। বরং তাদেরকে তিনি অনুরোধ করতেন যে, আপাতত এসব কাজে নিয়োজিত হয়ো না। এ মুহূর্তে তোমরা নামায কায়েম ও যাকাত দান করাতেই সীমাবদ্ধ থাক। তোমাদের শক্তি পূর্ণতা লাভ করুক। পরিবেশ উপযোগী হোক এবং আল্লাহর নির্ধারিত লড়াই এর দিনগুলো আসুক।

আল্লাহ তাঁর রসূলকে বাধাবিঘ্ন অপসারণের যে পন্থা ও পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন এবং যা রসূল (সা) দক্ষতা, স্থিরতা ও দৃঢ়তার সাথে অনুসরণ করেছেন, তা ছাড়া অন্য পন্থায় তা অপসারণের জন্য দাওয়াতকারীকে যদি পরামর্শ দেয়া হয়, তাহলে সেটা হবে মস্তবড় গুনাহ।

দাওয়াতকারী যখন তার বাধা-বিপত্তি অপসারণের কাজ সম্পন্ন করবে, পরিবেশ ও পরিস্থিতি যখন সম্পূর্ণ অবাধ ও নির্বিঘ্ন হয়ে যাবে এবং সে নিজের কাজ সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে, তখন আর কালবিলম্ব না করে তাকে সেই বিধি-ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ করতে হবে যা তার কাছে তার দাওয়াতের ঐকান্তিক দাবী। এ সময় সে এমন এক স্তরে পদার্পণ করবে যা বাধাবিপত্তি ও কষ্টের স্তরের চেয়ে কম গুরুতর ও কম ঝুঁকিপূর্ণ নয়। এ স্তরে তার দায়দায়িত্ব পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায় দ্বিগুণ বা বাড়তি না হলেও কম নয় কোন অংশেই।

এ স্তরে দাওয়াতকারীকে রাষ্ট্র ও জাতি গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। আল্লাহর ভীতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে জাতি ও রাষ্ট্র গড়তে হয়। কেননা সে তার দায়িত্ব পালনে তাঁর আদর্শের মূলনীতিগুলোর আনুগত্য করতে বাধ্য এবং তার সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতার অন্তর্নিহিত তাগিত ও প্রজ্ঞার আলোকে তা বাস্তবায়িত করতে উদ্বুদ্ধ। উক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি ও মূলনীতিসমূহের কতকাংশ আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। দাওয়াতকারীকে নতুন করে শুধু এটুকু জেনে নিতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের পথ

www.pathagar.com

ও পন্থা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তাতে কোন জড়তা ও অস্পষ্টতা রাখেননি। সুস্পষ্ট আদেশ ও নিষেধের আকারে তা বর্ণনা করেছেন। এসব আদেশ ও নিষেধের বাছবিচারে অক্ষমতার অজুহাত তুলে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব এড়ানোর অবকাশ যে কোন মানুষেরই নেই, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইতিপূর্বে আমরা একথাও বলে এসেছি যে, এই সহজাত বাস্তবায়ন প্রকৃতি আল্লাহর একটা দুর্লভ দান—যা স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবানেরই করায়ত্ব হয়ে থাকে। তবে এর অন্তত কিছু অংশ যে কোন মানুষ চেষ্টা করলে নিম্নলিখিত উপায়ে বা তার চেয়ে উত্তম অন্য কোন উপায়ে অর্জন করে নিতে পারে। যথা ঃ

প্রথমত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেতিহাস এবং বিশেষত তাঁর দাওয়াতী জীবনের ইতিবৃত্ত পুংখানুপুংখরূপে অধ্যয়ন। এরপর এই জীবনেতিহাসকে সুসংবদ্ধ কয়েকটি দাওয়াতী স্তরে বিভক্ত করা। অতপর এর প্রতিটি স্তরে স্থীর হয়ে গভীরভাবে তত্বানুসন্ধান চালানো এবং বুঝতে চেষ্টা করা যে, রসূল (সা) তাঁর সমসাময়িক পরিস্থিতি শুধরাতে কোন্ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

এই পর্যায়ে তাঁর মহান সীরাতের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায় বলে মনে করি না। তবে "দাওয়াতকারীর প্রেরণার উৎস" এই শীরোনামযুক্ত আগামী অধ্যায়ের 'কুরআন অধ্যয়ন' পরিচ্ছেদে রসূলের (সা) জিহাদ সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়ত, দাওয়াতকারী হিসেবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ যেসব নির্দেশ জারী করেছেন, কুরআন থেকে সেগুলো একত্রিত করা ও তাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা—যাতে করে এথেকে দাওয়াতকারীর জন্য একটা 'কার্যপদ্ধতি' বেরিয়ে আসে। এই কার্য-পদ্ধতি অনুসারে যখন সে কাজ করতে আরম্ভ করবে, তখন নবীদের এমনসব পদচিহ্ন সে দেখতে পাবে যা সে ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পাবে না।

তৃতীয়ত, যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর নিকট কৈফিয়ত তলব করেছেন ও ভর্ৎসনা করেছেন, সেগুলোকে একত্রিত করা। যেমন হযরত মূসা ও ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওপর করা হয়েছে এবং কুরআনে তার উল্লেখ রয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব ক্ষেত্রে তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন তারও তালিকা তৈরী করতে হবে এবং পরম আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে যত্নবান হতে হবে।

www.pathagar.com

চতুর্থত, ব্যক্তিগত কাজ, বাস্তবায়ন ও প্রয়োগকরণ, অনুশীলন ও আন্দোলন। এসবই তার মরিচা দূর করবে এবং তার জড়তা, আড়ষ্ঠতা ও স্থবিরতার অবসান ঘটাবে।

পঞ্চমত, সামষ্টিক রূহানিয়াতের পর্যায়ে যেসব পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছি, তা অনুসরণ করা। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ যথাস্থানে করা হয়েছে।

ষষ্ঠত, দাওয়াতের সাথে নিজেকে গভীরভাবে ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত রাখা, এর সমস্যা ও সংকট নিয়ে বেশী করে চিন্তা-ভাবনা করা, দাওয়াতের পরিবেশ ও বাধা-বিপত্তির পর্যালোচনা করা, কিভাবে এসব বাধা অতিক্রম করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা ও গবেষণা করা। এ কাজ দ্বারা দাওয়াত ও দাওয়াতকারীর মন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এর ফলে তার মন এমন একটা ময়দানে পরিণত হয়, যার সকল তৎপরতা আল্লাহর দাওয়াতের বার্তা প্রবাহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেখানে যা কিছু হৈ চৈ ও লম্ফঝম্ফ হয় একমাত্র আল্লাহর বার্তা অনুসারেই হয়। পার্থিব জীবনের অসার মত্ততা ও সস্তা ব্যস্ততা সেখানে মোটেই পাত্তা পায় না। দাওয়াতকারী যখন এ পর্যায়ে এসে উপনীত হয় তখন বুঝতে হবে যে, সে আমাদের প্রত্যাশিত সাফল্যের অনেকখানিই অর্জন করেছে। কেননা এ পর্যায়ে আসার পর তার মন এতটা পবিত্র ও আল্লাহমুখী হয়ে যায় যে, সেখানে একমাত্র আল্লাহর কথাই ধ্বনিত ও গুঞ্জরিত হতে থাকে।

সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতার সুফল

এ সম্পর্কে পূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতেই সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতার কিছু সুফল বর্ণিত হয়েছে। এখানে আরো কিছু সুফল বর্ণনা করা অসঙ্গত হবে না। এতে আশা করা যায় যে, এসব সুফল লাভের প্রবল বাসনা আপনাকে একজন যথার্থ কর্মতৎপর ও বাস্তবায়নকারী হতে অনুপ্রাণিত করবে।

১—দাওয়াত সম্পর্কে তার উপলব্ধি ব্যাপকতা ও প্রশস্ততা লাভ করবে। দাওয়াতের কাজে সে পরিপক্কতা ও দক্ষতা অর্জন করবে। জীবন ও মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে। কেননা সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতা দাওয়াতকারীকে এক পরিমণ্ডল থেকে অন্য পরিমণ্ডলে নিয়ে যায়। তাকে কাল্পনিক নীতিমালা থেকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর নীতি-মালার পরিমণ্ডলে নিয়ে যায়। দাওয়াতকারীর নিজ উদ্যোগে অথবা তার নির্দেশক্রমে তা বাস্তবায়িত হয় এবং তার সুফল সে বাস্তব জীবনে দেখতে পায়। সে একথাও বুঝতে পারে যে, তার দায়িত্ব শুধু নীতিমালার বাস্তবায়নেই সীমিত নয়, বরং সমাজের বহুমুখী দাবী-দাওয়ার মোকাবিলা করা এবং

www.pathagar.com

এমনভাবে করা যাতে তা তার মূল আদর্শের ভাবধারার পরিপন্থী না হয়—এও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ে সে অনুভব করে যে, আল্লাহর দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা থেকে তার মন-মগজে যেন অনেকগুলো শাখা বা উপবিধি গজিয়েছে। এভাবেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্রত তার মন-মগজে প্রশস্ত ও উদার রূপ পরিগ্রহ করে এবং তার মন-মগজ ও বুদ্ধিবৃত্তি এত উদার ও প্রশস্ত হয় যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্রত এবং সমাজ ও সংগঠনের দাবী—এ উভয়টাকেই সে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। এভাবেই তার জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডল প্রশস্ত হয়ে যায়, দাওয়াতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বকে সে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করে এবং মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও তার সংশোধনের উপায়ের সাথে তার নিবিড় পরিচয় ঘটে। এটা একটা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। এখানে আমরা এ বিষয়কে আর বেশী বিস্তৃত করবো না।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যে উপলব্ধি দায়িত্ব ও জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আর যে উপলব্ধি শুধুমাত্র বই-কিতাবের ছত্র থেকে বেরিয়ে নিষ্ক্রিয় অলস নীতিবাদীদের মস্তিষ্কে স্থান লাভ করে—এ উভয় রকমের উপলব্ধিতে যে কি বিরাট ব্যবধান, তা জনসাধারণ ভালেভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

২—আল্লাহর দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা ও তার খুঁটিনাটি বিধিসমূহ নিজের ওপর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে দাওয়াতকারীকে যে কষ্ট ও যাতনা ভোগ করতে হয়, তা তার স্নায়ুমণ্ডলকে কোমল ও মসৃণ বানিয়ে দেয়, তার অন্তরাত্মাকে পবিত্র করে এবং তার হৃদয়ে জজবার উষ্ণতা আনয়ন করে। অর্থাৎ দাওয়াতকারী এই প্রাণান্তকর সংগ্রাম ও সাধনার মাধ্যমে জাগ্রত চেতনা ও তীক্ষ্ণ আত্মোপলব্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী হয়। ফলে তার সামনে যাই আসে তা দ্বারা সে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হয় এবং তার পাশ দিয়ে যাই অতিক্রম করে তার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই যে, এরূপ অবস্থায় দাওয়াতকারী অন্যান্যদের চেয়ে কুরআনের মর্ম উপলব্ধিতে অধিকতর পারঙ্গম হয়। "দাওয়াতকারীর প্রেরণার উৎস" শীর্ষক আগামী এক অধ্যায় আমরা এ বিষয়ের ওপর আরো আলোকপাত করবো। মোদ্দাকথা এই যে, তার স্নায়ুমণ্ডলী এতটা কোমল ও মসৃণ হয় যে, তা কার্যত আল্লাহর কিতাবের বিদ্যুত প্রবাহ ও সূক্ষ্মতত্ত্ব পরিবহনের এক 'উৎকৃষ্ট তারে' পরিণত হয়।

৩—সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট ও আলামত হলো এই যে, তা দাওয়াতকারীকে কর্মতৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত কাজই হলো পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বা আইন এবং কাজ করার জন্যই এখানে মানুষ

www.pathagar.com

প্রেরিত হয়েছে। আর কাজ সম্পর্কে আল্লাহর বিধান এই যে, প্রতিদান ও প্রতিফলের সাথে তা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। (অর্থাৎ যে কোন কাজের একটা কিছু প্রতিফল বা প্রতিদান অবধারিত।) আল্লাহর এ বিধান দুনিয়া ও আখেরাতের এক অকাট্য বিধান। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

"যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও ভাল কাজ করবে, তা সে দেখবে (অর্থাৎ তার প্রতিফল পাবেই) আর যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও খারাপ কাজ করবে তা সে দেখবে।"-(সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮)

একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, এখানে কাজ দ্বারা আমরা সেই কাজই বুঝাচ্ছি, যা করা হয় সর্বব্যাপী কল্যাণের নিমিত্ত এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আমরা সেই কাজকে বুঝাচ্ছি না যা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় করা হয় এবং যার ফলাফল করায়ত্ব করে অহংকার ও ঔদ্ধত্যের হিংস্র থাবা।

বস্তুত আল্লাহর এ বিধান অকাট্যভাবে কার্যকর। এমনকি ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রেও তা অভ্রান্তভাবে কার্যকর। আল্লাহ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়ার সুফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করে, আমি তাকে দুনিয়ার সুফল দিয়ে থাকি।" তবে আমাদের বক্তব্য হলো আসল কাজ এবং মানুষের মহত্তম ব্রতের সাধনা নিয়ে। কাজ বা চেষ্টা-সাধনা কোন ভূমি বা সম্পত্তি নয়। আর তার প্রতিদান কোন পদ বা খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করা নয়। প্রকৃত প্রতিদান হলো বাস্তবতার জগতে নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য স্থায়ী কিছু সৎকাজের ভিত্তিস্থাপন করে যাওয়া। একজন মুমূর্ষু বৃদ্ধ রোগীর শিয়রে একবার গিয়েছিলাম। কাল ব্যাধির প্রভাবে তার জীবনের প্রদীপ তখন নিভু নিভু। কি যৌবন, কি বার্ধক্য—সারাটা জীবনই সে নিষ্ফল কাটিয়ে দিয়েছে। জীবনের অধিকাংশ সময় তার পাপাচারেই অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু জনগণের নিকট তার ব্যক্তিত্ব ছিল একাধারে প্রিয় ও ভয়ঙ্কর। রোগের কঠিনতম ক্রান্তিলগ্ন যখন তার নাভিশ্বাস তুলেছে, তখনই আমি তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। রোগীর সাথে আলাপ সেরে আমি যখন বিদায় নিতে যাচ্ছি, তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন ঃ "আমি এখন আমার ফেলে আসা ৬০ বছরের জীবনের দিকে তাকাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, সে ৬০ বছর একটি মাত্র দিনের সমান বা তার চেয়েও কম। এ জীবনের দিকে তাকালে কিছু বেহুদা কথাবার্তা এবং নিছক আমোদ-প্রমোদমূলক কিছু কাজ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। মনে হচ্ছে যেন, সে কাজগুলো নেহাৎ বায়বীয় কল্পনার মত আর আমি তার মাঝখানে একজন অপদার্থ, তুচ্ছ ও অসার মানুষ। দীর্ঘকাল আত্মপ্রবঞ্চনার ফাঁদে আটকা

www.pathagar.com

থেকেছি। আবার বেশ কিছুকাল মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধায়ও প্রতারিত হয়েছি। লোকে আমাকে ভালোবাসতো এবং আমার কাছে ভিড় জমাতো। কিন্তু আজ নিজের দিকে ও ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাই না। মানুষকে উপদেশ দেয়ার সুযোগ থাকলে তাদেরকে বলতাম, যে কাজ অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবে, যে কাজ আমলনামায় ও দাঁড়িপাল্লায় অনন্তকাল টিকে থাকবে, কল্পনার চোখে নয়—বাস্তবতার চোখ দিয়ে নিজের ও আমলনামার দিকে তাকানোর দিন যে কাজ চোখে পড়বে, সেই কাজ কর। এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আহা, যদি একটি দিনের জন্যও সুস্থাবস্থায় ফিরে গিয়ে কিছু কাজ করার এবং নিজেকে গঠন করার সুযোগ পেতাম এবং সেই একদিনের জীবন নিয়ে যদি আল্লাহর কাছে হাজির হতে পারতাম ! আজই যদি তার কাছে হাজির হই তাহলে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করার মত আমার কিছুই নেই, শুধু দীর্ঘ জীবনটা বৃথা কাটিয়ে দিয়েছি—এমন অবস্থাতেই হাজির হতে হবে।"

এ জাতীয় আরো অনেক কথা তিনি বলতে লাগলেন। আমি শুধু তার উপরোক্ত কথাগুলো উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করলাম। একথা কয়টি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, জীবন কোন সহায়-সম্পদ বা ব্যক্তিগত স্বার্থ সুবিধার নাম নয়। জীবন এমন কোন আসবাবপত্রও নয়, যা দ্বারা মানুষ তার কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। জীবন কোন খাদ্য, পানীয় ও পোশাক নয় কিংবা তা কেবল স্থবিরতা, জড়তা, অলসতা ও বিশ্রামের নাম নয়। জীবন হলো চিরস্থায়ী কাজের নাম—যে কাজ সত্যের প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সদগুণাবলীর লালন এবং সামষ্টিক কল্যাণের জন্য করা হয় এবং যে কাজ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়—মানুষকে সন্তুষ্ট করা বা নিজের তৃপ্তি লাভের জন্য নয়। শুধুমাত্র এ ধরনের কাজই জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে চোখে পড়বে—যখন ঐ অনুতপ্ত ব্যক্তির মত অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে।

আসুন, আমাদের প্রিয় নেতা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুশয্যায়ও একবার হাজির হই। তিনিও তখন তার অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। আসুন, দেখি তিনি সেই মুহূর্তে কি দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি স্বীয় জীবনের দিনগুলো, ঘন্টাগুলো এবং মিনিটগুলো পর্যন্ত পরখ করছিলেন। সেখানে তার নজরে পড়ছিল দীর্ঘ কঠিন জিহাদের তৎপরতার বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র। একটি মুহূর্তও বৃথা ও বেহুদা আমোদ-প্রমোদে কেটেছে দেখতে পাননি। এমনকি তার নবুয়াত পূর্ব জীবনের দিনগুলোও নয়। আল্লাহ তাঁকে সে সময়েও শিরক ও সব রকমের গুনাহ থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। সেই সমগ্র সময়টা তার কেটেছে পরম পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্র নিয়ে। তিনি ছিলেন অতিথি পরায়ণ, সত্যবাদী ও অসহায়ের সহায়। ন্যায়নীতি ও সত্যের বিপর্যয় মুহূর্তে

www.pathagar.com

তিনি মুক্তি দূত হয়ে এগিয়ে আসতেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। সে জীবন ছিল এমন যে, তার তুলাদণ্ডে সমগ্র মানবজাতির জীবনকে পরিমাপ করা হলেও তার পাল্লাই ভারী থাকতো। একটি আয়ুষ্কালেই তিনি এত অবদান রেখেছিলেন, যা সহস্র আয়ুষ্কালেও রাখা সম্ভব নয়।

ভেবে দেখুন, সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতা যখন মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও আত্মগঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে তখন তা কি বিরাট কৃতিত্ব দেখায়। বস্তুত যে ব্যক্তি সাধনা ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের কল্যাণার্থেই তাতে লিপ্ত হয়। এ ধরনের লোক যখন আল্লাহর কাছে হাজির হয়, তখন সাথে নিয়ে যায় কর্মময় জীবন, সাথে নিয়ে যায় বিরাট বিরাট কীর্তি। সাথে নিয়ে যায় এমন এক মানবীয় সত্তা—যা আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় দুনিয়ার তাবৎ পাহাড় পর্বতের চেয়েও ভারী। পক্ষান্তরে যারা নিরেট ও ফাঁপা এক সত্তা ও কর্মহীন এক জীবন নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হয়, সেইসব অবোধ ও অপদার্থ মানুষের বিপর্যয় অনিবার্য।

আমরা যেসব কথাবার্তা বলি, তা নিজের ইতিহাস নিজেই রচনা করে। আর যেসব কাজ আমরা করি, তাহলো ঐ ইতিহাসেরই ছত্র। চায়ের জমজমাট আসর, বেহুদা আলোচনার আড্ডা, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার সরগরম মজলিস, নিষ্ফল আমোদ-প্রমোদের উৎসব, উদাসীন ও উদ্দেশ্যহীন গতিবিধি ও তৎপরতা —এসবই পানির ওপর আঁকা ছবি এবং হাওয়ার ওপর রশী বাঁধার মতই। এরপর আপনার কাছে গুরুগম্ভীর কৈফিয়ত তলব করা হবে যে, আপনার জীবন ও যৌবন কিসের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে এসেছেন।

আমি বুঝতে পারি না মানুষ কবে এ কাল নিদ্রা থেকে জাগবে, কবে চেতনা ফিরে পাবে এই ঘনঘোর উদাসীনতার মায়াজাল থেকে।

জেনে রাখা দরকার যে, কাজে ডুবে থাকাই আল্লাহর বিধান। কর্মঠ, পরিশ্রমী ও সদাতৎপর লোকের হাতেই তিনি তুলে দেন দুনিয়ার কর্তৃত্বের চাবিকাঠি। অলস, কর্মবিমুখ, পেটপূজারী, ভোগবাদী ও গর্বিত লোকেরা আল্লাহর বিধানের বাইরে। এ ধরনের লোকেরা কষ্টদায়ক কীট ও রোগবাহক জীবাণুর মত প্রাণী দেহের জন্য ক্ষতিকর ও তৈরী ঘরবাড়ীর জন্য ধ্বংসাত্মক।

অনুরূপভাবে কর্মফল অনিবার্য—এটাও আল্লাহর শাশ্বত বিধি। আগেই বলেছি, কর্মের ফল সম্পদ বা ভূমি নয়। কর্মের আসল ফসল হলো সৎগুণের লালন, সত্যের শক্তি ও প্রতাপ এবং সাম্য, পরোপকার ও জনকল্যাণের প্রতিষ্ঠা। সৎকাজের এটাই ন্যায্য ফসল। কোন কাজই নিষ্ফল যায় না। কাজের স্বভাব ধর্মের মধ্যেই তার অনিবার্য ফল নিহিত থাকে। যদি কেউ তার কাজের ফল

www.pathagar.com

দেখতে না পায় তার জানা দরকার যে, কাজের ফলপ্রসু হওয়ার একটা নির্ধারিত সময় আছে—যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে কোন অবস্থাতেই তাকে তার কাজের ফল প্রকাশিত হতে না দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় না।

যারা বিনা কাজে ও বিনা শ্রমে প্রতিদান লাভ করার আশায় বিভোর, তারা এক অদ্ভুদ শ্রেণীর লোক। তারা ইট ছাড়াই অট্টালিকা গড়া এবং বাক্য ব্যবহার না করেই ইতিহাস লেখার অভিলাসী। কোন বাস্তবধর্মী জীবনে এটা সম্ভব নয়। এটা শুধু কল্পনাবিহারী জগতেই সম্ভব। বাস্তবধর্মী জীবনে মানুষের প্রতিটি ক্ষুদ্র বৃহৎ কাজের হিসেব নিয়েই প্রতিদান দেয়া হয়ে থাকে। একটি কণিকাও তাঁর তুলাদণ্ডের পরিমাপ থেকে বাদ যায় না।

অনেকে আছেন, জীবনে সাফল্য চান, সত্যের বিজয় দেখতে চান। অথচ তার পথ ও পন্থা কি জানেন না। তাই তারা বসে বসে কেবল ভাবেন কি কাজ করবো। তাদের জানা দরকার যে, প্রতিটা কথাই শ্রম, প্রতিটা পদক্ষেপই কাজ, প্রতিটা চলনবলনই তৎপরতা, প্রতিটা পরামর্শ এবং নির্দেশই কর্ম। এক কাজ হাজারো কাজের পথ উন্মুক্ত করে, এক তৎপরতা বহুবিধ তৎপরতার জন্ম দেয়। তার কাজ শুধু উদ্যমী হওয়া, সক্রিয় হওয়া, উদ্যোগী হওয়া, কর্মচঞ্চল হওয়া এবং অলসতা ও আড্ডা দেয়ার পুরানো অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা। কাজে নিয়োজিত থাকাই যে আল্লাহর বিধানের দাবী, সে কথা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কথা এবং কাজের বেলায়ও সত্য। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ○

"আল্লাহ এক কণা পরিমাণও জুলুম করেন না। যদি কোন ভাল কাজ করা হয় তবে তিনি তাঁর সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার দেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪০)

শর্ত শুধু এই যে, কাজটা করা চাই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং সত্যের সেবার উদ্দেশ্যে। যে ব্যক্তি কাজ করতে চায় সে কখনো তার পথ অবরুদ্ধ দেখতে পাবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ○

"যারা আমার পথে সাধনা করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ দেখাবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।"

–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৬৯)

www.pathagar.com

সবশেষে যে কথাটা বলতে চাই তা এই যে, সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতা যাকে কর্মে উদ্দীপিত করে, সে কার্যত সমগ্র দুনিয়ার সহায়-সম্পদ, কর্তৃত্ব, রাজত্ব ও প্রাসাদসমূহের চাবিকাঠি তার হাতে সমর্পণ করে। কাজেই তার কাছে কি বিরাট আমনত গচ্ছিত রাখা হলো, তা তার ভেবে দেখা উচিত। এই চাবিকাঠির বলেই ইসলামী দাওয়াতের শ্রেষ্ঠতম নায়ক সারা দুনিয়ার সহায়-সম্পদ ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিলেন এবং পরবর্তী দাওয়াতকারীরাও বহু অকল্পনীয় নিয়ামতের মালিক হয়েছিলেন। সুতরাং এই চাবিকাঠি দ্বারা কি কি অর্জন করবেন এবং কি কি বর্জন করবেন, দুনিয়ার কি কি কর্তৃত্ব হস্তগত করবেন এবং কি কি করবেন না, তাই ভেবে দেখুন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, নিজের সামনে অফুরন্ত কল্যাণের ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও মানুষ স্বেচ্ছায় তা গ্রহণে বিরত থাকে, বিজয় ও সাফল্য তার দোরগোড়ায় থাকা সত্ত্বেও সে তা থেকে দূরে অবস্থান করে এবং আপন সত্তা সংক্রান্ত নিগূঢ় তত্ত্ব তার কাছে উন্মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে তার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। বস্তুত পরিশ্রম ও কর্মই হলো বিজয় ও সাফল্যের একমাত্র উৎস, ইজ্জত ও সম্মান লাভের একমাত্র উপায় এবং সৌভাগ্য ও নেতৃত্ব লাভের একমাত্র পন্থা। আহা, এই সহজ সত্যটা যদি মানুষ বুঝতো !

৪—দাওয়াতকারীর সমগ্র কর্মক্ষেত্রটা আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ আলোর উপস্থিতিতে সে কোন হতাশা বা নৈরাশ্য অনুভবই করে না।

একথাও বলতে পারেন যে, সামনে বিদ্যমান প্রতিটি মানুষই আপনার মনে আস্থা জন্মায় এবং প্রতিনিয়ত আপনার আশা-ভরসাকে পুনরুজ্জীবিত করে। একথাও বলা ভুল হবে না যে, মানুষই আশা-ভরসার বাস্তব ভিত্তি। কিন্তু তবুও মনে রাখতে হবে যে, এ আশা-ভরসা ও আস্থা সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতারই দুর্লভ অবদান ও নিগূঢ় রহস্য।

এই আশার প্রকৃত তাৎপর্য কি, সে বিশ্লেষণে আমি যেতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে, বাস্তবায়নের সহজাত ক্ষমতা ও প্রবণতা দাওয়াতকারীর মনকে এমন এক তৃপ্তিকর ও মজাদার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ করে দেয়—যা আগাগোড়াই তাকে এই বিশ্বাসে উজ্জীবিত করে যে, সে নিশ্চিতভাবে এক অতীব উর্বর ময়দানে অবস্থিত। সে ঠিক সেই কৃষকের মতই নিশ্চিত থাকে যে কৃষক নিসন্দেহে জানে যে, তার বীজ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের এবং অংকুরোদ-গমের পূর্ণ যোগ্যতা তার আছে, সে জানে যে, তার জমী অত্যন্ত শক্তিশালী ও উর্বর এবং আবহাওয়া ও সামগ্রিক পরিবেশ তার জন্য সহায়ক ও অনুকূল। কৃষকের এই নিশ্চিত বিশ্বাস ও অনুভূতিকে কি নামে আখ্যায়িত করবেন, সেটা আপনিই ভেবে দেখুন। একে কি আশা বলবেন ? আসলে কিন্তু এটা আশার চেয়েও উর্ধের জিনিস। আশা তো কখনো কখনো নিস্ফলও হয়ে থাকে ; আশা অনেক সময় প্রতারণাপূর্ণ কামনা-বাসনা এবং অবাস্তব কল্পনায় পরিপূর্ণ থাকে।

www.pathagar.com

আশা অনেক সময় মানুষকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তিতে ভালো কিংবা মন্দ ধারণা দিয়ে থাকে। বিশেষত তা মানুষের দৃষ্টিকে কেবল ভবিষ্যতের সুফল প্রত্যাশার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে রাখে—বর্তমানের কোন সুফল লাভের ধারণা দেয় না। পক্ষান্তরে আলোচ্য কৃষক তার ফসল সম্পর্কে যে অনুভূতি পোষণ করে তা আসলে অটল বিশ্বাস। সন্দেহ-সংশয় তার ধারে কাছেও ঘেষে না। কেননা তার বীজ নিখুঁত, মাটি উর্বর এবং আবহাওয়া দুর্যোগমুক্ত ও অনুকূল। এ কৃষক আর কেউ নয়—সত্যের দাওয়াতদাতা। জনগণের মধ্যে সে যে মহান আদর্শ প্রচার করে, সেটাই তার বীজ। আর মানুষের সহজাত সত্যানুরাগ ও বিকারমুক্ত বিচারবোধ ও বিবেকই হলো তার বীজ বপনের ক্ষেত্র বা জমী। এই বীজ যখন ঐ মাটির গভীরে প্রোথিত হয় তখন তা তার লালন ও বিকাশ ঘটায় এবং তার সাথে কল্যাণমুখী উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংযোগ ঘটায়। আর আবহাওয়া ও পরিবেশের আনুকূল্য হলো আল্লাহর প্রতিপালন প্রক্রিয়া। আর প্রতিপালন ও অভিভাবকত্বের ব্যাপারে আল্লাহই যথেষ্ট।

এই পরিচ্ছেদের শুরুতে আমি বলেছি যে, দাওয়াতকারীর উপলব্ধির স্পষ্টতম লক্ষণ হলো এই যে, সে তার আল্লাহপ্রদত্ত আদর্শ ও তা প্রচারের ব্রতকে সত্য বলে বুঝবে এবং তা ছাড়া অন্য সবকিছুকে বাতিল বলে বিশ্বাস করবে। আর হক ও বাতিলের মধ্যে এতটা স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হবে, যতটা স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে স্বপ্নে দেখা দৃশ্য ও চর্মচোখে দেখা বাস্তব জগতের দৃশ্যের মধ্যে।

তাই দাওয়াতকারী তার দাওয়াতী কর্মক্ষেত্রে গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, তার কাছে যে আদর্শ ও বাণী রয়েছে, সেটাই একমাত্র ফলপ্রসু জিনিস। আর এ ছাড়া অন্য যা কিছু, তা তার জন্য ফলদায়ক নয়। কেননা এ নিছক অলীক কল্পনা—যার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। ব্যাপারটাকে এভাবেও তুলনা করে দেখা যেতে পারে যে, একটি হলো ভালো বীজ বপনকারী কৃষকের অনুভূতি আর অন্যটি পচা বীজ বপনকারী কৃষকের অনুভূতি বিশেষত বীজ যে পচা সে কথা যখন সে বুঝে। এভাবেও তুলনা করা যেতে পারে যে, একজন ভালো বীজ বপন করে আর অন্যজনের হাতে কোন বীজই নেই, তবু সে প্রথম ব্যক্তির বপনক্রিয়ার অনুকরণে খালী হাত শূন্যে ঘুরিয়ে বীজ বপনের ভান করে মাত্র। এ দুইজনের মধ্যে কে হক এবং কে বাতিল?

এটা ভাবা উচিত হবে না যে, আমরা নিছক কল্পনাপ্রসূত অনুমান নিয়ে অনর্থক কথার জাল বুনছি। আমরা বরং আপনার সামনে বাস্তব ব্যাপার স্পষ্ট করে তুলে ধরছি। এতদসত্ত্বেও আমরা বুঝি যে, আমরা যেটা ব্যক্ত করতে চাই তা পুরোপুরি ব্যক্ত করতে পারিনি। কেননা সেটা আমাদের সাধ্যের অতীত।

www.pathagar.com

দাওয়াতকারী নিজের দাওয়াতকে অকাট্য সত্য এবং তা ছাড়া অন্য সবকিছুকে স্বপ্নীল কল্পনা মনে করে। আর তার কাছে যে মহাসত্য রয়েছে তাকে সে বীজ মনে করে। আমি একথা বলছি না যে, এ বীজে ভবিষ্যতের নিশ্চিত ফসল নিহিত রয়েছে। বরং ওটা একই সাথে বীজও, আবার ফসলও। অর্থাৎ বর্তমানেই তাতে ফসল রয়েছে। একটা দুর্বোধ্য জিনিস বুঝবার জন্য পাঠককে টানা-হেচড়া করা আমাদের ইচ্ছা নয়। আমরা শুধু ফেরাউনের যাদুকরদের যে ঘটনা আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, তার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মূসা (আ) যে মহাসত্যকে মাটিতে নিক্ষেপ করেছিলেন, যাদুকররা তাকে সত্য বলে অনুধাবন করেছেন কেবল তখন—যখন তারা মু'মিন হয়ে সিজদায় পড়েছেন। এখন আপনার কি মনে হয় যে, যাদুকররা প্রথমে সত্য দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন, অতপর তার বীজ তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে ধারণ করেছেন, অতপর পর্যায়ক্রমে সে বীজ অংকুরোদগম হয়ে বড় হয়েছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তা সিজদা ও ঈমানের ঘোষণার আকারে ফল প্রসব করেছে ? না, ফলটা বীজের মধ্যেই উপস্থিত ছিল ? যেমন আল্লাহর বর্ণনায় এই শেষোক্ত ধারণাটাই পরিস্ফুটিত হয়েছে ঃ

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ○

"মূসা তাঁর লাঠি ছুড়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তা যাদুকরদের বানানো সমস্ত কিছু (সাপ) গিলে ফেলতে লাগলো।"-(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ৪৫)

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ○ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ○ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ○

"তাৎক্ষণিকভাবে সত্য জাহির হয়ে গেল এবং ফেরাউন ও তার সমর্থক গোষ্ঠীর কার্যব্যবস্থা বাতিল প্রমাণিত হলো। এর ফলে যাদুকররা সেখানে পরাজিত হলো এবং মাথা নত করলো। যাদুকররা সিজদায় পড়লো। তারা বললো ঃ আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক।—(সূরা আল আরাফ ঃ ১১৮-১২২)

এখানে যে মহৎ ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে আমরা এরই পক্ষপাতি। এখানে যে গভীর উপলব্ধির স্মরণ ঘটেছে আমরা একেই দাওয়াতকারীর হৃদয়ের বদ্ধমূল অনুভূতি বলে আখ্যায়িত করি। এ অনুভূতি কখনো কোন নৈরাশ্য ও হতাশাকে পাত্তা দেয় না। বরং আরো এক ধাপ এগিয়ে বলা যায় যে, এটা প্রত্যয়ের সেই তীব্র আলোর রশ্মী, যা বীজের মধ্যে লুক্কায়িত ফল তাৎক্ষণিক-

www.pathagar.com

ভাবে প্রত্যক্ষ করে। অথচ অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী লোকেরাও তা দেখতে পায় না ।

একবার এক পল্লী অঞ্চলের বাসে চড়ে আমি ইসলামী আন্দোলনের এক শীর্ষস্থানীয় নেতার সাথে সফরে যাচ্ছিলাম । আমাদের বহনকারী বাসটি এক ট্রাফিক পোস্টে থামলো । ট্রাফিক পুলিশটি আরোহীদের গণনা করলো এবং যথারীতি চেকিং এর দায়িত্ব সম্পন্ন করলো । এই সময় পুলিশের কাছে বসা এক ব্যক্তি নেতার কাছে এগিয়ে এলো তাকে সালাম করলো এবং তার হাতে চুমু খেল। অতপর তাদের দু'জনের মধ্যে যে সংক্ষিপ্ত আলাপ বিনিময় হলো তা নিম্নরূপ।

—আপনি অমুক না ?

—হ্যা। আপনি কে ?

—আমি অমুক। এই গ্রামের বাসিন্দা। এখানেই আমার পরিবার থাকে।

—আপনি আমাকে চিনলেন কি করে ?

ইম্বাবায় ইখওয়ানুল মুসলিমুনের এক শাখায় আপনাকে বক্তৃতা করতে দেখেছি। আমি একজন শ্রমিক। অর্থ উপার্জনের জন্য সেখানে থাকি। মাঝে মাঝে ঐ শাখায় যেয়ে থাকি। কয়েকদিনের জন্য পরিবার পরিজনকে দেখতে এখানে এসেছি।

ইতিমধ্যে ট্রাফিক পুলিশ তার প্রথাসিদ্ধ দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। আমাদের বাস আবার চলতে আরম্ভ করলো। নেতা আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ

এই গ্রামে ইখওয়ানের একটা শাখা গঠিত হয়েছে। আমি অবাক হয়ে বললাম ঃ ঐ লোকটাই কি এই শাখার কথা আপনাকে বলেছে—যা আমি শুনতে পাইনি ?

তিনি বললেন ঃ না। তবে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে যেটুকু কথা এখানে হলো তা আল্লাহ বৃথা যেতে দেবেন না। লোকটা একটু পরেই তার সাথীদের কাছে গিয়ে বসবে। তারা জিজ্ঞেস করবে তুমি যাকে সালাম দিলে উনি কে ? তখন সে বলবে উনি অমুক তখন তারা আবার জানতে চাইবে যে উনি কি করেন ? জবাবে সে আমি কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকি এবং কি কি বলি তা বলবে।

নেতা বললেন ঃ হকের দাওয়াতের প্রসঙ্গে এই যে কথাটুকু হলো বা যে উৎকৃষ্ট বীজ উৎকৃষ্ট ভূমিতে বপন করা হলো, আল্লাহ যেন তা থেকে আমাদেরকে উত্তম ফল দেন ।

ভেবে দেখুন এই সামান্য বাক্যালাপ থেকে বিজ্ঞ নেতা কি ভাবে কত সুন্দর ও নিটোল সত্য বের করে এনেছেন।

www.pathagar.com

অতপর আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, বিজ্ঞ দাওয়াতকারী যখন ঐ ক্ষুদ্র কথাবার্তার মধ্যে এতগুলো চমকপ্রদ তত্ত্বের সন্ধান পেলেন। তখন তার মন কোন অনুভূতি ও উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল ?

এর জবাব এই যে, তাৎক্ষণিক প্রতিদান ও নগদ ফল লাভের অটুট আস্থা এবং সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব জীবনের ওপর তার অনিবার্য প্রভাব সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় দ্বারা তার মন পরিপূর্ণ ছিল। সত্য দ্বীন সংক্রান্ত একটা অতি সংক্ষিপ্ত আকারের কথাবার্তার ব্যাপারে যখন তার অনুভূতি এ রকম তখন অনেক বড় ও বিস্তারিত ভাষণের ব্যাপারে তার অনুভূতি ও আস্থা কি রকম হতে পারে তা সহজেই বুঝা যায়।

একথা বলবেন না যে, কথা বেশী হওয়ার কারণেই তাঁর অনুভূতি এত বিরাট ও দৃঢ় হয়ে থাকে। কেননা সত্য সত্যই। কথা বেশী বা কম বলার দ্বারা তা মজবুত বা দুর্বল হতে পারে না। একটি মাত্র কথায় যে সত্যের স্ফুরণ ঘটে, তা অনেক লম্বা চওড়া কথায় প্রতিফলিত সত্যের চেয়ে কম গুরুত্ববহ হয় না।

এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, একজন যথার্থ দাওয়াতকারী তাঁর দাওয়াতী ভাষণে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের মূল্য কত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে উপলব্ধি করে থাকেন। অনুরূপ তার শোনা সত্য ভাষণেরও প্রতিটি শব্দের গুরুত্ব সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন। ফলে যে কথায় অন্যদের মধ্যে কোন চমক সৃষ্টি হয় না, কোন আলোড়ন, উল্লাস ও সাড়া জাগে না, সে কথাতেই তিনি মুগ্ধ হন, উল্লসিত ও অনুরণিত হন, আলোড়িত ও চমৎকৃত হন এবং যে কথায় অন্যরা তেমন কোন ভালো উপাদান দেখতে পায় না, সে কথাতেই তিনি অমূল্য রত্ন খুঁজে পান। একে শুধু আশাবাদ বলা যথেষ্ট নয়। এটা আশাবাদের চেয়ে উর্ধের এবং তা থেকে ভিন্নতর জিনিস। এর নাম অন্য যা খুশী দিতে পারে না —যদি 'প্রত্যয় ও আস্থার আলো' বলে আখ্যায়িত করা আপনার মনোপুত না হয়—যদি তাকে নগদ ফল ও তাৎক্ষণিক প্রতিদান প্রাপ্তির বিশ্বাসজনিত প্রশান্তি ও হর্ষোৎফুল্লতা বলতে না চান।

এসব লোককে কখনো বিসাদ, হতাশা ও নৈরাশ্যের শিকার হতে দেখেছেন কি ? না, তাদের মধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহের ফলে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট আনন্দের হিল্লোল এবং সত্যের অটুট শক্তি থেকে উৎসারিত উচ্চাকাংখা ও অজেয় মনোবলের সার্বক্ষণিক প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায় ?

জেনে রাখবেন, দাওয়াতকারী যে আদর্শ ও মর্মবাণীর দিকে মানুষকে ডাকে, তার প্রতি তার যেমন আস্থা থাকে, সমাজের সরলমতি মানুষের সহজাত সত্যপ্রীতি ও সত্যানুরাগের প্রতিও তার তেমনি আস্থা থাকে। তাই

www.pathagar.com

তাকে সবসময় দেখবেন, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সকলকেই দাওয়াত দেয়। কেননা সে সকলের স্বভাব প্রকৃতিতেই উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট ও কল্যাণমুখী প্রবণতার প্রত্যাশা করে। কারো কাছ থেকেই সে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার প্রত্যাশা করে না। একজন কৃষক তার সেই উর্বর জমি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে না—যে জমির শক্তি ও সুস্থতার সকল লক্ষণ প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত। সুতরাং মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাব সম্পর্কে দাওয়াতকারীর ধারণাই বা খারাপ হবে কিভাবে ?

বস্তুত মানুষের প্রকৃতিগত সুমতি এক অমোঘ সত্য। এটা আল্লাহর বিধান। কাজেই যখন কোন মানুষকে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে দেখা যাবে, তখন বুঝতে হবে তার প্রকৃতি তা প্রত্যাখ্যান করেনি। বাতিলের প্রতি কিছু ঝোঁক ও আকর্ষণ এবং কামনা ও প্রবৃত্তির কিছু পর্দা তার প্রকৃতিকে দাওয়াত গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র উক্তি শুনুন ঃ

"প্রত্যেক নবজাতক স্বাভাবিক সুমতি ও সত্যস্পৃহা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃস্টান বা অগ্নি উপাসক বানায়।"

আল্লাহ হযরত মূসা ও হারুনকে যে ফেরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন, তা একথা জেনেই পাঠিয়েছিলেন যে, অতবড় আল্লাহদ্রোহী স্বৈরাচারীরও মনের গভীরে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি একটা সুপ্ত ঝোঁক রয়েছে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন ঃ হয়তো সে উপদেশ মানবে কিংবা ভীত হবে। মোদ্দাকথা এই যে, একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান দাওয়াতকারী সকল মানুষকেই সাদরে গ্রহণ করে থাকে। জন্মগত সুমতি ও সত্য গ্রহীতার দিক দিয়ে সকলেই তার কাছে সমান। যে সত্যের দিকে সে আহ্বান জানায় তার প্রতিষ্ঠার বিপুল সংখ্যক সহযোগী ও অনুগামী সে জনগণের মধ্য থেকে পেয়ে যাবে, এ ব্যাপারে সে শুধু আশাবাদীই নয়, দৃঢ়প্রত্যয়ীও হয়ে থাকে। কেউ যখন তার দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে কিংবা অপ্রীতিকর জবাব দেয়, তখন অন্য সকলেও তাই করবে, এরূপ ধারণা সে পোষণ করে না। কেননা সে বুঝে যে, সকলের মধ্যেই সহজাত সত্যপ্রীতির একটা গুণ সুপ্ত আছে। আর এই সত্যই হলো সকল আশা-ভরসা, আস্থা ও বিশ্বাসের উৎস। তাই তাকে দেখা যাবে, একজনের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েও নতুন আশা ও নতুন আস্থা বুকে নিয়ে অন্যদেরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। যেন প্রত্যেক স্বভাব ও প্রত্যেক মুখ তাকে এই বলে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ঃ এসো, এখানে তোমার একজন সমর্থক আছে। এই সমর্থককে কিছুতেই হাতছাড়া করো না। রসূলের (সা) নবুয়াতের একাদশ বর্ষে সংঘটিত একটি ঘটনায় এ বক্তব্যের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

হজ্জের মওসুমে মক্কায় আগত বিভিন্ন আরব প্রতিনিধি দলের কাছে গেলেন। বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠী থেকে আগত এই বিপুল সংখ্যক লোকের

www.pathagar.com

বিভিন্ন পাহাড়ে ও উপত্যকায় স্থাপিত শিবিরে তিনি হাজির হলেন। তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে দিতে শিবির থেকে শিবিরান্তরে যেতে লাগলেন। এ সময় তার বয়স ৫১ বছর অতিক্রম করেছে। সমগ্র হজ্জের মওসুম জুড়ে এক একদিন এক এক শিবিরে ঘুরে ঘুরে দাওয়াত দিতে লাগলেন। এ কাজে তার সারা দিন প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত মরুভূমির বালুকারাশী কিংবা উত্তপ্ত প্রস্তরের স্তুপ পাড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছিল। প্রতিনিধি দলসমূহের বৈঠকাদিতে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর সাথে মত বিনিময় করতেন, আলাপ আলোচনা চালাতেন। অতপর কেউবা ভালোভাবে কেউবা অভদ্রভাবে তাঁর দাওয়াত অগ্রাহ্য করতো এবং দিন শেষে খালি হাতে ফিরতেন।

হজ্জের মওসুম প্রায় শেষ হয়ে এল। লোকদের এখন মক্কা থেকে বিদায় নেয়ার পালা। তখনো রসূলুল্লাহ (সা) কিছুমাত্র সাফল্য লাভ করেননি। ঠিক এই সময়েও, মওসুমের শেষ দিনগুলোতে যখন সবাই পাত্তাড়ি গুটাতে ব্যস্ত, তখনো তিনি নিজের কাজ নিয়ে সমানে এগিয়ে চলেছেন। মানুষ অস্বীকার করে চলেছে, তাতে তার কোন অবসাদ নেই, মওসুম নিষ্ফল চলে যাচ্ছে, তাতেও তার কোন হতাশা নেই। প্রতিদিন তিনি নতুন নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাত করে চলেছেন, নবতর আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে নতুন নতুন মুখের সন্ধান করে চলেছেন। একদিন রসূল (সা) বিভিন্ন শিবির ঘুরে বৈঠকাদি সেরে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের ভারে নুয়ে পড়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে ফিরছেন। এমন সময় দূর থেকে ছয়জন মদিনাবাসীকে দেখলেন। তাদেরকে তখনো দাওয়াত দেয়া হয়নি।

এরূপ অবস্থায় আমাদের কেউ পড়লে সারা দিনের শ্রম বৃথা যাওয়াতে সে ভীষণ ক্ষুব্ধ হতো। সকলের কাছ থেকে বিরক্তির সাথে সটকে পড়তো। ক্লান্তি ও অবসাদের আতিশয্যে হয়তো ঐ ছয়জন সম্পর্কেও সে হতাশার শিকার হতো —যেমন মওসুমের গোটা জনসমাবেশ থেকেই তাকে হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছে। পঞ্চাশোর্ধ বয়সের ভারে নুয়ে পড়া দেহ নিয়ে আমাদের কেউ যদি খরতপ্ত দীর্ঘ দিন বৃথা খাটুনি খেটে পড়ন্ত বেলায় এভাবে খালি হাতে ফিরতো, তাহলে ঐ ছয়জনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম নেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তো।

ঐ ছয়জনকে চুল কামিয়ে গোছগাছ করতে দেখে আমরা কেউ নিশ্চয়ই এই বলে সটকে পড়তাম ঃ ইস্, সব কাজ সেরে নির্ঞ্ঝাট বসে থাকা লোকগুলোকে যেখানে একটা কথাও শুনাতে পারলাম না, সেখানে এই চুল কামানোর কাজে ব্যস্ত লোকগুলো আর আমার কথা কি শুনবে ? আমাদের কেউ হলে নাক কুচকে সেখান থেকে চলে যেত। দাওয়াত দিতে যেত না খেউরীতে ব্যস্ত লোকদের মজলিসে।

www.pathagar.com

কিন্তু রসূল (সা) থামলেন। বয়সের ভারত্ব, নবুয়াতের মাহাত্ম্য ও প্রত্যয়দীপ্ত উজ্জ্বল মুখ নিয়ে তিনি ঐ ছয়জনের কাছে চলে গেলেন।

আল্লাহর কি অপার মহিমা ! এই ছয়জনই ছিলেন প্রথম আকাবার বায়য়াতকারী এবং এদেরকে ভিত্তি করেই মদীনায় গড়ে উঠেছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্দোলনের ইতিহাসখ্যাত ত্যাগী আনসার বাহিনী। এই ছয়জনই আরবে হিজরতোত্তর ইসলামের নবযুগের পত্তন ঘটিয়েছিল।

এখানে আমি পাঠককে এই উদাহরণ নিয়ে শুধু চিন্তা করার পরামর্শই দিচ্ছি। ভেবে দেখা দরকার যে, এই ঘটনার কি গভীর তাৎপর্য এবং কত সুদূর প্রসারী প্রভাব। এ উদাহরণের শিক্ষা শুধু এতটুকুই নয় যে, রসূল (সা) এই ছয়জনের কাছ থেকে আনুগত্য লাভ করেছিলেন। বরং এর আসল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, দাওয়াতকারী যখন প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে দাওয়াতের কাজে তৎপর হয়, তখন সে যত ক্লান্তি ও অবসাদে আক্রান্ত হোক এবং যত নৈরাশ্যকর অবস্থারই সম্মুখীন হোক, তার দাওয়াত নিষ্ফল ও বৃথা যেতে পারে না এবং তা অকাট্য সত্য—এ অটল বিশ্বাস তার মন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও দূরিভূত হয় না। আর এ বিশ্বাস যখন তার মধ্যে অবিচল থাকে, তখন তার প্রতি কেউ ঈমান আনুক বা না আনুক, কিংবা ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক তাতে কিছুই এসে যায় না।

উক্ত বিশ্বাস ও প্রত্যয় সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। চাই দাওয়াতকারীর দাওয়াত কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক। কেননা মানুষের গ্রহণ করা এক কথা, আর দাওয়াতকারীর মনে তার সত্যতা সম্পর্কে অবিচল বিশ্বাস থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। লোকেরা তাকে গ্রহণ করে বলে তা সত্য, আর প্রত্যাখ্যান করে বলে তা মিথ্যা—এটা কোন যুক্তি নয়।

একটু আগেই এক শীর্ষস্থানীয় দাওয়াতী ব্যক্তিত্বের ঘটনা উল্লেখ করেছি। যে দাওয়াতী শাখা গঠিত হবার প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, তা পরে আর গঠিত হয়নি। তাই বলে কি তার দাওয়াতের যথার্থতা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ন হয়েছে বা তার সেই প্রত্যয়ের সত্যতা বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে করেন ?

মনে করুন আপনার কাছে কিছু নগদ টাকা আছে। আপনি ইচ্ছা করলে তা দিয়ে রুটি কিনে টাকাকে রুটিতে পরিণত করতে পারেন। ইচ্ছা করলে তাকে কাপড়ে কিংবা অস্ত্রেও পরিণত করতে পারেন। অর্থাৎ, যা কিনতে পাওয়া যায়, তা কিনবার ক্ষমতা ঐ টাকার আছে। বাজারে যদি রুটি, কাপড়, অস্ত্র কিংবা আপনি অন্য যা কিনতে চান তা না পান, তাহলে টাকা তার ক্রয় ক্ষমতা

www.pathagar.com

তো হারালো না। ক্রয়ক্ষমতা সহকারেই তা আপনার কাছে সুরক্ষিত থাকবে। যতক্ষণ না কাংখিত জিনিস কিনতে পাওয়া যাবে ততক্ষণ তার মূল্যমান বজায় থাকবে।

সত্য দ্বীনের অবস্থাও তদ্রূপ। এটা এ বিশ্বজগতের সচল নগদ মুদ্রা। এটাই বিশ্বজগতের নিয়ম-নীতি ও সুষ্ঠু শৃংখলার রক্ষক। যে ব্যক্তিই এ মুদ্রার অধিকারী হবে, সে হবে ধনী। যে কোন জিনিস কিনতে সে সক্ষম। সক্ষম ধনিকদের যে অনুভূতি ও আত্মবিশ্বাস থাকার কথা, তার মধ্যেও তা আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থাকবে। আর এই একমাত্র সচল মুদ্রা যার নেই, সে গরীব অসহায়। গরীব অসহায়দের মনে যে অসহায়ত্ববোধ থাকার কথা, তার মধ্যে তা অবশ্যই থাকবে। এই বিশ্বাস, আস্থা ও প্রত্যয়ের অনুভূতি যার আছে, সে জানে যে তার জীবন সত্য, সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত। এ অনুভূতি আমাদেরকে উল্লিখিত সবকয়টি সম্পদের অধিকারী করে। কেননা যার মধ্যে উক্ত অনুভূতি আছে, সে উক্ত অনুভূতির কল্যাণেই দুইটি সুমহান গুণে ভূষিত হয়। প্রথমত, সে যখনই কোন কাজ করে তখন একথা উপলব্ধি করে যে, মুদ্রার অভ্যন্তরে যেমন রুটি উপস্থিত থাকে, ঠিক তেমনিভাবে তার কাজের অভ্যন্তরে তার ফলাফল লুকিয়ে আছে। এ উপলব্ধির কারণে তার জীবন বিরাট বিরাট সৎকর্মে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্য কথায় বলা যায়, তার জীবন রকমারি সম্পদে সমৃদ্ধ হয়। তাই তার দাওয়াতী তৎপরতায় শৈথিল্য, আলাপ-আলোচনায় সংকোচ এবং আন্দোলনে ও অগ্রাভিযানে অনীহা প্রদর্শন কল্পনারও অতীত। বিশেষত তা যখন সত্যের জন্য তথা দ্বীনের জন্যই নিবেদিত। এ ধরনের স্থবিরতা শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা দেয়া সম্ভব যার মধ্যে টাকা-পয়সার আকাংখা ও ঘৃণা একই সময়ে বিদ্যমান বলে ধরে নেয়া যায়। টাকার মূল্যমান সম্পর্কে বিশ্বাস এবং সত্যের মূল্যমান সম্পর্কে বিশ্বাস মূলত একই রকম। তবে সত্যের সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তি ও অর্থোপার্জনের সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তি এক রকম নয়। অর্থোপার্জনের সাধনাকারীর চেষ্টা-সাধনা কখনো ব্যর্থ হতেও পারে। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠাকামীর চেষ্টা-সাধনা তার নিয়ত তথা আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্য-নিষ্ঠার ওপর নির্ভরশীল। নিয়ত যদি সৎ থাকে তাহলে তার কাজ করাটাই সাফল্য। কেননা কাজই হলো সম্পদ। এ সম্পদকে সচল মুদ্রা বানানোর কারখানা হলো মন। তাই মন থেকে যে কথা তৈরী হয়ে বেরুবে এবং যে কাজের ওপর মনের সিল মারা থাকবে (অর্থাৎ যে কাজ সৎ উদ্দেশ্যে ও সৎ নিয়তে করা হবে) সে কথা ও সে কাজ সত্যের সচল মুদ্রা এবং তা সত্য নিষ্ঠার সম্পদ। ঐ সিল না থাকলে তথা সদুদ্দেশ্যে ও সৎ নিয়তে না বলা ও না করা হলে সে কথা ও কাজ আল্লাহর জগতে মূল্যহীন ও অচল।

www.pathagar.com

একজন বিজ্ঞ ও উত্তম দাওয়াতকারী তিনিই—যিনি সত্যের মূল্য জানেন এবং সত্য না হলে যে তিনি ও সমগ্র মানবজাতি বাঁচতে পারে না, তা উপলব্ধি করেন। আর উপলব্ধি করেন বলেই তা অর্জন, তার প্রতিষ্ঠা ও তার পক্ষ সমর্থনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। আর এই চেষ্টা ও সাধনা চালানোর সময় তিনি অনুভব করেন যে, এ সম্পদ তার বেশী করে সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং তার যথেষ্ট অবকাশও রয়েছে। এবার তাহলে চিন্তা করুন, এ ধরনের লোক কি কখনো হতাশ হতে পারে, না, তার সংকল্প প্রতিনিয়তই মজবুত হতে থাকে?

দ্বিতীয়ত, সত্য দ্বীন দাওয়াতকারীর মর্যাদা ও মনোবলকে সমুন্নত এবং তার পুরুষোচিত সাহস ও বিক্রমকে বৃদ্ধি করে। এখানে আমরা তাকে মুদ্রার সাথে তুলনা করে বলবো না যে, মুদ্রার মতই মনোবল বাড়ায়। কেননা যদিও মুদ্রার যে উপযোগিতা ও উপকারিতা, সত্যের উপকারিতা ও উপযোগিতাও দৃশ্যত তেমনি। তথাপি উভয়ের মধ্যেকার উপযোগিতার পরিমাণে অনেক পার্থক্য বিরাজমান। মুদ্রাতো কেবল মনোবল বাড়ায়। কিন্তু সত্য শুধু মনোবলই বাড়ায় না। বরং সেই সাথে তা দাওয়াতকারীর গোটা ব্যক্তিত্ব গঠন করে। তাকে বীরপুরুষে রূপান্তরিত করে। তাই মনোবল সমুন্নত করার এই প্রক্রিয়াটাই হলো ব্যক্তিত্ব গঠনের আসল উপাদান। এ উপদান দাওয়াতী অগ্নি পুরুষদের মধ্যে সক্রিয় থাকে বলেই তারা দেখতে পান, গোটা সমাজ বাতিলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন তারা বিচলিত হন না। সমাজের এসব লোক তাদের চোখে তুচ্ছ টিনের পাত, ভাঙ্গা মেটে পাত্রের টুকরো কিংবা রঙ্গীন কাগজ দিয়ে টাকা বানিয়ে খেলতামাশায় লিপ্ত শিশুদের মতই মনে হয়। এই শিশুদের ব্যাপারে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া একজন পরিণত মানুষের মধ্যে যতখানি পরিপক্কতা নির্দেশ করে, ততটা আর কোন জিনিসই করে না।

৫—সহজাত বাস্তবায়ন প্রবণতা যখন দাওয়াতকারীকে দাওয়াতের ময়দানে নামিয়ে দেয় এবং তার অতলান্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত করে, তখন দাওয়াতকারীর সাথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ ও বিচিত্র রকমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এসব বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক অনেক সময় আবার শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে আসে। অনেক সময় স্বাভাবিক হয় না।

সমাজের কেউ সমর্থক হয়, কেউ বিরোধী হয়, কেউ বিরোধী থেকে শত্রুতে রূপান্তরিত হয়, আবার কেউ শত্রুতার আতিশয্যে অত্যাচার নির্যাতন ও আগ্রাসন শুরু করে দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে প্রত্যেক শ্রেণীর সাথে বিশেষ ধরনের নীতি অবলম্বন করতে হয়। এর পাশাপাশি তাকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রাণান্তকর সংগ্রামও চালাতে হয় এবং বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার

www.pathagar.com

বিভিন্ন কৌশলও অবলম্বন করতে হয়। এমনকি অনেক সময় তার সারারাত দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় কেটে যায়, সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনাবলীর প্রভাবে মেজাজ বিগড়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, মন বিমর্ষ ও বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে যায়। অধিকন্তু তা তার ঘাড়ে এমন সব গুরুতর সমস্যার পাহাড় চাপিয়ে দেয় যা বহন করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তার উৎসাহ ও উদ্যমকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় এবং তাকে চরম অসহায় অবস্থায় নিপতিত করে। এমতাবস্থায় সে নিজের শক্তি সামর্থ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস হারাতে বসে। তার মনে হতে থাকে যে, পৃথিবীতে তার চেয়ে অক্ষম ও অসহায় আর কেউ নেই, আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন তার মত আর কারো নেই।

এসব কঠিন ও মারাত্মক সমস্যা যদিও দাওয়াতকারীর ব্যক্তিগত শক্তি ও সামর্থ বিনষ্ট করে দেয়, নিজের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত উচ্চ ধারণাকে গুড়িয়ে দেয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য যথা সময় না এলে তাকে অসার নির্জীব পদার্থে পরিণত করে দেয়, তথাপি মনে রাখতে হবে যে, এগুলো অত্যন্ত উপকারী ও কল্যাণকর সমস্যা। এসব সমস্যার উত্তাপে তার মন বিগলিত হয়। বিগলিত হওয়ার পর তা থেকে শৈথিল্য, উদাসীনতা ও স্থবিরতার খাদ বেরিয়ে যায়। অতপর নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে তার অনুভূতি সবচেয়ে তীব্র এবং আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষিতা সম্পর্কে তার বিশ্বাস সবচেয়ে একনিষ্ঠ হয়। এই সময়ে সে আল্লাহর আশ্রয় লাভের জন্য সবচেয়ে বেশী ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই সময়ে সে যদি আল্লাহর নিকট দোয়া করে, তাহলে সে দোয়া আসবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে। সে দোয়ার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাবে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শীরা-উপশীরা। সে দোয়া সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ও প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উর্ধে উঠবে। তার সামনে থেকে সকল পর্দা সরে যাবে এবং আল্লাহর আরশের নীচে সিজদায় রত হয়ে কাকুতি মিনতি সহকারে তার সাহায্য ও সমর্থন প্রার্থনা করবে। আর আল্লাহ তায়ালার দোয়া কবুলের তো কোন তুলনাই হয় না কারো সাথে। বিশেষ করে সে দোয়া যখন চরম দীনতা, অক্ষমতা ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে করা হয়।

এ অবস্থাটা সর্বদিক দিয়ে কল্যাণকর, বিপুল লাভজনক ও উপকারী। গাফিলতি, অসাবধানতা ও শিথিলতা বশত তার মধ্যে কখনো আত্মম্ভরিতা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং ভাবতে আরম্ভ করে যে, আমি তো বিরাট দাপটের মোজাহেদ হয়ে গিয়েছি, অনেক ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হয়ে গিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব আত্মম্ভরী চিন্তা-ভাবনা তার মন থেকে অপসৃত হয়ে যায় বিপদ-আপদ ও সমস্যার ভয়াবহতা দ্বারা আক্রান্ত হলে। অহংকারের বীজ যখন প্রবৃত্তির ভেতরে শিকড় গাড়ে এবং তা থেকে জন্ম নেয়া বিষবৃক্ষের

www.pathagar.com

ডালপালা যখন অন্তরের অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়, তখন তা থেকে যে বিষফল জন্মে তাহলো, আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই সে সবকিছু করতে পারে—এরূপ ধারণা। উচ্চতর আধ্যাত্মিকতাবাদের অন্যতম সারকথা এটা। পবিত্র কুরআনে এ কথাই বলা হয়েছে এভাবে ঃ

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ۙ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝

"সাবধান ! মানুষ অহংকারী হয় এই ভেবে যে সে আর কারো মুখাপেক্ষী নয়।"-(সূরা আল আলাক ঃ ৬-৭)

অর্থাৎ মানুষ যখন মনে করে যে, সে নিজ জ্ঞান, প্রতিভা, পদমর্যাদা, সম্পদ ও ক্ষমতা ইত্যাদির বলে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তখন অহংকার তার ওপর অথবা সে অহংকারের ওপর সওয়ার হয় এবং শয়তান যতদূর খুশী তাকে নিয়ে যায়। এ জন্য রসূল (সা) সবসময় আল্লাহর সাহায্য চেয়ে নিজের শক্তি, সামর্থের দৈন্য স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আমাকে এক নিমেষ বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্যও আমার নিজের ওপর নির্ভরশীল হতে দিও না।"

এই পূত-পবিত্র উন্নত অবস্থাটা দাওয়াতকারীর মলিনতা ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য অপরিহার্য। এতে করে সে নিজের যথার্থ পরিচয় সম্পর্কে সবসময় অবহিত থাকতে পারে। আর নিজেকে জানতে পারলে আল্লাহকে জানার পথ সুগম হয়। এরূপ অবস্থায় পতিত হওয়ার একটা উপকরিতা এই যে, মানুষ যখন নিজেকে দুর্বল ও অসহায় ভেবে আল্লাহর নিকট দোয়া করে তখন আল্লাহ অকল্পনীয়ভাবে তাকে সাহায্য করেন। এরূপ কঠিন মানসিক সংকটে পড়ে নূহ আলাইহিস সালাম যে কথা বলেছিলেন, আসুন তা একবার পড়ি ঃ

فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝

"তিনি আপন প্রতিপালককে ডেকে বললেন ঃ আমি পর্যুদস্ত। তুমি আমাকে সাহায্য কর।"-(সূরা আল কামার ঃ ১০)

এখানে 'আমি পর্যুদস্ত' এই উক্তিটা এমন এক ব্যক্তির অনুভূতি প্রতিধ্বনিত করছে, যে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও পতনোন্মুখ অবস্থার শিকার এবং যার আর কোন সহায় ও শক্তি নেই তা মোকাবিলা করার। তাই সে পরম আন্তরিকতা সহকারে শত্রুদের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য আল্লাহর সাহায্য চেয়েছে। আর এর জবাবও এসেছে অকল্পনীয়ভাবে।

فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُیُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

"তখন আমি আকাশের দুয়ারসমূহ খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়েছি এবং জমীন দীর্ণ করে প্রস্রবণে পরিণত করে দিয়েছি। আর এই পানি সেই কাজটি পূর্ণ করার কাজে লেগে গেল যা আগে থেকে নির্দিষ্ট ছিল।"—(সূরা আল কামার ঃ ১১-১২)

প্রিয় দাওয়াতকারী শুনে রাখুন, দুর্বলের দোয়া যখন ঔদ্ধত্য ও পরাক্রমের যন্ত্রণা নিয়ে আল্লাহর কাছে যায় তখন তা আকাশের দুয়ার খুলে দেয় এবং বিজয়ের উপকরণ ও তার সৈন্য সামন্তের দ্বারা জমীনের প্রস্রবণগুলোকে উদ্ঘাটন করে দেয়। এখন আমাদের জানা দরকার কিভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করবো এবং আল্লাহর সাহায্যের জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় আকাশ ও পৃথিবীর সৈন্য সামন্তকে করায়ত্ব করার উপায় কি। রসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তির রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, তোমরা তোমাদের দুর্বলদের কল্যাণেই আল্লাহর সাহায্য পেয়ে থাক।

রসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। দাওয়াতের কাজে তার দুই মহান সাহায্যকারী স্ত্রী খাদিজা ও চাচা আবু তালেবের একই বছর ইন্তিকালে তিনি এক দুঃসহ 'শোকের বছর'-এ পতিত হন। উভয়কে হারিয়ে তিনি এক ভয়ংকর একাকিত্বের দুঃসহ জ্বালা ভোগ করতে থাকেন এবং উভয়ের সমর্থন থেকে তিনি বঞ্চিত হন। এ পরিস্থিতিতে তিনি মক্কা থেকে বেশ খানিক দূরে তায়েফে গমন করেন। তাঁর আশা ছিল যে, হয়তো সেখানে তিনি তাঁর আন্দোলনের একজন সাহায্যকারী পেয়ে যাবেন। কিন্তু তারা তাঁকে মক্কাবাসীর চেয়েও ন্যক্কারজনক জবাব দিল এবং তায়েফের গুণ্ডা-পাণ্ডাদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। এতে তাঁর মন কেঁদে উঠলো। বিচ্ছেদের দুঃসহ জ্বালা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে দংশন করতে লাগলো। নিজেকে তিনি চরম অসহায় ও বিপন্নবোধ করতে লাগলেন। তাঁর হৃদয় থেকে তপ্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। মন ও জিহ্বা এক সাথে স্পন্দিত হয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানালো ঃ "হে আল্লাহ ! তোমার কাছে আকুতি জানাই যে, আমার শক্তি-সামর্থ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আমার কলা-কৌশল ও ফন্দি-ফিকিরের অভাব দেখা দিয়েছে। মানুষের সামনে আমি হীনবল সাব্যস্ত হয়েছি। হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু ! তুমি তো দুর্বলদের মনিব। তুমি আমারও প্রতিপালক ! কার কাছে আমাকে সঁপে দিচ্ছ ? এমন আত্মীয়ের কাছে—যে আমার প্রতি রুষ্ট ? অথবা কোন শত্রুকে কি আমার অভিভাবক বানিয়ে দিচ্ছ ? তুমি যদি আমার ওপর রুষ্ট না হয়ে থাক, তাহলে কোন কিছুরই আমি পরোয়া করি না।"

এখানে রসূলুল্লাহর (সা) এ উক্তির ব্যাখ্যা আমি দিতে চাই না যে, "আমার শক্তি-সামর্থ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, আমার কলা-কৌশল ও ফন্দি-ফিকিরের অভাব

www.pathagar.com

দেখা দিয়েছে এবং মানুষের সামনে আমি হীনবল সাব্যস্ত হয়েছি।" অনুরূপভাবে তাঁর একথারও ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন নেই যে, "তুমি তো দুর্বলদের প্রভু এবং তুমি আমারও প্রভু।" আমি শুধু পাঠককে গভীরভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো যে, রসূল (সা) যখন নিদারুণ সংকটে নিপতিত, তখনো তাঁর প্রত্যয় কত স্পষ্ট এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর ভক্তির আবেগ কত গভীর। এ থেকে বুঝতে পারা যাবে, কি রকম আবেগ, অনুভূতি ও বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া দরকার। এসব চিন্তা-ভাবনার ভার আমি পাঠকের ওপর অর্পণ করে নিজের আলোচনার ধারা অব্যাহত রাখতে চাই। আমার বক্তব্য এই যে, আল্লাহ তায়ালা রসূলের (সা) অন্তরের এ আকুতি অকল্পনীয়ভাবে কবুল করে নিয়েছিলেন। যেদিন তিনি তায়েফ থেকে নির্যাতিত হয়ে ফিরলেন, সেই দিন গভীর নিশীথে তিনি কুরআন তেলাওয়াতের বৈঠকে বসেন। সে বৈঠক আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক জ্বিন তাঁর তেলাওয়াত তন্ময় হয়ে শোনে। তিনি ধীর শান্ত সুমিষ্ট কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেন। তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সেই একই অপার্থিব শাশ্বত সুর ঝংকৃত হয়, যে সুর ঝংকৃত হয়েছিল তাঁর ফরিয়াদের মধ্য দিয়ে। বিশ্বজগতের কোণে কোণে এবং পরতে পরতে দাসসুলভ বিনয় ও আল্লাহর সর্বব্যাপী প্রভুত্বের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছড়িয়ে দিয়েছিল রসূলের (সা) তেলাওয়াতের সেই করুণ মধুর সুর। রসূলের (সা) হৃদয়ের মত নিষ্কলুষ পবিত্র হৃদয় যে এ পৃথিবীতে আর কারো নেই, সে কথা স্বয়ং আল্লাহই ভালো জানতেন। সেই পবিত্রতম অন্তর থেকে যে মোহনীয় সুর উত্থিত হয়েছিল, তা দাসের দাসত্ব ও প্রভুর প্রভুত্বের রহস্য উন্মোচিত করে দিয়েছিল। তাই দেখা গেল, ঐ তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে যে উদাত্ত আহ্বান প্রচারিত হলো, একদল জ্বিন সহসাই তা গ্রহণ করে বসলো। এভাবেই রসূলের প্রাণান্তকর চেষ্টা ও (তায়েফে প্রত্যাখ্যাত হলেও অনতিবিলম্বেই তা অন্যত্র) অকল্পনীয়ভাবে বিজয়ী ও সাফল্যমণ্ডিত হলো। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুসংবাদ নাযিল হলো ঃ

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ
قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝ قَالُوْا
يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ
وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

www.pathagar.com

"সেই সময়টার কথা স্মরণ কর, যখন আমি একদল জ্বিনকে তোমার দিকে আবর্তিত করলাম যেন কুরআন শ্রবণ করে। তারা যখন সেখানে উপনীত হলো, তখন পরস্পরকে বললো ঃ চুপ করে মন দিয়ে শোনো। যখন তেলাওয়াত ও তা শ্রবণ সম্পন্ন হলো, তখন তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সতর্ক করতে লাগলো। (অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলো।) তারা বললো ঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শ্রবণ করে এলাম, যা মূসা (আ)-এর পরে নাযিল হয়েছে এবং সমসাময়িক অন্যান্য আসমানী কিতাবকে সমর্থন করছে। এ কিতাব সত্যের পথ দেখায় এবং নির্ভুল পথে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর দাওয়াতকারীর ডাকে সাড়া দাও, তার প্রতি ঈমান আন। তাহলে তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেবেন।"

—(সূরা আল আহকাফ ঃ ২৯-৩১)

দাওয়াতকারীকে আমরা পরামর্শ দেই যে, দাওয়াতের সাগরে নিমজ্জিত হউন এবং নিজের জন্য সংকট ও সমস্যা সৃষ্টির উপকরণ বৃদ্ধি করুন—যাতে করে মন কলুসমুক্ত হতে ও আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারে। কেননা আল্লাহ এই ধরনের মন নিয়ে যে ব্যক্তি দোয়া করে একমাত্র তাঁর দোয়াই কবুল করে থাকেন।

৬—আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের যে ষষ্ঠ ফল আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া যায় তা খুব ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করুন। আমাদের অনেকে দৈনন্দিন জীবনের কোন কোন কাজকে বলে থাকে ঃ এটা একটা মৃত, প্রাণহীন আমল। আবার অন্য কাজকে বলে ঃ এটা একটা জীবন্ত ও শক্তিমান আমল। তার প্রথম কথার অর্থ এই যে, সেটা এমন একটা আমল—যা স্থবির, নির্জীব ও ঈমানহীন হৃদয় থেকে উদগত। অন্যথায় এতে প্রাণের স্পন্দন থাকতো, সজিবতা থাকতো। বড় বড় পরহেজগার ও মুত্তাকী ব্যক্তিগণকে অনেক সময় এভাবে মন্তব্য করতে শুনা যায় ঃ এটা একটা প্রাণহীন নামায। কিন্তু নামাযে যখন মনোযোগ একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও বিনয় পূর্ণরূপে বর্তমান থাকে, তাতে বিশুদ্ধভাবে রুকূ' সিজদা করা হয় এবং নামাযের দোয়া কালাম অন্তরের অন্তস্থল থেকে নির্গত হয়, তখন তা জীবন্ত নামায পদবাচ্য হয়। সে নামায আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে এবং কবুল হয়।

এটা এক অকাট্য সত্য কথা। এতে কোন অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতার লেশ নেই। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ ط وَمَا هِيَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ○

www.pathagar.com

"তোমার প্রভুর সৈন্যসামন্ত সম্পর্কে একমাত্র তিনিই অবগত আছেন। বস্তুত এটা (কুরআন) মানুষের স্মারক ছাড়া আর কিছু নয়।"

–(সূরা আল মুদ্দাস্‌সির ঃ ৩১)

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ۝

"(বল রূহ হলো আমার প্রভুর নির্দেশ। তোমাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)

বস্তুত কিছু আমল এমনও আছে যা জীবন্ত। কেননা তাতে রূহ বা প্রাণ থাকে। আর কিছু আমল আছে নিষ্প্রাণ। কেননা তা প্রাণশক্তি না নিয়েই জন্মেছে।

এই জীবন্ত ও মৃত আমলগুলো আমরা দেখতে পাই না বটে। তবে দেখতে না পাওয়ায় এটা প্রমাণিত হয় না যে, জীবন্ত ও মৃত আমল বলতে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। এই পৃথিবীতেই এমন বহু বিস্ময়কর সৃষ্টি আছে যা আমরা দেখতে, শুনতে বা স্পর্শ করতে পারি না এবং যার ঘ্রাণও অনুভব করি না। কেননা এসব গুণগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জিনিসকে দৈহিকভাবে অনুভব করার ক্ষমতা আল্লাহ আমাদের ইন্দ্রিয়কে দেননি। একথাও বলতে পারেন যে, অঙ্গপ্রত্যংগকে আল্লাহ শুধু বস্তুগত জিনিস অনুভব করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। বস্তুর উর্ধের জিনিসগুলোকে অনুভব করার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। তবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে আল্লাহ যদি কোন অস্বাভাবিক রহস্য উপলব্ধির বাড়তি ক্ষমতা দেন তা হলে সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা।

সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন কিংবা অক্ষম এই ইন্দ্রিয়গুলোই আমাদের জ্ঞানার্জনের একমাত্র উপায়। এগুলো যেটুকু জ্ঞান বহন করে আনে তার ভিত্তিতেই আমরা মতামত দিয়ে থাকি। কিন্তু পরকাল সম্পর্কে আমরা যেসব খবরাদি পাই—যার সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ কোন জ্ঞান নেই, সেগুলো আমাদের অস্বীকার করার ক্ষমতা বা যুক্তি নেই। এসব খবর যদি এমন কোন লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায় যার কথার সত্যতা, প্রজ্ঞার নির্ভরযোগ্যতা এবং বুদ্ধির অগ্রগণ্যতার স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণাদি রয়েছে তাহলে তা বিশ্বাস করাই আমাদের কর্তব্য।

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে রেখে আসা মৃতের সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে নামায থাকবে তার শিয়রের কাছে, রোযা ডান পাশে, যাকাত বাম পাশে এবং যাবতীয় জনকল্যাণ ও পরোপকারমূলক কাজ যথা নফল দান-সাদকা, সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সৌজন্য প্রদর্শন থাকবে পায়ের কাছে।"

www.pathagar.com

এসব সৎকর্মের মু'মিন বান্দার চারপাশে থাকার তাৎপর্য এই যে, এগুলো মৃতকে যে কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে এমনকি মুনকার ও নকিরের জিজ্ঞাসাবাদ থেকেও রেহাই দিতে চায়। যতক্ষণ এই নেক আমলগুলো নিশ্চিত না হবে যে, ঐ দুই ফেরেশতা মঙ্গলের দূত হয়ে তার কাছে এসেছে, ততক্ষণ তাদেরকে তার কাছে যেতে দেবে না। হাদীসটির শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ অতপর মৃতের মাথার দিক থেকে ঢুকবার জন্য ফেরেশতারা আসবে। তখন নামায বলবে ঃ আমি ঢুকতে দেব না। অতপর ডান দিক থেকে আসবে। তখন রোযা বলবে ঃ আমি ঢুকতে দেব না। অতপর বাম দিক থেকে আসবে। তখন যাকাত বলবে ঃ আমি ঢুকতে দেব না। অতপর পায়ের দিক থেকে আসতে চাইবে। তখন পরোপকার, সদ্ব্যবহার ও সৌজন্য ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ বলবে ঃ আমি ঢুকতে দেব না।

রসূলের (সা) একথাগুলোকে রূপক আখ্যায়িত করে এর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করা অনুচিত। আমাদের এরূপ মনে করা চলবে না যে, রসূল (সা) রূপক কথার সাহায্যে আখেরাতের প্রকৃত পরিস্থিতির কাছাকাছি একটা চিত্র দেখিয়ে দিয়েছেন। এরূপ ধারণা করা আমাদের জন্য অনুচিত। কেননা এতে রসূলের (সা) পদমর্যাদার ওপর অন্যায় ধৃষ্টতা দেখানো হবে। বিনা প্রমাণে তাঁর বক্তব্যের প্রকাশ্য ও আসল অর্থ বিকৃত করা হবে। আগেই বলেছি যে, আমরা সৃষ্টিজগতের প্রকৃত রহস্য জানি না বলে তা অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বলেন যে, নামায মৃত ব্যক্তির শিয়রে অবস্থান নেবে এবং এরূপ এরূপ কথা বলবে, তখন মেনে নিতে হবে যে, সেটা সম্পূর্ণ সত্য কথা। আমাদের অজ্ঞতাকে অন্যের কথার অর্থ বিকৃত করার যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে শুধু অসঙ্গতই নয় বরং আমাদের বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে সেটা অসম্মানজনকও বটে। আমাদের বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিসত্তার পক্ষে এটা একেবারেই অশোভন যে, আমরা সবসময়ই আমাদের সাধারণ সীমাবদ্ধতাকে আকড়ে ধরে থাকবো, যখনই কোন উঁচু মানের কথা শুনবো, অমনি তাকে নিজেদের নীচু পরিমণ্ডলের দিকে টেনে আনবো এবং তার অর্থ বিকৃত করে নিজের সংকীর্ণ গন্ডীর সাথে তাকে খাপ খাইয়ে নেবো। এ কাজ আমাদের বিবেক ও আত্মার পক্ষে অনুপযোগী ও বেমানান। আমাদের বিবেক ও আত্মার পক্ষে মানানসই কাজ হবে এই যে, এসব ব্যতিক্রমধর্মী মহামানবদের কথাবার্তা যে উচ্চতা থেকে নির্গত, সেই উচ্চতায় আরোহণ করবো এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই মানে উন্নীত করবো। সুতরাং যখন রসূল (সা) বলেন যে, নামায অমুক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং অমুক কথা ও অমুক কাজ করে, তখন তার অর্থ নিশ্চিতভাবে এই যে, তা সত্যিই অবস্থান নেয় এবং রসূল (সা) যা যা বলেছেন, সে অবিকল তাই বলে ও করে।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন এই যে, সে কিভাবে সেখানে যায় ও অবস্থান নেয় ? তার কি দুই পা আছে ? সে কিভাবে কথা বলে ? তার কি বাকশক্তি আছে ? সে কিভাবে ফেরেশতার পথ আগলায় ? তার কি দুই হাত আছে ? এসব প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো উচিত নয়। তার করা ও বলার পদ্ধতি ও প্রণালী যা হয় হোক। আমাদের কর্তব্য শুধু বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া যে, নামায শিয়রের কাছে অবস্থান গ্রহণ করবে এবং যথার্থই সেসব কথা বলবে, যা পরম সত্যবাদী রসূলের (সা) উক্তি থেকে জানা যায়। নচেৎ এসব তথাকথিত ব্যাখ্যাকারীরা আল্লাহর এ উক্তির কি ব্যাখ্যা দেবেন ঃ

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"যে দিন তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।"-(সূরা আন নূর ঃ ২৪)

হাত পা কিভাবে সাক্ষ্য দেবে ? এ বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো চাই না। যেভাবে সাক্ষ্য দেয় দিক। কথা হলো সাক্ষ্য যে দেয়া হবেই। সে ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। পরবর্তী আয়াত দেখুন।

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْآ اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"তারা তাদের চামড়াকে বলবে ! তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন ? চামড়া বলবে যে আল্লাহ্ সব জিনিসকে কথা বলিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও কথা বলিয়েছেন। তিনিই তো তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং তার কাছেই তোমরা ফিরে যাচ্ছ।"

—(সূরা হামিম সাজদা ঃ ২১)

মোদ্দাকথা এই যে, নামায, রোযা, যাকাত, সদাচার, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার এবং অনুরূপ যাবতীয় সৎকাজ এক ধরনের জীবন্ত প্রাণী এর একটা রূপ আছে বাহ্যিক, আর একটা আভ্যন্তরীণ। একটা গোপন আর একটা প্রকাশ্য। বাহ্যিক রূপটা হলো কাজের দৃশ্যগোচর চেহারা। আর গোপন রূপটা হলো তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি। কাজের বাহ্যিক দৃশ্যগোচর রূপ হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে মানুষ যা সম্পন্ন করে। আর তার প্রাণশক্তি হলো আল্লাহর আদেশ বা আজ্ঞা। আর এই বাহ্যিক রূপ ও প্রাণশক্তির মিশ্রণে এবং সমন্বয় সাধনের কাজটা সম্পন্ন হয় অন্তরে। তাই বলা যায়, ঈমানদার অন্তর থেকে যে ভালো কাজ সম্পন্ন হয় তা জীবন্ত আমল, সে আমল পবিত্র প্রাণশক্তি সঞ্চারিত। আর যে কাজ অন্তরের বাহির থেকে সম্পন্ন হয় তা মৃত আমল প্রাণহীন

www.pathagar.com

আমল। দাওয়াতকারী ও অন্যদের জন্য এখানে যে কথাটা আমি সুস্পষ্ট করে বলে দিতে চাই তা এই যে, এই সমস্ত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত আমল তার কর্তার সাথে আজীবন সংশ্লিষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর সময় ও তার পরে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া পর্যন্ত তার সাথে যুক্ত থাকে। এই যুক্ত থাকাটা তার নিষ্ক্রিয়ভাবে ও ফায়দাহীনভাবে থাকা হয় না। বরং তা সর্বদাই তার কর্তার সেবা ও উপকারে নিয়োজিত থাকে। জীবনে মরণে সর্বদা তা তাকে সবরকমের আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করে এবং তার যথাসাধ্য কল্যাণ সাধন করে। ইতিপূর্বে আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত যে হাদীস উল্লেখ করেছি, তা আমাদেরকে এই তত্ত্বই জানায় এবং এ বিষয়েই গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করে। তথাপি সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আর একটি হাদীস উল্লেখ করবো। এ হাদীস সকল সন্দেহ দূর করে এবং নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মায়। হাদীসটি অনেক দীর্ঘ। তার কিয়দংশ উল্লেখ করেই ক্ষ্যান্ত থাকবো। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "গত রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। (উল্লেখ্য যে, নবীদের স্বপ্নও সত্য। কেননা তা ওহীর অন্তর্ভুক্ত।) আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, শয়তান তাকে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় তার কৃত আল্লাহর জিকর (স্মরণ) এলো এবং তার কাছ থেকে শয়তানকে হটিয়ে দিল। উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে পিপাসায় ছটফট করছে। যখনই কোন প্যানির কূপের কাছে যাচ্ছে, অমনি তাকে পানি পান করতে বাধা দেয়া হচ্ছে এবং তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় রমযানের রোযা এসে তাকে পানি পান করিয়ে পিপাসা নিবৃত করলো। আমি আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। আরো দেখলাম নবীদের একটি দল বিভিন্ন ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বসে আছেন। ঐ লোকটি যখনই নবীদের কোন ক্ষুদ্র দলের কাছে যাচ্ছে অমনি তাকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এই সময় তার বীর্য স্খলনজনিত অপবিত্রতা থেকে গোছল করে পবিত্রতা অর্জনের আমলটি এসে তাকে ধরে এনে আমার কাছে বসিয়ে দিল।.......আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম, আগুনের তাপ ও শিখা থেকে বাঁচবার জন্য হাত সঞ্চালন করছে। এই সময় তার সাদকা এসে তার ও আগুনের মাঝখানে আড় হয়ে দাঁড়ালো এবং তার মাথার ওপর ছায়া ফেললো।.....আমার উম্মতের আরো এক ব্যক্তিকে দেখলাম, জাহান্নামের ফেরেশতারা তাকে ঘিরে ধরেছে। এই সময় তার সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার আমল এসে তাকে জাহান্নামের ফেরেশতাদের কবল থেকে রেহাই দিয়ে রহমতের ফেরেশতাদের দলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম, হামাগুড়ি দিয়ে আসছে এবং তার ও আল্লাহর মাঝখানে পর্দা পড়ে রয়েছে। এই সময় তার সৎ চরিত্র এসে তাকে হাত দিয়ে ধরে আল্লাহর নিকট

www.pathagar.com

হাজির করলো।.......আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম, পুলের ওপর দাঁড়িয়ে তালপাতা যেমন ঝড়ো বাতাসে কাঁপতে থাকে, তেমনি ভয়ে কাঁপছে। এই সময় আল্লাহর সম্পর্কে সে যে ভালো ধারণা পোষণ করতো, তা এসে তার কাঁপুনি থামিয়ে শান্ত করে দিল এবং সে পুল পার হয়ে চলে গেল। আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখলাম জান্নাতের দরযার সামনে পৌঁছতেই তার মুখের ওপর দরযা বন্ধ করে দেয়া হলো। এই সময় তার কাছে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই—এই সাক্ষ্য এসে হাজির হলো। সঙ্গে সঙ্গে দরযা খুলে গেল এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।"

এই সমগ্র হাদীসটি সুস্পষ্ট ও অকাট্যরূপে প্রমাণ করে যে, জীবন্ত আমলগুলোর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু শক্তি ও সারবস্তু নিহিত রেখেছেন, যার বলে তাদের কিছু কার্যকর ভূমিকা পালন ও ব্যবস্থা গ্রহণের সামর্থ আছে। এসব আমলের বা আমলের প্রাণশক্তির কার্যকর ভূমিকা ও ব্যবস্থা গ্রহণ শুধু আখেরাতে তার কর্তার উপকার সাধনের মধ্যেই সীমিত থাকে না। বরং দুনিয়াতেও তার উপকার সাধন করে থাকে। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি "لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" ("আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি একক ও লাশরীক। তিনিই সকল রাজত্ব ও প্রশংসার অধিকারী। তিনি সকল জিনিসের ওপর শক্তিমান।) এই দোয়া প্রতিদিন ১০০বার পড়বে, দোয়াটি তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখবে।"

তিরমিজী শরীফে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কোথাও যাওয়ার জন্য বাড়ী থেকে বেরুবার সময় যে ব্যক্তি বলে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

(আল্লাহর নামে বের হলাম। আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই।) তাকে বলা হয় ঃ তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তোমাকে সুপথে পরিচালিত করা হলো এবং নিরাপত্তা দেয়া গেল। অতপর শয়তান তার পথ থেকে সরে দাঁড়ায় এবং অন্য শয়তানকে বলে ঃ যাকে সুপথে চালিত করা হয়েছে, যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে গেছেন এবং যাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, তার সাথে আর কেমন করে পারা যায় ? অধিকন্তু নেক আমলগুলো তার কর্তাকে আশ্চর্যজনকভাবে বস্তুগত

www.pathagar.com

ব্যাপারেও সাহায্য করে থাকে। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, আটা ভাঙ্গা ও সাংসারিক কাজ-কর্মে অত্যধিক কঠোর পরিশ্রমে নাজেহাল হওয়ার কথা ব্যক্ত করে হযরত ফাতিমা (রা) রসূলের (সা) নিকট একজন খাদেম চেয়েছিলেন। এর জবাবে রসূল (সা) তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে শয়নের পূর্বে প্রতি রাতে ৩৩বার 'ছুবহানাল্লাহ', ৩৩বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বার আদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ এটা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম।

সাহাবী হাবীব বিন মুসলিমা (রা) যখনই কোন দুর্গের ওপর হামলা করতেন কিংবা কোন শত্রুর মুখোমুখী হতেন, তখন لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ বলতে তাঁর খুবই ভালো লাগতো। কথিত আছে যে, একবার তিনি ও তাঁর মুসলিম সৈনিকেরা এই দোয়া পড়ে ও 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলে রোমকদের একটি দুর্গে হামলা চালান, সঙ্গে সঙ্গে দুর্গটি বিধ্বস্ত হয় এবং শত্রুর পতন ঘটে। সম্ভবত হাবীব বিন মুসলিমার এই কাজের উদ্দীপনা জুগিয়েছিল অন্য একটি হাদীস। তাতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদেরকে যখন আরশ উত্তোলন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তখন তারা বলেছিলেন ঃ হে প্রভু ! তোমার মহিমা ও প্রতাপের বিপুল ভারে ভারাক্রান্ত এই আরশকে আমরা কেমন করে উত্তোলন করবো ? তখন আল্লাহ বললেন ঃ তোমরা 'লাহাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়। তখন তারা এই দোয়া পড়তেই আরশকে উত্তোলন করতে পেরেছিলেন।

আমরা একথা আগেই বলেছি যে, কথা ও কাজের সাথে প্রাণশক্তির সম্মিলন ঘটানোর কাজটা মু'মিনের অন্তরেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। সব কথা উপকার দর্শায় না এবং সব কাজ সাহায্য করে না। এ ব্যাপারটা দাওয়াত-কারীকে জানতে হবে এবং নিজের অন্তরের গুরুত্ব তাকে উপলব্ধি করতে হবে। এই অন্তর বা মন দিয়ে সে নিজেই নিজের বিজয়ের পতাকাবাহী বাহিনী গঠন করে নিতে পারে। এখন এ ব্যাপারে তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এই পরম কল্যাণময় বাহিনী কি সে নিষ্প্রয়োজন মনে করবে, না নিজের অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে সে বিকশিত করবে যাতে সেখান থেকে আল্লাহর এই অগণিত বাহিনী বেরিয়ে আসে। সেনাবাহিনীর সাথে তার সেনাপতির যে সম্পর্ক থাকে, আলোচ্য বাহিনীর সাথে মু'মিনের তার চেয়ে উচ্চতর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এ বাহিনী আপনার অন্তরের অন্তস্থল থেকে নির্গত। সুতরাং তারা আপনার এবং আপনি তাদের। অনুগত সন্তানরা বাপের প্রতি যতটা সহানুভূতিশীল থাকে, তারা আপনার প্রতি তার চেয়েও বেশী সহানুভূতিশীল হবে। বলতে পারেন, ঔরসজাত সন্তানদের পাশাপাশি এরা আপনার হৃদয়জাত সন্তান। পার্থক্য শুধু

www.pathagar.com

এই যে, ঔরসজাত সন্তানদের চেয়ে এরা আপনার অধিকতর অনুগত, দীর্ঘস্থায়ী এবং অধিকতর সহায়তাকারী। আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী থেকে আপনি এ ধারণা পেতে পারেন ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

"সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের জৌলুস মাত্র। পক্ষান্তরে অবিনশ্বর সৎকর্মগুলো তোমার প্রতিপালকের নিকট অধিকতর পুন্যময় ও উত্তম আশাপ্রদ।"–(সূরা আল কাহাফ ঃ ৪৬)

এ আয়াতে উক্ত দুই ধরনের সন্তান-সন্ততির মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তুলনা বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা উভয়ের স্বরূপ উন্মোচন করেননি, যাতে মানুষের চিন্তার রাজ্যে আলোড়ন ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কোন কিছু প্রবিষ্ট না হয়। তিনি শুধু অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের ওপর এর প্রকৃত মর্ম উদ্ধারের ভার অর্পণ করেছেন। কেননা তারা তো এ ব্যাপারে দক্ষ ও পারদর্শী। সূরা কাওছারের اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ। "তোমরা কুৎসা রটনাকারীই নির্বংশ।"এ আয়াতটি আমাদের উপরোক্ত বিশ্লেষণের সমর্থন জোগায়। যারা রসূলের (সা) পুরুষ সন্তানদের মৃত্যুতে বিদ্রূপ করে বলতো ঃ মুহাম্মাদ (সা) তো নির্বংশ হয়ে গেছে। তার অবর্তমানে তার নাম নেয়ার মত আর কেউ বেঁচে রইল না—এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদের মন্তব্যের জবাব দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, রসূলের প্রতি শত্রুতা ও আক্রোশ পোষণ করার কারণে যার অন্তর দূষিত ও বিকৃত হয়ে গেছে, সে-ই প্রকৃত নির্বংশ। অন্তর ও আমলের দিক দিয়ে তার কোন বংশধর অবশিষ্ট থাকবে না—যাদের স্মৃতি যুগ যুগ কাল ধরে মানববংশধরের মনে জাগরূক থাকবে। ঔরসজাত সন্তান যদি অসৎ হয় এবং তাকওয়া ও নেক কাজের সাথে তার কোন সংশ্রব না থাকে তাহলে সে সন্তান দ্বারা পিতার কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।

প্রিয় ভাই ! জেনে রাখবেন, আপনার জিহাদে তথা চেষ্টা-সাধনায়, এই সন্তানই (অর্থাৎ নেক আমল ও পবিত্র অন্তরধারী সন্তান) বেশী প্রয়োজনীয়। কাজেই নেক আমল ও সৎ নিয়ত বৃদ্ধি করতে থাকুন। তাহলে আপনার অগোচরে আপনার চারপাশে এই সন্তানের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এসব সন্তান তাদের পিতার ওপর কখনো বোঝা হয় না। পিতার অগোচরে তারা পিতার কাজের সহযোগী হয়। বরং অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, দুর্বলতার দরুন পিতা দিনে কিংবা রাতে নিজের শয়ন কক্ষে অক্ষম ও পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকে। অথচ সন্তানরা তার শয়ন কক্ষের পাশে বসে না থেকে দশদিকে

www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়ে এবং পিতা বা অভিভাবকের সাহায্যার্থে কাজের সন্ধান করে। পরবর্তী সময় যখনই কোন জনসমাবেশ আপনার জিহাদের কথা আলোচনা করবে তখনই এই পবিত্র অদৃশ্য সন্তানেরা তাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় তারা মানুষের মনে সহানুভূতির বিস্তার ঘটাবে এবং ভালাই ও কল্যাণের মনোবৃত্তি জাগাবে। ফলে আপনার প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ হবে। সকলে আপনাকে সমর্থন ও সাহায্য করা জরুরী বলে মত দেবে। এসব অদৃশ্য আত্মা আপনার এত সাহায্য করবে, যা শত সহস্র বক্তৃতা, বিবৃতি ও নিবন্ধ করতে পারবে না। পরবর্তী দিন হয়তো আপনার কাছে এসব লোকের মধ্য থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি এসে আপনার দাওয়াতের সমর্থক হয়ে যাবে এবং তার বা তাদের শহরে কোন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপনে আপনাকে যোগদান করতে অনুরোধ জানাবে।

তাই আপনার জিহাদে এই সন্তানদের অংশগ্রহণের প্রতি প্রবল আগ্রহ অক্ষুণ্ন রাখুন—তা সে জিহাদ কথা বা কাজের জিহাদ হোক—যুদ্ধ কিংবা শান্তির জিহাদ হোক। এই সন্তানদের সমাবেশ না ঘটিয়ে যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে নামে, সে অস্ত্রসস্ত্র ছাড়া ময়দানে নামা মুজাহীদের চেয়েও দুর্বল সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আর একথাও জেনে রাখা ভাল যে, এ সন্তানরা তাদের পিতার স্বপক্ষে অত্যন্ত চমৎকার ও বিস্ময়কর ধরনের সংগ্রাম করে থাকে। এদের সম্পর্কেই আল্লামা ইবনুল কাইয়েম বলেন ঃ "সৈন্যরা যুদ্ধে ইমাম সাহেবের যে তেজস্বীতা ও শৌর্যবীর্য দেখতে পেত তা ছিল চমকপ্রদ।"

---

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

দাওয়াতকারীর প্রেরণার উৎস ও উপকরণ

এখানে উৎস ও উপকরণ বলতে আমরা তার বক্তৃতার তেজস্বীতা, বাকশৈলী ও তথ্যবহুল ভাষণের উৎস ও উপকরণ বুঝাচ্ছি না। আমরা কেবল বুঝাচ্ছি, তার যোগ্যতা ও প্রতিভার উৎকর্ষ সাধনের উপকরণ, তার আত্মা ও মানসিক আবেগ-অনুভূতিতে প্রজ্ঞা সঞ্চারণের পন্থা, তার ব্রত সাধন তথা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের চেষ্টায় তাকে বাস্তব পথনির্দেশ দানের উপকরণ এবং যে নির্মল, সুন্দর ও মহৎ সমাজের প্রতি সে আহ্বান জানায়, তা নির্মাণের সামগ্রী সরবরাহের উৎস। এখানে আমরা যে কয়টি উৎস ও উপকরণের উল্লেখ করবো, সে শুধু উদাহরণ হিসেবেই উল্লেখ করবো। এর দ্বারা এমন ধারণা নেয়া চাই না যে, উক্ত উৎস ও উপকরণ কেবল এই কটার মধ্যেই সীমিত। সেই উৎস ও উপকরণগুলো হচ্ছে (১) মহাগ্রন্থ আল কুরআন (২) সুন্নাতে রসূল (৩) জাতিসমূহের ইতিবৃত্ত এবং মহাপুরুষ ও মহানায়কদের জীবনেতিহাস (৪) চলতি জীবনের বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ। এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে কিছু পথ- নির্দেশক বক্তব্য পেশ করা অসঙ্গত হবে না বলে মনে করি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১-আল কুরআন

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَاالْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ

"(হে রসূল !) আমি আপনার নিকট আমার আদেশে সৃষ্ট এক প্রাণশক্তি ওহী যোগে পাঠিয়েছি। এর আগে আপনি তো জানতেনই না কিতাব কি জিনিস এবং ঈমান কি জিনিস।"—(সূরা আশ্ শুরা ঃ ৫২)

বহু সংখ্যক সাধারণ লোক তো বটেই, এমনকি বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং গবেষকদেরও অনেকে বলে থাকেন যে, কুরআনের দু'টা দিক রয়েছে। একটি এর শাব্দিক দিক, আর একটি অর্থ ও মর্মগত দিক। অতপর তারা বহু দল ও ফেরকায় বিভক্ত হন। সাহিত্যিকরা এর মর্মগত সৌন্দর্য ; ভাষাগত চমৎকারিত্ব ও বর্ণনা শৈলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। অতপর কঠোর পরিশ্রম করে অনুসন্ধান করেন কি কি কারণে তা অলৌকিক তথা মানবীয় সাহিত্যিক প্রতিভার নাগালের বাইরে। তা কি তার অপূর্ব শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠন প্রণালীর কারণে, না তার মর্ম ও তাৎপর্যের গভীরতার কারণে, না উভয় কারণে ?

ফেকাহ ও আইন শাস্ত্রবিদেরা এর শব্দ ও মর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তা থেকে ইবাদাত, আন্তমানবীয় সম্পর্ক ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত বিধিসমূহ বের করার উদ্দেশ্যে।

আর তর্কশাস্ত্রবিদেরা আকায়েদ সংক্রান্ত মূলনীতি, তার সংরক্ষণ ও তার ওপর বাতিলের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তার শব্দ ও অর্থের প্রতি নজর দিয়ে থাকেন।

আর সমাজতাত্ত্বিকেরা তা মন্থন করেন তা থেকে সাম্য ও অন্যান্য মানবাধিকার পরিবারের মৌলিক উপাদান, তার বন্ধন রক্ষা ও কাঠামো দৃঢ় করণের উপকরণসমূহ, লেনদেন ও পারস্পরিক সম্পর্কের সেইসব নীতিমালা —যা সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে সমাজকে সুসংবদ্ধ করে। সেইসব নৈতিক ও চারিত্রিক আইন ও বিধানসমূহ—যা ব্যক্তির বিবেককে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে এবং জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ পদ্ধতিকে সমুন্নত করে—সেই সবের সন্ধান লাভের জন্য।

আর রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদরা কুরআনের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেন তা থেকে তাদের সর্বজনবিদিত তত্ত্ব উদ্ভাবনের জন্য। তবে দুঃখের বিষয় যে,

www.pathagar.com

তারা ও পূর্বোল্লিখিত বিশেষজ্ঞরা তাদের কাংখিত তত্ত্বানুসন্ধানে এমন কোন মতাদর্শ অনুসরণ করেন না, যা তাদের সকল প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা দেয়।

এসব শ্রেণী এবং তাদের মত অন্যান্যরা কুরআনে শুধুমাত্র শব্দ ও তার মর্ম এই দু'টো জিনিস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। অথচ আমরা আলোচনার শুরুতেই এ আয়াতটি এ জন্য উল্লেখ করেছি, যাতে পাঠক জানতে পারে যে, কুরআন শুধু শব্দ ও তার মর্মের সমষ্টি নয়—তাতে একটা 'রূহ' তথা প্রাণশক্তিরও সমাবেশ ঘটেছে।

এখন এই তিনটে জিনিস—প্রাণশক্তি, মর্ম ও শব্দের মধ্যে কোন্‌টির অগ্রাধিকার, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি না। কেননা এর প্রত্যেকটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং একমাত্র তিনিই সর্ব বিষয়ে অবগত। আমি শুধু এই কথাটুকু বলবো যে, আমাদের মন ও বিবেকে কুরআনের প্রাণশক্তির প্রতি যথাযথ গুরুত্বের উপলব্ধি থাকা উচিত। এটা মোটেই ভালো কথা নয় যে, আমরা শুধু প্রাণী ও মানুষের দেহেই প্রাণের গুরুত্ব উপলব্ধি করবো—আল্লাহর কালামে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করবো না। রূহ বা প্রাণ উভয় ক্ষেত্রেই তো আল্লাহর নির্দেশে উদ্ভূত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবের রূহ বা প্রাণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলেছেন "আমি এভাবেই আপনার নিকট আমার আদেশে উদ্ভূত এক প্রাণশক্তি ওহী যোগে পাঠিয়েছি।" আবার অন্যত্র প্রাণীদেহের রূহ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ○

"তারা তোমার নিকট রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তুমি বলে দাও ঃ রূহ আমার প্রভুর নির্দেশক্রমে আবির্ভূত। তোমাদেরকে এ সম্পর্কে খুব সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)

সুতরাং যারা কুরআনের অলৌকিকত্ব নিয়ে গবেষণা করেন তাদের সর্বপ্রথম এই প্রাণশক্তির সন্ধান করা উচিত। অতপর তার শব্দ ও মর্মে কি শক্তি, সৌন্দর্য, উপদেশ ও আইনগত বিধি নিহিত রয়েছে, তার অনুসন্ধান চালানো উচিত। যিনি এর শব্দের অলৌকিকত্ব নিয়ে গবেষণারত, তিনি তো আর সেই হঠকারী ব্যক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবেন না, যে বলবে যে, "এতে আমি কোন অলৌকিকত্ব দেখি না। বরং আমার কাছে এর চেয়েও চমকপ্রদ সাহিত্য কীর্তি রয়েছে।" কিন্তু কুরআনে যে আল্লাহ প্রাণশক্তি তথা উজ্জীবনী ও প্রেরণাদায়ক শক্তি রয়েছে তার অলৌকিকত্ব অবিসম্বাদিত রূপে বিরাজমান। সকলকে হতবাক

www.pathagar.com

ও হতবুদ্ধি করে দেয়ার ক্ষমতা যে এর রয়েছে, সেটা সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহর কালামে নিহিত এই আল্লাহপ্রদত্ত প্রাণশক্তির প্রভাবের বিরুদ্ধে কেউ কখনো টু শব্দটি করেনি—ঠিক যেমন প্রাণীদেহে আল্লাহপ্রদত্ত প্রাণের প্রভাবকে অস্বীকার করার চিন্তাও কেউ কখনো করবে না। কুরআন এই উভয় অলৌকিকত্বের প্রতি ইংগীত দিয়ে বক্তব্য রেখেছে। যেমন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ط

"আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের কাছে তোমরা ফরিয়াদ জানাও, তারা সকলে মিলেও একটি মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারবে না।"-(সূরা হাজ্জ ঃ ৭৩)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝

"সমগ্র মানবজাতি ও জ্বিন জাতি একত্রিত হয়েও যদি এই কুরআনের সমতুল্য কোন গ্রন্থ রচনা করতে চেষ্টা করে, তবুও তা রচনা করতে পারবে না—যদিও তারা পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে তা করতে সচেষ্ট হয়।"—(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৮)

কেননা আলোচ্য ব্যাপারটা কোন বস্তুগত বা ভাষাগত ব্যাপার নয়। তেমন হলে যে কোন হটকারী ব্যক্তি তা রচনা করার সামর্থ দাবী করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারতো। কিন্তু যে প্রাণশক্তি দেহকে সজিব ও সবল করে এবং ভাষাকে উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করে, তার অলৌকিকত্ব এতবেশী স্পষ্ট ও প্রকাশ্য যে, তা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারো নেই। আমি এখানে কুরআনের অলৌকিকত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হইনি যে, তার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাণশক্তি কতখানি সক্রিয় ও সঞ্চারিত তার পূর্ণ বিবরণ দেবো। আমি শুধু দাওয়াতকারীর প্রতিভা ও আবেগ-অনুভূতির উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায় এবং ওহীর শ্রেষ্ঠতম ভাণ্ডার হিসেবে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করছি। কাজেই প্রত্যেক দাওয়াতকারীর বরং প্রত্যেক মানুষেরই কুরআন সম্পর্কে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলো পালন করা উচিত ঃ

১

তাকে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এই মহাগ্রন্থ আসলে একটি রূহ বা আত্মা বা প্রাণশক্তি। প্রাণের অনেক স্বাভাবিক আলামত থাকে। তার প্রধান আলামত হলো জীবন ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি এবং শক্তি। এ ছাড়া দৃষ্টিশক্তি শ্রবণ শক্তি প্রভৃতিও তার উল্লেখযোগ্য আলামত। কুরআন যে মানুষের মন ও তার সকল মানসিক বৃত্তি যোগ্যতা ও প্রতিভাকে জীবন দান

www.pathagar.com

করে—তার বিকাশ ও বৃদ্ধি সাধন করে, তাকে শক্তি যোগায়, তাকে শ্রবণশীল ও দৃষ্টিমান করে—সে কথা বহু আয়াতে বিবৃত হয়েছে। সেই সকল আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি শুধু দাওয়াতকারীকে এই রহস্য অনুসন্ধান ও তা অর্জনের আহ্বান জানাতে চাই। কুরআনের সেই প্রাণশক্তির সাথে তার মনের সংযোগ স্থাপনের অনুরোধ জানাতে চাই—যাতে করে তার সমগ্র সত্তা তা থেকে শক্তি ও আলোর প্রবাহ ছোটে ও স্ফুরণ ঘটে। মানুষের মনে এই কুরআনী প্রাণশক্তি প্রবাহ পাঠাতে সমগ্র কুরআন অধ্যয়ন করার প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজন শুধু কুরআন ও তার মনের মাঝখানে যেসব পর্দা আড় হয়ে আছে তা সরিয়ে দেয়া। এগুলো যখন সরে যাবে এবং মন কুরআনের সামনে মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে, তখনি সে অনুভব করবে যে, তার সমগ্র সত্তা সজিবতা, শক্তি, আলো, আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রেমে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। এমনকি কুরআনের একটামাত্র আয়াতই এ ব্যাপারে যথেষ্ট হতে পারে যদি আমরা তার সাথে যথাযথভাবে সংযোগ স্থাপন করি। কথাটা আমি আক্ষরিক অর্থেই বলছি। কেননা একটি মাত্র আয়াতের মর্মকে পরিপূর্ণভাবে তথা ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক দিয়ে আমল ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে এবং তা থেকে যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের আভাস বা তাগিদ পাওয়া যায়, বিন্দুমাত্র অবহেলা ও শৈথিল্যের অবকাশ না দিয়ে তা অনুসরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন এবং সেই সাথে তার প্রাণশক্তিকে তথা তার বক্তব্যের মূল প্রেরণা ও ভাবধারাকে হৃদয়ের সকল সুপ্ত বৃত্তির সাথে মিশিয়ে একাকার করে দেয়ার দ্বারা মানুষ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ প্রক্রিয়া তাকে নতুন মানুষ রূপে গড়ে তোলে এবং তার সমগ্র সত্তাকে আলোয় উদ্ভাসিত করে। এর উদাহরণ এই যে, এক ব্যক্তি খোলা বৈদ্যুতিক তারের যে কোন এক প্রান্ত বা যে কোন একটি স্থান স্পর্শ করা মাত্রই তার দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হবে, সে প্রবল ঝাঁকুনী খাবে এবং তার স্বাভাবিক স্বস্তি ব্যাহত হবে। এ জন্য এক সাথে একই সময় তারের সকল অংশ স্পর্শ করার দরকার নেই। যে কোন একটি জায়গায় হাত লাগলেই হয়। রসূল (সা) বলেছেন ঃ "কুরআন আল্লাহর এক অটুট রশী। এর এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে, অপর প্রান্ত মানুষের হাতে।" সুতরাং এর যে কোন অংশ যদি আমরা মজবুতভাবে ও অটলভাবে ধরে রাখতে পারি, তাহলে তার পরিবাহিত রহস্য আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে ঢুকে যাবে, আর তাতে হৃদয় ঝাঁকুনী খাবে ও জীবন্ত হয়ে উঠবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ط

www.pathagar.com

"আল্লাহ অতি উত্তম কালাম নাযিল করেছেন। এ এমন কিতাব যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ কালাম শুনে সেই লোকদের গা শিউরে ওঠে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতপর তাদের দেহ ও মন নরম হয়ে আল্লাহর স্মরণে উৎসুক হয়ে উঠে।"-(সূরা আয যুমার ঃ ২৩)

আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন ঃ কুরআনের একটি আয়াতই যদি মনকে উজ্জীবিত করার জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে আর সারাটা কুরআন পড়ে কী লাভ ? আল্লাহই বা কেন একটি মাত্র আয়াত বা গুটিকয় আয়াত নাযিল করে ক্ষ্যান্ত থাকলেন না ? প্রশ্নটা যথার্থ ও সঙ্গত বটে। কিন্তু যখন আমরা জানতে পারি যে, মনকে সজীব করাই কুরআনের একমাত্র কাজ নয়, বরং কুরআনের কাজ হলো জীবনকে সুশৃংখল ও সুসংবদ্ধভাবে গড়ে তোলার জন্য সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতি রচনা করে দেয়া—যাতে করে মানুষ আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে আমল ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিপথগামী না হয়, তখন আর এ প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। কোন কোন সুফী বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তাসাউফ শিখলো কিন্তু ফিকাহ (জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সংক্রান্ত আল্লাহর বিস্তারিত আইন ও বিধান) শিখলো না, তার কুফরীতে পতিত হওয়া অবধারিত। এই তাসাউফই হলো মনের সজিবতার আরেক নাম। আর ফিকাহ শেখার অর্থ হলো আল্লাহর হুকুম ও বিধিমালা জানা। ইতিপূর্বে আমরা এর নাম দিয়েছি জীবনযাপনের সুষ্ঠু কর্ম-পদ্ধতি। আর কুফরী হলো আল্লাহর পথচ্যুত হওয়া। আল্লাহ যখন মানুষকে জীবন দিলেন এবং তার মধ্যে রূহ সংক্রান্ত যাবতীয় নিগূঢ় তত্ত্ব সমর্পণ করলেন তখন তাকে লাগামহীন ছেড়ে দেননি। তার মধ্যে বিবেক সৃষ্টি করেছেন যা তার দুনিয়ার জীবন সুশৃংখল ও পরিপাটি করে গড়ে এবং তার সব ব্যাপারে সুষ্ঠু কৌশল রচনা করে। এভাবে সে ভালো ও মন্দ এবং লাভ ও ক্ষতির বাছবিচার করতে সক্ষম হয়। কুরআনের রূহ বা প্রাণশক্তিও ঠিক তেমনি। তার দ্বারা মানবজাতির মন সজিব হয়। আর শরীয়াতের বিধান হলো এই সজিবতার জন্য বিবেক স্বরূপ। এ বিধান তাকে সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে আল্লাহর দিকে ধাবিত ও চালিত হবার পথ দেখায়। এ জন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "একজন ফকীহ (শরীয়াত বিশেষজ্ঞ) শয়তানের ওপর এক হাজার আবেদ (যিনি সর্বদা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর ইবাদাত ও ধ্যানে মগ্ন থাকেন)-এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী।" আগেই বলেছি যে, একটি মাত্র আয়াত এমনকি একটিমাত্র বচন দ্বারাও এই সজিবতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কেননা সে আয়াত বা বচনের মধ্য দিয়ে এমন এক রূহ বা প্রাণশক্তির স্ফুরণ ঘটে, যার সাথে আকৃতি ও আয়তনের কোন সম্পর্ক নেই। তার সাথে বচনের দৈর্ঘ বা হ্রস্বতারও কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য আহকাম তথা

www.pathagar.com

আইনগত বিধির কথা আলাদা। আমাদের জন্মগত প্রকৃতি থেকেই আল্লাহ জানেন যে, আইনগত বিধি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত না হলে আমাদের বিবেক তা উপলব্ধি ও উদ্ভাবন করতে সক্ষম নয়। বিবেক ও বুদ্ধি যদি হৃদয়ের মত প্রকৃতি ও গুণসম্পন্ন হতো এবং তা এক নিমেষে সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য গ্রহণ করতে সক্ষম হতো, তাহলে আল্লাহ আমাদের জন্য এক আয়াতেই সমস্ত আইনগত বিধি বর্ণনা করে দিতেন অথবা আইনগত বিধিগুলোকে আজ আমরা যেভাবে জানি ও চিনি, তার প্রকৃতি ও গুণাগুণ তা থেকে ভিন্ন রকম হতো। কিন্তু আল্লাহ সকল জিনিসকে তার সেই শাশ্বত নিয়মেই সংঘটিত করেন, যে নিয়মে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়। সুতরাং কুরআনের কতখানি আমরা পড়ি তার ওপর আমাদের মনের সজিবতা লাভ নির্ভর করে না—নির্ভর করে কিভাবে পড়ি তার ওপর। এ প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি পরামর্শ দিচ্ছি ঃ

১—কুরআনের প্রতিটি বচন ও তার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করুন।.....এজন্য কোলাহলমুক্ত নিভৃত নির্জনতায় কুরআন পড়া কর্তব্য —বিশেষত গভীর রাতের নির্জন মুহূর্তে—যখন মন অত্যন্ত নির্মল, নিষ্কলুষ ও স্বচ্ছ থাকে এবং হৃদয়ের সকল পর্দা খুলে যায়।

২—কুরআন অধ্যয়নের আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন যে, আপনার কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ও আকাংখা কি আল্লাহর অনুগত, না পার্থিব স্বার্থের অনুগত ?

একথা সকলের জেনে রাখা উচিত যে, প্রতিটি পার্থিব কামনা ও বাসনা বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে সুকঠিন পর্দা বিশেষ। মানুষের মনের সাথে কুরআনের সংযোগ সৃষ্টিতেও তা গুরুতর প্রতিবন্ধক। অর্থ লোলুপতা ও সম্পদের মোহ, সন্তান-সন্তুতির প্রতি স্নেহ ও মমতা, দুনিয়াবী স্বার্থের প্রতি মনের তীব্র আকর্ষণ ও চিন্তামগ্নতা, নিজের কর্ম, মেধা, সততা, যোগ্যতা, ক্ষমতা, শক্তিমত্তা, পদের দাপট প্রভৃতির ওপর গর্ববোধ, আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি প্রবৃত্তির দুর্নিবার আকর্ষণ ও ঝোঁক, প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সুখ ও সমৃদ্ধিতে উষ্মা ও উন্নাসিকতা তথা পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, বিরাগভাজন ব্যক্তির অমঙ্গল ও বিপদ কামনা ইত্যাদি মনের কতিপয় মারাত্মক বাধা ও অবরোধ বিশেষ। এসব অবরোধ মনের অভ্যন্তরে কুরআনের প্রাণশক্তি সঞ্চালনকে প্রতিহত করে।

সুতরাং আপনাকে সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে যে, আপনার সাথে কুরআনের সংযোগ স্থাপনের পথে এসব বাধার কোন একটাও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। এর মাপকাঠি আপনার সামনেই রয়েছে। কাজেই আপনার

www.pathagar.com

অবস্থার খোঁজ-খবর আপনি নিজেই নিতে চেষ্টা করুন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের এ দু'টি উক্তি প্রনিধানযোগ্য ঃ

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ط

"যে ধ্বংসের মুখে পতিত, সে যেন সুস্পষ্ট যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হয় আর যে বেঁচে গেছে সে যেন সুস্পষ্ট যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে বেঁচে থাকে।"—(সূরা আল আনফাল ঃ ৪২)

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝ وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط

"হে নবী ! যখন আপনি কুরআন পড়েন, তখন যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী, তাদের মধ্যে ও আপনার মধ্যে আমি একটা গোপন পর্দা ঝুলিয়ে দেই এবং তাদের মনের ওপর কতকগুলো ভারী অবরোধ স্থাপন করি যেন কুরআনকে তারা বুঝতে না পারে। তা ছাড়া তাদের কানের ওপরও আমি একটা ভারী বোঝা চাপিয়ে দেই।"-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৫-৪৬)

প্রিয় ভাই ! মনের সজিবতাই সবকিছু। আপনি যখন সজিবতা চান, তখন আপনাকে সজিব বানাতে পারে এমন কোন চেষ্টাতেই কার্পণ্য করবেন না —চাই তা যতই কষ্টকর হোক না কেন। আমরা এমন একটা ব্রত নিয়েছি এবং এমন একটা বার্তা নিয়ে অগ্রসর হয়েছি—যার হক আদায় করা একমাত্র সজিব মনের পক্ষেই সম্ভব। আমরা পরকালীন জীবনের অভিযাত্রিক, যে জীবনে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। শুধু কলুষমুক্ত ও নির্দোষ মন নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হতে পারলেই সেখানে লাভবান হওয়া যাবে। কাজেই সামষ্টিক রুহানিয়াত সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা যেভাবে বলেছি সেই ভাবে এই পার্থিব মোহ ও লালসা থেকে মনকে মুক্ত করুন, যাতে করে আপনার মন সকল বাধা-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। মন যখন বাধা-বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, তখন আপনি একজন জান্নাতবাসীর অনুভূতি নিয়েই সবকিছু বুঝবেন ও অনুভব করবেন, কাউকে ভালোবাসবেন, কাউকে ঘৃণা করবেন, কখনো কাঁদবেন, কখনো বিনয়াবনত হবেন।

৩—আপনি একান্তভাবে আল্লাহর গোলাম—এই মনোভাব সর্বদা মনে জাগরুক রাখুন। এটাকে আপনার প্রবল বাস্তব অনুভূতিতে রূপান্তরিত করুন —রূপকের পর্যায়ে রাখবেন না। সেই অনুভূতিকে এতটা প্রবল ও তীব্র করুন, যেন তা আপনাকে এক বিরাট ও মহান মনিবের সামনে তার গোলামের বশ্যতা ও আনুগত্যের সঠিক রূপ দেখিয়ে দেয়। মহাপ্রতাপশালী কোন

www.pathagar.com

স্বৈরাচারী মনিবের সামনে একজন নগণ্য ভৃত্যের মনে কিরূপ ভীতি ও উৎকণ্ঠার ভাব বিরাজ করে, তা আমরা সবাই বিলক্ষণ জানি। আমরা এও জানি যে, এই আজানুপ্রণত দাসের সমগ্র সত্তা তার কানে ও মনে এসে কেন্দ্রীভূত হয়। তাকে যা আজ্ঞা করা হয় তা সে শুনবে, যা নির্দেশ দেয়া হয় তা সে অম্লান বদনে মেনে নেবে—এ জন্য সে সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকে। তার চোখ, মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি, মাথার হেলন ও দোলন—সবকিছু এক বাক্যে সোচ্চার ঘোষণা দিতে থাকে যে, সে সর্বান্তকরণে মনিবের অনুগত এবং যে কোন নির্দেশ সানন্দে মাথা পেতে নিতে সে প্রস্তুত। এসব অভিব্যক্তি সে তার সর্বাঙ্গে ফুটিয়ে তোলে শুধু মনিবকে একথা জানাবার জন্য যে, সে মনিবের সন্তুষ্টি লাভেই উদগ্রীব এবং মনিবের ইচ্ছাতেই তার ইচ্ছা।

দুনিয়াতে আল্লাহর এক বান্দাকে তারই মত অপর এক বান্দার সামনে এভাবে নতজানু থাকতে দেখা যায়। আমরা চাই, এ অবস্থাটা তার মধ্যে বিরাজ করুক শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে। কারো যদি এ সৌভাগ্য লাভ হয়, তবে তার ওপর থেকে সকল পর্দা, সকল বাধা ও অন্তরায় অপসৃত হবেই এবং সে নিশ্চিতভাবে নিজেকে আল্লাহর আরশের সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। তখন সে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধীন দেখতে পাবে। তখন সে আল্লাহর প্রতাপ ও বিরাগ থেকে একমাত্র আল্লাহরই করুণা ও কৃপার আশ্রয় চাইবে। এ সময়ে তার সমগ্র সত্তা তার মনে ও কানে কেন্দ্রীভূত হবে। ফলে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ তার মনে এত গুরুত্ব লাভ করবে, যে অন্য কারুর আদেশ ও নিষেধ তার ধারেকাছেই ঘেষতে পারবে না। এ অবস্থাটায় উপনীত হওয়া সম্ভব একমাত্র ক্রমাগত অনুশীলন ও রপ্ত করণের মাধ্যমে। আর এ অবস্থাটাই নিসন্দেহে কুরআনের সাথে মনের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা।

৪—এই দাসত্ববোধটা হতে হবে অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণ ও যথার্থ। মনিব যে আদেশ দিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা বাস্তবায়নে ত্বরিত গতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রেরণা তার মধ্যে সৃষ্টি হতে হবে ঐ দাসত্ববোধ থেকে। এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে দু'টো কথা বলা যায়ঃ

প্রথমত, আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন এক দিক দিয়ে উক্ত নির্দেশের বাস্তব বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার অনেক দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট দিক স্পষ্ট হয়ে যায়। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কিতাবের এমন বুঝ লাভ করে, যা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক তেলাওয়াতে সীমাবদ্ধ পাঠক লাভ করে না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য দায়িত্বেরই বাস্তবায়ন মাত্র। অথচ বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়ার আগে এ দায়িত্ব পালনের সাহসই পাওয়া যাচ্ছিল না। মানুষ যখন নিজেকে কঠোর চেষ্টা ও কষ্টকর সাধনার মাধ্যমে আদেশ বাস্তবায়নে প্রস্তুত করে নিতে পারবে এবং কোন রকম শৈথিল্য ও উদাসীনতা ছাড়াই এসব দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হবে, তখন তার মনে ও স্নায়ূতে চঞ্চলতার জোয়ার বয়ে যাবে, তার বোধশক্তিতে চেতনার উন্মেষ ঘটবে এবং তার মনিষায় জাগরণের ঢেউ উঠবে। এতে করে তার কুরআন বুঝার অগ্রগতি সাধিত হবে এবং এই মহাগ্রন্থের বহু জটিল রহস্যের গ্রন্থী উন্মোচিত হবে। বাস্তবায়নের সাগ্রহ উদ্যোগ ছাড়া স্নায়ূমন্ডল ক্রমান্বয়ে সচেতনতা হারাতে বসবে, মানসিক বৃত্তিগুলো উদাসিনতা ও স্থবিরতার শিকার হতে থাকবে। ফলে এগুলো আর কুরআন অধ্যয়নের যোগ্য থাকবে না।

৫—কুরআন যে আল্লাহরই বচন ও বক্তব্যের সমষ্টি, সে কথা মনে রাখতে হবে। আর একথাও স্মর্তব্য যে, আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠতম মহিমা ও উৎকৃষ্টতম গুণাবলীর একমাত্র আধার। যে কোন বচন ও বাণী, এমনকি মানুষেরও বচন ও বাণী, বক্তার অজ্ঞাত রহস্য ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রতীক। এজন্য আমাদের কেউ যখন কাউকে কিছু শেখাতে চায় তখন সে নিজের উক্তি ও বচনসমূহকে একটা পাঠ্য বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট করে। সেই পাঠ্য বিষয় তার বক্তব্য পেশ করতে তাকে সবিশেষ সহায়তা করে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, আল্লাহর অজ্ঞাত রহস্য, তার মহিমা ও চরমোৎকৃর্ষ প্রাপ্ত গুণাবলীকে আমরা যেন তার বাণী থেকেই উদ্ধার করি। ইমাম জাফর সাদেক (র) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাঁর কালামের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি জগতের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু তারা দেখতে পায় না।"

আল্লাহর কালামের মধ্যে তাঁর সাক্ষাত লাভের জন্য তাঁর চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত ও সর্বোচ্চ মহিমামণ্ডিত গুণাবলী আমাদের মনে জাগরূক করা প্রয়োজন। যেমন সর্বশক্তিমানত্ব, একাধিপত্য, মহাকল্যাণকারিতা ও করুণাময়ত্ব প্রভৃতি —যার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এগুলোর মধ্য থেকে যতগুলোকে সম্ভব পরম একনিষ্ঠ ও ভীতিবিহ্বল মনে স্মরণ করতে হবে। এই গুণাবলীর ব্যাপারে পূর্ণ সচেতনতা নিয়ে এবং কুরআন অধ্যয়ন ও তার তত্ত্বানুসন্ধানের আগ্রহ নিয়ে যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে অগ্রসর হবে, কুরআনের আয়াতগুলো নিজের পরিপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার তার সামনে উজাড় করে দেবে, সকল গুপ্ত রহস্য তার সামনে উদঘাটন করে দেবে।

একটা নিবন্ধ পড়ার আগে আমরা সাধারণত তার লেখকের নামটা পড়ে দেখি। তিনি যদি কোন অসাধারণ ও খ্যাতনামা গ্রন্থকার হন, তাহলে তার

www.pathagar.com

কতকগুলো সুবিদিত গুণ সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মানসপটে ভাসে। যেমন তার শ্রুতিমধুর ভাষা, লালিত্যময় বাকরীতি, অলংকার সমৃদ্ধ রচনাশৈলী ও মনোজ্ঞ বর্ণনাভঙ্গী তার প্রামাণ্য ও অকাট্য তথ্যে সমৃদ্ধ বক্তব্য, তার যুক্তিসঙ্গত মতামত এমনকি তার ব্যক্তিগত ও মানসিক বৈশিষ্টসমূহ পর্যন্ত আমাদের মনকে তাৎক্ষণিকভাবে নাড়া দিয়ে যায়। এসব গুণ-বৈশিষ্ট মনে জাগরূক হওয়ায় আমরা নিবন্ধের প্রতিটি কথা গভীরভাবে প্রনিধান করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকি এবং তার প্রত্যেকটা বক্তব্যের সূক্ষ্ম ইংগীত ও তাৎপর্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে সচেষ্ট হই। কখনো কখনো এমনও হয় যে, আমরা লেখকের নাম বিহীন প্রবন্ধ পড়ে ফেলি তখন লেখাটাকে মামুলি মনে করেই পড়ি পরে যখন কেউ জানাই যে, লেখাটা অমুক নাম করা লেখকের, তখন সেই লেখকের অসাধারণ মনিসা ও শক্তিধর প্রতিভার কথা মনে করে পুনরায় পড়ি। এবার লেখকের মধ্যে এমন সব তত্ত্বের সন্ধান পাই যা ইতি পূর্বে পাইনি। লেখার ছত্রে ছত্রে যেন লেখকের আত্মা আমাদের দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। অথচ ইতিপূর্বে সে ছিল পর্দার আড়ালে নিখোঁজ ও অদৃশ্য। বলা বাহুল্য আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে এর চেয়েও উচ্চাঙ্গের উদাহরণ প্রযোজ্য। আমি মনে করি এ উদাহরণ থেকে আমরা যা প্রতিপন্ন করতে চাই। পাঠক তা যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছেন।

৬—সবশেষে আমাদের এমন ভাবে কুরআন অধ্যয়ন করা উচিত যেন তা স্বয়ং আল্লাহর মুখ থেকেই শুনতে পাচ্ছি। এ বিষয়টা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান দ্বারা বুঝা গেলেও আমরা ক্রমনন্বয়ে এর প্রতি উদাসীন হয়ে চলেছি। কেননা কুরআন তো আল্লাহর কথাই। তিনি আমাদের এ সম্বোধন করেই একথা বলেছেন এবং আমাদেরকে উদ্দেশ করেই বলেছেন। আর এর ন্যূনতম দাবী এই যে, এই মহান বক্তার বক্তব্য যেন আমরা কান লাগিয়ে ও মনোযোগ দিয়ে শুনি। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

"যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা একাগ্রভাবে শোনো এবং চুপচাপ থাক। আশা করা যায় তোমরা করুণা লাভ করবে।"-(সূরা আরাফ ঃ ২০৪)

আল্লাহর প্রতি এই একাগ্রতা শুধু কান লাগালেই সম্পন্ন হয় না। বরং তা সমগ্র মন ও বোধ শক্তি নিয়োজিত করার দ্বারাই সুসম্পন্ন হতে পারে। এটা এমন একটা মর্যাদা যা লাভ করতে মানুষকে ক্রমাগত অনুশীলন ও অধ্যবসায় দ্বারা তার উচ্চ মর্গে আরোহণ করতে হয়। আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে কোন এক মনীষী বলেছেন আগে আমি কুরআন পড়ে কোন মজা পেতাম না। পরে আমি এমনভাবে পড়তে আরম্ভ করলাম যেন আমি রসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনছি। তিনি যেন সাহাবাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছেন। আরো কিছু দিন পর

www.pathagar.com

পর এমন ভাবে পড়তে লাগলাম যেন জিবরীল (আ) রসূলকে (সা) পড়ে শোনাচ্ছেন। আর আমি জিবরীলের মুখ থেকে শুনছি। এরপর পালা এল স্বয়ং আল্লাহর ; এখন আমি তাঁর মুখ থেকেই শুনি, এই পর্যায়ে আমি এত মজা পাই এবং এত বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হই যে, তা থেকে নিবৃত্ত থাকা আমার পক্ষে এক বিন্দুও সহনীয় নয়। এটা প্রত্যক্ষ অবলোকনের স্তর। এর বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। কেবল আলামত ও লক্ষণ উল্লেখ করা সম্ভব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার ভুক্ত জনৈক বুজুর্গ সম্পর্কে কথিত আছে যে, একবার নামাযের মধ্যে তার এমন ভাবান্তর উপস্থিত হলো যে, তিনি মুর্ছা গেলেন। জ্ঞান ফিরে পেলে তাকে এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, "আমি অমুক আয়াতটি মনে মনে বার বার পড়ছিলাম। সহসা আমি স্বয়ং আল্লাহর মুখ থেকে ঐ আয়াত শুনতে পেলাম। তখন আল্লাহর মহিমান্বিত অবস্থান চাক্ষুস দেখতে পাওয়ায় আমার দেহ স্থির থাকতে সক্ষম হয়নি।"

প্রিয় দ্বিনী ভাই ! যেসব উপায়ে আপনার পক্ষে কুরআনের সাথে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব, তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করলাম। এ উপায়ে যখন আপনি সংযোগ স্থাপন করবেন তখন আপনার হৃদয়ে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হতে এবং সজিবতার বিকাশ ঘটতে আরম্ভ করবে। আপনার মন তখন দুলতে থাকবে, আনন্দে মাতোয়ারা হবে এবং সদ্য উদগত উদ্ভিদের মত সুষমামণ্ডিত হবে। মালেক ইবনে দীনার (র) বলতেন ঃ হে কুরআনের ধারক ও বাহকগণ ! কুরআন তোমাদের হৃদয়ে কোন্ ফসল ফলিয়েছে ? কুরআন তো মু'মিনের জন্য ফসলের মওসুম নিয়ে আসে যেমন মেঘ পৃথিবীর জন্য বয়ে আনে নূতন শস্যের আগমনি বার্তা।

(২)

কুরআনকে একটি রূহ তথা প্রাণশক্তি বা উজ্জীবনী ও চালিকা শক্তি হিসেবে অধ্যয়নের পরেই দাওয়াতকারীর দ্বিতীয় যে কর্তব্য দাঁড়ায় তা হলো এই যে, জিহাদের সবচেয়ে অভিনব ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট তার সবচেয়ে নির্ভুল তত্ত্ব ও তথ্য এবং তার সবচেয়ে মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষের যে, পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যে জিহাদের সর্বাধিনায়ক স্বয়ং রাসূল (সা) এবং যে জিহাদের সৈনিক সাহাবায়ে কেরাম (রা) সেই জিহাদের বিভিন্ন খবর ইসলামের দাওয়াত দাতাকে কুরআনের বিভিন্ন অংশ মন্থন করে খুজে বের করতে হবে। সেই সাথে মক্কী পরিমণ্ডলে ও মাদানী পরিমণ্ডলে জিহাদের প্রকৃতি ও চরিত্র কি রূপ ছিল, তা অনুসন্ধান করতে হবে। কুরআনের এ অধ্যয়ন হতে হবে শিক্ষামূলক ও উপলব্ধি মূলক নিছক আবৃত্তি মূলক ও সান্ত্বনা মূলক নয়।

১-এই অধ্যয়নটার গুরুভার লাঘব করার মানসে বলছি যে, মক্কার জিহাদ ছিল সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দু'টি মনোবৃত্তি ও মনন ভঙ্গীর দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম।

www.pathagar.com

একটা মনোবৃত্তি ছিল আল্লাহ, ফেরেশতা, রসূল ও আখেরাতের বিশ্বাস ভিত্তিক এবং সেই বিশ্বাসের আলোকে জীবন ও জগতের প্রকৃত তত্ত্ব ও পরিচয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ ভিত্তিক।

২- দ্বিতীয় মনোবৃত্তি হলো জড়বাদ, ভোগবাদ ও নিরেট আওতাভিত্তিক । এ মনোবৃত্তি ঈমানের কোন একটি তত্ত্বেও বিশ্বাস করে না। বিশ্বজগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী এ রকম যে, ওটা নিছক একটা ইন্দ্রিয় গোচর সীমাবদ্ধ পার্থিব ব্যাপার। দোলনা থেকে এর শুরু এবং কবরে এর সমাপ্তি। এর আগে পরে আর কিছু নেই।

প্রথম মনোবৃত্তির কাছে তাওহীদের আকীদা স্বীকৃতি কিন্তু দ্বিতীয় মনোবৃত্তির কাছে এটা একটা উদ্ভট ব্যাপার। সূরা সোয়াদে এ মনোবৃত্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝

"এতগুলো মাবুদকে (রসূল) মাত্র একটা মাবুদ বানিয়ে ফেললো ? এ তো ভীষণ উদ্ভট কথা ! তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এই বলে সটকে পড়লো যে, তোমরা যে যার কাজে যাও তো। নিজেদের দেবদেবীদের ব্যাপারে মত স্থির রাখ। আসলে এ একটা মতলববাজী, আমরা ইদানিং কালে এমন কথা আর শুনিনি। নিশ্চয় এ একটা মনগড়া ব্যাপার।"

-(সূরা সোয়াদ ঃ ৫-৭)

বস্তুত ইন্দ্রিয়নির্ভর বিকৃত বুদ্ধিবৃত্তির চিন্তাধারা এ রকমই। তাওহীদ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যত বিতর্ক চলে, তার সবটাকে এই চিন্তাধারারই ফসল বলে মেনে নেয়া চলে।

ঈমানদার সুলভ মনোবৃত্তির কাছে রসূল বিশ্বাস উদ্ভট মনে হয় না। কিন্তু বস্তুবাদী বুদ্ধিবৃত্তি একে কঠোরভাবে অস্বীকার করে। তার প্রতিক্রিয়া এ রকম হয়ে থাকে।

أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا -

"আল্লাহ মানুষকে রসূল করে পাঠালেন না কি ?"

-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৪)

www.pathagar.com

হঠকারিতা ও উপহাসের সাথে বলা হয় ঃ

مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ط

"রসূলের এ কেমন চালচলন যে, খাওয়া দাওয়াও করে, বাজারেও ঘোরাফিরা করে ?"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৭)

রসূলের দারিদ্রকে অবিশ্বাসীরা তাদের মতের সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতো। তারা মনে করতো যে, আল্লাহ্ যদি মানুষকেই রসূল বানাতেন, বড় বড় পদ মর্যাদাশালী, প্রতাপশালী ও ধনবানদেরকেই রসূল নির্বাচন করতেন। তারা বলতো !

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ط

"আমাদের মধ্য থেকে কি শুধু ওঁর উপরই ওহী নাযিল হলো ?"
–(সূরা সোয়াদ ঃ ৮)

আরো বলতো ঃ

لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝

"এই কুরআন দুই শহরের কোন গন্যমান্য ব্যক্তির ওপর নাযিল হলেই পারতো।"–(সূরা আয যুখরুফ ঃ ৩১)

জাহান্নামের ফেরেশতা ১৯জন। কিন্তু এই জড়বাদীরা মনে করতো ফেরেশতারা তাদেরই মত। তাই এমন জাহান্নামকে তারা মস্করার যোগ্য মনে করতো, যেখানে অগণিত মানুষ আযাব ভোগ করবে। অথচ মাত্র ১৯জন তাদের পাহারা দেবে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ص وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لا وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ط وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

www.pathagar.com

"আমি দোযখের প্রহরী বানিয়েছি কেবল ফেরেশতাদেরকেই। তাদের সংখ্যাটা আমি অবিশ্বাসীদের জন্য পরীক্ষার ব্যাপার বানিয়েছি। উদ্দেশ্য এই যে, কিতাবধারীরা তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করবে। মু'মিনদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পাবে এবং কিতাবধারীরা ও মু'মিনরা কোন রকম সংশয় পোষণ করবে না। তবে যাদের মনে রোগ আছে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা বলবে, এর দ্বারা আল্লাহ কোন্ উদাহরণ দিতে চেয়েছেন? এভাবেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথগামী করেন। আসলে তোমার প্রভুর সৈন্য সামন্তের সংখ্যা কত তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। বস্তুত! সে সৈন্য সামন্ত মানুষের জন্য হুশিয়ারী সংকেত মাত্র।"-(সূরা আল মুদ্দাসসির ঃ ৩১)

পরকালের বিশ্বাস তাদের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে সবচেয়ে অসম্ভব ও সুদূর পরাহত ব্যাপার। কুরআনের ভাষায় ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ○

"অবিশ্বাসীরা বলে ঃ তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেবো না কি, যে তোমাদেরকে জানায় যে, তোমরা কবরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও নাকি নুতন করে সৃষ্টি হবে?"-(সূরা আস সাবা ঃ ৭)

উল্লিখিত দুই ধরনের মনোবৃত্তির মধ্যে যত বিতর্ক এই মৌলিক আকিদা বিশ্বাসগুলো নিয়েই। এর বিপুল অংশকে কুরআনে রেকর্ড করা হয়েছে। কুরআন এ অকীদার যথার্থতা প্রতিপন্ন করে এ সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের মনোভাব কি এ নিয়ে তাদের বিতর্ক ও সন্দেহ কি ধরনের তাও বর্ণনা করে এবং অকাট্য প্রমাণ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিগ্রাহ্য সরল ও সুস্পষ্ট যুক্তি দিয়ে তা খন্ডন করে। এসব যুক্তি আমাদের সামনে জড়বাদী মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট তুলে ধরে এবং মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বছর যাবত যে তর্কযুদ্ধের বহ্নিশিখা জ্বলেছিল তার একটা স্বচ্ছ ধারণা দেয়।

দুই মনোবৃত্তির মধ্যে যেমন যুদ্ধ চলেছিল, তেমনি যুদ্ধ চলেছিল দুই শক্তির মধ্যেও। তার একটা হলো নিরস্ত্র ও নিরীহ ঈমানী শক্তি, আর অন্যটা হঠকারী ও আগ্রাসী তাগুতী শক্তি। তাগুতী শক্তি সবচেয়ে বেশী যে জিনিসের ভয় পেত তা ছিল তার আধিপত্য ও কর্তৃত্ব হারানো এবং দুর্বল মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার বিনিময়ে তার যে কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠেছিল তা হাত ছাড়া হওয়া। এ জন্যই মুমিনদের ওপর সে তার সমস্ত আক্রোশ ঝাড়তো এবং নির্যাতন চালাতো। এ ব্যাপারে তারা কোন রক্ত সম্পর্কের পর্যন্ত পরোয়া করতো না। এবং কোন

www.pathagar.com

রকম বিবেকের দংশন এবং নৈতিক বা প্রতিশ্রুতিগত দায়-দায়িত্বও অনুভব করতো না। এই হঠকারী আগ্রাসনের মোকাবিলায় ঈমানী শক্তি কোন রকমের দুর্বলতা ও ভীতি বিহ্বলতা দেখায়নি। বরং ঈমানী শৌর্যবির্য আল্লাহর ওপর নির্ভরতা আর রসূলের অনুকরণ ও অনুসরণের তেজস্বিতায় বলিয়ান হয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

কুরআনের মক্কী অংশ এসব কিছুরই ছবি তুলে ধরে এবং এর দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলীর নিখুঁত বর্ণনা দেয়। এই দুই ধরনের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের বিবরণ যখন ধীর শান্ত মস্তিষ্কে অধ্যয়ন করবেন আর কুরআনের শুধু মক্কী অংশে তার ঘটনাবলী লক্ষ্য করবেন এবং নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুসারে এক সূরা থেকে আর এক সূরায় প্রবেশ করবেন, তখন আপনার পূর্ণ জজবা ও আবেগ নিয়ে এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে এবং আপনার অন্তরে এ সংঘর্ষের উত্তাপ ও তেজস্বিতার অনুপ্রবেশ ঘটতে এক মুহূর্তও দেরী হবে না। এভাবে কুরআন বুঝা, তার নিগূঢ় তাৎপর্য ও তত্ব উদ্ধার করা আপনার পক্ষে আরো বেশী সহজ সাধ্য হবে। এ ভাবে জিহাদের ময়দানে বসেই আপনি এই বাস্তব জিহাদের বর্ণনা দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন এবং আপনার লক্ষ্য ও মিশন বাস্তবায়নের আসল কর্মক্ষেত্রেই এর দ্বারা লাভবান হতে পারবেন। তখন যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন যে, আজ আর গতকালের মধ্যে কী গভীর সাদৃশ্য। তবে এ উপলব্ধি নির্ভর করে ঘটনাবলীর সঠিক নিরীক্ষা ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষুরধার মেধা ও মনীষার ওপর। প্রসঙ্গত জানিয়ে দিচ্ছি যে, হাফনী নাসেফ ও তার সহকর্মীদের সংকলনে নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুসারে সূরাগুলো বিন্যস্ত আছে। এবার মদিনার রণক্ষেত্রের পর্যালোচনা করা যাক। সেখানে মু'মিনদের বাহিনী তিনটে পৃথক ফ্রন্টে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। সে তিন ফ্রন্ট হলো ইহুদী, মোনাফেক ও সমগ্র আরবের মোশরেকদের ফ্রন্ট। সেখানে তারা শুধু মক্কার মোশরেকদের মোকাবিলা করেনি। এই সাথে একথাও স্মরণ রাখা প্রায়োজন যে, এখানে মু'মিনদের বাহিনী মক্কার চেয়ে অধিকতর জনশক্তি ও অস্ত্র শক্তিতে সজ্জিত ছিল। ফলে তা ছিল একটা বিপজ্জনক সশস্ত্র শক্তি।

১- প্রথমে ইহুদীদের বিবরণ দেয়া যাক। তারা ছিল আসমানী কিতাব ও ওহীর জ্ঞানে যুগ যুগ কাল ধরে সমৃদ্ধ। কিন্তু তারা শুধু কিতাবের আঙ্গিক ও শাব্দিক দিক ধারণ করেছিল। তার মূল প্রাণশক্তি তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। তাদের মগজে শুধু এর শব্দগুলো স্থান পেয়েছিল। এর সুমহান আদর্শ ও নিগূঢ় মর্মবাণী থেকে তারা রিক্ত ও দেউলে হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের মন হয়ে গিয়েছিল নির্জীব ও নির্মম। তাই তাদের অধিকাংশ আল্লাহর বিধানের অবাধ্য হয়ে পড়ে। তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি তীব্র হয়ে ওঠে এবং তারা নিষিদ্ধ সুদ ও ঘুষের লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বার্থ শিকারে তারা হারাম হালাল ও ন্যায় অন্যায়ের বাছবিচার করতো না। তা সত্ত্বেও তারা বলতো। আমাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। অথচ সেই পার্থিব স্বার্থ আবারও যদি সামনে এসে পড়ে, অমনি তারা তা খপ করে ধরে ফেলে। এতে তাদের বিন্দুমাত্রও বাছবিচার ও লজ্জাশরমের বালাই ছিল না। কেননা তারা যে আল্লাহর সন্তান সন্তুতি ও প্রিয়জন। কাজেই তাদেরকে শুধু অল্প কিছু দিনের জন্যই আগুন স্পর্শ করতে পারবে। এভাবে তারা তাদের দ্বীনদারীকে দুনিয়াদারীর অধীনস্ত করে দেয়। নিজেদের কিতাবকে নগণ্য সার্থের বিনিময় বিকিয়ে দেয়। সংক্ষেপে এই ছিল তাদের ও তাদের পূর্ব-পুরুষদের তৎকালীন হাল-চাল।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় এলেন, তখন তাদের সাথে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এ মৈত্রী তাদের নিরাপত্তা, শৃংখলা ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। তারা যদি বৈধ ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন করতে চাইত তবে তারও নিশ্চয়তার ব্যবস্থা এতে ছিল। কিন্তু তারা যখন দেখলো, তাঁর শক্তি ক্রমেই বাড়ছে, তাঁর কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও প্রতাপ ক্রমেই জোরদার ও প্রবলতর হচ্ছে, তার আনীত ইসলাম দিন দিন নিরংকুশ ক্ষমতাশালী ও পরক্রান্ত হয়ে উঠছে এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের চাবিকাঠি তার হাতেই কেন্দ্রীভূত হতে চলেছে, তখন প্রতিহিংসা তাদের মনকে কুরে কুরে খেতে লাগলো। এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন তাদের মনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আল্লাহ তাদের এ অবস্থার বর্ণনা দিয়েই বলেন ঃ

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (المائدة : ٦٨)

"তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যে ওহী নাযিল হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে তাদের অনেককেই আরো বেশি হঠকারী ও অবাধ্য বানিয়ে তুলবে। অবিশ্বাসী জাতির এ আচরণে তুমি ব্যথিত হয়ো না।"

ইহুদীদের চরিত্রের এ হচ্ছে দু'টো অতি নোংরা বৈশিষ্ট। প্রথমটা হলো নগণ্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য আল্লাহর দ্বীনকে বিসর্জন দেয়া। আসলে এটা তাদের এক প্রাচীন ব্যাধিও। দ্বিতীয়টা হলো তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ। এটা তাদের নয়া ব্যাধি। এই সাথে যুক্ত হয়েছিল তাদের শঠতা, ধূর্তামি, ধড়িবাজি, বিশ্বাসঘাতকতা, কুটিলতা ও ষড়যন্ত্রপরায়নতা। কুরআনে তাদের দুনিয়াবী সার্থের বিনিময়ে দ্বীনকে বিকিয়ে দেয়ার সর্বনাশা বেসাতীর স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়ে বলেছে ঃ

www.pathagar.com

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ○

"যখন আল্লাহ্ কিতাব প্রাপ্তদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা মানুষের কাছে এ কিতাবকে শ্রেষ্ঠ করে তুলে ধরবে। কোন ক্রমেই তা লুকিয়ে রাখবে না। কিন্তু পরক্ষণেই তারা সে অঙ্গীকারকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে এবং তার বিনিময়ে নগণ্য পার্থিব স্বার্থ আয় করেছে। কী জঘণ্য পণ্যই না তারা কিনে থাকে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৭)

তাদের এই চরিত্র চিত্রনে কুরআনের মাদানী অংশের বেশ কিছু আয়াত নিয়োজিত। আর তাদের দুনিয়া প্রীতি ও পার্থিব স্বার্থ লোলুপতার বর্ণনাও বহু আয়াতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এ আয়াতটি লক্ষণীয় ঃ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ

"মানব জাতির মধ্যে তাদেরকেই তুমি দীর্ঘ জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশী উৎসুক দেখবে। এমনকি মোশরেকদের চেয়েও বেশী। তাদের কেউ কেউতো হাজার বছরের আয়ু পাওয়ার বাসনাও পোষণ করে।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ৯৬)

এ আয়াতের ব্যাকারণগত বিশ্লেষণ থেকে এ বিষয়টাও সাথে সাথে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, কোন বিশেষ ধরনের বা মানের জীবন তাদের কাম্য নয়। জীবন হলেই তাদের হয়, তা যে রকমই হোক।

তাদের কাছে উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট, উঁচু মানের কিংবা নীচু মানের, ভদ্র কিংবা ইতর সম্ভ্রান্ত কিংবা অসম্ভ্রান্ত সব ধরনের জীবনই সমান। জীবনের মান বা রকমফের নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। জীবন বা আয়ুষ্কালটাই তাদের কাছে প্রধান, তা যেমনই হোক।

কুরআন তাদের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার বিবরণ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

www.pathagar.com

"মোশরেক ও আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তাদের কেউই চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পথ থেকে তোমাদের কাছে কোন ভালো জিনিস নাযিল হোক। অথচ আল্লাহ তাঁর রহমতের জন্য যাকে ইচ্ছা তাকেই নির্বাচিত করেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১০৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا ج

"কিতাবধারীদের অনেকেই সত্য তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরও নিছক হিংসাবশত তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পরও পুনরায় কাফের বানানোর খায়েশ রাখে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১০৯)

অন্যত্র ঃ

وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا ج وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ط

قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

"যখন তোমাদের সাথে তাদের দেখা হয় তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু যেই নিভৃতে চলে যায় অমনি হিংসার চোটে আঙ্গুল কামড়ায়। তুমি বল ! তোমরা তোমাদের হিংসা নিয়ে মর গিয়ে। আল্লাহ মনের সকল গোপন কথা জানেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১৯)

এসব দুনিয়া লোভী নরাধম—যারা দুনিয়ার সার্থে আল্লাহর দ্বীনকে বিকিয়ে দিয়েছে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মোশরেকদের সাথে খোলাখুলি যুদ্ধ করতে আসবে, এটা কি আশা করা যায় ! কক্ষণো নয়। মোশরেকরা তার বিরুদ্ধে কূটতর্ক এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের মাধ্যমে প্রকাশ্যে ও নগ্ন ধৃষ্টতা সহকারে আগ্রাসী যুদ্ধ চালিয়েছিল। কিন্তু এসব নীচাশয় লোকদের কাছ থেকে কুচক্রীসুলভ ও কাপুরুষোচিত যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না। আর এটা এমন এক যুদ্ধ, যা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা সর্বাগ্রে নিজেদের জীবন ও নিরাপত্তার জন্যই উদগ্রীব ও উৎকণ্ঠিত থাকে। এই নিকৃষ্ট কাপুরুষতা তাদেরকে অতপর যত ঘৃণীত ও নোংরা পন্থা অবলম্বেই প্ররোচিত করুক, তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। তারা যখন দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে পরিত্যাগ করতে পেরেছে এবং তাদের আসমানী কিতাবকে সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য বিসর্জন দিতে পেরেছে তখন সেই নোংরা যুদ্ধ কৌশলগুলোর বাস্তবায়নের প্রায়োজন দেখা দিলে তারা আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করতে কি কুণ্ঠিত হবে ? কক্ষণো নয়। কেননা এ পংকীল কৌশল প্রয়োগে তাদের এক ফোটা রক্তও ঝরাতে হয় না কিংবা তাদের জীবন ও নিরাপত্তাকে কিছু মাত্র বিপদ বা কষ্টের ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে হয় না।

www.pathagar.com

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে তারা একথা শুনেছে ও জেনেছে যে, তিনি মূসা (আ) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের মত শরীয়াত নিয়েই এসেছেন।

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى -

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই বিধানই প্রবর্তন করেছেন। যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমি তোমার কাছে ওহী যোগে পাঠিয়েছি এবং যার আদেশ আমি ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসাকেও দিয়েছিলাম।"-(সূরা আশ শূরা ঃ ১৩)

কুরআনের আইন ও তাওরাতের আইনের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য এ উক্তির যথার্থতার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই সাদৃশ্যের একটি দৃষ্টান্ত নিম্নের আয়াতে লক্ষণীয় ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ لا وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط

"তাওরাতে আমি তাদের জন্য বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং প্রত্যেক জখমের সমান বদলা।"-(আল মায়েদা ঃ ৪৫)

এই হলো নবাগত নবীর দাবী এবং তাঁর আনিত কুরআনেরও দাবী। এর সাক্ষী তারাও এবং তাদের কিতাবও। এখন এটা যদি তারা স্বীকার করে ও মেনে নেয় তাহলে সেটা হয় তাদের শত্রুকে নিজেদের ওপর কর্তৃত্বশীল ও বিজয়ী করার সমার্থক। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে তা হলে শত্রুর দাবীকে খণ্ডন করতে পারে এবং নিজেদের হিংসা চরিতার্থ করতে পারে। এমতাবস্থায় তারা কি এর বিরুদ্ধতা থেকে বিরত থাকবে বলে মনে করেন? কুরআন এ কথাও বলেছে যে, তাওরাত এই নবীর সুসংবাদ দিয়েছিল এবং তাঁর কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্টের উল্লেখ করেছে। সে বলেছে ঃ

يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ -

www.pathagar.com

"তারা তাওরাতে ও ইঞ্জিলে তাঁর পরিচয় লিখিত দেখে যে, তিনি তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দেবেন ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবেন।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭)

এমতাবস্থায় তারা কি তাওরাতে তাঁর নাম অক্ষত রেখে দিতে পারে? তারা কি স্বীকার করবে যে, এই নিরক্ষর নবীর সম্পর্ক তাওরাত সত্যিই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে? এটা তো তাদের জন্য আল্লাহর কিতাবে আর একবার হাত সাফাই করার এবং সেই মহান নামটাকে লুকিয়ে ফেলার এক মস্ত সুযোগ। একটা ইতর কাপুরুষ কি বিকৃতি করণের মাধ্যমে মনের আক্রোশ মেটানোর এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে?

বস্তুত ইহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যে কুটীল যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেছিল, তাদের কাপুরুষতাই ছিল তার ভিত্তি ও মূল কারণ। এ বিষয়টা যখন আমরা মনে জাগ্রত করবো তখন কুরআনের যে নিগূঢ় মর্ম আমাদের মন-মগজে বদ্ধমূল রয়েছে, তা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিকতর স্পষ্ট ও বোধগম্য হবে। এ ব্যাপারে কুরআনের কয়েকটি আয়াত দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করছি ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ○

"যখনই তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন রসূল তাদের কাছে বিদ্যমান আসমানী সমর্থক হয়ে এসেছেন, অমনি কিতাবধারীদের একটা গোষ্ঠী আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে ফেলে দেয় এবং এমন ভান করে যেন কিছুই জানে না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১০১)

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ
وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۭ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ
شَيْئًا ۭ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۭ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا
خِزْيٌ ۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

"ইহুদীদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী এমনও আছে যারা আল্লাহর বাণীগুলোকে বিকৃত করে বলে, তোমাদেরকে যদি এই বাণী শোনানো হয় তাহলে তা গ্রহণ করো, অন্যথায় তা এড়িয়ে যেও। স্বয়ং আল্লাহ যাকে গোমরাহ

www.pathagar.com

করতে চান, তার ব্যাপারে তোমার কখনো কিছু করার থাকবে না। এরাই সেই সব লোক, যাদের মনকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার ইচ্ছা আল্লাহর নেই। দুনিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪১)

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ج وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

"তাদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী রয়েছে যারা আল্লাহর কিতাবকে পড়তে গিয়ে জিহ্বাকে এমনভাবে ওলট পালট করে যেন তোমরা তাদের পড়া অংশকে কিতাবেরই অংশ মনে কর, অথচ আসলে তা কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে ! এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। অথচ আসলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি। তারা জেনে শুনেই আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৮)

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ ـ

"হে আহলে কিতাব ! তোমরা কেন জেনে শুনে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে সন্দেহজনক করে তুলছ এবং সত্যকে গোপন করছ ?"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭১)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াতকে খণ্ডন করার জন্য তারা ওজুহাত দিত যে, আল্লাহ তাওরাতে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন কোন রসূলকে ততক্ষণ বিশ্বাস না করি, যতক্ষণ না তিনি একটি কুরবানী করা পশু হাজির করেন এবং আসমান থেকে এক অলৌকিক আগুন এসে তা খেয়ে ফেলে। আপনাকে তো এ জিনিসটা হাজির করতে দেখলাম না। কাজেই আপনার ওপর ঈমান আনতে আমাদের অসুবিধা আছে। কেননা এটা আল্লাহর আদেশ। এই বাজে ওজুহাতটা সূক্ষ্মভাবে বিচার বিবেচনা করলে এতে অত্যন্ত হীনমানসিকতা জনিত ও কাপুরুষচিত দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়বে। যারা সাহস ও বীরত্বের সাথে শত্রুর মোকাবিলা করতে অনিচ্ছুক এ দুর্বলতা তাদেরই বৈশিষ্ট।

তাদের বক্তব্য যদি সত্য হতো তা হলে পূর্ববর্তী যেসব নবী এসব অলৌকিক কুরবানী করে দেখিয়েছেন তাদের ওপর তারা অনেক আগেই ঈমান আনতো। অথচ তারা সে সব নবীকে শুধু অস্বীকারই করেনি, বরং তাদেরকে

www.pathagar.com

হত্যাও করেছে। কুরআনের বেশ কিছু আয়াত এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছে। সূরা আলে ইমরানের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ط قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○ (ال عمران : ١٨٣)

"যারা বলেছে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা কোন রসূলের প্রতি ততক্ষণ ঈমান না আনি, যতক্ষণ না তিনি এমন কুরবানী আমাদের সামনে আনেন, যাকে আগুন খেয়ে ফেলে। হে রসূল ওদেরকে বলুন ! আমার আগে তোমাদের কাছে অনেক রসূল এসেছেন। তাঁরা বহু অলৌকিক নিদর্শন নিয়ে এসেছেন এবং তোমরা যার কথা (যে কুরবানীর কথা) বলেছ তাও এনে দেখিয়েছেন। তথাপি তোমরা তাদেরকে হত্যা করলে কেন ? সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলতো দেখি।"

সূরা বাকারার এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَتَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ز وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ○ (البقرة : ٨٧)

"একথা কি সত্য নয় যে, তোমাদের মনোপুত নয় এমন বিধান নিয়ে যখনই তোমাদের কাছে কোন রসূল এসেছেন অমনি তোমরা হঠকারিতা দেখিয়েছ ? কাউকে অস্বীকার এবং কাউকে হত্যা করেছ ?"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা শুধু এই একটি অস্ত্র দিয়েই লড়াই করেনি। কেননা বিকৃত করণ ও সত্যকে গোপন করার নেতিবাচক কার্যধারা মনের আক্রোশ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যথেষ্ট নয়। এসব ক্ষিপ্ত মনকে তৃপ্ত করার জন্য এমন কিছু ইতিবাচক কাজেরও প্রায়োজন, যা দ্বারা ইসলামের গোটা প্রাসাদে ফাটল সৃষ্টি করা যায়। কেননা আল্লাহর এই মহিমান্বিত দ্বীনের ক্রমেই প্রতাপশালী হয়ে উঠতে থাকা ও তার সগৌরব বিজয়ের খবর অব্যাহতভাবে আসতে থাকায় তাদের কলিজা জ্বলে যাচ্ছিল। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ز وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ط

"তোমাদের (মু'মিনদের) ভালো কিছু হলে তারা বিমর্ষ এবং খারাপ কিছু হলে তারা হর্ষোৎফুল্ল হয়।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১২০)

www.pathagar.com

কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, এই ইতিবাচক কাজ সেই হীনমনা কাপুরুষদের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য ছিল। যারা তাদের জীবন ও নিরাপত্তার জন্যই সবচেয়ে বেশী উদগ্রীব ও লালায়িত এখন দেখা যাক তাদের করার মত ইতিবাচক কাজ কী ছিল। সে কাজ আর কিছু নয়—রসূল (সা)-এর সহযোগীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির হীন চক্রান্ত আঁটা এবং শয়তান প্ররোচিত তৎপরতা দ্বারা তাদের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো। ইহুদীদের হীন চক্রান্তের একটা নমুনা এই যে, একবার তারা দেখলো আওস ও খাজরাজের একদল লোক ভ্রাতৃসুলভ মিল মুহাব্বাতের মনোভাব নিয়ে একই বৈঠকে বসেছে। তারা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে পরস্পরকে প্রীতি ও মমত্বের সাথে আকৃষ্ট করছে। এ অবস্থা দেখে তারা ভীষণ ক্ষেপে গেল। তারা তৎক্ষণাত সেখানে একজন কুচক্রী চর পাঠালো। তাকে বলে দিল, সে যেন সেখানে গিয়ে রসূল (সা)-এর আগমনের তথা ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে ঐ দুই গোত্রের মধ্যে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘঠিত হয়েছিল তার কিছু স্মৃতিচারণ করে। সে বুয়াস যুদ্ধের কিছু কীর্তিগাথা সেখানে আলোচনা করলো। সেই যুদ্ধের বিজয়ী পক্ষের গৌরব বর্ণনা করে একটা কবিতাও সে শুনিয়ে দিল। আর যায় কোথায়। এক পক্ষ তাতে খুশীতে গদগদ হলো এবং অপর পক্ষ ভীষণ রুষ্ট হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই দুই পক্ষে ঘোরতর মারামারি শুরু হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর শুনে দ্রুত সেখানে উপস্থিত হলেন এবং কুচক্রী ইহুদীর ষড়যন্ত্র তাদের কাছে ফাঁস করে দিলেন। সকলে অনুতপ্ত হলো এবং একে অপরের কাছে এগিয়ে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে ও হাত মেলাতে লাগলো। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই সূরা আলে ইমরানের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ○

"হে মুমিনগণ ! তোমরা যদি কিতাবধারীদের কোন গোষ্ঠীর কথামত কাজ কর তাহলে তারা তোমাদের মু'মিন হওয়ার পর পুনরায় কাফের বানিয়ে ছাড়বে।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০০)

সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির শয়তানী চক্রান্তের একটা দৃষ্টান্ত এই যে, তারা তাদের এক একটা গ্রুপকে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে পাঠাতো। গ্রুপটি যেয়ে ঈমান আনার ঘোষণা দিত। এতে মুসলমানরা উল্লসিত হতেন এবং খবরটা সমগ্র মদীনায় রাষ্ট্র হয়ে পড়তো। অতপর ঐ সদ্য ঈমান আনা গ্রুপটি নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে প্রচার করতো যে, তারা রসূলরে (সা) হাল-হাকীকত নিকট থেকে

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষণ এবং তাঁর ধর্মের গুণ-বৈশিষ্ট্য পরখ করে এসেছে। কিন্তু তাওরাতে যে রসূলের উল্লেখ করা হয়েছে উনিই যে, সেই রসূল তা তাদের মনে হলো না। তাঁর আনিত কুরআনও প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে তাদের কাছে বিবেচিত হয়নি। এই ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করার পর তারা দুঃখের সাথে ঘোষণা করতো যে, প্রতীক্ষিত নবী না আসা পর্যন্ত তাদের পূর্বতন ধর্মে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। এভাবে তারা ঈমান এনে ফেলেছে, বা ঈমান আনতে ইচ্ছুক হয়েছে—এমন লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতো বা ফিরিয়ে রাখতো এবং অনেককে সন্দিগ্ধ ও হতবুদ্ধি করে ফেলতো। এ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য দেখুন ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَاۤءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

"হে আহলে কিতাব ! তোমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে বিকৃত করার মাধ্যমে মু'মিনদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছ কেন ? অথচ তোমরাই তো সাক্ষী যে, তারা সত্য পথেই আছে। জেনে রেখ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ অজ্ঞ ও উদাসীন নন।"

-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৯)

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْۤ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

"আহলে কিতাবের একটা গোষ্ঠী বলেছে, মু'মিনদের ওপর যে বিধান নাযিল হয়েছে, দিনের প্রথম ভাগে তার ওপর ঈমান আন এবং শেষ ভাগে তা প্রত্যাখান কর। সম্ভবত এই কৌশলে কাজ করলে এরা নিজেদের ঈমান হতে ফিরে যাবে।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭২)

এখানেই শেষ নয়। তারা ইসলামের রীতিনীতি ও আল্লাহর নাযিল করা কুরআনের কোন কোন আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ এবং উপহাস করতেও কুণ্ঠিত হতো না যাতে করে সরলমতি মু'মিনদের ধারণা জন্মে যে, কুরআন একটা অসার ও অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। যখন নাযিল হলো ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ

"কে আছে যে, আল্লাহকে সৌজন্যমূলক ঋণ দিতে পারে ? তাহলে আল্লাহ তাকে সে ঋণ দ্বিগুণ করে দেবেন।"

-(সূরা আল হাদীদ ঃ ১১ ; সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৫)

www.pathagar.com

তখন ইহুদীদের কেউ কেউ ব্যাংগ বিদ্রূপে মেতে উঠলো এবং হাসাহাসি করতে লাগলো। কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বললো ঃ মুহাম্মাদের আল্লাহ এত গরীব যে, আমাদের কাছে ঋণ চাইছে ! এভাবে লাগাম ছাড়া আরো অনেক বক্তব্য উচ্চারিত হলো। মানুষকে এরূপ ধারণা দেয়া হতে লাগলো যে, যে আল্লাহর ঋণ করার দরকার পড়ে, তার ওপর ঈমান আনা সঙ্গত নয়। আবু বকর (রা) ক্রোধে অধির হয়ে ঐ পাপিষ্ঠ দুরাত্মাকে পিটুনী দিলেন। লোকটি বিচার চেয়ে রসূলের (সা) দরবারে হাজির হলো। আবু বকর (রা) আনুপূর্বিক ঘটনা রসূলকে (সা) জানালেন। এমতাবস্থায় হীনমনা ও নীচাশয় লোকেরা যা করে থাকে ইহুদীটিও তাই করলো। সে অস্বীকার করলো এবং নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করলো। আল্লাহ তা'য়ালা এই প্রসঙ্গে তৎক্ষণাত নাযিল করলেন ঃ

قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ م سَنَكْتُبُ مَاقَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَآءَ

بِغَيْرِ حَقٍّ لا وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ۝

"যারা বলেছে আল্লাহ গরীব আর আমরা ধনী, তাদের কথা আল্লাহ শুনেছেন। তাদের এ উক্তি ও নিরপরাধ নবীদের হত্যার ঘটনাবলী আমি অচিরেই লিপিবদ্ধ করবো এবং তাদেরকে বলবো আগুনে পোড়ার শাস্তির মজাটা এবার ভোগ কর।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮১)

অনুরূপভাবে আজান, কেবলা পরিবর্তন এবং অন্যান্য ইসলামী রীতিপ্রথা নিয়েও তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ط

"যখন তোমরা নামাযের জন্য সকলকে ডেকেছ তখন তারা একে খেল তামাসা বলে গণ্য করেছে।–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৮)

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ط

"নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, কি কারণে মু'মিনদের সাবেক কেবলা পরিত্যক্ত হলো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪২)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا

وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ۔

"আল্লাহ তার কিতাবে একথা নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনগুলো নিয়ে কুফরী ও বিদ্রূপ চলতে দেখবে তখন তাদের মজলিশে বসো না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৪০)

www.pathagar.com

কুরআনে এ ধরনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

মোটকথা ইসলামের প্রতি ইহুদীদের আচরণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি সাধন, তাতে যা কিছু আছে তা অস্বীকার ও গোপন করা। (২) ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে বিভেদাত্মক ষড়যন্ত্রের বীজ বপন ও সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি। (৩) ইসলামের রীতিনীতি ও কুরআনের আয়াতের প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস। এ ব্যাপারে তাদের আচরণ ছিল কাপুরুষোচিত ও ইতরসুলভ এবং চরম প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও ক্ষ্যাপামী জনিত। এ তথ্য অর্জন দ্বারা আমরা কুরআন বুঝার খুবই কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারি। কুরআনের এ বুঝ হবে গভীর আবেগ ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ—নিছক যুক্তিসিদ্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বুঝ নয়।

এরপর যখন তাদের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহীত নীতি ও আচরণ পর্যালোচনা করি, তখন তা নিম্নরূপ দেখতে পাই ঃ

(ক) সর্বোত্তম পন্থায় অথবা নিদেন পক্ষে আক্রমণকারীদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর শালীনতর পন্থায় প্রতিরোধ। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ق

"আহলে কিতাবের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ো না উৎকৃষ্টতর ও শালীনতর পন্থায় ছাড়া।"-(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৬)

বস্তুত একজন শক্তিশালী ও তেজস্বী মু'মিনের বিবেক কখনো অভদ্র লোকদের সাথে তাদের অস্ত্র দিয়েই লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়াকে শোভন ও সঙ্গত বিবেচনা করে না। আগেই বলেছি যে, রসূলুল্লাহ (সা) এই শালিনতা ও ভদ্রতার খাতিরেই তাদের অন্যায় আচরণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে ইসলামের কল্যাণের নিমিত্ত তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন। কেননা এ কাজে সহায়তা করতে পারে এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সশস্ত্র বাহিনী তার হাতে তখন ছিল। কিন্তু তিনি তাদের আচরণকে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করেছেন এবং শানিত যুক্তি ও ভদ্রজনোচিত বিতর্কের মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ চালিয়ে গেছেন। একথা সত্য যে, রসূল (সা) ইহুদীদের কিছু অংশকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন এবং অন্য কিছু সংখ্যক ইহুদীকে হত্যাও করেছেন। কিন্তু এটা আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি সাধন ও ইসলামের বিরোধিতার প্রতিশোধ ছিল না। এটা ছিল শুধু তার সাথে সম্পাদিত তাদের মৈত্রীচুক্তি ভঙ্গ এবং বনু নজীর কর্তৃক তাঁকে সফরকালে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার মাধ্যমে হত্যার চেষ্টা ও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের শাস্তি। অবশ্য আল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে ষড়যন্ত্র থেকে

www.pathagar.com

রক্ষা করেছিলেন। এ ঘটনার উল্লেখ সূরা হাশরে রয়েছে। তা ছাড়া বনু কুরায়জা খন্দক যুদ্ধে এমন বিশ্বসঘাতকতা করে ও এমন ভয়ংকর চক্রান্ত আটে। যা সফল হলে পৃথিবীতে আর একজন মুসলমানও বেঁচে থাকতো না, গোটা ইতিহাসই ভিন্ন রকম হতো এবং আজকের দুনিয়ার বাস্তব চিত্রও ভিন্ন রকম হতো। এ ঘটনার কিছুটা সূরা আহযাবে এবং বিস্তারিত বিবরণ সীরাতের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ বিশ্বসঘাতকতার জন্য তিনি বনু কুরাইজাকেও চরম দণ্ড দিয়েছিলেন।

বস্তুত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে বিতর্কে সর্বোত্তম পন্থাই অবলম্বন করতেন এবং ষড়যন্ত্র, হিংসা এবং গর্হিত ও বর্বরোচিত আচরণের মত অপরাধগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। এ ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেরই বাস্তব রূপ ঃ

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا ج
حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ج فَاعْفُوا
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

"আহলে কিতাবের অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পরও পুনরায় তোমাদেরকে কাফের বানাতে উদগ্রীব। তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্বেও কেবল হিংসার বশবর্তী হয়েই তারা এ অভিলাষ পোষণ করে। তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে যেতে থাক—যতক্ষণ না আল্লাহ পরবর্তী নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১০৯)

(খ) সকল নবী ও রসূলের প্রতি এবং সকল আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত প্রদান। কেননা কুরআন তার পূর্ববর্তী সকল রসূল ও কিতাবের সমর্থন ও সত্যায়নকারী হিসেবে এসেছিল। যতক্ষণ সকল নবী আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন, যতক্ষণ তাদের লক্ষ্য একই থাকে এবং সকল কিতাব ইসলামের মৌলনীতি ও বিধানের ব্যাপারে একমত থাকে ততক্ষণ তাদের সকলের প্রতি ঈমান আনা জরুরী। আর এই সকল নবীর সাহায্য এবং সমর্থন করাও জরুরী। কেননা এটা স্বয়ং আল্লাহকেই সমর্থন করার সামিল। এ সম্পর্কে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত প্রনিধান যোগ্য ঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَٰقَ النَّبِيِّۦنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ
رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ط قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ

www.pathagar.com

وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ط قَالُوْا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

"সেই সময়টার কথা স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ সকল নবীর কাছ থেকে অঙ্গিকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে আজ আমি কিতাব ও বিজ্ঞান, কর্মকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা দিয়েছি। অতপর কাল যদি অন্য কোন নবী তোমাদের নিকট ঠিক সেই শিক্ষা নিয়েই আসে, যা তোমাদের কাছে আগে থেকেই বর্তমান, তা হলে তাঁর প্রতি তোমরা ঈমান আনবেই এবং তাঁর সাহায্য করবেই। এই বলে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি এ অঙ্গিকার করছ এবং আমার নিকট থেকে অঙ্গিকারের গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ ? তাঁরা বললেন ! হ্যাঁ আমরা অঙ্গিকার করলাম। আল্লাহ বললেন ঃ বেশ, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক। আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮১)

বস্তুত এ এক নির্ভেজাল দাওয়াত। আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজে নিয়োজিত কাউকে এ দাওয়াত দেয়া হলে সে খুশী হয় এবং দাওয়াতদাতার ওপর বিরক্ত হয় না। কেননা আল্লাহর দিকে যারা দাওয়াত দেন, তারা একই লক্ষ্যে জিহাদে রত। একে অপরকে পেয়ে খুশী হন এবং একজন আর একজনের সাহায্য দ্বারা ধন্য হন। যখনই ময়দানে এমন কোন নূতন দল আভির্ভূত হয়, যারা আমাদের মতই কাজ করে এবং আমাদের দাওয়াতই প্রচার করে এবং আমাদের কিতাবে তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণও আছে, তখন সেই দলকে পেয়ে আমাদের আনন্দিত হওয়াই কর্তব্য। কেননা সে দল আমাদের শক্তি বৃদ্ধিরই সহায়ক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বা দল সেই নবাগত দলের বিরোধিতা শুরু করে দেয় এবং তাকে পর্যুদস্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়, বুঝতে হবে যে, সে আল্লাহর জন্য নয়—নিজের জন্যই কাজ করে। এজন্যই আমরা ইহুদীদেরকে রসূলুল্লাহর (সা) ওপর বিরক্ত হতে দেখেছি। অথচ তিনি তাদেরকে সকল আসমানী কিতাবের ওপর ঈমান আনার আহবান জানিয়েছেন, শুধু নিজের কিতাবের ওপর নয় তাহলে এতে অসুবিধাটা কোথায় ?

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ لا

"(হে নবী !) আপনি বলুন ঃ হে আহলে কিতাব ! আমরা আল্লাহর ওপর এবং আমাদের ও পূর্ববর্তীদের ওপর নাযিল হওয়া কিতাবের ওপর ঈমান এনেছি—এটাই কি আমাদের প্রতি তোমাদের শক্রতা পোষণের কারণ ?"
-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৯)

www.pathagar.com

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط

"আপনি বলুন! হে আহলে কিতাব! তোমরা যতক্ষণ তাওরাত ও ইঞ্জিলকে এবং তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নতুন করে যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তা বাস্তবায়িত না করবে ততক্ষণ তোমাদের কোনই মূল্য নেই।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৮)

এই উদার ও উদাত্ত আহবানের প্রতি ইহুদীরা চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং সংকীর্ণ মানসিকতা, একগুয়েমী, নীচাশয়তা, গোয়ার্তুমী ও হটকারিতার পরিচয় দেয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ج لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

"তারা (আহলে কিতাব) জনগণকে বলে ! তোমরা শুধু ইহুদী হয়ে যাও, নতুবা শুধু নাসারা (খৃস্টান) হয়ে যাও, তাহলেই সঠিক পথের অনুসারী হতে পারবে। আপনি বলুন ! বরং একনিষ্ঠভাবে কেবল ইবরাহীমের মতাদর্শ অনুসরণ কর। ইবরাহীম তো মোশরেক ছিলেন না। তোমরা বল আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম, আর ঈমান আনলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের গোত্রদের ওপর যা নাযিল হয়েছিল এবং মূসা, ঈসা ও অন্য সকল নবীকে যেসব কিতাব তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল, সেই সবের ওপর ; আমরা এই সব নবীর কারো সাথে কারো পার্থক্য করি না। আমরা কেবল মাত্র আল্লাহরই কাছে আত্ম-সমর্পিত।" —(সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৫-১৩৬)

এই সার্বজনীন দাওয়াতকেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তার করতে থাকেন এবং উদার ও প্রশস্ত হৃদয় মানুষদের সমাজে বদ্ধমূল ও প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। অবশেষে এক সময় বিরুদ্ধবাদীদের সকল উন্নাসিকতা সত্ত্বেও সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও আল্লাহর দ্বীন বিজয় হয়। বস্তুত সবল ও

www.pathagar.com

সতেজ ঈমান এবং আল্লাহর ওয়াদার প্রতি অবিচল আস্থা যাদের থাকে, তারাই এরূপ নির্মল ও স্বচ্ছ নীতি অনুসরণ করে থাকেন। (অর্থাৎ বিপক্ষের এক-গুয়েমীর মধ্যেও উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিতে থাকেন)।

(গ) আহলে কিতাবের ওপর আল্লাহ যে অঢেল নিয়ামত বর্ষণ এবং তাদেরকে যে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছেন, তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ..... وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝ .... وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۗ

"হে বনী ইসরাইল ! আমি তোমাদেরকে যে নিয়ামত দিয়েছি এবং সারা বিশ্বের ওপর যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি, তা স্মরণ কর। ....আর সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের দলবলের কবল থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম—যারা তোমাদের ওপর কঠোর নির্যাতন চালাতো, তোমাদের পুরুষ সন্তানদের জবাই করতো এবং মেয়ে সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতো। সে অত্যাচার ছিল তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা। আর যখন তোমাদেরকে দিয়ে সমুদ্রকে খণ্ডিত করেছিলাম, তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলাম এবং ফেরউনের দলবলকে তোমাদের চোখের সামনেই ডুবিয়ে মেরেছিলাম।.....আর আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া ফেলে রেখেছিলাম এবং তোমাদের জন্য মান্না ও সালওয়া, নামক খাদ্য সরবরাহ করেছিলাম।-(আল বাকারা ঃ ৪৭, ৪৯-৫০, ৫৭)

অতীতের দুরবস্থা ও তা থেকে নিষ্কৃতিলাভের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া এমন এক পদ্ধতি, যাতে নিকৃষ্টতম শত্রুরও মন গলে যায় ও সুমতি ফেরে। তবে নীচাশয়, হিংসুটে আত্মাভিমানীর কথা আলাদা। সে তো গোটা দুনিয়াকে মুঠোর মধ্যে না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।

অবশ্যই তাদের ওপর আক্রমণ চালানোরও দরকার ছিল। তাদের লজ্জা-জনক কার্যকলাপের পর্যালোচনা ও গুপ্ত রহস্য ফাঁস করা অপরিহার্য ছিল। তবে এ আক্রমণেও সর্বোচ্চ ন্যায় বিচার বজায় রাখা হয়েছিল। এতে আসল সত্য

www.pathagar.com

ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ, আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি সাধন ও হেরফের করার মত যে গুরুতর অপরাধগুলো তারা করতো তার ফিরিশতি, মূসা থেকে ঈসা (আ) পর্যন্ত সকল নবীদের সাথে তাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে শত্রুতামূলক আচরণ করেছিল তার বর্ণনা, আল্লাহর হুকুম ও নিদর্শনাবলীর প্রতি তারা যে অমান্যতা, বিরোধিতা ও একগুয়েমীর মনোভাব প্রদর্শন করেছিল এবং সর্বোপরী কতক নবীকে হত্যা ও কতক নবীকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার যে জঘন্যতম পাপাচারে তারা লিপ্ত ছিল তার উল্লেখ করা ছাড়া এতে আর কোন অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জন করা হয়নি। এসব বিবরণ শুধু এই উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছিল, যাতে করে জনসাধারণ তাদের দ্বারা প্রতারিত না হয় এবং জেনে নিতে পারে যে, কুরআনের প্রতি তাদের আজকের আচরণ তাদের সুদীর্ঘ অতীতের নিরবচ্ছিন্ন কার্যধারারই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া প্রাচীন ও চিরাচরিত মজ্জাগত স্বভাব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নাযিল করা এই সকল বর্ণনা ও ফিরিস্তি যত দীর্ঘই হয়ে থাকুক তা তাওরাতে লিপিবদ্ধ ফিরিস্তিকে ছাড়িয়ে যায়নি।

এই আক্রমণে কতখানি ন্যায়বিচার বজায় রাখা হয়েছে তা আপনি সুস্পষ্ট-রূপে তখনই বুঝতে পারবেন যখন দেখবেন যে,ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে ইসলাম তাদের পক্ষের ও বিপক্ষের তথ্য সমান গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে। তাদের পিতৃ-পুরুষদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে, নূহকে, ইবরাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে সারা দুনিয়াবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে মনোনীত করেছেন।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৩)

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

"এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে জ্ঞানের ভিত্তিতে সারা দুনিয়াবাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে মনোনীত করেছি।"-(সূরা আদ দোখান ঃ ৩২)

তবে সেই সাথে সে একথাও জানিয়েছে যে, আল্লাহর নাফরমানীর কারণে তিনি এই পূর্বপুরুষদের কোন কোন গোষ্ঠীকে দৈহিকভাবে বিকৃত করেছেন, তাদের কাউকে বানর এবং কাউকে শুকর বানিয়েছেন। আবার তাদের চলতি বংশধরের প্রতিও সুবিচার করেছেন এই বলে ঃ

مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝
يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

www.pathagar.com

"আহলে কিতাবের মধ্যে এমন গোষ্ঠীও আছে যারা রাতের নিভৃত মুহূর্তগুলোতে (নামাযে) দাঁড়িয়ে আল্লাহর আয়াতগুলো পাঠ করে এবং সিজদাও করে। তারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, সৎকাজে আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং কল্যাণমূলক কাজে প্রতিযোগিতা করে। এরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।"-(আলে ইমরান ঃ ১১৩-১১৪)

مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ○

"তাদের মধ্যে একটি ন্যায়পরায়ন গোষ্ঠীও আছে। তবে অধিকাংশই ভীষণ দুষ্কৃতকারী।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৬)

এই ন্যায় নিষ্ঠ ও সুবিচারমূলক পথ অনুসরণে রসূলের (সা) আশা ছিল যে, তারা হয়তো তাঁর ওপর ঈমান আনবে। কিন্তু সে আশা যে পূরণ হবার নয়, সে কথা আল্লাহ জানিয়ে দিলেন এই বলে ঃ

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط

"আপনি যতক্ষণ ইহুদী ও নাসারাদের ধর্ম অনুসরণ না করবেন ততক্ষণ তারা আপনার ওপর কিছুতেই খুশী হবে না।"-(আল বাকারা ঃ ১২০)

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ج

"কিতাবধারীদের কাছে যদি সকল নিদর্শন নিয়েও আপনি হাজির হন তবু তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৫)

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ـ(البقرة : ٧٥)

"তবে কি তোমরা তাদের ঈমান আনার আশায় থাকবে? অথচ তাদের এক গোষ্ঠী আল্লাহর কালাম শুনতো এবং জেনে বুঝেও তা বিকৃত করতো।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ৭৫)

মোদ্দাকথা এই যে, যে ফ্রন্টে ইহুদীদের সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লড়াই চলতো, তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের মাদানী সূরা বিশেষত সূরা বাকারা, আলে ইমরান ও মায়েদাতে পাওয়া যাবে। আশা করা যায় যে, উপরোক্ত আলোচনা আমাদের জন্যও একই ধরনের সংগ্রামের প্রাথমিক পথ দেখিয়ে দেবে এবং সংগ্রামের এ পথ পেয়ে আমরা এই লড়াই সংক্রান্ত কুরআনের ভাষ্যকে আরো সহজে বুঝতে পারবো। এভাবে কুরআন সম্পর্কে যে বুঝ অর্জিত হবে তা শুধু গবেষকের বুঝ নয় বরং দাওয়াত ও প্রচারকারীর বুঝও

www.pathagar.com

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দাওয়াত ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিই আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত ঘটনাবলীর সাথে নিজের আবেগ অনুভূতিকে জড়িত ও সংযুক্ত করে থাকেন। আমি বিশেষভাবে পরামর্শ দেবো যে, তফসীরে ইবনে কাছিরকে সবসময় হাতের কাছে রাখবেন। এ তফসীর উক্ত প্রাথমিক সংগ্রামের পথ সম্পর্কে যথাযথ অবগতি জন্মায় এবং আপনাকে এমনভাবে সংগ্রামের পরিবেশে জীবন ধারণে সহায়তা করে যেন আপনি তা দেখছেন ও শুনছেন। এ জন্য কুরআন পাঠকের অন্তরে কুরআনের প্রাণশক্তিকে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এবং দাওয়াতকারীকে তার দাওয়াতের কাজে অত্যন্ত উপকারী নানা রকমের আক্রমণাত্মক ও প্রতিরোধমূলক লড়াই এর প্রকৃত রূপ পর্যবেক্ষণ করানোর ব্যাপারে এ তফসীরের অসামান্য প্রভাব ও ক্ষমতা রয়েছে।

মোনাফেকদের ফ্রন্ট

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন, তখন মদীনাবাসী আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে তাদের রাজা হিসেবে বরণ করে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবে ঘটনা স্রোত এই লোকটির আশা আকাংখ্যার বিপরিত খাতে প্রবাহিত হলো। এজন্য সে তার একদল বন্ধু-বান্ধব ও অনুচরদের সাথে নিয়ে মদিনায় বসে পরিস্থিতি পাল্টে দেয়ার এবং রসূলের (সা) জন্য নানা রকমের সমস্যা ও সংকট সৃষ্টির চেষ্টায় নিয়োজিত হলো। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৈনিকদের শক্তি জোগালেন এবং তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করলেন। বদর যুদ্ধের পর থেকে তারা পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে লাগলো এবং বলাবলি করতে লাগলো যে, এবার একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন দেখলো যে, লোকেরা ইসলামে দিক্ষিত হচ্ছে এবং আল্লাহর রসূলের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তখন তারা আর একাকী থাকা সমীচীন মনে করলো না। তাই তারা লোক দেখানোভাবে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হলো। কিন্তু মনে মনে তার প্রতি অবিশ্বাস ও আক্রোশ অব্যাহত রাখলো। তারা প্রকৃতপক্ষে রসূলের (সা) ইহুদী ও অ-ইহুদী শত্রুদের পঞ্চম বাহিনী হিসেবে কাজ করতে লাগলো। তাই আল্লাহ তাঁর রসূলকে এই মোনাফেকদের হাল-হাকীকত জানিয়ে দিলেন যাতে তিনি সাবধান হন। জানালেন অবশ্য সাধারণভাবে — চিহ্নিত করে নয়। আল্লাহ বললেন ঃ

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ط وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قف مَرَدُوْا
عَلَى النِّفَاقِ قف لَاتَعْلَمُهُمْ ط نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ط

"তোমাদের পার্শবর্তী বেদুইনদের মধ্যে এবং মদিনাবাসীর মধ্যে কিছু কপট বিশ্বাসী আছে। মোনাফেকীতে তারা একেবারে ঝানু। তুমি তাদেরকে চিন না। আমি চিনি।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১০১)

www.pathagar.com

পরবর্তী সময়ে তাদের সম্পর্কে আরো তথ্য জানালেন এই বলে ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ○ وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ط وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ○

"যাদের মনে ব্যাধি রয়েছে, তারা কি ভেবেছে যে, আল্লাহ কখনই তাদের মনের গোপন কপটতা প্রকাশ করবেন না ? আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে তোমাকে তাদের দেখিয়ে দিতে পারতাম। চাল-চলন ও হাবভাব দ্বারা তুমি তাদের চিনে নিতে পারতে। কথার স্বর দ্বারা তুমি অচিরেই তাদেরকে চিনতে পরবে। আর আল্লাহ তো তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত আছেনই।"–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২৯-৩০)

মক্কায় মোশরেকদের, মদিনায় ইহুদীদের এবং তার পর এই গোষ্ঠীর ভূমিকা আমাদের জানা আছে। সন্দেহ নেই যে, এ তিন গোষ্ঠীর মধ্যে মোনাফেকরাই সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য। মনের দিক থেকে তারা সবচেয়ে নীচ এবং স্বভাব ও প্রকৃতির দিক থেকে সবচেয়ে কষ্টদায়ক। বস্তুত মোনাফেকীর মত আপদ আর নেই যা মনুষ্যত্ব ও সাহসিকতার বিনাশ সাধন করে। এ জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ج وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ○

"নিশ্চয় মোনাফেকরা দোযখের সর্বনিম্ন আবর্তে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৪৫)

এই গোপন লড়াই এর কৌশলগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ !

(ক) যুদ্ধবিগ্রহে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়। মোনাফেকরা এ কাজে অন্য সবার চেয়ে বেশী পারঙ্গম। তারা ইসলাম গ্রহণ করতো, রসূলের (সা) প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করতো এবং বিভিন্ন কাজে যথাযথ ও সুযোগ্য ভূমিকা পালন করতো। এমন কি স্বয়ং ওমরও (রা) তাদের অধিকাংশকে অত্যন্ত সৎ ও পরহেজগার বলেই জানতেন। অথচ এসব "গণ্যমান্য পরহেজগার" লোকেরা যুদ্ধের সময় ময়দানে না গিয়ে দিব্বি ঘরে বসে থাকতো। তাদের চেয়ে কিছু কম পরহেজগার সাধারণ লোকেরা যখন তাদের বসে থাকতে দেখতো, সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অনুকরণ করতো এবং তারা খানিকটা নিস্তেজ ও ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়তো। পরহেজগার ও গণ্যমান্য বলে পরিচিত ঐ সব লোক অন্যদেরকেও পরামর্শ দিত ময়দানে না যাওয়ার জন্য।

www.pathagar.com

ফলে কেউ কেউ বাড়ীতে বসে থাকতো। আর যারা ময়দানে যেত তারা তাদের পরামর্শ অমান্য করেই যেত। এ ধরনের কোন লোক যখন রণাঙ্গনে শহীদ হতো, তখন ওরা বলতোঃ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْاَطَاعُوْنَا مَاقُتِلُوْا ط قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

"লোকগুলো যদি আমাদের কথা শুনতো (অর্থাৎ ময়দানে না যেত) তাহলে মারা পড়তো না। হে নবী ! আপনি তাদেরকে বলুনঃ তোমাদের কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে নিজেদের ওপর থেকে মৃত্যুকে হটিয়ে দাওতো।"–(সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৮)

কিছু মোনাফেক বাড়ী থেকে রওনা হয়ে যেত। কিন্তু পথ থেকেই আবার ফিরে আসতো এবং বলতো ! আল্লাহর কসম, কি কারণে আমরা গলা কাটাতে যাচ্ছি বুঝি না। এ ধরনের কোন লোক যখনই ফিরে আসতো, তার সাথে যোদ্ধাদের একটা বড় দলও ফিরে আসতো, ওহোদের দিন এই রকম ঘটনাই ঘটেছিল। আর যখন ফিরে না এসে সোজা রণাঙ্গনে চলে যেত, তখন সে ঘুরে ঘুরে সৈনিকদের মধ্যে নানা রকমের অপপ্রচারনা ছড়িয়ে ও কুপ্ররোচনা দিয়ে তাদের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করতো। এ রকম ঘটেছিল তাবুক যুদ্ধে। কুচক্রি মোনাফেকদের অপপ্রচার ও কুপ্ররোচনামূলক কথাবার্তার একটা নমুনা দেখুন ! "ইনি (রসূলুল্লাহ) মনে করেন যে, রোম সাম্রাজ্যের তাবত দুর্গ ও প্রাসাদসমূহ দখল করে নেবেন। অসম্ভব, অসম্ভব।"

কেউ কেউ একথা বলেও লড়াকু সৈনিকদের মনে আতংক সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিল। "তোমরা কি রোমকদের সাথে লড়াই করাকে আরবদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই করার মত সহজ মনে করেছ ? আল্লাহর কসম, মনে হচ্ছে আগামীকালই তোমাদের সাথে সাথে আমাদেরও হাতে দড়ি পড়বে।"এ প্রসঙ্গে আল্লাহ যথার্থ বলেছেনঃ

لَوْخَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّازَادُوْكُمْ اِلاَّ خَبَالاً وَّلاَ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ج (التوبة : ٤٧)

"তারা (অর্থাৎ মোনাফেকরা) যদি তোমাদের সাথে লড়াই করতে যায়ও, তাহলেও তারা তোমাদের মানসিক অস্থিরতাকে বাড়িয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু করবে না এবং তোমাদেরকে বিপদে নিক্ষেপ করার প্রচেষ্টা হিসেবে তোমাদের ভেতরে ঘুরে ঘুরে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকবে।"

www.pathagar.com

(খ) মুসলমানদের মধ্যে কলহ-বিবাদ এবং বিভেদ বিশৃংখলা ও আতংক সৃষ্টির জন্য তারা যে কোন মোক্ষম সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার না করে ছাড়তো না।

বনু মুসতালিক যুদ্ধে দু'জন মুসলিম কিশোরের মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া বাধলো। এদের একজন মোহাজেরদের এবং অপরজন আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোহাজের কিশোরটি চিৎকার করে উঠলো ঃ "ওগো মোহাজেররা আমাকে বাঁচাও।" আর আনসার কিশোরটি চিৎকার করে উঠলো ঃ "ওগো আনসাররা আমাকে বাঁচাও।" ব্যাপারটা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর কানে যেতেই সে সোৎসাহে এগিয়ে এল। এমন একটা বিবাদকে দুই গোষ্ঠির (মোহাজের ও আনসার) মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহার না করে সে ছাড়লো না। কেননা এ ধরনের একটা স্বপ্ন সে বহুদিন ধরেই দেখছিল। সে বললো ঃ তারা (মাহাজেররা) তো দেখছি, আমাদের দেশে বসেই আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। আল্লাহর কসম, আমাদের এবং এই সব কুরাইশি আলখেল্লা ওয়ালাদের বেলায় নিম্নের প্রবাদ বাক্যটিই সঠিকভাবে প্রযোজ্য ঃ

"তোমার কুকুরকে আচ্ছামত ঘি মাখন খাইয়ে শক্তিশালী বানাও, যাতে তোমাকেই একদিন খেয়ে ফেলে।"

(দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা অথবা খাল কেটে কুমীর আনার সমর্থক) অতপর সে তার আশপাশে বসা মদিনাবাসীকে এই বলে উত্তেজিত করতে লাগলো ঃ "তোমরাই তো নিজেদের এ সর্বনাশ করেছ। ওদেরকে নিজেদের এলাকায় ঠাঁই দিয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পত্তি ওদের সাথে ভাগ করে নিয়েছ। মনে রেখ, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা যদি ওদের (মোহাজেরদের) সাহায্য করা বন্ধ করতে, তাহলে তোমাদের এলাকা ছেড়ে ওরা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হতো।"

তার আর একটি উস্কানীমূলক কথা কুরআনের সূরা 'মুনাফিকুনে' উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط

"তারা বলে ঃ আমরা যদি মদিনায় ফিরে যাই, তাহলে সেখান থেকে সবলরা দুর্বলদেরকে বহিস্কার করবে।"–(সূরা আল মুনাফিকুন ঃ ৮)

এসব কথা দ্বারা ঐ নরপিশাচ মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অভিনব ও প্রাজ্ঞ ব্যবস্থা দ্বারা আল্লাহ তার এই দুরভিসন্ধিকে নস্যাত করে দেন

www.pathagar.com

এবং স্বীয় বাহিনীকে রক্ষা করেন। সেই বিচক্ষণ পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ সীরাত গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(গ) ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের প্রতি বিদ্রূপ, উপহাস এবং তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন গুজব ও মিথ্যা অপবাদ রটনা দ্বারা আন্দোলনের গুরুত্ব ও আকর্ষণ ম্লান করার অপচেষ্টা। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হজরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করে নিজের ঘাড়ে এ অপকর্মের প্রধান দায়িত্ব চাপিয়ে নিয়েছিলো। এটা ছিল পরোক্ষভাবে ইসলামের ওপরই এক প্রচন্ড আঘাত। আয়েশার সতিত্ব নিয়ে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি, তার পিতা ও পিতার পরিবারের ইজ্জতে কালিমা লেপন এবং স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সংসয় জন্মানোর এ অপচেষ্টার দরুন স্বভাবতই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য মুসলিম নেতাদের উদ্দীপনায় ভাটা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। রটনাকারীদের ধারণা মতে রসূল (সা) একজন ব্যভিচারিনী নারীকে নিজের সহধর্মিনীর মর্যাদা দিয়ে যাচ্ছিলেন। (নাউজু বিল্লাহ)

এই অপবাদ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান এই স্রোতে ভেসে যায়। এ ফেতনা মুসলমানদের জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারতো এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় এ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়তো যদি না রসূলল্লাহ (সা) বিচক্ষণতার সাথে ত্বরিত ব্যবস্থা নিয়ে এই ফেতনার অবসান ঘটাতেন। এ ঘটনা এবং এর মীমাংসায় রসূলুল্লাহর (সা) প্রাজ্ঞ পদক্ষেপের বিবরণ সীরাত গ্রন্থাবলীতে দ্রষ্টব্য।

মোনাফেকরা নেককার ও পরহেজগার মু'মিনদেরকে উপহাস ও বিদ্রূপ দ্বারা হেয় করতে চেষ্টা করতো। এদের এক ব্যক্তি একবার একদল সৎকর্মশীল হাফেজ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করে ঃ

"আমাদের এই হাফেজ সাহেবরা তো দেখছি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে পেটুক, সবচেয়ে মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে সবচেয়ে ভীরু কাপুরুষ।" রসূল (সা) একথা শুনে ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তখন ঐ ব্যক্তি এসে ওজর পেশ করতে লাগলো যে, আমরা তো কেবল ঠাট্টা-মস্করা করছিলাম। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা মন্তব্য করেছিল ঃ "উনি তো বড্ড কান-কথা শোনা মানুষ যা বলা হয় তাই বিশ্বাস করেন আবার তার বিপরীত কথা যখন শোনেন তখন তাও বিশ্বাস করেন।"

মু'মিনদের মধ্যে যারা দানশীল ছিলেন তাদেরকেও তারা নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। যে ব্যক্তি বেশী দান করতো তাকে রিয়াকার বলে দোষারোপ

www.pathagar.com

করতো। আর যে অক্ষমতা বশত সামান্য দান করতো তাকেও নানা রকম বিদ্রূপাত্মক কথা বলে জ্বালাতন করতো। এসব আচরণ সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কেউ তাদের মুসলমানত্বকে অস্বীকার করতে পারতো না। কেননা তারা মুখে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ উচ্চারণ করতো। অথচ এই সাক্ষ্যদানের আড়ালে রকমারী অপরাধে লিপ্ত থাকতো। এর জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করলেই নানা ওজর আপত্তি পেশ করতো, অথবা অস্বীকার করতো ও কসম খেত।

(ঘ) রসূল (সা) ও মুসলমানদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার মানসে ইহুদী, মোশরেক ও ঈসায়ীদের সাথে গোপন যোগাযোগ রাখা ও দেন-দরবার চালানো। এসব দেন-দরবারের বিবরণ তফসির ও সীরাত গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। উদাহরণ স্বরূপ ভণ্ড তপস্বী আবু আমেরের দলভুক্ত মোনাফেকদের আচরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই লোকটি রোম সম্রাটের নিকট গিয়ে রসূল (সা)-কে পরাভূত করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। রোম সম্রাট তাকে সাহায্যের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেন। সে সেখানে অবস্থানও করে। সেখান থেকে সে মদিনায় তার দলীয় মোনাফেকদের কাছে চিঠি লিখে প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দেয় যে, তাদের কাছে শীঘ্রই একটা সেনাদল যাবে এবং তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সাথে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত ও স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করবে। সে তাদেরকে কোন এক নিভৃত স্থানে একটা দুর্গ বানাতে নির্দেশ দেয়—যেখানে বসে তার দূত ও চিঠিপত্র তারা গ্রহণ করতে পারবে এবং সে ফিরে আসার পর সেটা তার ঘাঁটি হতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে তার অনুচররা তার জন্য একটা মসজিদ নির্মাণ করে—যা পরবর্তী সময়ে মসজিদে জেরার নামে অভিহিত হয় ! এই মসজদি সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ط وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

"যারা একটা মসজিদ নির্মাণ করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, সেখানে বসে তারা ইসলামের ক্ষতিসাধন, কুফরী অবলম্বন, এবং মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে আর আগে থেকেই যারা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, তাদের ওঁৎ পাতার ঘাঁটি বানাবে। তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে যে, আমরা ভালো উদ্দেশ্যে এটা করেছি। অথচ আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা মিথ্যাবাদী।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৭)

www.pathagar.com

এসব লোকের সাথে রসূলের (সা) যে আচরণ ও ভূমিকা ছিল, সেটা একমাত্র স্বয়ং রসূল (সা) ছাড়া আর কারুর দ্বারা সম্ভব ছিল না।

(ক) মোনাফেকদের মনের অবস্থাকে আল্লাহ তা'য়ালার ওপর সোপর্দ করে নিজে শুধু তাদের বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে আচরণ করতেন। একবার তার কাছে একজন মোনাফেক এসে স্বীয় মোনাফেকী থেকে তাওবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সে বললোঃ হে রসূল ! আমার মুখে ঈমান মনে মোনাফেকী। আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করি। তখন রসূল (সা) বললেন ! "হে আল্লাহ ! এই ব্যক্তিকে তোমার জিকরে সোচ্চার জিহবা দাও, তোমার প্রতি শোকর গোজারী মন দাও, তাকে আমাদের ভালোবাসার এবং আমাকে যারা ভালোবাসে তাদেরকে ভালোবাসার তাওফিক দাও এবং তার সকল কার্যকলাপকে ভালো করে দাও।" লোকটি বললোঃ হে রসূল ! আমার কিছু মোনাফেক সঙ্গী আছে, আমি তাদের নেতা ছিলাম। তাদেরকেও কি নিয়ে আসবো ? রসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "যে আমার কাছে আসে তার জন্য আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। আর যে গুনাহর কাজ অব্যাহত রাখে তার ব্যাপারে আল্লাহই যথেষ্ট। তবে তুমি কারো কাছে গোপনীয়তা ফাঁস করো না।"

(খ) মোনাফেকদের দুষ্কর্মের গুনাহ সম্পর্কে তিনি ভীষণ ভীত ও উৎকণ্ঠিত থাকতেন। আল্লাহ যখন তাদের কোন ব্যাপারে তাকে জানাতেন, তখন কোন এক সাহাবীকে ডেকে বলতেন ! এই গোষ্ঠীটার খবর লও। কারণ তারা পুড়ে ভষ্ম হতে চলেছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তারা অমুক কথা বলেছে কিনা। যদি অস্বীকার করে তা হলে বলো হ্যাঁ, তোমরা অমুক অমুক কথা বলেছ যেমন তাবুক যুদ্ধে বলা হয়েছিল যখন মোনাফিকরা মুসলমানদেরকে রোম সাম্রাজ্য সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছিল।

(গ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোনাফেকদেরকে বুঝিয়ে দিতেন যে, তিনি যে তাদের অপকর্মগুলোকে দেখেও চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন সেটা তিনি সজ্ঞানে ও সচেতনে মহানুভবতা দেখাচ্ছেন। তিনি এমন বোকা বা উদাসীন নন যে এসব টেরই পান না। অনেক সময় তিনি তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতেন যে অচিরেই তাদের সব কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়ে যাবে। তাদের কথাবার্তা সরলমতি মু'মিনদের কথাবার্তার মত ছিল না। আল্লাহ বলেনঃ

ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

"তাদের হাব-ভাব ও চাল-চলন দেখেই তুমি তাদেরকে চিনতে পেরেছ। তাদের কথার স্বর দ্বারা অচিরেই তাদেরকে তুমি চিনে নিতে পারবে।"

-(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩০)

www.pathagar.com

তাদের গতিবিধিও অনুগত মু'মিনদের গতিবিধির মত ছিল না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً ـ

"তাদের যদি যুদ্ধে যাওয়ার সত্যিই ইচ্ছা থাকতো তাহলে তার জন্য তারা প্রস্তুতি নিত।"-(সূরা আত তাওবা ৪৬)

কিন্তু অন্যদের মত তারা কোন প্রস্তুতিই গ্রহণ করেনি। সুতরাং যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া মোনাফেকীর অন্যতম আলামত। রসূলুল্লাহ্‌র (সা) নিকট মিথ্যে ওজর পেশ করে দিলেই চলবে, এই ধারণা বশতই তারা প্রস্তুতি নিত না। সত্যি বলতে কি, ওজর বাহানা করাটাই মোনাফেকদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○ (التوبه : ٤٥)

"যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না এবং মনে সন্দেহ পোষণ করে, তারাই তোমার কাছে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চেয়ে থাকে।"

(ঘ) তাদের কাপুরুষতা ও হীনতার বর্ণনা দিতেন। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ লক্ষ্য করুন ঃ

وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ○ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُوْنَ ○ (التوبه : ٨٦ ـ ٨٧)

"যখনই কোন সূরা এই নির্দেশ সহকারে নাযিল হতো যে, তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আন এবং তাঁর রসূলের পক্ষে জিহাদ কর তখন তাদের মধ্যকার সক্ষম লোকেরা জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি চাইত এবং বলতো ঃ যারা জিহাদে যাচ্ছে না তাদের সাথে আমাদেরকে থাকতে দিন। তারা পশ্চাদবর্তীদের (অর্থাৎ মহিলাদের) সঙ্গী হওয়াই পসন্দ করতো।"

فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ○ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ قف

www.pathagar.com

"অতপর যখনই একটি অকাট্য সূরা নাযিল হলো এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ করা হলো, তখন তুমি দেখতে পেলে যে, ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা তোমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন মৃত্যু তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আসলে আনুগত্য ও সুবোধসুলভ কথাবার্তা বলাই তাদের পক্ষে শ্রেয়।"-(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২০-২১)

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ط وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ط كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ط يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ط هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ط قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ز اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ٥ (المنفقون : ٤)

"এদের শরীরের দিকে তাকালে তা তোমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে। আর তারা কথা বললে তা শুনতে তুমি মগ্ন হয়ে যাবে। আসলে তারা দেয়ালের সাথে জোড়া কাঠের মত (অর্থাৎ অকর্মণ্য)।"

যে কোন সুবিবেচক পাঠকের দৃষ্টিতে মোনাফেকদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েই কুরআনের ক্ষ্যান্ত থাকা সবচেয়ে সুবিচারপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত কাজ হয়েছে। এসব ঘাপটিমারা বিশ্বাসঘাতক যদি আধুনিক যুগের কোন আন্দোলনে থাকতো তাহলে তাদের কি পরিণতি হতো তা সহজেই আন্দাজ করা যেতে পারে। তাদের অপরাধের প্রতি কিরূপ উদার আচরণ করা হতো, তা সকলেই দেখতে পেত।

বস্তুত এ ফ্রন্টের প্রকৃত অবস্থা এই যে, মোনাফেকেরা ইসলামী বাহিনীর মনোবল খর্ব করা, তাদের সংগঠনে বিভেদ ও ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং রসূলের (সা) মিশনের গুরুত্ব হালকা করে তাকে মানুষের মনে প্রভাবহীন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। তারা তাঁকে ধ্বংস করার জন্য মদিনার ভেতরে ও বাইরে অবস্থিত ইসলামের দুশমনদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করতেন তাহলো ঃ (১) তিনি কেবল তাদের বাহ্যিক আচরণটাই গ্রহণ করতেন এবং তাদের গোপন বিষয় আল্লাহর নিকট সোপর্দ করতেন। (২) কখন তাদের ওপর তাদের পাপাচারের শাস্তি নাযিল হয়, সেই আশংকায় তিনি অস্থির থাকতেন। (৩) তাদেরকে শুধু এটুকু আভাস দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকতেন যে, তাদের খলতা ও কপটতা বুঝবার মত তিক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধি তার আছে। (৪) তাদেরকে সামগ্রিকভাবে কাপুরুষ ও নীচুমনা বলে মন্তব্য করা ছাড়া আর কোন কষ্টদায়ক ব্যবহার তাদের সাথে করেননি। তাদের কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি কখনো মাথা ঘামাননি।

www.pathagar.com

আশা করি উপরোক্ত আলোচনার এই সারসংক্ষেপ ইসলামের আহ্বায়ককে কুরআনের মোনাফেকী সংক্রান্ত অংশ বুঝতে প্রচুর সহায়তা করবে। এই অংশগুলো মদিনায় নাযিল হওয়া সূরাসমূহে বিশেষত্ব সূরা বাকারার কতিপয় আয়াত এবং সূরা নিসা, তাওবা, মুহাম্মদ ও মুনাফিকুনে রয়েছে।

মোশরেকদের ফ্রন্ট

এ ফ্রন্ট তরবারী যোগে প্রকাশ্য লড়াই ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেরই আর এক নাম। তবে কুরআন এসব ঘটনার বিবরণ প্রচলিত ঐতিহাসিকদের বা রণাঙ্গনে কর্মরত সাংবাদিকদের রীতিতে দেয়নি। তার অনুসৃত রীতি একেবারেই অভিনব। সে শুধু যুদ্ধের সেইসব ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সেইসব কথাই উদ্বৃত করে, যা উদ্বৃদ করার যোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনা ও কথাবার্তার উদ্বৃতি প্রসঙ্গে সে যুদ্ধের অনুসরণীয় নীতি এবং বিধিও বর্ণনা করে। পড়বার সময় এমন সব বিস্ময়কর বিজয়ের বর্ণনা পাওয়া যায় —যা মানুষের মনকে হতচকিত করে দেয় এবং সমর বিশারদদের কল্পনাকেও হার মানায়। সে এ যুদ্ধকে সবচেয়ে মহৎ ও সম্মানজনক ব্যবসায় বলে আখ্যায়িত করে এবং কিভাবে সে মহত্তম ব্যবসায়ের দিকে উচ্চাভিলাসীরা ধাবিত হয় ও অসীম ক্ষমতাধর বিশ্ব প্রভুর দরবারে উচ্চতম সম্মানের আসলে অধিষ্ঠিত হবার আকাঙক্ষা পোষন করে, তারও উল্লেখ করে। সবচেয়ে বড় বিস্ময় হলো যুদ্ধের সেই নীতি ও বিধিসমূহকে বাস্তবায়নে তার অনুসৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি। আর এই বিধির বাস্তবায়নের উচ্চাকাঙক্ষা ও সুদৃঢ় সংকল্প ও পরিমাণে উপস্থিত থাকবে, যুদ্ধের বিস্ময়কর সাফল্য ও ঠিক সেই পরিমাণেই আসবে। কাজেই ইসলামের বীরত্ব আইনভিত্তিক বীরত্ব এবং এই বীরত্ব ও সাহসিকতার ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই সে আইন আত্মপ্রকাশ করে। এখন আপনি যদি বলেন যে, এই আইনের অন্তর্নিহিত তত্ত্বই মুসলমানদেরকে বীর পুরুষে পরিণত করেছিল এবং এর কারণেই তারা অজেয় বীরযোদ্ধা হতে পেরেছিল তাহলে সে কথা সত্য। আর যদি বলেন ঃ মুসলমানরা তাদের কার্যকলাপ দ্বারাই এসব আইন ও বিধির জীবন্ত প্রতিকৃতি তৈরী করেছিলেন, তাহলে আপনার একথাও যথার্থ। পবিত্র কুরআন এই উভয় তত্ত্বই ধারণ করে। এক দিকে সে যুদ্ধ সংক্রান্ত আইনগুলোর মহিমা ও মর্যাদা বর্ণনা করে, যাতে করে তার আনুগত্যের সংকল্প জন্মে। অপর দিকে সে মু'মিনদের কাজেরও প্রশংসা করে যাতে করে ঐ কাজগুলো অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়।

আমরা অবশ্য কুরআনে বর্ণিত যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল আইন ও নৈতিক বিধিসমূহ বর্ণনা করতে চাই না। আমরা শুধু মদিনায় রসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধসমূহের একটি দিক বিশ্লেষণ করবো। আলোচনার এ পর্যায়ে

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহর (সা) জিহাদের ফ্রন্টসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র তৃতীয় ফ্রন্টে তার অনুসৃত নীতি ও ভূমিকার প্রকৃতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকবো।

১-ইসলামের সমর আইনের প্রথম ধারা এই যে, যুদ্ধ শুধুমাত্র আল্লাহর পথেই হতে হবে। মুসলমানরা এ ধারাটা পড়েছেন, বুঝেছেন এবং যথাযথভাবে তার দাবীও পূরণ করেছেন। কেননা তাদের মন এ ধারাটা পুরোপুরিভাবে আয়ত্ব করেছিল এবং এর প্রতি যথার্থভাবে ঈমান এনেছিল। আমরা এখানে আল্লাহর পথে যুদ্ধের তিন ধরনের উদ্দেশ্যের বর্ণনা দেয়াই যথেষ্ট মনে করবো ঃ

প্রথমত, ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের কার্যকর বিস্তার ও প্রসার ঘটানো। আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج

"তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না সকল ফেতনা দূরীভূত হয় এবং সকল আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।"
–(সূরা আনফাল ঃ ৩৯)

দ্বিতীয়ত, মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা তার নিরীহ ও দুর্বল অধিবাসীদেরকে বিদেশী আধিপত্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○

"তোমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহর পথে এবং সেই সব দুর্বল পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুদের মুক্তির জন্য লড়াই করছ না যারা এই বলে দোয়া করছে যে, হে আমাদের প্রতিপালক ! জালেমদের নিগড়বদ্ধ এই দেশ থেকে আমাদেরকে মুক্ত কর আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক ও সহায়ক জুটিয়ে দাও।–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৫)

তৃতীয়ত, বিশ্বাসঘাতক এবং চুক্তি অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের শাস্তি প্রদান। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط

www.pathagar.com

"যারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে, রসূলকে বহিষ্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং তোমাদের ওপর প্রথমে যুদ্ধ চালিয়েছে, তাদের সাথে কি তোমরা লড়বে না ?"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১৩)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত হোদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি যখন মক্কার মোশরেকরা ভঙ্গ করলো, তখন কুরআনের এ অংশটি নাযিল হয়।

২-এই মহা কল্যাণময় আইনের দ্বিতীয় ধারা হলো, মুসলিম যোদ্ধা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার প্রতিদান আল্লাহ ছাড়া আর কারুর কাছ থেকে পাওয়ার আশা করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন ঃ

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে বেঁচে দিতে পারে কেবল তাদেরই আল্লাহর পথে লড়াইতে অংশগ্রহণ করা উচিত।

— (সূরা আন নিসা ঃ ৭৪)

পক্ষান্তরে যারা আখেরাতের জীবনকে দুনিয়ার স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে, এ আইন তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।

অবশ্য আল্লাহ যাদের ভাগ্যে বিজয় লিখেছেন তারা এই দুনিয়াতেও নিশ্চিত প্রতিদান, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করে থাকে। আর আখেরাতে আল্লাহর পুরস্কার সকল ইসলামী সৈনিকের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ০

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করে, সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী হোক, তাকে আমি বিরাট পুরস্কার দেবো।" —(সূরা আন নিসা ঃ ৭৪)

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ط

"(হে নবী!) আপনি বলুন ঃ তোমরা আমাদের জন্য কিসের প্রত্যাশা কর ? সর্বোত্তম জিনিস দু'টোর একটাই তো ?" —(সূরা আত তাওবা ঃ ৫২)

এখানে সর্বোত্তম জিনিস দু'টো হলো, সত্যের পার্থিব জয় এবং নিহত হলে শাহাদাতের পুরস্কার লাভ।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে এমন একটা ভুল থেকে সকলকে হুঁশিয়ার করতে চাই—যা অনেকেই সদুদ্দেশ্য নিয়েই করে থাকেন। সে ভুলটা এই যে, তারা মনে করেন, সর্বোত্তম জিনিস দু'টোর একটা হলো বিজয়কালে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং অপরটি শাহাদাতের সওয়াব। এটা ভুল এই জন্য যে, একজন মুসলিম যোদ্ধার নিকট দুনিয়ার স্বার্থের চেয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠাই অধিকতর কাম্য হয়ে থাকে। এই মহৎ ও উচ্চ উদ্দেশ্য ঈমানের দাঁড়িপাল্লায় যে কোন পার্থিব স্বার্থের চেয়ে ভারী হয়ে থাকে—চাই সে স্বার্থ দুনিয়া ভরা স্বর্ণই হোক না কেন।

অধিকন্তু আখেরাতে শাহাদাতের প্রতিদানের স্থলে গনীমাতের সম্পদকে সর্বোত্তম জিনিস দু'টোর একটা বলে নির্ধারণ করা সুষ্ঠু বিচার বুদ্ধিরও অগম্য। দুনিয়াবী গনীমতের সম্পদ তো শহীদদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারের তুলনায় কিছুই নহে। শহীদদের পুরস্কার ভাষায় বর্ণনা করাই সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ج

"আপনি বলুন ঃ দুনিয়ার সম্পদ নিতান্ত নগণ্য।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৭)

এখন বিবেচনা করুন, গনীমাতের সম্পদ দুনিয়ার এই নগণ্য সম্পদের কতটুকু। আর তা শাহাদাতের অসীম ও অফুরন্ত প্রতিদানের তুলনায় বা কতখানি। এরপর নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহর পরিমাপ দণ্ডে এই গনীমাত কি শহীদদের পুরস্কারের পরিবর্তে সর্বোত্তম জিনিস দু'টোর একটা হবার যোগ্যতা রাখে ? বস্তুত মু'মিনের বিবেক বিজয়ের গৌরব এবং সত্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পকে উক্ত সর্বোত্তম জিনিস দু'টোর একটা হিসেবে গ্রহণ করেই তৃপ্ত বোধ করে। আল্লাহর নিম্নোক্ত উক্তিতে এই ধারণারই প্রতিফলন ঘটেছে ঃ

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْيَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করতে করতে নিহত হয় অথবা বিজয়ী হয়, তাকে আমি বিরাট পুরস্কার দান করবো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৪)

এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদকেই কি আল্লাহ 'বিরাট পুরস্কার' নামে অভিহিত করছেন ? অথচ তিনিই তো সারা দুনিয়ার সম্পদকে নিতান্ত সামান্য বলে উল্লেখ করেছেন। সবশেষে যে কথা এ প্রসঙ্গে বলা দরকার তাহলো, মু'মিনরা যাদের হাতে শোভা পেত তলোয়ার আর যাদের মনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন প্রার্থনা ধ্বনিত হতো না এবং তাঁর

www.pathagar.com

প্রতিদান ছাড়া অন্য কিছুর প্রত্যাশাও থাকতো না, তারা স্বভাবতই টাকার গোলাম ছিলেন না। তাদের হাতে যদি শেষ পর্যন্ত কিছু গনীমাতের সম্পদ এসে গিয়ে থাকে, তাহলে তা আল্লাহরই সম্পদ এবং তার ওপর আল্লাহর শত্রুদের মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই মু'মিনরাই সে সম্পদের বেশী হকদার এবং তা তাদের জন্য হালাল।

৩-যুদ্ধের নৈতিক আচরণ বিধির তৃতীয় বিধি এই যে, মু'মিনরা জিহাদে যে সাহায্য লাভ করে তার উৎস একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। কোন সৃষ্ট জীবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহর কাছ থেকে যে ক্ষমতা সে লাভ করে সেটাই তার একমাত্র সম্বল। আল্লাহ নিজের অপার ক্ষমতার বর্ণনা বহু জায়গায় বহুভাবে দিয়েছেন। যেমন—

'তিনি সর্বশক্তিমান।'
'তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান।'
'তিনি অটুট ক্ষমতার অধিকারী।'
'তিনি তার বান্দাদের ওপর পরাক্রমশালী।'

তবে যে কথাটা তার শক্তিমত্তার সবচেয়ে ব্যাপক বর্ণনা দেয় এবং তিনি ছাড়া আর কারো আদৌ কোন ক্ষমতা নেই বলে উল্লেখ করে তাহলো এই ঃ

আল্লাহর নিকট ব্যতীত কোথাও কোন ক্ষমতা নেই। কাজেই মু'মিন যখন আঘাত করার জন্য হাত নাড়ে তখন একমাত্র আল্লাহর শক্তির বলেই হাত নাড়ে তার নিজের শক্তির বলে নয়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

"তাদের সাথে তোমরা লড়াই কর। আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়েই তাদেরকে শাস্তি দেবেন।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১৪)

মুসলমানরা কত লোককে হত্যা করেছে, কত বীরকে ধরাশায়ী করেছে। কিন্তু তাদের এসব কাজের প্রকৃত ও যথার্থ স্বরূপ আল্লাহ এভাবে উদঘাটন করেছেন ঃ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ص

"তাদেরকে তো তোমরা হত্যা করনি। হত্যা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ।"
—(সূরা আল আনফাল ঃ ১৭)

একবার এক ব্যক্তি এসে রসূলকে (সা) খবর দিল যে, শত্রুরা সৈন্য ও অস্ত্রের সমাবেশ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে বললো ঃ 'আমার মনে হয়

www.pathagar.com

আপনার একটু সাবধান হওয়া ও শংকিত হওয়া উচিত।' তখন রসূল (সা) আল্লাহর আরশের দিকে তাকালেন। দেখলেন, সেখানে এমন এক মহাশক্তি অধিষ্ঠিত, যিনি ইচ্ছা করলেই পৃথিবীর সকল বস্তু ও প্রাণীকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম। তাই এ সংবাদে তাঁর ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল। তিনি উচ্চারণ করলেন ঃ ...... অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। কুরআনে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ○

"যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, শত্রুরা সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশ করেছে, (যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে।) কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর, এ সংবাদ তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিল। তারা বললো ঃ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি খুব ভাল অভিভাবক।" —(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩)

বস্তুত আল্লাহ যাদেরকে ইসলামী জিহাদের নৈতিক আচরণবিধি শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে এরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ আচরণ বিধির একটি নমুনা নিম্নোক্ত আয়াতে লক্ষ্যণীয় ঃ

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ط اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ○

"তোমাদের এই যে যোদ্ধা বাহিনী, এরা কি তোমাদেরকে এতটা সাহায্য করবে যে, আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন হবে না ? বস্তুত কাফেররা বিভ্রান্তিতে মগ্ন আছে।" —(সূরা আল মুল্‌ক ঃ ২০)

মুসলমানদের কেউ কেউ ভুলক্রমে সময় সময় তাদের সংখ্যাধিক্যে গর্ববোধ করতেন। ফলে তৎক্ষণাত তাদের ওপর এমন আপদ আসতো যা তাদেরকে আল্লাহর বিধানের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে বাধ্য করতো। কুরআনে হোনাইনের ঘটনা প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে ঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ لا وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ لا اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ○

www.pathagar.com

"আর হোনাইনের দিন—যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করে তুলেছিল। কিন্তু সে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে লাগলো না। এমন প্রশস্ত পৃথিবীও তোমাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে এল। শেষ পর্যন্ত তোমরা পিছ পা হয়ে পালালে।"—(সূরা আত তাওবা ঃ ২৫)

৪-যুদ্ধ সংক্রান্ত আল্লাহর বিধির চতুর্থ ধারা এই যে, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় কোন উপহার বা উপঢৌকন নয়, যা বিনামূল্যে ও বিনাশর্তে দেয়া হয়। এর শর্ত এই যে, মু'মিন সক্রিয়ভাবে আল্লাহর পথে জিহাদে উদ্যোগী ও উদ্যমী হবে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

"যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।"—(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭)

সুতরাং কেউ যদি বিনা চেষ্টাতেই আল্লাহর সাহায্য পেতে চায় এবং ঘরে বসে বসেই সাহায্যের আশায় পথ চেয়ে থাকে, তাহলে সেটা তার শোচনীয় অজ্ঞতা ও বোকামীর পরিচায়ক। তার জীবন যে বৃথাই নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ধারা বাস্তবায়নের পন্থা এই যে, আমাদেরকে সর্বাত্মকভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজে নামতে হবে, সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ নিয়োজিত করতে হবে এবং আমাদের সাধ্য ও সামর্থের আওতায় যথাসম্ভব সর্বাধিক চেষ্টা-সাধনা চালাতে হবে। এ চেষ্টা যদি পরিমাণে ও আকারে নিতান্ত নগণ্য এবং ক্ষুদ্রও হয়, তথাপি এটাই আল্লাহর সাহায্য লাভের একমাত্র চাবি-কাঠি। আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর যত সৈনিক আছে, তাদেরকে সচল ও সক্রিয় করার একমাত্র গোপন কলকাঠি মু'মিনের প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনাতেই নিহিত।

একথাও জেনে রাখা দরকার যে, ইসলামের এসব সমর বিধিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এবং এর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত কুরআনের আয়াতের সংখ্যাও প্রচুর। এসব আয়াতে এই বিধিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা মেলে। যদি কেউ ধারণা করে যে, সে প্রত্যেক ধারার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা জেনে ফেলেছে, তবে এ রকম ধারণা করা ঠিক নয় এবং তা থেকে সাবধান থাকা উচিত। কেননা ধারাগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপরিসর। তবে এর ব্যাখ্যা সম্বলিত সকল আয়াতের উল্লেখ করতে গেলেও আমাদের আলোচনা অতিমাত্রায় দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন।

সবশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, পবিত্র কুরআন এই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সৈন্যদের তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ দেয় না। সে শুধু এসব আইন ও আচরণ বিধি বর্ণনা করে। মুসলিম যোদ্ধাদের যেসব কথাবার্তা ও কার্যকলাপ উক্ত

www.pathagar.com

আইন-কানুন ও আচরণ বিধির বাস্তব নমুনা, তার নিগূঢ়তর তত্ত্বের কার্যকর ব্যাখ্যা এবং তার প্রতিশ্রুত ফলের বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য। কুরআন সে সবেরই উল্লেখ করে। কাজেই যখন আল্লাহর পথে জিহাদের রক্তঝরা ইতিহাস পড়বো, তখন আমাদের মনে ঐসব আইন ও নৈতিক আচরণ বিধি এবং সেই আইন ও আচরণ বিধির প্রতীক মুসলিম যোদ্ধাদের বীরত্ব গাথাকে মনে জাগরুক রাখা দরকার। যদি রাখতে পারি, তাহলে একই আয়াতের মধ্য থেকে এমন সব তত্ত্ব আমাদের সামনে উদঘাটিত হবে, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি।

এভাবে প্রস্তুতি নেয়ার পর এক এক করে বদর, ওহোদ, বনু নজীর, খন্দক, বনু কুরায়জা, হোদাইবিয়া ও তবুক যুদ্ধের বিবরণ সূরা আলে ইমরান, আনফাল, তাওবা, আহজাব, ফাত্‌হ, হাশর প্রভৃতিতে পড়ুন। এ সকল সূরা মদিনায় অবতীর্ণ। আমরা যে অমূল্য তত্ত্বের কথা বললাম, এসব সূরা উল্লিখিত নিয়মে পড়লে তা অবশ্যই পাবেন ইনশাআল্লাহ। অবশ্য সে জন্য শর্ত এই যে, এই পড়ার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হবে তাকে আপনি নিজের দাওয়াতী ও জিহাদী দায়িত্ব পালনের জন্য পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করবেন।

(৩)

কুরআনের অভিষ্ট সমাজের ভিত্তি

কুরআন আমাদের এই সচেতনতা নিয়ে পড়তে হবে যে, তা একটা উন্নত নৈতিক মান সম্পন্ন সমাজ কিংবা একটা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ সমাজ গঠন করতে চায়। কুরআনের সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল বর্ণনা সম্পন্ন আয়াতগুলোতে এই সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান আমাদের খুঁজতে হবে। আর তা খুঁজবার জন্য আমাদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে হবে ঃ

১-প্রত্যেক মানুষকে সমাজের জন্য একজন উপকারী ও নিরাপদ সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কুরআন কি কি শিক্ষা দিয়েছে?

২-সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংগঠন যাতে অন্যায় ও দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত ও সৎকাজে নিয়োজিত থাকার ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগী হয়, সে জন্য তার নির্ধারিত সামষ্টিক জীবনের নীতিমালা ও মতাদর্শ কি কি এবং তার ভাবাবেগ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারাই বা কি?

৩-রাষ্ট্রীয় গণপ্রশাসনের আওতায় যাতে কুরআনে বর্ণিত বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী শ্রেষ্ঠ জাতি লালিত ও বিকশিত হতে পারে, সে জন্য সে কি কি নীতি ও বিধির প্রবর্তন করেছে?

বিষয়টাকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য বলছি যে, কুরআনে আল্লাহ, ফিরেশতা, কিতাব, রসূল, আখেরাত ও ব্যক্তিগত সৎ গুণাবলী সম্পর্কে যা

www.pathagar.com

কিছুই আছে, তা শুধু ব্যক্তি মানুষের গঠন সংক্রান্ত। সুতরাং এ দিকে আপনার সাধারণ দৃষ্টি নয়—অন্তরের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। তাহলে দেখতে পাবেন যে, কুরআন মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্তাকে সর্বোত্তম ও দৃঢ়তম ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত উপাদান ও উপকরণ সরবরাহ করেছে। আরো দেখতে পাবেন যে, সে এই পর্যায়ে অকল্পনীয় খুঁটিনাটিরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি এই বর্ণনা সম্বলিত কিছু সংখ্যক নির্বাচিত আয়াত আপনি নিজের জন্য সংকলিত করে রাখেন, যাতে করে প্রয়োজনীয় প্রমাণ দর্শানোর সময় তা আপনার মুখে অনর্গলভাবে চালু হয়ে যায়।

পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পন্ন সম্প্রদায় ও সংগঠনসমূহের আচরণ বিধির ব্যাপারে কুরআনে শ্রেণীবদ্ধ সমাজ কাঠামো ও সম্পদগত ব্যবধান, কেবল আদর্শিক নয় বরং বাস্তব গণভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে মানবাধিকারের নিশ্চয়তা, ধনীর সম্পদে গরীবের প্রাপ্য নির্ধারণ এবং সকল সম্পদকে মূলত আল্লাহর সম্পদ বলে ঘোষণা প্রদান সহ এমন সব সিদ্ধান্ত উচ্চারিত হয়েছে, যা দ্বারা বৈষয়িক ও মনস্তাত্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান সহজতর হয়েছে, সামষ্টিক আবেগ অনুভূতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে এবং সমাজে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার মনোভাব ব্যাপকতা ও বিস্তার লাভ করেছে। তাই প্রত্যেক দাওয়াত কর্মীর উচিত কুরআন থেকে এ জাতীয় নীতিমালা যথাসম্ভব বেশী করে সংগ্রহ করা। সেই সাথে সমাজকে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে গড়ার ব্যাপারে প্রত্যেকটা মূলনীতির উপযুক্ত প্রয়োগ ক্ষেত্র জানাকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

রাষ্ট্র প্রশাসনের ক্ষেত্রে কুরআন সর্বোচ্চ প্রশাসকের দায়িত্ব সম্পর্কে দু'টো প্রধান মূলনীতি নির্ধারণ করেছে। যথা ঃ (১) শাসন কার্যে পূর্ণ ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। (২) শাসকের নিকট মানুষের গচ্ছিত অধিকারসমূহের সংরক্ষণ। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা গচ্ছিত অধিকার ও অর্পিত দায়িত্বসমূহকে তার প্রকৃত হকদারের হাতে সোপর্দ করবে এবং যখন শাসন পরিচালনা করবে তখন ইনসাফের সাথে পরিচালনা করবে।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

আর জনগণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যকেও দু'টো প্রধান মূলনীতির মাধ্যমে নির্ধারণ করেছে। তাহলো ঃ

www.pathagar.com

(১) আল্লাহর নাফরমানী হয় না এমন সকল ব্যাপারে শাসকের পূর্ণ আনুগত্য।

(২) শান্তিপূর্ণ উপায়ে যেসব সমস্যার সমাধানে জনগণ ও তাদের শাসক অপারগ, তার মীমাংসার জন্য আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝ (النساء : ٥٩)

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীলদের। অতপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হও, তাহলে সে ব্যাপারকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট সমর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও শুভ পরিণামবাহী।"

এভাবে কুরআন জান-মাল রক্ষা, বেচা-কেনা, ঋণ, বন্ধক, ভাড়া, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন রচনা পর্যন্ত বিস্তৃত। তাছাড়া রাষ্ট্রের বিদেশ নীতির বুনিয়াদী ধারাসমূহ। যথা, যুদ্ধ, শান্তি, সন্ধি ও চুক্তি প্রভৃতি ঘোষণা এবং রাষ্ট্রের সবলতা ও দুর্বলতার কারণসমূহও পর্যন্ত উল্লেখ করেছে। এক কথায় কুরআন এ সকল ব্যাপারে এত বিস্তারিত বিধি দিয়েছে, যার পর আর কোন মৌল বিধির প্রয়োজন দেখা দেয় না।

কিন্তু যখন কুরআনের উপরোক্ত বৈশিষ্ট সম্পর্কে সচেতন না হয়ে কুরআন অধ্যয়ন করা হয় তখন তাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও যুক্তিহীন মনে হয়। মনে হয় আমরা এক অজানা অচেনা বিদেশী নগরীতে পরিভ্রমণ করছি। পক্ষান্তরে যখন উক্ত বৈশিষ্ট সূক্ষ্ম ও সচেতনভাবে মনে জাগরুক রাখি, তখন আমাদের চর্মচক্ষু ও মানস চক্ষুতে চমকপ্রদ অভাবনীয় তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ভাসিত হয়।

(৪)

আমাদের কর্তব্য এই যে, কুরআনকে এরূপ জেনে বুঝে অধ্যয়ন করতে হবে যে, তাতে বিশ্বজগতের নিয়ামক সকল আইন ও বিধিমালা নিহিত রয়েছে। আল্লাহর নিকট সকল জিনিস পরিমিতভাবে বিদ্যমান এবং সকল ব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধান অনুসারে গৃহীত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এসব নিয়ম ও বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, তার প্রতি ঈমান আনে ও তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং সেই জ্ঞানকে উত্তম উপায়ে কাজে লাগায়, তার হাতে বিশ্বপ্রকৃতির চাবিকাঠি এসে যায় এবং কিভাবে সেই চাবিকাঠি ব্যবহার করবে,

www.pathagar.com

তা তারই বিবেচ্য বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি প্রাকৃতিক নিয়ম—যা কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে—এখানে উল্লেখ করছি ঃ

১-গুনাহ মাফ চাওয়ায় জীবিকার প্রাচুর্য আসে। এ জীবিকা কেবল আধ্যাত্মিক জীবিকা নয়, এটা বস্তুগত জীবিকারও নিয়ামক বিধান। এ ব্যাপারে আপনাকে কেবল আন্দাজ-অনুমানের ওপর নির্ভরশীল করে ছেড়ে দিতে চাই না। আল্লাহর এ উক্তি প্রনিধান করুন ঃ

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۝ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল। (ক্ষমা প্রার্থনা করলে) তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষাবেন, তোমাদেরকে অনেক সন্তান ও ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচা ও নহর তৈরী করে দেবেন।"—(সূরা নূহ ঃ ১০-১২)

আধুনিক যুগে আমরা এসব ব্যাপারে সন্দেহ ও অবজ্ঞায় লিপ্ত হয়েছি। আমরা ভেবেছি, এ জাতীয় কথাবার্তা নিছক ভীতি প্রদর্শন ও আশ্বাস প্রদানের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে। একে আমরা বাস্তব ব্যাপার ও অকাট্য সত্য বিধান বলে মানি না। এর ফলে আমরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আমাদের মহান পূর্বপুরুষগণ এ সত্যকে উপলব্ধি করতেন এর কল্যাণকারিতায় বিশ্বাস রাখতেন এবং মহাকাশের সুপ্ত কল্যাণের ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটনে সচেষ্ট থাকতেন। ফলে আল্লাহ তাদের ইহলৌকিক মনোবাঞ্ছাও পূরণ করতেন।

কথিত আছে যে, হযরত ওমরের (রা) খেলাফতকালে একবার ঘোর অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি নগরবাসীকে সাথে নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য রওনা হলেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহও (সা) এ ধরনের দুর্যোগকালে বিপদমুক্তির জন্য প্রকাশ্য ময়দানে গিয়ে সদলবলে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। ওমর (রা) স্বল্প সময় ব্যাপী যে দোয়া করলেন তা ছিল কেবল গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা। অতপর লোকজনকে নিয়ে ফিরে এলেন। লোকেরা তাকে প্রশ্ন করলো ঃ কই, আপনি তো বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন না !

তিনি বললেন ঃ আকাশের বালতি দিয়ে তোমাদের ওপর পানি বর্ষাবার আবেদন জানিয়েছি।

লোকেরা বললো ঃ আকাশের বালতি আবার কি জিনিস ?

তিনি বললেন ঃ গুনাহ্ মাফ চাওয়া।

www.pathagar.com

লোকেরা অবাক হয়ে গেল এবং এমনভাব দেখালো যে ব্যাপারটা তাঁর মনগড়া, না কুরআনের নির্দেশ তা যেন তারা বুঝতেই পারেনি।

তখন খলিফা বললেন ঃ যেহেতু কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ يُّرْسِلِ السَّمَاۤءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ

"তোমরা তোমাদের মনিবের নিকট গুনাহ মাফ চাও। তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল। গুনাহ মাফ চাইলে তিনি তোমাদের ওপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষাবেন।"–(সূরা আন নূহ ঃ ১০-১১)

এ জন্য আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইলাম। শীঘ্রই আল্লাহ তার ইচ্ছামত বৃষ্টি দেবেন।

বর্ণিত আছে যে, ওমর (রা) তার একথা শেষ করতে না করতেই দীগন্ত আলোড়িত করে প্রচণ্ড বাতাস বইতে আরম্ভ করলো। একের পর এক মেঘ ভেসে আসতে লাগলো। মদিনার আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন, যা সূরা নূহের উপরোক্ত আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। (অর্থাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হলো।)

২-আল্লাহর নেয়ামতের কার্যকর রক্ষা কবচ হলো নিম্নোক্ত দোয়া পড়া ঃ

قُلْتَ مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ۙ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ع

"আল্লাহ যা চেয়েছেন (তাই দিয়েছেন) তার সাহায্য ব্যতীত আর কোথাও কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই।"–(সূরা কাহ্ফ ঃ ৩৯)

এ একটা অতি মর্যাদাপূর্ণ বিধান এবং বিজ্ঞানময় নির্ভুল শিক্ষা। সূরা কাহ্ফে এক মু'মিনের মুখ দিয়ে উচ্চারিত একথাটা আল্লাহ উদ্ধৃত করেছেন। নিজের বাগিচা নিয়ে গর্বিত আপন বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন ঃ

وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ۙ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ع

"নিজের বাগিচায় প্রবেশ করার সময় তোমার বলা উচিত ছিল যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন দিয়েছেন। তার সাহায্য ব্যতীত কোথাও কোন শক্তি নেই।"
–(সূরা আল কাহাফ ঃ ৩৯)

একথাটা আমরা বহুবার পড়েছি। কিন্তু এর ভেতরে যে মহাকল্যাণ নিহিত রয়েছে তার দিকে আমরা ভ্রূক্ষেপও করিনি। এ জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"আল্লাহ তার বান্দার ওপর ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি কিংবা আপনজনের আকারে যে অনুগ্রহই করেন, সে যদি তা পেয়ে বলে ঃ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ তাহলে মৃত্যু ব্যতীত আর কোন দুর্যোগ তার ওপর সংঘটিত হবে না।"

এ জন্য অতীতের কোন কোন মুসলিম মনীষী বলতেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সম্পদ, সন্তান বা অবস্থা লাভ করে অতিশয় মুগ্ধ ও প্রীত হয়, তার বলা উচিত ঃ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কথাটা একজন মনীষীর হলেও তা কুরআনের একটি আয়াত থেকে গৃহীত এবং রসূলের (সা) পবিত্র হাদীস দ্বারাও সমর্থিত।

৩-প্রত্যেক দুষ্কর্ম ও অপরাধমূলক কাজ তার কর্তার ওপরই প্রত্যাবর্তিত হয় এবং তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে। এ বিধিটি আল্লাহর সকল আইন ও বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খারাপ উদ্দেশ্য বা সংকল্প প্রত্যেক কাজের মধ্যে এমন একটা অশুভ প্রেতাত্মার জন্ম দেয়, যা হিংস্র শ্বাপদের মত ওঁৎ পেতে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকে এবং যথা সময়ে কর্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিম্নের আয়াত কয়টি পড়লেই আমরা একথার সত্যতার প্রমাণ পাই ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ

"হে মানবজাতি ! তোমাদের দুরভিসন্ধি তোমাদেরই সর্বানশ সাধন করে।"—(সূরা ইউনুস ঃ ২৩)

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ

"প্রত্যেকটি কুটিল ষড়যন্ত্র ও জঘন্য প্রতারণা তার কর্তাকেই আক্রান্ত করে।"—(সূরা আল ফাতির ঃ ৪৩)

فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ

"যে ব্যক্তি অঙ্গিকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে।"

–(সূরা আল ফাত্‌হ ঃ ১০)

খ্যাতনামা মনীষী মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল কারজী বলেছেন ঃ "তিনটে কাজ যে ব্যক্তি করবে, সে তা দ্বারা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার রেহাই নেই ঃ অসদুদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি লালন করা, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা করা এবং অঙ্গিকার ভঙ্গ করা।" বস্তুত এ উক্তির সমর্থন পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত তিনটে আয়াতেই সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান।

www.pathagar.com

অপর দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমঙ্গল কামনাকারীর জন্য ভয়ঙ্কর অশুভ পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"সাবধান! কারোর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো না। কেননা তা চক্রান্তকারীরই সর্বনাশ ঘটায়। এ জন্য একজন প্রার্থনাকারী আল্লাহর নিকট প্রার্থনায় নিয়োজিত আছে।"

অধিকন্তু আল্লাহ আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরূপ পরিণতি হওয়া আল্লাহর শাশ্বত বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত। সূরা ফাতিরের আয়াতটি শেষ অবধি পড়ুন ঃ

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝

কুচক্রিরাই আপন চক্রান্তের কবলে পড়ে। তারা কি চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম আশা করে? বস্তুত তুমি আল্লাহর শাশ্বত নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ও পরিবর্তন কখনো দেখতে পাবে না।"-(আল ফাতের ঃ ৪৩)

৪-মানুষ যে কোন লক্ষ্যে আল্লাহর নামে চেষ্টা-সাধনা করুক, সে তাতে সফল হবেই। এ সত্যকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করে নেয়া মানুষের পক্ষে সহজ। তবে মন দিয়ে তা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়। কেননা এটা বিশ্বাসের ব্যাপার। তাই যাদের উপযুক্ত মন আছে, তারাই তা মনে বদ্ধমূল করতে পারে। আমি ইতিপূর্বে একাধিকবার বলেছি যে, মনের স্বভাব হলো এই যে, সে যা হৃদয়ঙ্গম করেছে তা যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয়।

কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির স্বভাব হলো, সে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই না করে কোন কিছুই গ্রহণ করে না। সে যুক্তির ভিত্তি হলো প্রত্যেক কার্যসম্পন্ন হওয়ার পেছনে উপযুক্ত কার্যকারণের উপস্থিতি, সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও তথ্য বিশ্লেষণ, তুলনামূলক বিচার এবং বোধগম্যতার অন্যান্য প্রচলিত নিয়ম ও বিধি।

মানুষ যখন তার বুদ্ধি ও চিন্তাপ্রসূত তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, তখন সে এমনভাবে কর্মে উদ্যোগী হবে যে, পা ফেলবার আগে সে কোথায় পা পড়ে, সেটা ভেবেচিন্তে হিসেব-নিকেশ করে পা ফেলবে। কিন্তু যখন মনের টান ও বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, তখন নিঃশর্ত আনুগত্যের ভিত্তিতে সে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে। কেননা যে ব্যাপারে সে অনুপ্রাণিত, সেটা তার কাছে বাস্তব সত্য।

এখানে আমি বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধি ও মানসিক উপলব্ধির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছুক নই। অবশ্য আমি অনুভব করি যে, এ বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী।

www.pathagar.com

কেননা কুরআন ও হাদীসে এমন অনেক বিষয় আছে যা নিশ্চিত বিশ্বাসের দাবী জানায়। অথচ নিরেট বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে দৃষ্টি দিলে তা নিছক অলীক কল্পনা বলে মনে হয়। তথাপি স্থানাভাবে আমরা সে বিশ্লেষণ থেকে নিবৃত্ত থাকছি। শুধু এটুকু জোর দিয়ে বলতে চাই যে, উক্ত উভয় ধরনের উপলব্ধিই মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যাতে উভয়টিই যথাস্থানে কাজে লাগাতে পারে।

বর্ণিত আছে যে, মুসলমানরা যখন মিসর বিজয়ের উদ্দেশ্যে সেখানে যান এবং উচ্চস্তরের নেতৃবৃন্দ আলোচনায় বসেন, তখন তারা সেনাপতিকে পরামর্শ দেন যে, মিসরীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য দূত পাঠানো হোক। দূত যখন আলোচনা চালাতে গেলেন তখন মিসরীয় কর্মকর্তারা তার মিসর জয়ের সংকল্পকে অবজ্ঞা করে ও তার মনে বিজয়ের ব্যাপারে হতাশা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে এরূপ জবাব দেন ঃ দেশটিকে দখল করা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। কেননা আমরা যে মুহূর্তে বিভিন্ন উপত্যকা পাড়ি দিয়ে তোমাদের এখানে এসে পৌঁছেছি, সে মুহূর্তেই আল্লাহ তা আমাদের দখলে এনে দিয়েছেন। কেননা তিনি বলেছেন ঃ

وَلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ـ

"তারা যে উপত্যকাই অতিক্রম করে, তা তাদের জন্য লিখে দেয়া হয়।"
-(সূরা আত তাওবা ঃ ১২১)

এই অপূর্ব ব্যাখ্যা, এই সূক্ষ্ম উপলব্ধি এবং এই নিশ্চিত বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় যা দ্বারা এই মু'মিনদেরকে আল্লাহ অনুগৃহীত করেছিলেন, তার বিচার বিশ্লেষণের ভার আমি পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

৫-আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ঘোষণা করেছেন ঃ

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ـ

"তিনি সৎকর্মশীলদের অভিভাবক।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ১৯৬)

আল্লাহ কর্তৃক সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ একটা কার্যকর বিধি এবং সত্য ভাষণ। এই অভিভাবকের সুরক্ষিত নিরাপদ অভিভাবকত্বের আশ্রয় গ্রহণে যারা আগ্রহী তাদের অবগতির জন্যই এ বিধিটি ঘোষিত। আগ্রহীদের শুধু একটা কাজই করণীয়। তাহলো এই যে, তাদেরকে সৎকর্মশীল হতে হবে, যাতে করে এই বিধি তাদের ওপর বলবত হয়।

অনেক সময় কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি দুর্বল ও অনাথ সন্তান রেখে মারা যায়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর অভিভাবকত্ব তাদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। কেননা

www.pathagar.com

এটা আল্লাহর সর্বব্যাপী অনুগ্রহেরই সম্প্রসারণ। তাছাড়া তাদের অভিভাবকত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং তাদের পিতাকেই অভিভাবকত্ব ও সংরক্ষণ দানের শামিল। পিতা এতে সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করে। সূরা কাহফে মূসা আলাইহিস সালাম ও খিজির আলাইহিস সালামের ঘটনায় এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ط

"দেয়ালটি ছিল শহরে বসবাসকারী দু'জন এতিম বালকের। ওর নীচে তাদের জন্য কিছু গুপ্তধন রক্ষিত ছিল। বালকদ্বয়ের পিতা ছিল নেককার। তাই আল্লাহ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যখন বড় হবে, তখন যেন (দেয়ালের নীচ থেকে) ঐ সম্পদ উদ্ধার করে। এটা ছিল তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী। আসলে কাজটা আমি নিজের খেয়াল-খুশী মত করিনি।"-(সূরা আল কাহাফ ঃ ৮২)

বস্তুত আল্লাহ খিজির আলাইহিস সালামকে দেয়াল মেরামত করার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, যাতে এতিম বালকদ্বয়ের সম্পদ রক্ষিত হয় এবং তাদের নেককার পিতার প্রতি তার মৃত্যুর পরেও আল্লাহ যে অভিভাবকত্ব বজায় রেখেছেন, তার সুবাদে তারাও যেন আল্লাহর শুভেচ্ছা লাভে ধন্য হয়।

এই ঘটনা সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর একটি চমৎকার বক্তব্য আমরা পড়েছি। একবার তাঁর আমলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। লোকেরা তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে ফরিয়াদ জানাতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহর (সা) চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব জীবিত। উমর (রা) আব্বাসের (রা) হাত ধরে ময়দানে নিয়ে চললেন বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে। দোয়া করার সময় তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ ! তোমার নবী স্বীয় উম্মতের জন্য তোমার নিকট বৃষ্টির দোয়া করতেন। সে দোয়া তুমি কবুল করতে। আজ দেখ, আমরা এসব লোক এখানে এসেছি। আজ আমাদের জন্য বৃষ্টির দোয়া করার কেউ নেই। হে আল্লাহ ! এই দেখ, তোমার নবীর চাচা এবং তাঁর পরিবারের শেষ সদস্য আব্বাস (রা) আমাদের সাথে আছেন। কাজেই তোমার পুন্যবান নবীকে তাঁর পরিবারের এই শেষ ব্যক্তির মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখ। তোমার কথা তো সত্য। তুমি বলেছ ঃ

www.pathagar.com

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ج

"দেয়ালটা ছিল শহরের দু'জন এতিম বালকের এবং তার নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন। তাদের পিতা ছিল পুণ্যবান।"-(সূরা আল কাহাফ ঃ ৮২)

এভাবে দোয়া করার অব্যবহিত পরই মুষলধারে বৃষ্টি নামলো।

ইতিপূর্বে আমি যেসব উদাহরণ উল্লেখ করেছি, তাতে এর পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে এবং তা থেকে আমাদেব বক্তব্যের প্রকৃত মর্ম জানা যায়। যদিও কুরআনে এই বিধিসমূহের অনুসন্ধান চালানো এবং তা থেকে আল্লাহর পথনির্দেশ লাভ করা কঠিন কাজ নয়। তথাপি কাজটা আরো সহজ করার মানসে কতিপয় নির্দেশিকা আমি উল্লেখ করছি ঃ

১-নিম্নের দু'টি আয়াতের বাক্য গঠন ও শব্দ প্রয়োগ ও পদবিন্যাস প্রণালীতে যে কোন পাঠক উক্ত বিধিসমূহের বহু বিধি পেতে পারেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

"যারা নির্যাতিত হয়ে আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্য অবশ্য তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তমভাবে পুনর্বাসিত করবো। তবে আখেরাতে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার আরো বড় যদি তারা জানতো।"-(আন নাহল ঃ ৪১)

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ-(البقرة : ١٩٤)

"জেনে রাখ, আল্লাহ সংযমী লোকদের সঙ্গে থাকেন।"

২-নিম্নের দু'টো আয়াতের শাব্দিক বিন্যাসেও আল্লাহ এই বিধির একটা বিরাট সমাবেশ ঘটিয়েছেন ঃ

ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ٩ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط

"তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। তাহলে তিনি তোমাদের ওপর অবারিত বৃষ্টি বর্ষাবেন।"-(সূরা নূহ ঃ ৯-১০)

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ

"তাদের সাথে লড়াই কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়ে তাদেরকে সমুচিত শাস্তি দেবেন।"—(সূরা আত তাওবা ঃ ১৪)

www.pathagar.com

৩- নিম্নের আয়াত কটির বিশেষ ধরনের বাচনভঙ্গীতেও আল্লাহর অনেক-গুলো শাশ্বত বিধান পূর্ণ দৃঢ়তা ও অকাট্যতা নিয়ে বিরাজমান ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ○

"যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন।"-(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭)

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ـ(الطلاق : ٢)

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।"

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط (الطلاق : ٣)

"যে ব্যাক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।"
—(সূরা আত তালাক ঃ ৩)

اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ ـ

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তা হলে তিনি তোমাদেরকে হক ও বাতিল বাছাই করার ক্ষমতা ও উপকরণ দেবেন।"
—(সূরা আল আনফাল ঃ ২৯)

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ـ(الاعراف : ٩٦)

"(সেই ধ্বংস প্রাপ্ত) শহরগুলোর বাসিন্দারা যদি ঈমান আনতো ও সততার জীবন যাপন করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আকাশ ও পৃথিবী থেকে অফুরন্ত কল্যাণের দুয়ার খুলে দিতাম।"—(সূরা আল আরাফ ঃ ৯৬)

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ج وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ط

"যা ফেনা, তা উড়ে উবে যায় আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা পৃথিবীতে স্থায়ী হয়ে টিকে থাকে।"—(সূরা আর রাদ ঃ ১৭)

৪- আরো কয়েকটি বিধি নিম্নের আয়াতগুলোতে আরেকটি বিশেষ ধরনের বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে উঠেছে ঃ

وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ز فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ـ(توبة : ٥٢)

www.pathagar.com

"আল্লাহ আমাদের জন্য যেটুকু বিপদ-মুসিবত নির্ধারিত করে রেখেছেন তাছাড়া আর কিছু আমাদেরকে কখনো আক্রান্ত করবে না।"

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ـ(توبة : ٣٢)

"আল্লাহ তাঁর আলো পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত না করে ছাড়বেন না।"

وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ ـ

"যে কোন উপত্যকাই তারা অতিক্রম করে, আল্লাহ তা তাদের জন্য নির্ধারিত করে দেন।"—(সূরা আত তাওবা ঃ ১২১)

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط

"যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে, কেবলমাত্র তারাই তিরস্কার পাবার যোগ্য।"-(আশ শুরা ঃ ৪২)

৫-পূর্ববর্তী কাজের পরিণতি নির্দেশক বাক্য সম্বলিত নিম্নের আয়াত ক'টিতেও কতিপয় বিধি লক্ষণীয় ঃ

نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ط

"তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা বানিয়ে দিয়েছেন।"—(সূরা আল হাশর ঃ ১৯)

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط (توبة : ٦٧)

"তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।"

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

"(মূসা ফেরাউনকে বললেন) আমি তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গেলাম। অতপর আল্লাহ আমাকে নেতৃত্ব দান করলেন এবং নবী ও রসূলদের মধ্যে শামিল করে নিলেন।"—(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ২১)

এসব সুস্পষ্ট বর্ণনার পর আমাদের একমাত্র কর্তব্য থেকে যায় এসব বিধির অনুসন্ধান চালানোর কাজে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে মনোনিবেশ করা। কেননা এগুলো হলো আল্লাহর চিরস্থায়ী ও চিরন্তন নিয়ম এবং তা সর্বদাই চালু ও কার্যকর। যে বিশেষ বাচনভঙ্গী, পদবিন্যাস ও শব্দ প্রয়োগ প্রণালীর উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছি, আমাদের বক্তব্য তার মধ্যে সীমিত নয়। আসলে যে কোন আয়াত থেকে প্রাপ্ত যে কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশে এই বিধিমালার একটা না একটা বিধি থাকবেই। এটা নির্ভর করবে শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী, বিচার ক্ষমতা, গুরুত্ব দেয়ার মানসিকতা এবং গভীর ঔৎসুক্য ও আগ্রহের ওপর—যে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মত চিন্তা-গবেষণায় নিয়োজিত এবং ধ্যানে মগ্ন ও তন্ময় করে দেয়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ও ঔৎসুক্য নিয়ে কুরআন পড়ুন। দেখবেন, আপনার অন্তরে বিশাল বিশাল দীগন্ত উন্মোচিত হবে।

৫

একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, কুরআন আল্লাহরই বাণী ও বক্তব্য এবং আল্লাহর নিগূঢ় তত্ত্ব, তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। এটা এমন একটা বিষয়, যা সাধারণত লোকেরা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে না।

মানুষের রচনা ও বক্তব্যের সমালোচনায় সাহিত্যিকদের অভিরুচী ও মতামতে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। কেউ বলেন ঃ ভাষাগত আঙ্গিকের ওপরই বাক্যের চমৎকারিত্ব নির্ভর করে—ভাব ও বক্তব্যের ওপর নয়। আবার অন্যরা বলেন ঃ ভাব ও বক্তব্যই আসল। ভাষা তো তার বাহন মাত্র। তাদের মতে প্রত্যেক জিনিসের সারবস্তুই বিচার্য—বাহ্যিক খোলসের কোন গুরুত্ব নেই। সাহিত্য সমালোচকদের রুচী ও মতের এরূপ বিভিন্নতা যখন আছে, তখন একথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, প্রতিভার স্তর ভেদে এবং উচ্চাংগের ভাব ও বক্তব্য উদ্ভাবনের ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে লেখক সাহিত্যিকদের মানেরও তারতম্য না হয়ে পারে না। তাই তাদের রচনা ও তার অন্তর্নিহিত ভাব, মর্ম ও বক্তব্যের গুণগত ও পরিমাণগত মান অনুসারেই শ্রেষ্ঠত্ব ও চমৎকারিত্বের বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত হতে বাধ্য।

এটা যখন আমরা মেনেই নিয়েছি, তখন আসুন, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে কত বিরাট ও বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান, তা কল্পনা করি। এক দিকে রয়েছে এক নগণ্য সৃষ্টি—যার অস্তিত্বই বলতে গেলে হিসেবে ধরার মত নয়। অপর দিকে রয়েছেন মহামহিম—যিনি সব ক্ষেত্রেই সর্বেসর্বা। উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে একান্ত জরুরী। এতে করে আমরা দুর্বল, অক্ষম মানুষের রচনার ভাব ও মর্মে এবং আল্লাহর রচিত বাণীর চিরন্তন ও সীমাহীনভাবে মর্মে ও তথ্যে যে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান, তার অন্তত কিছুটা অনুধাবন করতে পারবো।

এই চেতনা ও পার্থক্যবোধ নিয়ে কুরআন পড়া হোক—এটাই আমাদের কামনা। তাহলে আশা করতে পারি যে, এর প্রতিটা শব্দই শুধু নয়, বরং প্রতিটা অক্ষর আমাদের সামনে তত্ত্ব ও তথ্যের এক একটা কূলকিনারাহীন সমুদ্র

www.pathagar.com

উদঘাটিত করে দেবে। একথা আমরা ইসলামের ব্যাপারে গোড়ামী ও সংকীর্ণ মানসিকতার বশবর্তী হয়ে বলছি না। মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যেকার পর্বত প্রমাণ পার্থক্য নিরূপণের যথাসাধ্য চেষ্টা করে—এমন একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বলছি। কেননা এ পার্থক্য বুঝতে পারলে তার পক্ষে উপরোক্ত চরম ও পরম সত্য কথা ছাড়া আর কিছু দিয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ বাণীকে কুরআনের কতগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যক পাতায় ও সীমিত সংখ্যক সূরায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ওলামায়ে কেরাম কুরআনের আয়াত, শব্দ এমনকি অক্ষর পর্যন্ত গণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। তাহলে একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, এই সীমিত অক্ষরগুলোতে আল্লাহর শাশ্বত বাণীর সমগ্র ভাব, মর্ম এবং তত্ত্ব ও তথ্য পরিপূর্ণরূপে সন্নিবেশিত হয়েছে। কাজেই কুরআনের প্রতিটা অক্ষর যদি গভীর ও নিগূঢ় তত্ত্ব ও তাৎপর্যে সমৃদ্ধ না হয়, তাহলে কেমন করে ভাবা যায় যে, এতে আল্লাহর অথৈ জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে।

যে কোন একজন সাহিত্যিক তার কোন সাহিত্য কর্মে কুরআনের সমান বা তারও বেশী অক্ষরের সমাবেশ ঘটাতে পারে। আপনি যদি সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সমগ্র গোষ্ঠীর রচিত সাহিত্যকর্ম একত্রিত করেন এবং তার অক্ষরগুলো গণনা করেন, অতপর সেই সকল অক্ষরের অন্তর্নিহিত মর্ম ও তাৎপর্যের সারাংশ বের করেন। অতপর সেই সকল নিগূঢ় তত্ত্বের সাথে কুরআনে সন্নিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্যের তুলনা করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই লজ্জিত হতে হবে এবং একটা অযৌক্তিক কাজে ক্রমাগত কাল ক্ষেপণের কলংক ও বিড়ম্বনা থেকে আপন বুদ্ধি-বিবেককে মুক্ত রাখার জন্য এই তুলমানমূলক বিচার-বিবেচনা আপনি তৎক্ষণাত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন। শুধু সমসাময়িকদের কথাই বা বলি কেন, আপনি যদি বিশ্বের সকল কালের ও সকল প্রজাতির সকল সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের রচনা সংগ্রহ করেন, তার সমস্ত অক্ষরগুলো গণনা করা ও তাতে সন্নিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্যের সারাংশ বের করা যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়। অতপর আল্লাহর কালামের সাথে যদি তার তুলনা করেন, তাহলে এটাও আপনার কাছে একটা নিদারুণ বোকামী বলে মনে হবে, আর আপনার বিবেক-বুদ্ধি ও আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস এই নির্বুদ্ধিতার কাজে সামান্যতম ভ্রূক্ষেপ করতেও অস্বীকার করবে। আপনার সত্তার অভ্যন্তরে ও অন্তরের অন্তস্থলে ঐশী আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে সর্বকালের মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলবে ঃ

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ـ(بنى اسرائيل : ٨٥)

www.pathagar.com

"তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

—(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ○ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ○

"কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে বটে। তবে আখেরাত সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ ও উদাসীন।"—(সূরা আর রূম ঃ ৬-৭)

অন্তরের অন্তস্থলে ধ্বনিত সেই ঐশী আওয়াজ আপনার সামনে নিম্নরূপ বক্তব্যও হাজির করবে ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ○

"(হে নবী !) আপনি বলুন ঃ সমুদ্র যদি আমার প্রভুর বাণী লেখার জন্য কালিতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে এক সময় সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে. কিন্তু আমার প্রভুর কথাগুলো শেষ হবে না।"—(আল কাহফ ঃ ১০৯)

وَلَوْ اَنَّ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّانَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط

"পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, তা যদি কলমে পরিণত হয় এবং সমুদ্র (দোয়াতে রূপান্তরিত হয়) এবং আরো সাতটি সমুদ্র তাকে কালি সরবরাহ করে, তাহলেও আল্লাহর কথা লেখা শেষ হবে না।"

—(সূরা লোকমান ঃ ২৭)

সতুরাং আপনি যখন সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানকে একত্রিত করবেন—যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং তাকে কুরআনের সমসংখ্যক শব্দ ও অক্ষরের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন, তাহলে একথা বলা কি অসঙ্গত হবে যে, তার প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে অফুরন্ত তত্ত্ব, তথ্যের ইংগীত রয়েছে ? কথাটা অসঙ্গত হবেই বা কেন ? আপনার সামনে যে কুরআন, তাতে তো দুনিয়া ও আখেরাতের জ্ঞানের এত বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়।

বস্তুত কুরআনের প্রতিটা শব্দের অন্তরালে লুকিয়ে আছে অসংখ্য দুর্জ্ঞেয় রহস্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কুরআনের কিছু

www.pathagar.com

অংশ রহস্যময়, কিছু অংশ স্পষ্ট, তার শুরুও আছে এবং শেষও আছে।" বস্তুত তিনি কুরআনকে যেরূপ পরিপূর্ণভাবে বুঝেছেন আমরা সেভাবে বুঝিনি। এজন্য তিনি বলেছেন ঃ "কুরআনের বিস্ময়ের কোন শেষ নেই।" এই সীমাহীন বিস্ময়ের আঁধার কুরআন আমাদের গভীর চিন্তা-গবেষণার দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পদার্থ বিজ্ঞানীরা পদার্থ নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে অণু পর্যন্ত গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন যে, অণুই হলো মৌল বিন্দু—যার সম্মিলন ও সমাবেশে পদার্থের জন্ম হয়ে থাকে। এই বিন্দুর বিভাজন সম্ভব নয়। কেননা সূক্ষ্মতা ও ক্ষুদ্রতায় তা চরম সীমায় গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু কিছুকাল পরে তারা উক্ত অণু সম্পর্কে নতুন এক বিস্ময়কর তথ্য উদঘাটন করলেন। তারা জানালেন যে, অণুকেও ভাগ করা ও ভাঙ্গা যায়। কেননা তারা সত্যি সত্যি তা ভেঙ্গেছেন এবং তার ভেতরে যে রকমারি আলোকরশ্মী এবং আল্লাহর অভিনব সৃষ্টির অস্তিত্ব রয়েছে, তা উদ্ভাবন করেছেন। আজও পর্যন্ত তারা এই অণুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো সম্পর্কে বিস্ময়কর ও চাঞ্চল্যকর হাজারো রহস্য একে একে উদঘাটন করে চলেছেন। অথচ কুরআনে আমরা অণুর এই বিভাজন ও বিখণ্ডীকরণের তত্ত্ব আগে থেকেই বিদ্যমান দেখতে পাই। নিম্নোক্ত আয়াতে এ তত্ত্বটি পড়তে গিয়ে আমাদের মনে হয় তা সবেমাত্র পড়ছি ঃ

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

"আসমান ও জমীনে এক বিন্দু পরিমাণ অথবা তার চেয়ে ছোট বা বড় এমন কোন জিনিস নেই যা তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে আছে এবং এক পরিচ্ছন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ নেই।"—(সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

এখানে أَصْغَرَ "তার চেয়ে ছোট" এই একটি মাত্র কথায় শুধু যে অণুর অস্তিত্বের আভাস রয়েছে তা নয়, বরং তা যে ভাঙ্গা ও ভাগ করা যায় সে কথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই অণুকে ভাঙ্গা ও ভাগ করার জন্য কত চেষ্টা-সাধনা, কত চিন্তা-গবেষণা এবং কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে এবং কত জ্ঞান ও তথ্য অর্জিত ও ব্যবহৃত হয়েছে, আর এই বিভাজিত অংশ তারা পরমাণুকে কেন্দ্র করে কত জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরিত এবং প্রাকৃতিক শক্তি সংক্রান্ত কত অজানা রহস্য উদঘাটিত হয়েছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। আপনি যখন জানবেন যে, অণুর বিভাজন অত্যাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগণিত নতুন পরিমণ্ডলের প্রবেশদ্বার মাত্র তখন আপনি এটাও বুঝতে সক্ষম হবেন উক্ত أَصْغَرَ "তার চেয়ে ছোট" কথাটা মানুষের সেই সময়কার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কি নিদারুণভাবে পরিহাস করছে, যখন তারা অণুর বিভাজন সম্ভব বলে স্বীকার

www.pathagar.com

করতো না। "তার চেয়েও (বিন্দুর চেয়েও) ছোট" এই কথাটা তখন দৃষ্টির আড়ালে লুকানো চাঞ্চল্যকর ও বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে যারা অজ্ঞ ছিল, তাদেরকে প্রয়োজনীয় আভাস ইংগীত দিচ্ছিল।

আল্লাহর লক্ষ নিযুত শব্দের মধ্য থেকে মাত্র একটি শব্দের অবস্থা যখন এই, তখন তার সকল শব্দের সামগ্রিক অবস্থা কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কথাটা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, যে বাক্য আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতাধীন বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তার একটি শব্দ বা বাক্যাংশ যখন এত গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত, তখন আমাদের দৃষ্টির অগোচর ও ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির আওতাবহির্ভূত রূহ বা আত্মার নিগূঢ় রহস্য সম্বলিত শব্দ বা বাক্য কত বেশী তাৎপর্যময়, তা কেবল চিন্তা করেই বুঝা যায়।

এ পর্যন্ত আলোচনার পর আমি আর নিজেকে বা অন্য কাউকে এই বিষয়ের আরো গভীর তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়ে যেতে চাই না। আমি শুধু এটুকু প্রত্যাশা করি যে, কুরআন অধ্যয়নকারী যেন এই চেতনা ও অনুভূতিকে জাগরুক রেখে তা অধ্যয়ন করে যে, সে কোন মামুলী বাণী পড়ছে না, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতলান্ত রহস্যে ভরপুর এক অসাধারণ বাণী পড়ছে। এর ফল হবে এই যে, সে কোন একটি লাইনও এতটা ভাসাভাসাভাবে পড়ে রেখে যাবে না যে, তা থেকে অন্তত একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য সে উদ্ধার করতে পারেনি।

প্রত্যেক কুরআন পাঠকের একথাও জেনে রাখা দরকার যে, কুরআনের প্রতি এবং তার আয়াতসমূহে নিহিত রকমারি অভিনব তত্ত্বের প্রতি যে চেতনা ও অনুভূতি আমরা রাখি, শুধুমাত্র সেই আলোচনাতেই আমরা তৃপ্ত হতে পারি না। কেননা আল্লাহকে যারা যথাযথভাবে চিনেছেন, তাদের কাছে কখনো কখনো এসব তত্ত্ব ও তথ্যের সামান্য কিছু উন্মোচিত হলেও পরক্ষণেই এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, সে সব তত্ত্ব ও তথ্য আবার পর্দার আড়ালে হারিয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ اِلاَّ اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ

مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ ○

"আল্লাহর বাণীর নিগূঢ় মর্ম একমাত্র আল্লাহ এবং পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরাই জানেন। তারা বলেন ঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এর সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত। বস্তুত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোকেরাই শুধু এ থেকে উপদেশ লাভ করে থাকে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭)

www.pathagar.com

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

"এই কুরআন যদি কোন পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে, সে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে যাচ্ছে ও বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ যাতে চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়, সে জন্যই এসব উদাহরণ আমি দিয়ে থাকি।"-(সূরা আল হাশর ঃ ২১)

সুতরাং কুরআন পড়ার সময় আসুন, গবেষণা করুন এবং আল্লাহর কালামে সঠিক পথনির্দেশ ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে তত্ত্বানুসন্ধান করুন। তাহলে আপনার সামনে যে জ্ঞানের দ্বার এখন পর্যন্ত রুদ্ধ রয়েছে, তা অচিরেই খুলে যাবে। কুরআনকে একটা জ্ঞানভাণ্ডার মনে করে পড়ুন এবং তারপর দেখুন, তা থেকে আপনি কত জ্ঞান লাভ করতে পারেন। আপনার কুরআন শরীফখানা খুলুন, তার যে কোন একটি সূরায় একজন দক্ষ নৃতত্ত্ববিদের মত অনুসন্ধান চালান এবং গুপ্ত মূল্যবান ধনরত্ন উদ্ধারে সচেষ্ট হউন। এক একটি আয়াত করে পড়তে থাকুন, আপনার কুরআনের পাদটিকায় প্রত্যেক আয়াতের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ শীরোনাম হিসেবে লিখে রাখুন. অতপর এগুলোকে একটি খাতায় বা তালিকায় একত্রিত করুন। তখন আপনি এসব শীরোনাম ও সারসংক্ষেপের মধ্যে জীবন ও তার বাস্তব সমস্যাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের সন্ধান পাবেন। সেসব গভীর তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে যদি আপনি দীর্ঘ সময় কাটাতে চান. তাহলে অনেক দীর্ঘ সময় কাটাতে পারবেন। আমি আমার কুরআন শরীফ খুলে সূরা জুখরুফের সাক্ষাত পেয়েছিলাম। আমি এ সূরার আয়াতগুলো থেকে যে কয়টি মৌলিক বিষয় পেয়েছি. তা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ ۝

"নিশ্চয়ই এ কুরআন মূলগ্রন্থে সুরক্ষিত। আমার নিকট তা অতি মর্যাদাপূর্ণ ও বিজ্ঞানময় কিতাব।"—(আয়াত ঃ ৪)

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝

"তোমরা সীমালংঘনকারী বলে আমি কি তোমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে এ কিতাব পাঠানো বন্ধ করে দেবো ?"—(আয়াত ঃ ৫)

www.pathagar.com

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ ○ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

"অতীতের জাতিগুলোর কাছে আমি কত নবী পাঠিয়েছি। কিন্তু কোন নবী তাদের কাছে এলেই তারা তাকে বিদ্রূপ করতো।"-(আয়াত ঃ ৬-৭)

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ○ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ○

"তিনি তোমাদের যানবাহন হিসেবে নৌকা ও জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তোমরা তার ওপর আরোহণ কর, অতপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহের দানকে স্মরণ কর এবং বল ঃ মহান পবিত্র তিনি যিনি এই জিনিসকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো একে বশ মানাতে পারতাম না।"-(আয়াত ঃ ১২-১৩)

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ○

আল্লাহর ভাগ্যে কি সেই সন্তানরা এলো যারা অলংকারের মধ্যে প্রতিপালিত আর তর্কবিতর্কে নিজেদের বক্তব্যও স্পষ্ট করে বলতে পারে না?"-(আয়াত ঃ ১৮)

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ط اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ط

"যারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ছাড়া আর কিছু নয়—সেই ফেরেশতাদেরকে তারা নারী মনে করেছে। তারা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টি হতে দেখেছে?"-(আয়াত ঃ ১৯)

اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ○ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

"আমি কি ইতিপূর্বে তাদেরকে (ফেরেশতা পূজার স্বপক্ষে) কোন কিতাব দিয়েছিলাম যার সনদ তাদের কাছে আছে? না, বরং তারা বলে ঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা পন্থার অনুসারী পেয়েছি আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি।"-(আয়াত ঃ ২১-২২)

www.pathagar.com

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ لا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ○ قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ط قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

"এমনিভাবে যে জনপদেই আমি কোন সাবধানকারীকে পাঠিয়েছি, সেখানকার সচ্ছল লোকেরা বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা পথের অনুসারী পেয়েছি আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি। তখন সাবধানকারী (রসূল) বলেছে ঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাকে যে মত ও পথের ওপর পেয়েছ, আমি যদি তার চেয়ে ন্যায়সঙ্গত পথ দেখাই, তাহলেও কি আমার অনুসরণ করবে না ? তারা জবাব দিয়েছে ঃ তোমরা যা নিয়ে এসেছ, তা আমরা মানি না।"
–(আয়াত ঃ ২৩-২৪)

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ○ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

"আসল ব্যাপার হলো, আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাকে বিপুল ভোগের উপকরণ প্রদান করেছি। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে সত্য এসেছে এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদানকারী রসূলের আবির্ভাব ঘটেছে। সেই সত্য আসা মাত্রই তারা বলে উঠলো ঃ এটা যাদু এবং এ আমরা অস্বীকার করি।"
–(আয়াত ঃ ২৯-৩০)

وَقَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ○

"তারা বলেছে ঃ এই কুরআন দুই নগরীর কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির ওপর নাযিল হলেই ভাল হতো।"–(আয়াত ঃ ৩১)

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط

"আমিই তাদের মধ্যে দুনিয়ার জীবনে বাঁচার উপকরণ বন্টন করেছি আর আমিই তাদের কিছু লোককে অপর কিছু লোকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি, যেন তাদের একজন আর একজনকে নিজের কাজে লাগাতে পারে। (অর্থাৎ জবরদস্তিমূলকভাবে নয়, বরং স্বতস্ফূর্তভাবে একে অপরের স্বার্থ

www.pathagar.com

উদ্ধার ও সেবা করে এবং একে অপরকে নিজের অনুসারী বানায়।"
-(আয়াত ঃ ৩২)

وَلَوْ لَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ٥ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ ٥ وَزُخْرُفًا ط وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ٥

"সকল মানুষ একই নীতির অনুসারী হয়ে যাবে—এই আশংকা যদি না থাকতো, তাহলে আমি দয়াময় প্রভুর অমান্যকারীদের ঘরের ছাদ, ওপরে আরোহণের সিড়ি, দরজা ও হেলান দিয়ে বসার আসনসমূহ রূপা দিয়ে গড়ে দিতাম এবং আরো বিলাস সামগ্রী দিয়ে সজ্জিত ও সৌকর্য শোভিত করতাম। এসব তো শুধু দুনিয়ার জীবনের জীবিকা ও ভোগের সামগ্রী। আর পরকাল তোমার প্রতিপালকের নিকট কেবলমাত্র সৎলোকদের জন্যই নির্দিষ্ট।"-(আয়াত ঃ ৩৩-৩৫)

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ٥

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে জীবনযাপন করে, আমি তার ওপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই। ফলে সে তার সাক্ষী হয়ে যায়।"-(আয়াত ঃ ৩৬)

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ٥

"শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তি যখন আমার নিকট পৌঁছুবে, তখন নিজের শয়তানকে বলবে ঃ হায়! তোর ও আমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকতো! তুইতো নিকৃষ্টতম সাথী!"-(আয়াত ঃ ৩৮)

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ٥

"তুমি কি বধির লোকদের শুনাবে? অথবা অন্ধ ও সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত লোকদেরকে পথ দেখাবে?"-(আয়াত ঃ ৪০)

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ٥ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ٥

www.pathagar.com

"এখন তো আমি এদেরকে শাস্তি দেবই, চাই তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেই, অথবা তোমাকে তাদের জন্য ওয়াদা করা সেই পরিণাম প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দেই। তাদের ওপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান।"
–(আয়াত ঃ ৪১-৪২)

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

"সুতরাং তুমি দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখ তোমার কাছে ওহী যোগে প্রেরিত বিধানকে। নিশ্চয় তুমি নির্ভুল পথে আছ।"–(আয়াত ঃ ৪৩)

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ○

"বস্তুত এই কিতাব তোমার ও তোমার জাতির জন্য স্মারক। অচিরেই তোমাদেরকে এর ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।"–(আয়াত ঃ ৪৪)

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ○

"তোমার পূর্বে আমি যত রসূল পাঠিয়েছি, তাদের সকলকে জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যে, তাদের বন্দেগী করতে হবে?"–(আয়াত ঃ ৪৫)

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ○ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ز وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

"পরে যখন সে [মূসা (আ)] আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে নিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো। আমি তাদেরকে যখনই কোন নিদর্শন দেখাই তা তার পূর্ববর্তী নিদর্শনের চেয়ে বড় বলে সাব্যস্ত হয়। পরন্তু তারা ভালো হয়ে যাবে এই আশায় আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। প্রত্যেক শাস্তির সময়ই তারা বলতো ঃ ওহে যাদুকর! তোমার আল্লাহর নিকট থেকে তুমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছ, তার জোরে তুমি তাঁর নিকট আমাদের জন্য দোয়া কর। আমরা নিশ্চয়ই হেদায়াত পাবো। কিন্তু যেই আমি তাদের ওপর থেকে শাস্তি হটিয়ে দিতাম অমনি তারা ওয়াদা ভঙ্গ করতো।"–(আয়াত ঃ ৪৭-৫০)

www.pathagar.com

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ج اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ لا وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ○ فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْجَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ○

"একদিন ফেরাউন নিজের জাতির লোকজনের মাঝে চিৎকার করে বললো ঃ হে জনগণ ! মিসরের রাজত্ব কি আমার জন্য নির্দিষ্ট নয় ? আর এই নদীগুলো কি আমারই নির্দেশে প্রবাহিত হচ্ছে না ? তোমরা কি এটা দেখতে পাও না ? আমি কি ভালো, না এই হীন লাঞ্ছিত লোকটি ? যে নিজের কথাটাও স্পষ্ট করে বলতে পারে না। তাঁর ওপর স্বর্ণের কাঁকন নাযিল করা হয়নি কেন ? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী তার পাহারাদার হয়ে এলো না কেন ?"-(আয়াত ঃ ৫১-৫৩)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

"সে নিজের জাতির লোকদেরকে গুরুত্বহীন মনে করেছিল। আর তারা তার কথাই মেনে নিল। আসলে তারা ছিল নাফরমান।"-(আয়াত ঃ ৫৪)

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

"শেষ পর্যন্ত তারা যখন আমাকে ক্রুদ্ধ করলো, তখন আমি তাদের ওপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে ডুবিয়ে মারলাম।"(আয়াত ঃ ৫৫)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ○ وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ط مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ○

"আর যখনই মরিয়মের ছেলের দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো, অমনি তোমার জাতির লোকেরা হট্টগোল করে উঠলো। এবং বলতে লাগলো ঃ আমাদের মাবুদ ভালো, না সে ? এ দৃষ্টান্ত তারা তোমার সামনে শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পেশ করেছে। আসলে এরা বড় ঝগড়াটে লোক।"[১]
-(আয়াত ঃ ৫৭-৫৮)

১. কথিত আছে যে, যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ "নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসব মা'বুদের উপাসনা তোমরা কর তারা দোযখের ইন্ধন হবে।"(সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৮) তখন মোশরেকরা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনুজ জাবয়ারী নামক এক ধড়িবাজ মোশরেক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভ্রান্তিতে ফেলার চক্রান্ত আঁটলো। তিনি লা-জওয়াব হয়ে যান এমন একটা প্রশ্ন উদ্ভাবন

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ○ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ○

"কিয়ামতের দিন মুত্তাকীরা ছাড়া সকল বন্ধুরাই পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। হে আমার বান্দাগণ ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমাদের দুশ্চিন্তারও কোন কারণ নেই।"-(আয়াত ঃ ৬৭-৬৮)

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

"এই সেই জান্নাত—যা তোমরা দুনিয়ায় নেক কাজ করার ফল স্বরূপ পেয়েছ।"-(আয়াত ঃ ৭২)

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ○ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ○

"এই লোকেরা কোন রকম পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি, বেশ, তাহলে আমিও একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই।" অথবা তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদের গোপন কথাবার্তা ও সলাপরার্শের কিছুই শুনি না ? আমি তো সবই শুনি। তদুপরি আমার ফেরেশতারা তাদের কাছ থেকেই সবকিছু লিখে রাখছে।"-(আয়াত ঃ ৭৯-৮০)

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর মৌলিক বিষয় বা শিরোনাম ঃ

১-আল্লাহর বিশিষ্ট জ্ঞানের আওতায় যা কিছু মর্যাদাপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত, কুরআনে তাই সন্নিবেশিত হয়েছে।

২-আমাদের সীমাতিরিক্ত গোমরাহী আমাদের হেদায়েত লাভের যোগ্যতা বিনষ্ট করে না।

করে নিয়ে সে তাঁর কাছে গিয়ে বললো ঃ হে মুহাম্মাদ ! আল্লাহর এ উক্তি যে, তোমরা এবং তোমাদের মা'বূদরা জাহান্নামের কাষ্ঠ হবে—শুধু আমাদের এবং আমাদের মা'বূদদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, না যে কোন জাতি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন মা'বুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ? রসূল (সা) বললেন ঃ এটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তখন সে বললো ঃ হে মুহাম্মাদ ! তোমার সাথে তাহলে আমার একটা তর্ক আছে। ঈসা (আ) তো খৃষ্টানদের মা'বুদ ছিলেন। এ আয়াত অনুসারে তাহলে তিনিও তো দোযখবাসী। সুতরাং আমাদের মা'বূদদের অবস্থা তাঁর চেয়ে ভালো নয়। তাঁর সাথে আমাদের এবং আমাদের মা'বূদদের দোযখে থাকাতে অসুবিধা কি ? এর জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আরো নাযিল হয় ঃ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ "যাদের সম্পর্কে আমার তরফ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, তারা কল্যাণ লাভ করবে, তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে।"—(সূরা আম্বিয়া ঃ ১০১)

www.pathagar.com

৩-সত্যকে অস্বীকার করা ও সত্যের আহ্বায়কদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করা বাতিলপন্থীদের চিরাচরিত স্বভাব।

৪-আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যেক বস্তুগত নিয়ামতে আমাদের জন্য দু'টো ফায়দা নিহিত রয়েছে ঃ একটি বস্তুগত অপরটি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক।

৫-অলংকার ও বিলাসিতার মধ্যে লালিত পালিত হলে কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করার যোগ্যতা জন্মে না।

৬-ঐন্দ্রিক অনুভূতি ও উপলব্ধি যতক্ষণ দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৭-সত্যাসত্য বিচার না করে অন্ধ আনুগত্য করার দ্বারা মানুষ নিজের হেয়তা ও অশুভ পরিণতিই ডেকে আনে।

৮-নেতৃবৃন্দের বিলাসী স্বভাবের অন্ধ অনুকরণ মানুষকে হঠকারী বানিয়ে ফেলে এবং সত্যকে গ্রহণ ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতার বিলোপ ঘটায়।

৯-দৈহিক ভোগের উপকরণের পুরুষানুক্রমিক দাসত্ব মানুষের হক ও বাতিলে বাছবিচার করার ক্ষমতা রহিত করে দেয়।

১০-হৃদয়ের ঐশ্চর্যই মানুষের মহত্ব ও মর্যাদা নির্ণয়ের মাপকাঠি—ধন ও মানের প্রাচুর্য নয়।

১১-জীবন ধারণের উপকরণ ও গুণগত মানের দিক দিয়ে মানুষের পার্থক্য ও তারতম্য দুনিয়ার বিনির্মাণ ও উন্নয়ন এবং সমাজ গঠনের শাশ্বত রীতি।

১২-সত্যের মাপকাঠিতে ঈমানের সম্পদ-ই প্রকৃত সম্মান ও ঐশ্বর্যের উৎস। আর দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ী সামগ্রী হীনতা, লাঞ্ছনা ও দুর্দশার উৎস।

১৩-আল্লাহর স্মরণ মানুষের মনের সৎগুণাবলী, তার সৌন্দর্য সুষমা ও দীপ্তির স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা দেয়। মানুষ যখন এই স্মরণ থেকে নিবৃত হয় তখন শয়তানের পক্ষ থেকে তার ওপর এমন হামলা চালানো হয়, যে তার মনের যাবতীয় উত্তম বৈশিষ্ট বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৪-বন্ধুত্বের সবচেয়ে টেকসই, অটুট ও পরিচ্ছন্ন বন্ধন হলো আল্লাহর সন্তোষভিত্তিক ভালোবাসা। বাতিলের ওপর ভিত্তি করে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তা ত্রুটিপূর্ণ ও ভ্রান্ত।

১৫-সত্যের দিকে আহুতদের বিবেক যখন বিকৃত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তখন আর তাদের সত্যকে গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে না।

www.pathagar.com

১৬-দুনিয়া হলো একটা সর্বনাশী জায়গা। সত্যের দিকে আহ্বায়ক রসূলগণ ও তাদের অনুসারীগণ তা থেকে নিরাপদ। এই নিরাপদ লোকদেরকে যে ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান করে, সে আল্লাহর আযাব ভোগ করবেই—চাই আহ্বায়কের জীবদ্দশায় করুক কিংবা তার মৃত্যুর পর।

১৭-সত্য তার নিশানবাহীকে দুনিয়ার চক্রান্ত ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে।

১৮-কুরআন মানুষকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্যের যোগান দেয় এবং তাকে সতর্ক করে।

১৯-ইসলাম এক চিরন্তন শাশ্বত ও মৌল মহাসত্য। কোন বিষয়ে কোন কালে এ মহাসত্যের একাংশ অন্য অংশকে খণ্ডন করে না।

২০-যার জীবন বাতিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আল্লাহর আযাব দ্বারা সে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

২১-মানুষের চিন্তাশক্তি যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং কেবল দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুভূতি ছাড়া তার আর কোন অনুভূতি বা বোধশক্তি অবশিষ্ট থাকে না, তখন তার মূল্যবোধ বিকৃত হয়ে যায় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে যা সে অনুভব করে, তা তার বোধশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২২-যে কোন জাতির নেতৃত্ব তথা শাসন কর্তৃপক্ষ জাতির সমগ্র জনশক্তি ও কর্মক্ষমতাকে হয় ন্যায়নীতি ও তেজস্বীতায় উদ্দীপিত করবে নচেৎ তাকে বাতিল এবং বস্তুবাদী ও ভোগবাদী মূল্যবোধে সজ্জিত করবে। (দেখুন ৫১-৫৩ আয়াত) স্বৈরাচারী একনায়কের শাসন জাতিকে অত্যন্ত নিম্নমানের লক্ষ্যাভিসারী ও অন্যায়ের অনুসারী বানিয়ে তাকে গুরুত্বহীন ও তুচ্ছ জাতিতে পরিণত করে।
–(দেখুন, ৫১, ৫২, ৫৩)

২৩-যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, সে ধ্বংস হবে।

২৪-যুক্তিহীন বিতর্ক তুলে বিভ্রান্তি ও বিভ্রাট সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো বাতিল শক্তির চিরাচরিত স্বভাব।

২৫-আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, তা অনন্তকাল ধরে স্থায়ী থাকবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তা অটুট থাকবে।

২৬-আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত নেক আমল জান্নাতের অবধারিত নেয়ামতের নিশ্চয়তা দেয়।

২৭-ইসলামের দুশমনরা যে চক্রান্তই আটুক এবং যত কৌশলই করুক, আল্লাহর পক্ষ থেকে আরো জোরদার কৌশল অবলম্বন করার ফলে তা ব্যর্থ ও প্রত্যাখ্যাত।

www.pathagar.com

০ বাতিলের অনুসারী যে কৌশল বা চক্রান্ত আঁটে, তা বিনা সুতোয় বোনা রজ্জুর মত। প্রকৃতির এমন কোন গঠনমূলক উপাদান তাতে থাকে না, যা যে কোন কাজের ভিত্তি স্বরূপ এবং তার স্থিতির নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম।

০ বাতিলের অনুসারীরা এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত থাকে যে, সকল বিষয়ের শেষ পরিণতি তাদের মুঠোর মধ্যে।

০ বাতিলের অনুসারী যে কৌশল বা ষড়যন্ত্রই আঁটে, আল্লাহর বিধান অনুসারে তা শেষ পর্যন্ত তার নিজের বিপর্যয় ও লাঞ্ছনাই ডেকে আনে।

একথা সত্য যে, এই সমস্ত শীরোনাম কোন একটি আয়াতের জন্যও যথেষ্ট নয়। একথাও অনস্বীকার্য যে, আমরা আলোচ্য সূরাটির সকল আয়াত পর্যালোচনা করিনি। তথাপি পাঠকের কাছে এটা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যে কয়টি শিরোনাম আমি উল্লেখ করেছি তার প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ ও বৈষম্য মণ্ডিত। জীবনের বাস্তব অথচ চিন্তাগত ক্ষেত্রের কোন না কোন প্রকারের বর্ণনা এর সব ক'টিতেই পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে কোন কোন শিরোনাম বস্তুর ঊর্ধের জিনিস যেমন ফেরেশতা প্রভৃতির বর্ণনা সম্বলিত প্রত্যেকটি শিরোনামের বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে যে, জ্ঞান ও তত্ত্ব কথার স্ফুরণ ঘটেছে, তার সারকথা হলো বাতিলের সকল সংশ্রবমুক্ত নিটোল মহাসত্য।

এ পদ্ধতিতে যদি কুরআন পড়তে চান তা হলে আপনাকে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে পড়তে হবে এবং আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে এ কাজে পুরোপুরি-ভাবে নিয়োজিত করতে হবে। একমাত্র এই পন্থায়ই আপনার সামনে আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে উপনিত হওয়ার সমস্ত প্রায়োজনীয় জ্ঞান ও তত্ত্ব উদঘাটিত হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির সেই স্বাদ ও গন্ধ আপনি উপভোগ করতে পারবেন, যার বর্ণনা দেয়া কারো সম্ভব নয়।

এক দ্বীনী ভাই এই পদ্ধতি প্রয়োগের নিজস্ব অভিজ্ঞতা আমাকে শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আমি আমার অফিসে চার পাঁচ ঘন্টা বা তারও বেশী সময় ধরে কুরআন অধ্যায়নে বসতাম। যতই সময় অতিবাহিত হতো ততই আমি এই সুখকর ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতাম। আমার সমগ্র সত্ত্বা এক ধরনের নেশার মত্ততায় ক্ষণে ক্ষণে যেন উচ্ছৃংখল হয়ে উঠতো অথবা বলা যেতে পারে যে, আমার মনে আনন্দের এমন প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা দিত যে, তার চাপ আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠতো। ফলে বে-এখতিয়ার বই কিতাবের ওপর সশব্দে থাপ্পড় বসিয় দিতাম অথচ মুখ দিয়ে সন্তোষ ও তৃপ্তিসূচক কথা উচ্চারণ করতাম।"

এই ব্যক্তি সমগ্র কুরআন এই পদ্ধতিতেই অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। কুরআনের নিজস্ব কপিটিতে তিনি দীর্ঘ তিন বছর ধরে এত টীকা টিপ্পনি

www.pathagar.com

লিখেছেন, যা, তার তীক্ষ্ণ প্রতিভারই স্বাক্ষর বহন করে। পরবর্তী সময়ে যখন আবার তা অধ্যয়ন করেছেন মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্যে দীপ্তিমান অসংখ্য সূর্য তার মানসপটে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমি আবারো আপনাকে পরামর্শ দেবো তফসিরে ইবনে কাছির অধ্যয়ন করার। কেননা এ তফসির আপনাকে প্রায়োজনীয় সকল নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করবে।

এবার যে কথাটা বলতে চাই তা এই যে, পুরো দিনে যেটুকু পড়লেন, তা একত্রিত করুন। একদিনে কমপক্ষে গড়ে এক পারার এক অষ্টমাংশ পড়া উচিত। অতপর নিজের মন-মগজে তাকে দক্ষতার সাথে বিন্যস্ত করুন।

অতপর আপনি আপনার অর্জিত শিক্ষাকে জনগণের মধ্যে প্রচার ও চালু করুন। আলোচনার ধারা বিন্যাস আপনি নিজের ইচ্ছামত করুন। সদ্য অর্জিত এ শিক্ষাকে জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য আপনি যে আলোচনা করবেন, তা শ্রোতাদের মনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করবে, এমনকি আপনার মনকেও তা ভীষণভাবে নাড়া দেবে। কেননা সে জ্ঞান এখনও আপনার মনকে নব আবির্ভূত আপনার আবেগ ও অনুভূতিতে তা সবেমাত্র জাগরণ ও শিহরণ তুলেছে। আপনার হৃদয়ে তার পেলবপরশ এখনো তরতাজা রয়েছে।

শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি আপনার স্মৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে এ শিক্ষা আরো গভীরভাবে বদ্ধমূল হবে ত্বরিত প্রচারের উদ্যোগের কল্যাণে। আলোচনা যতবেশী ও ঘন ঘন করবেন ততই তার উন্নতি ও প্রবৃত্তি ঘটবে এবং আপনার যুক্তিপ্রমাণ পেশ করার ভাষা আরো শাণিত ও প্রাঞ্জল এবং বাধনমুক্ত হবে। সবশেষে আমার অনুরোধ, সমার্থক বা প্রায় সমার্থক আয়াতগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করুন যে, প্রত্যেকটি বিষয়ে আয়াতের এক একটি গ্রুপ তৈরী হয় এবং প্রত্যেকটি গ্রুপ আলোচ্য বিষয়ের এক একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে। এভাবে বিষয়ের সব কয়টি উপাদান সংগৃহীত হয়ে বিষয়কে পূর্ণতা দান করে। কোন কৃত্রিমতা ছাড়াই পর্যায়ক্রমে কাজ শুরু করুন। এ ব্যাপারে শুরুতেই সবচেয়ে মূল্যবান সাহায্য পাবেন তফসিরে ইবনে কাছির থেকে। এভাবে অচিরেই আপনার কাছে একটি বিরাট তথ্যবহুল গ্রন্থ তৈরী হয়ে যাবে ইনশআল্লাহ। পর্যায়ক্রমে শুরু করতে বলেছি এই জন্য যে, এতে করে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিতে ও মনে আপনার অভিষ্ট বিষয় ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীভূত হতে থাকবে। এভাবে বিষয়টা নোট বইতে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিতে গোছালো ও পরিপক্ক হবার সুযোগ পাবে আর এভাবে আলোচনার সময় আপনার যুক্তিপ্রদর্শন অত্যন্ত সফল, পূর্ণাঙ্গ ও অকাট্য হবে। আল্লাহর সাহায্যে আপনি সর্বোত্তম পথের সন্ধান পাবেন।

www.pathagar.com

(৬)

একথা মনে রেখে কুরআন পড়তে হবে যে, এই মহাগ্রন্থের প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আখেরাতের সাফল্য ও মুক্তির জন্য প্রস্তুত করা।

বস্তুত কুরআনে সন্নিবেশিত আল্লাহর প্রেরণা ও উজ্জীবনী শক্তি, জিহাদের কাহিনী, সামাজিক ব্যবস্থা, আইন-কানুন ও তত্ত্ব ও তথ্যের বিষয়ে যত কথাই আমরা বলেছি, সেসব কুরআনের আসল ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নয়, সেগুলো ইসলামের চূড়ান্ত অভিষ্ট নয়। মূলত আল্লাহর পথপ্রদর্শন দ্বারা মানুষের মনকে জাগ্রত করা এবং প্রত্যেক বস্তুগত ও নৈতিক উপায় উপকরণের সাহায্যে আল্লাহর পথপ্রদর্শনের পূর্ণতা সাধনই এসব বিষয় অবতারণার উদ্দেশ্য—যাতে করে মানুষের মনে আল্লাহর পথের জ্ঞান জীবন্ত ও অম্লান থাকে এবং সে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ) পানে এগিয়ে যেতে পারে।

তাই প্রত্যেক আয়াতে এ বিষয়টা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা এটা ছাড়া আয়াতের শিক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় এবং তার বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে যায়। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা এবং দলীল-প্রমাণ উল্লেখের ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু আমি নিবৃত্ত থাকছি। বুদ্ধিমান পাঠকের তীক্ষ্ণ মেধা ও ধীশক্তির ওপর এটা ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহর নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন মহিমান্বিত কুরআন দ্বারা আমাদের হৃদয়কে বসন্ত ঋতুর মত ফলে-ফুলে সুশোভিত, আমাদের যাবতীয় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে দূরীভূত এবং আমাদের দৃষ্টিকে উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ করে দেন। আল্লাহ আমাদের সরদার মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর অনুসারী ও সাহাবীদের ওপর সালাম ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

www.pathagar.com

২-সুন্নাহ্

পবিত্র কুরআনের পরেই সুন্নাহ্ বা হাদীস হলো দ্বীন ও দুনিয়ার জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। সুন্নাহ্ হলো একটি পূতঃপবিত্র নিষ্পাপ হৃদয়ের সৌরভ। সুন্নাহ হলো সেই শ্রেষ্ঠতম বিবেকের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার পরিপূর্ণ নির্যাস—যে বিবেক কুরআন, বিশ্বপ্রকৃতিতে বিরাজমান নিদর্শনাবলী, সমাজবদ্ধ জীবনের শ্বাশত রীতিনীতি, মানব মনের রোগব্যাধি, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিগত জীবনের সমস্যাবলী ও তার সংস্কারের বিবিধ পন্থাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিল। তাই যখনই কেউ উচ্চারণ করবে ঃ "রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন" অমনি কান খাড়া করুন তা শোনার জন্য এবং সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তিক ও অনুভূতি শক্তিকে তা বুঝার কাজে নিয়োজিত করুন। কেননা এক্ষুণি আপনি যে কথা শুনবেন, তার মত সত্য কথা, উপকারী কথা ও পবিত্র কথা আর কোন মানুষ কখনো বলেনি। এদিক থেকে সে কথা এমন এক অমূল্য রত্ন যে, সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ায় বিদ্যমান সকল ধন-সম্পদ তার সামনে নগণ্য ও তুচ্ছ। সে কথা এমন দুষ্প্রাপ্য সম্পদ যে তা একাধারে বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও বাস্তব —সকল বিচারেই অতুলনীয়, প্রত্যেক গবেষকই তা থেকে ঈপ্সিত সর্বোত্তম ফায়দা লাভ করে আপন পিপাসা নিবৃত করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। কেননা সুন্নাহ তথা হাদীস শাস্ত্রে ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে অংশীদার হয়েও এ যুগের অনেকে এ বিষয়টি লক্ষ্য করেন না। সে বিষয়টা হচ্ছে এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের যে ইতিহাস আমরা সুন্নাহ্ বা হাদীসে পাই তা স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাসের মত নয়। তার জীবনী ও অন্যান্য বড় বড় নেতা ও মনিষীদের জীবনীর মত নয়। অন্যান্য নেতা ও মনিষীর জীবনেতিহাস হলো সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে তাদের নিজস্ব মন-মগজ প্রসূত কার্যকলাপ ও দিকনির্দেশনার যে প্রভাব পড়ে তারই ইতিহাস। কিন্তু রসূলের (সা) জীবনেতিহাস হলো স্বয়ং আল্লাহরই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তৎপরতার কার্যবিবরণী। আল্লাহ্ তাঁর সেই তৎপরতাকে তাঁরই একনিষ্ঠ অনুগত এক বান্দার (রসূলের) হাতে কার্যকর করেন। এসব কাজে ঐ বান্দার নিজস্ব কোন ভূমিকা থাকে না। তিনি যে কথাই বলেন, তা তার মনগড়া কথা নয়। তিনি তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা যে কাজই করেন, তা তাঁর নয়–বরং আল্লাহই কৃতকর্ম।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, রসূলের (সা) কর্মময় জীবনের ইতিহাস মানবজাতির অন্য সকল যুগের প্রচলিত ইতিহাস

www.pathagar.com

থেকে আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী। প্রচলিত ইতিহাস মানুষের ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত ও জাতিগত কর্মকাণ্ডেরই সমাবেশ মাত্র এবং সাধারণ মানুষই তার স্রষ্টা। কিন্তু নবী জীবনের ইতিহাস এমন কতকগুলো উপাদান ও বৈশিষ্ট দ্বারা নির্মিত, যা আমাদের সাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতার ফসল নয়, বরং তার চেয়ে অনেক উর্ধের জিনিস। তাই এ ইতিহাসকে অন্যান্য মানবীয় ইতিহাসের মত পড়া মারাত্মক ভুল। এ ধরনের অধ্যয়নের ভিত্তি অত্যন্ত নড়বড়ে ও ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। এমনকি তার আদৌ কোন ভিত্তি না থাকাও বিচিত্র নয়। কেননা উক্ত দুই ধরনের ইতিহাসের উপাদানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা মূল সত্যেরই অপলাপ মাত্র। এটা যেমন অযৌক্তিক ও নিবুর্দ্ধিতামূলক, তেমনি তা থেকে কোন সুষ্ঠু ফল লাভও অসম্ভব। এ অধ্যয়ন ভ্রান্ত এই জন্য যে, এর দ্বারা যখন অসত্য ও অবাস্তব ফল অর্জিত হবে, তখন তা আমাদেরকে শক্তি, কল্যাণ ও জ্ঞানের প্রকৃত উৎস থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করবে, আর আমাদেরকে সেই সত্যনিষ্ঠার নীতি থেকেই পথভ্রষ্ট করবে যা ঈমানের দুর্বার আগ্রহে ও প্রত্যয়ের দৃঢ় সংকল্পে অনুকূল সাড়া দিয়ে মনকে ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত করে। বলা বাহুল্য, প্রথাসিদ্ধভাবে আমরা যে ধরনের যুক্তি প্রয়োগে অভ্যস্ত কিংবা যে ধরনের নীতি-নিয়ম দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত, তা সেভাবে মনকে ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত করে না। ইতিহাসের ও নবী জীবনের এরূপ ভ্রান্ত অধ্যয়ন আমাদেরকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চালিত করবে। অথচ শক্তি, কল্যাণ ও জ্ঞানের প্রকৃত উৎসের ঘনিষ্ঠতা লাভ এবং সত্যনিষ্ঠ নীতি অবলম্বনে মনকে ঈমানী আলোয় সমুজ্জ্বল করাই হলো সমগ্র নবী জীবনের সারশিক্ষা এবং এটাই প্রকৃত সত্যের কেন্দ্রবিন্দু।

বস্তুত অনেকে নবী জীবনের ইতিহাসকে নিছক এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পড়ে থাকেন যে, তা একটা অসাধারণ সংগ্রামের ফল, একজন বলিষ্ঠ জনকল্যাণ-কামী, শান্তি প্রিয়, ন্যায়বাদী, স্বাধীনতাকামী ও সাম্যবাদী মহাত্মার কার্যধারা —যিনি এসব মহৎ আদর্শকে সমাজে এমনভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, যে যুগ যুগ ধরে তা অনাগত মানব বংশধরকে প্রভাবিত ও উজ্জীবিত করতে থাকবে। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গী রসূলের (সা) প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ এবং তাঁর জীবনের আসল উদ্দেশ্য ও চালিকাশক্তি নিরূপণে ব্যর্থ। রসূলের মন-মগজে ও শীরা-উপশীরায় যে মহাসত্যের জাজ্জ্বল্যমান প্রবাহ দৃশ্যমান, যে মহাসত্য সকল জিনিসের পর্যবেক্ষণে তাঁকে এক অনন্য যুক্তি সরবরাহ করতো, যে মহাসত্য তাঁর চেতনা ও প্রজ্ঞাকে অতুলনীয় বিজ্ঞানময়, সুগভীর ও সূক্ষ্ম আচরণ বিধি শিখিয়েছেন, সেই মহাসত্য ঐ দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। বস্তুত তাঁর প্রতিটি চালচলন ও কার্যকলাপ—যা সাধারণ মানুষের চোখে তাঁকে কখনো মহান, কখনো সাধারণ মানুষ রূপে চিহ্নিত করতো—তা আল্লাহর প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীতেই সম্পন্ন হতো। ফলে সব ব্যাপারেই তাঁর পদক্ষেপ হতো সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। আর এসব কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁর এমন এক তেজস্বী ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বা ভাবমূর্তি ফুটে উঠতো, যার সামনে অত্যন্ত বিরল ও অনন্য সাধারণ শক্তিমানদের ক্ষমতা ও প্রতিভাত ম্লান হয়ে যেত।

২—আল্লাহর বান্দা হিসেবে তাঁর স্থান

আল্লাহর বান্দা বা গোলাম হওয়ার ব্যাপারটা সচরাচর এমনভাবে আলোচিত হয়ে থাকে যে, সাধারণ মানুষের মনে এর সম্পর্কে অত্যন্ত অস্পষ্ট অথবা খুবই হীন ধারণা জন্মে অথবা কথাটার প্রতি আমরা তেমন ভ্রূক্ষেপই করি না। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সা) বেলায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তিনি তাঁর যুক্তি ও প্রজ্ঞা উভয়ের দৃষ্টিতেই একজন নিরেট আজ্ঞাবহ দাস বা গোলাম ছিলেন। দাসত্ব বা গোলামীর যাবতীয় বৈশিষ্টই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এটা ছিল তার সমগ্র সত্তায় দিবালোকের মত স্বচ্ছ সত্য এবং তার সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই গোলামীর অনুভূতিই তাঁর মধ্যে অতি উচ্চমানের মর্যাদাবোধ ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি জন্মালেও তা তাঁকে মূঢ়তা ও অহংকার থেকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছিল। একজন ভৃত্য তার মনিবের মালিকানার আওতাধীন কর্মরত থাকাকালে যে রূপ দাসত্বের অনুভূতি রাখে, সে যেরূপ উপলব্ধি করে যে, মনিবের অন্য কোন দাসের ওপর তার মনিবের নির্দেশ পৌছে দেয়ার অতিরিক্ত কোন কর্তৃত্ব নেই, ঠিক তেমনিভাবে তিনি নিজেকে 'আবদুল্লাহ' বা আল্লাহর বান্দা বলে অনুভব করতেন। এ অনুভূতি তাঁর মনে পরিপূর্ণরূপে স্পষ্ট ছিল। এ অনুভূতি তাকে অনেক বিপদের মুখে ঠেলে দিত। তথাপি তিনি বিচলিত হতেন না। আবার তা যখন তাকে বিজয় মাল্য পরাতো তখনও তিনি বিন্দুমাত্র গর্বিত হতেন না এবং শোকর ও বিনয়ের সীমা অতিক্রম করতনে না। যখন তিনি সম্মানিত ও প্রশংসিত হতেন, তখনও ঐ অনুভূতি তাকে অন্য মানুষের সাথে একই কাতারে দাঁড় করিয়ে রাখতো। রাজা-বাদশাদের মত তাজীম তিনি গ্রহণ করতেন না। অন্য নবীদের চেয়ে তাকে অনেক বেশী মর্যাদা দেয়া হোক, তা পসন্দ করতেন না এবং এমন বাড়াবাড়ি হতে দিতেন না, যা তাকে আল্লাহর মর্যাদার সম আসনে অধিষ্ঠিত করে। এই ছিল তার আদব, সুশীল আচরণ, তার নম্রতা, বিনয়, সত্যবাদিতা, বলিষ্ঠতা ও তেজস্বীতা। তিনি বুদ্ধিমত্তার গুণে অলংকৃত এবং মূর্খতা ও কুসংস্কারের দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন। আচরণ বিধিকে তিনি নিরেট স্বাভাবিকতার দাবীর ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি সর্বোচ্চমানের পরিশীলিত মানসিক ও সামাজিক আচরণের গুণে গুণান্বিত ছিলেন। মূলত আল্লাহর বান্দা হওয়ার অনুভূতি তার এই গুণাবলীকে আরো বেশী উৎকর্ষ ও পূর্ণতা দান করেছিল মাত্র।

www.pathagar.com

রসূলের (সা) জীবনী অধ্যয়নকালে এ সত্যকে যদি মনে জাগরুক না রাখা হয় তাহলে আমরা যে ইতিহাস পড়বো তা সঠিকভাবে বুঝতেই পারবো না এবং তা থেকে যথার্থ শিক্ষা, প্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করতে পারবো না।

৩—আল্লাহর রসূল বা দূত হিসেবে তাঁর স্থান

'রসূলুল্লাহ' শব্দটা ব্যাপকভাবে এবং সকল যুগের মুসলমানদের মুখে বহুল উচ্চারিত। এভাবে এটা একটা পরিভাষায় পরিণত হওয়ায় এর প্রকৃত মর্মার্থ যথার্থ গুরুত্ব ও স্পষ্টতা নিয়ে আমাদের মনে উপস্থিত নেই। অথবা বলা চলে যে, তা একটা নিশ্চল ও নির্বাক খোদাইকৃত লিখনে পরিণত হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, একটি বারংবার জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত এবং অপরটি বারংবার হাত দ্বারা সঞ্চালিত হয়। এই শব্দটির অর্থের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছাড়াই তার উচ্চারণ ও সঞ্চালন অব্যাহত থাকে।

একজন ভারসাম্যপূর্ণ মনোনিবিষ্ট গবেষক যখন ধীর স্থীরভাবে রসূলের (সা) বিভিন্ন রকমের কাজ ও কথা পর্যালোচনা করে, তখন সে তাঁর রিসালাতের সত্যতার স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ ও পেশ করতে পারে। এ ধরনের গভীর পর্যালোচনা তাকে অনিবার্যভাবে রসূলের প্রত্যেক কথা ও কাজের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে। এই ঐক্য ও সমন্বয় সম্পন্ন হলে তাঁর সকল বিক্ষিপ্ত কথা ও কাজকে একই লক্ষ্যের অভিসারী এবং একই খাতে প্রবাহিত দেখতে পাওয়া যাবে। আরো দেখা যাবে, এই সকল কথা ও কাজের মধ্যে চেতনা, অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার এক সুগভীর ঐক্য ও মিল বিদ্যমান। সে প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি যে একজন স্বেচ্ছাচারী মানুষের নয়, কিংবা আপন খেয়ালে বা হুজুগে তাড়িত মানুষেরও নয়, বরং একজন 'প্রেরিত' মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞাই যে তার সর্বত্র সুসমন্বিত রূপে বিরাজমান, তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হবে। বস্তুত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন সর্বপ্রথম আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান ও তার প্রচার কার্যে নিয়োজিত হওয়ার আদেশ পান, সেদিন থেকেই তিনি 'রসূল' (দূত) শব্দটির এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আপন চেতনায় বদ্ধমূল করে নেন। তারপর থেকে তার চেতনা ও মন-মগজ থেকে এ অনুভূতি এক মুহূর্তের জন্যও দূরীভূত হয়নি যে, তিনি একজন 'রসূল' আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্দেশ মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বই তাকে অর্পণ করা হয়েছে। 'রসূল' শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণের পর এই পদের যতগুলো বৈশিষ্ট ও লক্ষণ জানা যায়, তার সবগুলোর পরিপূর্ণ সমাবেশ সহকারেই তিনি সকল সময় ও সর্বাবস্থায় 'আল্লাহর রসূল'। রিসালাতের সকল দাবী বাস্তবায়ন এবং সকল গোপন ও প্রকাশ্য শর্ত পূরণ করেই তাকে আল্লাহর রসূল হয়ে থাকতে হয়। তাঁর দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত এবং তাঁর মুখ থেকে এমন কোন কথা

www.pathagar.com

উচ্চারিত হতে পারে না, যার মূলে রিসালাতের এই মর্মার্থ সক্রিয় নেই এবং যার ওপর এই মর্মার্থের ছাপ অংকিত নেই। সুতরাং তিনি 'রসূল' এই অর্থেই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ বাণী বা বার্তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিতেই তিনি আদিষ্ট। কাজেই সেই বার্তা পৌঁছে দেয়া ছাড়া তার আর কোন দায়িত্ব নেই। সেই বার্তার একটি শব্দও কমানো বা বাড়ানোর আদৌ কোন এখতিয়ার তার নেই। রসূল হিসেবে তাঁর কোন ভূমিকা যদি প্রশংসা বা সম্মান লাভের যোগ্য বলে মনে হয়, তাহলে যুক্তির দাবী এই যে, সেই সম্মান ও প্রশংসা সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করতে হবে। কেননা তিনিই তাঁকে অনুগ্রহ পূর্বক 'রসূল' পদে অভিষিক্ত করেছেন। এই পদে থাকা অবস্থায় রসূল যে ভূমিকাই পালন করেন, তাঁর কোন কিছুর কৃতিত্ব দাবী করা তাঁর সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক মহত্বের সাথে খাপ খাবে না। এমন কি অন্য কেউ তাঁকে সেই কৃতিত্ব দিতে চাইলেও তা গ্রহণ করা তার পক্ষে শোভন হবে না। এই জন্যই রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর যে কোন সদগুণ বা সৎকর্মের কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করতেন। রসূল হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ছাড়া নিজের আর কোন করণীয় তিনি দাবী বা স্বীকার করতেন না।

নিজের মধ্যে কোন গুণ বা কৃতিত্ব কার্যত না থাকা সত্ত্বেও যারা তার মিথ্যা ও কৃত্রিম দাবীদার সাজে, তাদের একটা চিরাচরিত স্বভাব এই যে, তারা মাঝে মাঝে ভুল করে বসে। ফলে যে জিনিস থেকে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে, সে জিনিসই তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের অধিকাংশ কথা ও কাজে কৃত্রিমভাবে নিজেদের যে চরিত্রের ধারণা তারা দেয় তা ম্লান হয়ে যায়। এভাবে তাদের দাবী ও বাস্তবতার মধ্যে বৈপরিত্য ও বৈসাদৃশ্য ধরাপড়ে এবং তাদের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকা তাঁর কথা ও কাজে সর্বদা একই থাকে। তাঁর প্রত্যেক কাজ এবং কথা একই মৌলিক চেতনা থেকে উৎসারিত এবং সে চেতনা হলো এই যে, তিনি আল্লাহর রসূল বা দূত।

রসূলের (সা) জীবনেতিহাসে তাঁর এই দূত হওয়ার অভ্রান্ত চেতনাই যখন তাঁর রিসালাতের সত্যতার অকাট্য প্রমাণবাহী, তখন সেটা আমাদের কাছে নির্ভুল পথনির্দেশ লাভ এবং দায়িত্ব অনুধাবনের সহায়ক। এ দ্বারা আমাদের চলার পথ স্পষ্ট হবে এবং আমাদের গন্তব্য চিহ্নিতকারী ফলকগুলো আমাদের দৃষ্টিপথে সমুজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হবে। ফলে আর কোন ভুল বুঝাবুঝি, পথচ্যুতি বা শৈথিল্য ও উদাসীনতা আমাদের দায়িত্ব পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। একমাত্র এ পথেই প্রকৃত সত্যের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, যথার্থ

www.pathagar.com

গুণধরের গুণের স্বীকৃতি এবং কৃতিত্বের অধিকারী না হয়েও যারা কৃতিত্বের প্রশংসা লাভের অভিলাসী, তাদের খপ্পর থেকে সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব।

নবী জীবনের ইতিহাস পড়ার সময় এই তত্ত্ব ও তাৎপর্যকে অবহেলা করা হলে আমরা সে জীবনের খোলস ছাড়া আর কিছু পাবো না। আর এই খোলস দ্বারা কারো মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করা, কারো মধ্যে প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করা এবং কারো উদ্যম ও সাহস উজ্জীবিত করা সম্ভব নয়।

৪—রসূলের (সা) চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞার ঔজ্জ্বল্য

উপরে যে আলোচনা করেছি তার অর্থ এ নয় যে, রসূল (সা) আদৌ কোন স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী ছিলেন না কিংবা বিবেক ও চরিত্রগত কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল না। এরূপ ধারণা করার কোন ভিত্তি নেই। হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তাঁর চরিত্র কেমন ছিল ? এর জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ **"কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।"**

আর আমরা জানি যে, কুরআন হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার মহৎ নৈতিক গুণাবলীর উৎস এবং ন্যায় বিচার, বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস, আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য আর বিবিধ রকমের আচার-আচরণ ও লেন-দেনের পূর্ণাঙ্গ বিধান।

আপন বুদ্ধিমত্তার অগ্রগণ্যতায়, স্বভাবের সুষ্ঠুতা ও বিশুদ্ধতায়, নিরেট সত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর মেজাজ ও প্রকৃতির ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে এবং তাঁর প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ পদ্ধতির নির্মলতায় রসূল (সা) ছিলেন এক অতুলনীয় মহামানব। আল্লাহ নিজস্ব পর্যবেক্ষণের অধীনে তাঁকে কুরআনে চিত্রিত আদর্শ মানবের পূর্ণতম নমুনা হিসেবে সৃষ্টি করেন। তাই চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব, মেজাজ ও স্বভাবের নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা, গোপনীয় বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টির দখল, স্থিরতা ও সহিষ্ণুতা, সংকল্পের দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণতা ও অনমনীয়তা, সত্য ও ন্যায়নীতি সংক্রান্ত মূল্যবোধের যথার্থ বাছবিচার এবং আল্লাহর নিকট বিবেক ও আত্মার তৃপ্তিদায়ক যে অপার্থিব সম্পদ সম্ভার রয়েছে, তার স্বাদ গ্রহণের উপযুক্ত মৌলিক অভিরুচী ইত্যাকার মহৎ গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহ তাঁকে পরিপূর্ণ মাত্রায় অলংকৃত করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে যে শ্রেষ্ঠতম মান, দৃষ্টান্ত ও ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়েছে, তার সাথে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল এক পূর্ণাঙ্গ নমুনা হিসেবে আল্লাহ তাঁকে তৈরী করেছিলেন। মানবজাতির মধ্যে তিনিই ছিলেন কুরআনের মানে উত্তীর্ণ সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ। কুরআন থেকে শিক্ষাগ্রহণ, কুরআনের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব এবং গোপনে, প্রকাশ্যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলে তার

www.pathagar.com

সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার ব্যাপারে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তার জুড়ি নেই। সম্ভবত এ জন্যই আল্লাহ্ বলেছেন :

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

"আল্লাহ তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কোথায় রাখবেন সেটা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।"-(সূরা আল আনআম : ১২৪)

তাঁর নবুয়াত পূর্ব জীবনের ইতিবৃত্ত ও মহৎ গুণাবলীর বিবরণ পড়লেই বুঝা যাবে আমাদের উপরোক্ত উক্তি কত সত্য ও অভ্রান্ত। বস্তুত তিনি এমন কোন জমাট ও অচেতন পাত্র ছিলেন না যার মধ্যে রিসালাত ঢেলে দেয়া হয়েছে। বরং তিনি ছিলেন জন্মগতভাবে এক প্রাণবন্ত, সুবোধ, স্বাধীনচেতা, লক্ষ্য সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত ও যুক্তিসঙ্গত মতাদর্শের অনুসারী, বিবেকবান, সংবেদনশীল ও চরিত্রবান মহৎ পুরুষ।

কুরআনের প্রজ্ঞাময় শিক্ষা তাঁর এসব গুণ-বৈশিষ্টকে আরো বরকতময় করলো এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, মহৎ চরিত্র ও আল্লাহর অপার অনুগ্রহের উপঢৌকনে সমৃদ্ধ করলো। এর ফলে তাঁর অন্তরে ও বিবেকে 'রসূল' ও 'বান্দা' সুলভ দায়িত্ব ও মর্যাদার যে তাৎপর্য নির্ণিত হয়েছিল, সেটা হয়ে দাঁড়ালো একটা অতিরিক্ত বৈশিষ্ট। এ বৈশিষ্ট তাঁর পূর্ববর্তী গুণ-বৈশিষ্টের অবস্থান ও সীমা নির্দিষ্ট করে দিল। এটা তার বিবেক-বুদ্ধি ও আবেগ-অনুভূতি উভয়ের জন্য নিজ নিজ সমস্যাবলীর সমাধান ও মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের এলাকা নির্দিষ্ট করে দিল। এদিক থেকে বিচার করলে রসূল অর্থাৎ যে কোন নবী ও রসূল যে কোন ব্যাপারে অন্যান্য মানুষের চেয়ে পৃথক মত ও পথ অবলম্বন করে থাকেন। দুনিয়ার কোন মানুষের ইচ্ছা ও মর্জি অনুসারে চলতে তিনি বাধ্য নন। যে রাষ্ট্রদূত ভিন্ন দেশে নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁর পদ ও দায়িত্ব অনুসারে যে ধরনের বেশভূষা ধারণ তাঁর কর্তব্য, তাঁর সকল আচরণ ও চালচলনে তা তাঁকে ধারণ করতে হয়। তাঁর সকল কার্য সমাধা করতে এবং সকল সমস্যার নিরসন করতে তাঁকে নিজ জাতির মতামত এবং নিজ দেশের অনুসৃত নীতি অবলম্বন করতে হয়। নিজের স্বাধীন মতানুসারে তিনি কোন কাজ করতে পারেন না। তাঁর বিভিন্ন অবস্থা ও নানা রকমের জানা-অজানা স্বার্থের দাবী মেটানোর ব্যাপারে তাঁকে তাঁর নিজ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের আওতাধীন থাকতেই হয়। অথচ একথা সন্দেহাতীতরূপে সত্য যে, রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ-লাভের আগে তাঁকে তা চিন্তা ও আচরণে রাষ্ট্র আরোপিত কোন রকমের বস্তুগত বা তাত্ত্বিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হতো না। আবার তাঁর রাষ্ট্রদূত পদ বিলুপ্ত হওয়ার পরও তাঁকে কোন বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হবে না।

www.pathagar.com

এখানেই আল্লাহর দূত রসূলের (সা) সাথে মানবীয় রাষ্ট্রদূতের বিরাট পার্থক্য। রসূলের (সা) জন্মগত স্বভাব বা মেজাজ তাঁর কাছে নাযিল করা ওহীরই বাস্তব রূপ ছিল। তাই তাঁর অমনোপূত কোন কাজে তাকে বাধ্য করা হতো না বরং তাঁকে রিসালাতের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা তাঁর প্রবৃত্তি ও অভিরুচীর সাথে সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যশীল ছিল। আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে দৌত্যকর্ম পরিচালনার জন্য তাঁকে বিভিন্ন কার্য সমাধা করতে যে বিশেষ নীতি ও কৌশল অবলম্বন করতে হতো, সেটা ছিল অন্যদের থেকে পৃথক তাঁর একটা ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট। এ বৈশিষ্ট তাঁকে চিন্তার প্রশস্ততার সেই সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়েছিল যেখান থেকে তিনি আপন লক্ষ্য ও গন্তব্যের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছার দাবী ও চাহিদা কি তাও জানতে পেরেছিলেন। অথচ এ সৌভাগ্য অন্য কারো হয়নি।

এর একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রসূলের (সা) জীবনে আমরা দেখতে পাই। হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় রসূলের (সা) সঙ্গে এক হাজার চারশো সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। অথচ একমাত্র আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছাড়া প্রথম দিকে আর কেউ এই সন্ধিতে সম্মত হননি। বাদবাকী সাহাবীরা স্পষ্টত রসূলের (সা) মতের বিপক্ষে ছিলেন। এঁদের শীর্ষে ছিলেন ওমর বিন খাত্তাব (রা)। আবু বকরের (রা) মন্তব্য অনুসারে "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আল্লাহর মধ্যে এ ব্যাপারে যে সমঝোতা ও মতৈক্য ছিল, তাঁদের দৃষ্টি সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।"

বিশেষভাবে এই ঘটনা নিয়ে অনেক গবেষক চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। যে শান্তি ও সন্ধির আগ্রহ তিনি দেখিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার ওপর অবিচল ছিলেন, তারা তার প্রশংসা করেন, একে রসূলের (সা) মহানুভবতার প্রতীক বলে গণ্য করেন এবং এর কোন বিকল্প ছিল না বলে তারা অভিমত দেন। কিন্তু এসব বিচার-বিবেচনা সত্বেও তাঁরা এই সন্ধির প্রকৃত তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম। রসূলের (সা) জীবনেতিহাস অধ্যয়ন কালে আল্লাহর 'বান্দা' ও 'রসূল' হওয়ার অর্থ কি, তা যারা বোঝেন, তারা এই অক্ষমতার রহস্যও বোঝেন। আসলে যুদ্ধ বা শান্তি মৌলিক বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হলো, মানুষের জীবনে কিছু উচ্চতর মূল্যবোধ থাকা চাই। সেই মূল্যবোধই তার আশা-আকাংখার লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হওয়া চাই এবং তার দ্বারাই তার সকল তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এই মূল্যবোধ যদি তাকে শান্তি স্থাপনে অনুপ্রাণিত করে তবে তার তাই করা উচিত আর যদি তা তাকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে তবে তার যুদ্ধই করা উচিত। অনেক সময় যুদ্ধই মানবতার অধিকতর কল্যাণ সাধন করে। মানুষ যতক্ষণ তার প্রাণপ্রিয়

www.pathagar.com

মূল্যবোধের জন্য হাসিমুখে জীবন বিসর্জন দিতে অথবা তারই খাতিরে বেঁচে থাকতে প্রস্তুত হয়, ততক্ষণ সে কল্যাণের পথে থাকে। হোদাইবিয়ার দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই উচ্চতর মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের দিকেই নজর রেখেছিলেন।

এখানে আরেকটা জরুরী বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, যার প্রতি প্রত্যেক সীরাত পাঠকের মনোনিবেশ একান্ত প্রয়োজন। সেটা হলো রূহানী নিয়মবিধি এবং অদৃশ্য জগতের বরকত।

আল্লাহর নির্দেশ থেকেই রূহের আবির্ভাব। আর অদৃশ্য জগতের বরকত এমন বস্তু, যা কোন ফন্দি-ফিকির দ্বারা অর্জন করা যায় না। আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত যুক্তি দিয়ে তার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। বক্ষ্যমান আলোচনার প্রারম্ভে আমরা যেখানে বলেছি যে, "সত্যনিষ্ঠার নীতি ঈমানের দুর্বার আগ্রহে ও প্রত্যয়ের দৃঢ়সংকল্পে অনুকূল সাড়া দিয়ে মনকে যেভাবে ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত করে আমাদের অভ্যাস সুলভ যুক্তি কিংবা সচরাচর অনুসৃত নীতি সেভাবে উদ্ভাসিত করে না" সেখানে আমাদের উক্তি "সত্য নিষ্ঠার নীতি"র অর্থ হলো, অদৃশ্য বরকত ও রূহানী জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব। বস্তুত এটাই রিসালাতের তথা রসূলের জীবন ও ব্রতের সারকথা এবং সীরাতের মৌল শিক্ষা।

বস্তুত সমগ্র বিশ্বজগত বস্তু ও রূহেরই সমষ্টি। বস্তু থেকেই রূহের উদ্ভব। অতপর বস্তুর শক্তি-সামর্থ ও নিয়মবিধি রূহেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছে। মানুষও বস্তু রূহেরই সমষ্টি। তার রূহও বস্তু থেকেই উদ্ভূত। আর রূহই তার শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য এবং পৃথিবীতে তার ব্যতিক্রমী অবস্থানের মূল কারণ বা উৎস।

আপন সত্তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক তথা তার ভেতরকার বস্তু ও রূহের সাথে মানুষের সংযোগ স্থাপনই হচ্ছে তার সর্বোচ্চ মানের আদর্শ জীবনের নমুনা। এই সংযোগ দ্বারাই সে তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সত্তাকে পূর্ণতা দান করতে সক্ষম। আর ঐ সংযোগ ছাড়া তার সত্তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। হয়ে পড়ে অমঙ্গলজনক। কেননা সে ক্ষেত্রে মানুষের জীবন নিছক ইন্দ্রিয় নির্ভর ও বাহ্যিক অনুভূতি সর্বস্ব হয়ে পড়ে। তার সত্তার বৃহত্তর অংশ ও অধিকাংশ যোগ্যতা ও প্রতিভা থেকে সে বঞ্চিত থাকে। বরং যথার্থ মূল্যবোধের বিচারে সে তার সমগ্র সত্তাকেই হারিয়ে ফেলে।

www.pathagar.com

একমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক আদর্শ নমুনা। তিনি জীবনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গনে মানবীয় সত্তাকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সকল নিয়মবিধিকে এমন নিপুণ ও দক্ষ সমন্বয়ের মাধ্যমে তিনি গ্রহণ করেছিলেন যে, প্রাকৃতিক জগতের সকল নিয়ম ও রীতি তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর ইঙ্গিত সমর্থন ও সাফল্য তাঁর মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছিল, আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণ ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

প্রাকৃতিক জগতে বহু শক্তি সক্রিয় রয়েছে। সেই সব শক্তির সহায়তায় নিয়োজিত রয়েছে আরো কিছু সংখ্যক শক্তি এবং আইনবিধি। আমাদের জীবনে এই সকল শক্তির অনেক অবদান বহু শিক্ষামূলক কার্যকর প্রতীক ও নিদর্শন রয়েছে। আবার প্রকৃতির উর্ধের অর্থাৎ অদৃশ্য ও আধ্যাত্মিক জগতেও বহু শক্তি সক্রিয় রয়েছে। সেই সব শক্তির সহায়ক আরো বহু শক্তি, আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি রয়েছে। আর আমাদের জীবনে রয়েছে তার বহু বাস্তব প্রভাব, প্রতীক এবং অবদান এই উভয় ধরনের জগত স্বীয় স্বভাব প্রকৃতিতে, নিয়ম-রীতিতে এবং তার সামনে মানুষের সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপনের পন্থা ও পদ্ধতিতে পরস্পরের বিরোধী।

কিন্তু সম্ভবত মানুষ একমাত্র প্রাকৃতিক জগতের সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করেছে আর এই জগতের শক্তিসমূহের সাথেই আপন ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়ার সম্পদ গড়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে অন্য যে জগতটি রয়েছে, তার শক্তি ও নিয়ম-বিধির উপলব্ধি, সন্ধান লাভ এবং তার সাথে তার আচার-ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত। সেটা তারা বুঝতে তো পারেইনি। এমনকি বুঝবার সাহসও করেনি। এ জন্য এই ধরনের লোকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন তার প্রভাব ও অবদান দ্বারা সমৃদ্ধ অলংকৃত হতে পারেনি। আর পারেনি বলেই তাদের মনে এ জগতটার স্মৃতি পর্যন্ত স্থান পায় না। তাদের মধ্যে কোন আলোচনা হলে তাতে এ জগতটার বিপরীত ধ্যান-ধারণাই স্থান পায়। ভাবখানা এই যে, এ জগতটার যেন কোন অস্তিত্বই নেই। অথচ আসলে তা সম্পূর্ণ আন্দাজ-অনুমান ও অলীক কল্পনা প্রসূত ধারণা। এ ধারণা অদৃশ্য জগতকে উপলব্ধি করার অক্ষমতাই প্রকাশ করে মাত্র।

আমাদের বক্তব্য এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ক্ষেত্রে এক অনবদ্য ঐতিহাসিক নমুনা। তিনি বস্তুজগত ও অদৃশ্যজগত তথা রূহানী জগতের সাথে একই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। উভয়টিতেই নিজের উপস্থিতির প্রমাণ দিয়েছেন এবং উভয় জগতেই তিনি নিজের উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেছেন। উভয় জগতের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে

www.pathagar.com

তিনি আপন কর্তব্য স্থীর করেছেন। অদৃশ্য শক্তিসমূহের বিস্ময়কর কার্যনির্বাহ এবং রসূলের (সা) বাহ্যিক অবস্থার সাথে ঐ সকল শক্তির যোগাযোগ ও পরিচিতি এতটা ব্যাপক ছিল যে, তাঁর আভ্যন্তরীণ অবস্থাও তার আওতাধীন ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও সেটা আওতার বাইরে থাকতো না। তাঁর কাছে যে ওহী আসতো, তা প্রতিনিয়ত তাঁর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে পথনির্দেশ দিতে থাকতো এবং তার বস্তুগত উৎপাদনের প্রাচুর্য, শত্রুর ওপর বিজয়, তাঁর অবদানের স্থায়িত্ব, পৃথিবীতে তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর দায়-দায়িত্ব লঘু-করণ ও সকল বিষয়ে তার উদ্দেশ্যের সাফল্য নিশ্চিত করতে তাদের সকল গুণ-বৈশিষ্টও ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা নিয়োজিত থাকতো। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا○

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাঁর কাজ সহজ করে দেন।"
—(সূরা আত তালাক ঃ ৪)

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا○

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তার সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে কৃতসংকল্প। আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"—(সূরা আত তালাক ঃ ৩)

উপরে যে পাঁচটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও উপকরণের বর্ণনা দেয়া হলো, তার সবই হলো রসূলের (সা) একক বৈশিষ্ট, মানুষের সমাজে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতই ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া করতেন, বাজারেও চলাফেরা করতেন। তবে উক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট তাঁর ভেতরকার সত্তা ও জীবনকে অন্যান্য মানুষের আভ্যন্তরীণ ও গোপন সত্তার চেয়ে অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন করে তুলেছিল। তাঁর চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে অদৃশ্য তত্ত্ব ও আল্লাহর ইচ্ছার সাথে একাত্ম ও একাকার করে দিয়েছিল। সুতরাং আমরা যদি রসূলের (সা) জীবনী থেকে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে ইচ্ছুক হই, তাহলে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, তাঁর সেই মহৎ জীবন যা আমরা ওহী নাযিলের পরে বিকাশমান দেখতে পাই—তা আসলে আল্লাহ কর্তৃক তাঁকে নবী হিসেবে মনোনয়ন ও নবুয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করণের ফল স্বরূপ তাঁর মধ্যে বিকশিত পাঁচটি চারিত্রিক বৈশিষ্টের সমাবেশেই সৃষ্ট। বস্তুত উক্ত সত্যকে মনে রেখে সীরাত পড়া-ই সীরাত থেকে উপকার লাভের সঠিক ও সুষ্ঠু উপায়।

www.pathagar.com

উক্ত পাঁচটি বৈশিষ্টের কোন্‌টার কতটুকু প্রভাব রসূলের (সা) জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। তার সবিস্তার বিবরণ দেয়া আমাদের পক্ষে আপাতত সম্ভব নয়। ঐ মহান জীবনে আপন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে কিভাবে তিনি ঐ পাঁচটি গুণ-বৈশিষ্টের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত পেশ করারও অবকাশ এখানে নেই।

তবে প্রত্যেক সীরাত পাঠককে একথা মন-মগজে বদ্ধমূল রেখেই তা পাঠ করতে হবে যে, সে সীরাত গ্রন্থে যা কিছু পড়ছে তা একমাত্র ঐ পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের ফসল। তাহলে অচিরেই তার সামনে সেই অনুপম সীরাতের অভিনব ও অলৌকিক ঘটনাবলী স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। একমাত্র তখনই আমরা একথা প্রমাণ করতে পারবো যে, সাধারণ ইতিহাস ও তার নায়কদের জীবনীর মত করে রসূলের সীরাত পাঠ করার দোষ থেকে আমরা আমাদের বিবেককে ও সীরাতকে মুক্ত করতে পেরেছি। রসূলের সুন্নাহর এই রূহানী পরিমণ্ডল এমন সব শিক্ষা ও ঘটনায় পরিপূর্ণ—যা সরাসরি মানুষের মন ও আকিদাকে সম্বোধন করে এবং শুধুমাত্র বস্তুকেন্দ্রিক নীতিমালার আজ্ঞাবহ বস্তুসর্বস্ব বুদ্ধিকে তা মোটেই গুরুত্ব দেয় না। এ জন্যই আধুনিক গবেষক, শিক্ষক ও অধ্যাপকগণকে দেখা যায়, তারা যখন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে ফেরেশতাদের লড়াই করা এবং রসূল (সা) কর্তৃক ধূলি নিক্ষেপ করে মোশরেকদের চোখ কানা করে দেয়া এবং ইত্যাকার অন্যান্য ঘটনা পড়েন, তখন মনে হয় যেন তারা এসব ঘটনাকে তাদের বস্তুবাদী যুক্তির আলোকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারছেন না। আসলে এগুলো ছিল আল্লাহর সেই অপ্রতিরোধ্য পদক্ষেপসমূহের অন্যতম, যা বস্তু ও অবস্তু নির্বিশেষে সবকিছুর ওপর পরাক্রান্ত। আমার মতে, তারা এসব ঘটনাকে এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যান যেন তার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেন না এবং মনে মনে অস্বীকার করেন। আপনার ভূমিকা এ থেকে ভিন্নতর হওয়া উচিত। তাই সবসময় রসূলের (সা) জীবনের ঘটনাবলীতে দু' ধরনের উপাদান সন্ধান করতে থাকুন। প্রথমত, প্রত্যক্ষ আল্লাহর উপাদানসমূহ, দ্বিতীয়ত, রসূলের (সা) ব্যক্তিগত রূহানী উপাদানসমূহ। এই শেষোক্ত উপাদানগুলোতে যদিও রসূলের (সা) ব্যক্তিগত ছাপ বিদ্যমান, কেননা তা একান্তভাবে তাঁরই মানসিক প্রেরণা থেকে উদ্ভূত, তথাপি তাও আল্লাহর উপাদানই বটে। কেননা রসূলের (সা) আবেগ অনুভূতি সবসময় আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বজায় রেখে চলতো। কাজেই প্রথমোক্ত উপাদানগুলো প্রত্যক্ষভাবে এবং শেষোক্ত উপাদানগুলো পরোক্ষভাবে আল্লাহর উপাদান। শেষোক্তগুলোর আল্লাহর উপাদান হওয়ার ব্যাপারটা শুধুমাত্র আল্লাহর আলোকে উদ্ভাসিত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী লোকদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণেই

www.pathagar.com

ধরা পড়ে। পাঠক যাতে আমাদের বর্ণিত এই নিগুঢ় তত্ত্বের আলোকে নবী জীবনের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন সে জন্যই প্রথমটির উল্লেখ করলাম। আর দ্বিতীয়টি উল্লেখ করলাম আপনাকে একথা কার্যকরভাবে অবগত করার উদ্দেশ্যে যে, যে ব্যক্তি নিছক পেটের তাগিদে নয়, কিংবা তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জৈব তাড়নাতেও নয়—বরং একমাত্র আল্লাহর রূহানী আবেগ ও প্রেরণার দাবী অনুসারে জীবন ধারণ করে, আপন প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর ভিত্তিতে নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের ভিত্তিতে সকল কাজ সম্পাদন করে এবং নিজের ব্যক্তিগত ঝোঁক ও আকর্ষণের বশবর্তী হয়ে নয় বরং সত্যের জন্য ও সত্যের পথে জিহাদ করে, সে ব্যক্তির ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। ফলে সে আসমান ও জমীনে আল্লাহর যে অগণিত গোপন ও প্রকাশ্য সৈনিক রয়েছে, তাদের সমর্থন ও আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়ে নিশ্চিতভাবে জয় লাভ করবে। এ বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। কেননা রসূলের (সা) জীবনের যেসব আদর্শগত তত্ত্ব বাস্তব ঘটনার আকারে মূর্ত হয়ে উঠেছে বলে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করা যায়, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় লাভ তাঁর মধ্যে অন্যতম। আসুন, আমরাও এই সৈনিকদের সাহায্য দ্বারা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলার আগ্রহে উজ্জীবিত হই। বিপথগামী মূর্খ ও আহম্মকদের মত আল্লাহর সাহায্যের প্রতি অনীহা ও অবজ্ঞা পোষণ করার দুর্মতী যেন আমাদের কখনো না হয়।

প্রিয় দ্বীনী ভাই ! সীমাহীন কল্যাণের ভাণ্ডার আপনার সামনেই বিদ্যমান। শুধু হাত বাড়াতে যা বাকী, আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণায় উজ্জীবিত হাত বাড়ালেই তা পাবেন। নবী জীবনের কার্যকলাপের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এটাই। তাঁর কথাবার্তা সম্পর্কেও আমাদের একই অভিমত। কেননা তাঁর কথা অন্যান্য মানুষের কথার মত নয়। তিনি যখন বলেন যে, যে মজলিসে আল্লাহর বিষয় আলোচিত হয়, ফেরেশতারা সে মজলিসকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখেন, তখন বিশ্বাস করুন, এ একটা পরম সত্য ভাষণ। এতে কোন রূপক বা দ্ব্যর্থবোধক কথার মিশ্রণ নেই। কেননা তিনি নিশ্চিতভাবে জানে না এমন কথাই বলেছেন। অন্যদের অজানা অনেক রহস্য যে তাঁর জানা ছিল, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তিনি বলেছেন যে, কোন মু'মিন তার অন্য মু'মিন ভাই এর কল্যাণার্থে দোয়া করলে ফেরেশতারা বলেন ঃ আল্লাহ কবুল করুন, আর তুমি যা তোমার ভাই এর জন্য চেয়েছ, অনুরূপ জিনিস তোমাকেও দান করুন। সুতরাং এ ধরনের দোয়া যে কবুল না হয়ে পারে না, সেটা ধ্রুব সত্য। আর যখন তিনি কোন কাজের প্রতিদানের ওয়াদা করেন, কোন অজানা রহস্য বা তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেন, অথবা কোন উপদেশ দেন, তখন তা এক সন্দেহাতীত অকাট্য সত্য।

www.pathagar.com

রসূলের (সা) সুন্নাহ বা হাদীসকে এভাবে অধ্যয়ন করলে ইসলামকে এবং তার নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যকে ঠিক সাহাবাদের মত বা প্রায় তাদের মত বুঝতে পারবো। তখন কুরআনের দাওয়াত দ্বারা মানুষকে সুপথ প্রদর্শনের যোগ্যতা আপনি অর্জন করতে পারবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রসূল সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুসরণের যোগ্যতা দান করুন।

---

www.pathagar.com

৩-ইতিহাস ও মনীষীদের জীবনী

দাওয়াতকারীর চরম লক্ষ্য এ হওয়া চাই না যে, সে একজন শিক্ষকের মত ইতিহাসের কেবল পুঁথিগত তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যস্ত করবে অতপর তা তার ছাত্রদের সামনে তুলে ধরবে।

দাওয়াতকারীর উদ্দেশ্য এও হওয়া চাই না যে, সে কেবল রসিকতা করবে। কেবল সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেয়া এবং অক্লান্তভাবে সময় কাটানোর জন্য কাহিনী শোনাবে। আমরা অনেককে দেখতে পাই, এ তুচ্ছ পন্থাই অনুসরণ করে এবং কোন সংযোগ ও সম্বন্ধ ছাড়াই উদ্দেশ্যহীনভাবে কেবল কাহিনীর পর কাহিনী বলতে থাকে।

দাওয়াতকারীকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস পড়তে হবে যে, তা মানুষের ভুল ও নির্ভুল কাজ এবং সুপথ ও বিপথ চারিতার তথ্য ভাণ্ডার। আর এ সবের পরিণতিতে তার যে মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটেছে, ইতিহাস তারও সংরক্ষিত রেকর্ড। এসব তথ্য থেকে তাকে নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রহণ করাই তার কাজ। এ ক্ষেত্রে কুরআন কি পন্থা অবলম্বন করেছে তা লক্ষ্য করেছেন কি ? কুরআনের অবলম্বিত এই পদ্ধতিই আমাদের অভিষ্ট বিষয়।

বস্তুত শুধুমাত্র অতীত মানবগোষ্ঠীসমূহের অবস্থা জানাই কুরআনের ইতিহাস ও কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য নয়। এর আসল ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবতার এমন সুষ্ঠু যত্ন নেয়া যাতে মানুষের সহজাত মৌলিক ও স্থায়ী মেজাজ, প্রবণতা এবং জ্ঞানের মানের যথাযথ যাচাই ও তদারক সাধিত হয়। এই যত্ন ও সেবার খাতিরেই তার জন্মগত স্বভাব মেজাজ ও জ্ঞানের মানের ইতিহাস, তার অবদান ও তার কৃতকর্মের ফল স্বরূপ অর্জিত মঙ্গল ও অমঙ্গলের বর্ণনা দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে যে স্বভাব প্রবণতা ক্ষণস্থায়ী এবং যে মেজাজ পরিবর্তনশীল, কুরআন তার ইতিহাস বর্ণনা করে না। কেননা স্থান ও কালের পরিবর্তনে তা ও তার প্রভাব লোপ পায়। কুরআন একটি চিরস্থায়ী ও শাশ্বত গ্রন্থ। কাজেই মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধির চিরস্থায়ী মান এবং তাঁর স্বভাব ও মেজাজের মৌলিক ও শাশ্বত কার্যধারার ওপরই সে তার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ভিত্তি গড়ে। স্বভাব ও মেজাজের এই চিরন্তন কার্যধারা এবং জ্ঞান ও বিচার-বিবেচনার এই শাশ্বত মান মানবজাতির মধ্য থেকে এমন একটি গোষ্ঠীর পত্তন করে, যা বুনিয়াদী গঠন প্রকৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক রূপ কাঠামোর দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সমভাবাপন্ন। একথা সন্দেহাতীত রূপে সত্য যে, মানবজাতির মধ্যে এই

www.pathagar.com

মৌলিক স্বভাব, সহজাত প্রবণতা ও জ্ঞানের মান মূলত একই স্তরের হলেও পরিস্থিতি ও পরিবেশের বিভিন্নতায় তা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। আর বিবেক-বুদ্ধির কোন কোন বৈশিষ্ট তার কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এর বিভিন্নতা এবং বাহ্যিকরূপ ও লক্ষণের ব্যবধান সত্ত্বেও আপনার পক্ষে দৃশ্যমান কার্যধারা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, তাকে তার মূল চালিকা শক্তির মানদণ্ডে বিচার করা এবং তার মূল প্রেরণাদায়ক শক্তির সাথে সংযুক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভব।

বস্তুত কুরআন যেখানে কোন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয় ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি উল্লেখ করে, সেখানে সে শুধু ঘটনার শিক্ষণীয় বিষয়ের ওপরই আপন দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে। যেমন তালুত ও জালুতের যুদ্ধের ব্যাপারে কুরআন নিছক ঐতিহাসিক বর্ণনা দেয় না এবং সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের পূর্ণ ছবি পাঠকের মানসপটে চিত্রিত করার প্রয়াস পায় না। কেননা বাহ্যিক রূপ কাঠামো তার কাছে বড় কথা নয়। সে শুধু পাঠককে এই ধারণাটা দিয়েই ক্ষ্যান্ত থাকে যে, সেখানে একটা মুষ্টিমেয় দল আল্লাহর পথে লড়াইতে ব্যাপৃত ছিল আর অপর দলটি ছিল কাফেরদের দল এবং তার সৈন্য সংখ্যা ছিল বিপুল। কিন্তু আল্লাহ মু'মিনদের দলকে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। ফলে তারা বিজয়ী হয়। ঘটনাটা সূরা বাকারার ২৪৬ থেকে ২৫২ আয়াত পড়ে দেখুন। দেখবেন, পুরো ঘটনাটা ঈমানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ঈমান যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম যোদ্ধাদেরকে দৈহিক তেজস্বীতা ও অদম্য মনোবল দিয়ে টিকে থাকতে এবং আল্লাহর সাহায্য আনিয়ে দিয়ে বিজয়ী হতে কিরূপ ভূমিকা পালন করে, তার বর্ণনাই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। আর এ বর্ণনার মধ্যে রণ তৎপরতার যেটুকু খুঁটিনাটি এসেছে, কুরআন তাকে নিতান্ত আনুসঙ্গিক ব্যাপার হিসেবেই রেখে দিয়েছে।

এ ধরনের সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দাওয়াতকারীকে তার দাওয়াত ও আন্দোলন সম্পর্কে যেমন ব্যাপক বুঝ প্রদান করে, তেমনি তার আলোচ্য বিষয়ের দাবী ও চাহিদা সম্পর্কে তাকে দেয় দৃপ্ত চেতনা। ফলে কোন ক্লান্তিকর ও বিভ্রান্তিকর অবস্থায় সে পতিত হয় না।

আর একটা বিষয় এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কুরআনের বর্ণিত ঐতিহাসিক কাহিনীটির একাধিক তাৎপর্য ফুটে উঠতে পারে। দাওয়াতকারী এই বিভিন্ন তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করতে পারেন। এ দ্বারা স্পষ্টতই সে দাওয়াতের প্রয়োজনীয় কর্মকুশলতা, দক্ষতা ও সচকিত বুদ্ধিমত্তা রপ্ত করে নিতে পারে। প্রতিবার অনুভূতির নতুন নতুন তন্ত্রীতে আঘাত করে নতুন শিহরণ জাগাতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, হিটলারের

www.pathagar.com

উত্থানের ঘটনাও আপনাকে আপন অভিষ্ট সাধনে সহায়তা করতে পারে। আপনি তা থেকে প্রমাণ দর্শাতে পারেন যে, একটি জাতির পতন ঘটা ও ধ্বংসোন্মুখ হওয়ার পরও সে তার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে যদি তার সন্তানেরা তা ফিরিয়ে আনতে ঐক্যবদ্ধ ও কৃতসংকল্প হয়। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জনে যথাযথভাবে উদ্যোগী ও অভিলাসী না হলে তা সম্ভব নয়। আবার এ উত্থানের দৃষ্টান্ত দিয়ে একথাও প্রমাণ করতে পারেন যে, দারিদ্রের তীব্র কষাঘাত একটি পতনোন্মুখ জাতির জরাজীর্ণ কুটির থেকে এমন দুরন্ত মহানায়কের জন্ম দিতে পারে যিনি ধ্বংসস্তুপ থেকে গোটা জাতিকে পুনরুদ্ধার করতে পারেন, সমসাময়িক বড় বড় রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়কদের অনুপাতে অশিক্ষিত বা আধাশিক্ষিত হয়েও যিনি সেই জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। এ ঘটনা থেকে আপনি এ শিক্ষাও তুলে ধরতে পারেন যে, একটা বাতিল শক্তির যত বড় শক্তিশালী সেনাবাহিনীই থাকুক না কেন, তা অতি দ্রুত ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। আপনি নাৎসী মতবাদের সেই আগ্রাসী দর্শনের সমালোচনা করতে পারেন, যা জার্মান জাতিকে সমগ্র মানবজাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং তাদেরকে শ্রেষ্ঠতম প্রজাতির মানবগোষ্ঠী বলে অভিহিত করেছিল আর অন্যান্য জাতিকে তাদের গোলাম ও চাকর-নফরে পরিণত করার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। আর এ দাবীও করেছিল যে, এটাই প্রকৃতির নিগূঢ় বিধান ও আল্লাহর নির্দেশ। অথচ আল্লাহ এমন নির্দেশ দিতেই পারেন না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম (আ) মাটির তৈরী। তাই জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান। তবে যে যত সৎ ও আল্লাহভীরু, সে ততই সম্মানের উপযুক্ত। এটাই সেই অকাট্য মহাসত্য যাকে আল্লাহ ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ـ

"বাতিল শক্তির ওপর নিক্ষেপ করেন এবং তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেন এবং পর্যুদস্ত করেন।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৮)

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ـ

"বস্তুত আল্লাহ সত্যের জ্যোতিকে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা দিয়ে আলোকময় না করে ছাড়বেন না।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩২)

হিটলারের উত্থান ও পতনের ইতিহাসকে এভাবে রকমারি ক্ষেত্রে বক্তব্য প্রমাণ করার কাজে লাগানো চলে। আমি সম্ভাব্য সেই সকল ক্ষেত্রের উল্লেখ করতে গেলে আমাকে মূল আলোচনার বিষয়ের আওতার বাইরে চলে যেতে হতে পারে।

www.pathagar.com

ইতিহাসে এমন কতকগুলো খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনাও থাকে, যা আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হয়। কিন্তু এগুলো নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা তাতে যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বহু মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, মেজাজের বহু উল্লেখযোগ্য গুণাগুণ ও বিচিত্র মানসিক ভাবপ্রবণতার সন্ধান পাই। দাওয়াত-কারীকে এসব কিছুর জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে। উল্লিখিত গুণ-বৈশিষ্টগুলোর বিপুল অংশ অন্যান্য স্বৈরাচারী শাসকদের ইতিহাসেও পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

৪-কর্মতৎপর মানব জীবনের বাস্তব ঘটনা

কর্মতৎপর মানব জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীই হচ্ছে তার চলমান ইতিহাস, একদিন এটাই পরিণত হবে অতীত ইতিহাসে। অতীত ইতিহাসের মত চলমান ইতিহাসেও মানুষের ন্যায়-অন্যায় ভুল-নির্ভুল সুপথচারিতা ও বিপথগামিতা আর এগুলোর যে পরিণতি ও ফলাফল দেখা দিয়েছে তার রেকর্ড সঞ্চিত থাকে। অতীত ইতিহাসের তুলনায় চলমান ইতিহাসের একটা বৈশিষ্ট আছে। চলমান ইতিহাস মানুষের জীবনকে অবিকৃতভাবে শুধু কিতাবের পাতায় নয় বরং পৃথিবীর খাতায় অংকিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরে। এমন বাস্তব ও জীবন্তভাবে তুলে ধরে যে, তার দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি ও আবেগ অনুভূতিতে তা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। খানিকটা সংক্ষেপে ও খানিকটা সবিস্তারে নয়—বরং পুরোটাই সমান বিস্তৃতি ও স্পষ্টতা সহকারে পেশ করে। মানুষকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের এমন সব ঘটনাবলীর সামনে নিয়ে দাঁড় করায় যার মধ্য দিয়ে সে স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে, আর্থসামাজিক রীতিনীতি কতখানি বিকৃত হয়েছে কিংবা বিশুদ্ধ আছে। এ ছাড়া বিশুদ্ধতা ও সততার এমন কতকগুলো বাস্তব নমুনাও পেশ করে যা সংকল্পের দৃঢ়তা সত্যনিষ্ঠা এবং সকল কথা ও কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অদম্য আকাংখার প্রতীক। চলমান ইতিহাস মানুষকে আবার কখনো কখনো এমন সব ডাকাত ও লুটেরার সামনে এনে দাঁড় করায় যারা মানব সমাজের মহত্ব ও গৌরবের সকল চিহ্নকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাই প্রতিদিন, প্রত্যেক পথে-ঘাটে, প্রত্যেক পত্র-পত্রিকায়, প্রত্যেক বাড়ীতে, অফিসে আদালতে এবং প্রত্যেক নির্দোষ কিংবা নোংরা আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রে ঐসব ভালো ও মন্দের নমুনা আপনার সামনে দেখা দেবে বাস্তব ও লোমহর্ষক পোশাকে সজ্জিত হয়ে। এ জন্য আপনি যে দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত তার যথাযথ বুঝ নিয়ে এবং আপনার আবেগ অনুভূতির যথাযথ সংবেদনশীলতা নিয়ে ইতিহাসের ঐ মূল্যবান অংশটা (চলমান) সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন। তার লক্ষ্য ও চালিকা শক্তি কি তা বুঝতে সচেষ্ট হউন। তার কার্যকারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করুন। আপনার চিন্তার আলোকে সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ ও তার সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণের পর তাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করুন। জীবনের নির্বাচিত ঘটনাবলীতে সংরক্ষণ করার জন্য আপনার একটা ফাইল বা রেকর্ড থাকা বাঞ্ছনীয়। অতপর দেখবেন যে, এই রেকর্ডে সংরক্ষিত কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করলে আপনার কথা শ্রোতার কাছে কত হৃদয়গ্রাহী, কত প্রভাবশালী, কত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও কত মূল্যবান প্রমাণিত হয়। জনৈক ইখওয়ানী নেতাকে জানি, তিনি তাঁর সাপ্তাহিক রেকর্ড থেকে সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে জুময়ার খুতবার বিষয় নির্ধারণ করতেন। এটা একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত ছিল। আল্লাহ তাঁকে তাঁর মেম্বারে পুনর্বহাল করুন এবং উপযুক্ত সামর্থ ও সফল্য দান করুন। আমীন।

---

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

বক্তব্য ও ভাষণ দেয়ায় দাওয়াতকারীর ভূমিকা

(১) ভাষণ বা বক্তৃতা

(২) পাঠ বা ছবক

(৩) খুতবা বা ক্ষুদ্র ভাষণ

(৪) প্রবন্ধ

(৫) সাধারণ কথাবার্তা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার মতে, লেকচার ও পাঠ দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তথাপি অনেকেই লেকচারকে পাঠ বা ছবকের চেয়ে অনেক বেশী বিস্তারিত ও ব্যাপক এবং বিষয়বস্তুর উপাদানগুলো সংক্রান্ত তথ্যের অধিকতর সমাবেশ বলে মনে করেন। তাদের মতে প্রভাষক বা লেকচারারের তদারকী অধিকতর প্রসারিত ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া দরকার এবং শ্রোতাকে এতটা আগ্রহী করে তোলার যোগ্য হওয়া চাই যে, সে যেন অভিনব ও চমকপ্রদ তথ্য এবং নির্ভুল ও তেজোদ্দীপ্ত পথনির্দেশ লাভের জন্য উন্মনা ও উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

প্রভাষককে নিজের ভাষণে শৃংখলা ও ধারাবিন্যাসে তৎপর থাকতে হবে, অতিমাত্রায় ভাবাবেগে ভেসে গিয়ে ও সাময়িক ঝোঁকের আবেশে ক্রমাগত মনগড়া বক্তব্য দিয়ে শ্রোতাদেরকে মূল বিষয়বস্তু থেকে দূরে হটিয়ে দেয়া তার পক্ষে সঙ্গত নয়। অবশ্য মামুলী পাঠদানের বেলায় এসব জিনিস কিছু কিছু বলতে পারে এবং এতে পাঠ্যবস্তু খানিকটা উপভোগ্যও হতে পারে। প্রভাষক হিসেবে ভাষণ দিতে গিয়ে যে কয়টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার বলে উল্লেখ করলাম, তার সবকয়টির সাথে আরেকটি জিনিসও যোগ করা প্রয়োজন। সেটি হলো, তাকে তার কথাবার্তার মধ্যে আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বপ্রকৃতিতে এমন কোন অবস্থা বা আলোচ্য বিষয় নেই, যা আল্লাহর সাথে সংযোগ সূত্রে আবদ্ধ নয়। সেই সংযোগের অপরিহার্য দাবী হলো, ঐ অবস্থা বা বিষয়টায় আল্লাহর রঙ প্রতিফলিত হওয়া চাই অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণায় তা উজ্জীবিত ও সঞ্চালিত হওয়া চাই। যে কোন আলোচ্য বিষয় বা বক্তব্যকে আল্লাহর রং বর্জিত করা একমাত্র সেইসব লোকের কাজ হতে পারে, যারা জীবনকে আল্লাহ থেকে অথবা আল্লাহকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে তৎপর। এরূপ করার পর তো জীবন নিছক নকল পণ্য ও জাল মুদ্রার ন্যায় অচল ও অথর্ব হয়ে যেতে বাধ্য। আর সে জীবন সম্পর্কে যে কোন কথা বরকতহীন ও জ্ঞান বিবর্জিত হবে।

দাওয়াতকারীর কথাবার্তা যাতে আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয়, সে জন্য সর্বপ্রথম পাঠদান বা ভাষণদানে অবশ্য পালনীয় কয়েকটি মূলনীতির উল্লেখ করছি। এরপর বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে যে পাঁচটি জিনিসের উল্লেখ করেছি, তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশআল্লাহ।

১-দাওয়াতকারীর পাঠদান স্কুল বা অন্য কোন শিক্ষায়তনের অধ্যাপকের পাঠদান থেকে ভিন্ন।

www.pathagar.com

(ক) দাওয়াতকারী ভূগোল, রসায়ন, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

(খ) পাঠ ও ভাষণদানের ক্ষেত্রে একটির পদ্ধতি অন্যটি থেকে ভিন্নতর। স্কুলের পাঠদানের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে পাঠ্য বিষয়ের সকল খুঁটিনাটি সহ সবিস্তারে তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়। তা না করতে পারলে তার যোগ্যতা অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ মনে করা হয়। কেননা তার দায়িত্বই হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সূক্ষ্মতম জ্ঞান বিতরণ। পক্ষান্তরে দাওয়াতকারীর পাঠদানের বেলায় ইসলামের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আইনগত বিধান শেখানোর পাশাপাশি উক্ত আইনের আনুগত্য করার উপযোগী বিনয়ী মানসিকতা সৃষ্টির জন্যও উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করতে হয় এবং সেই সাথে প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথাও আলোচনা করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ রোযার পাঠ দিতে গিয়ে শিক্ষককে রোযার ফেকহী মাসয়ালা বর্ণনা করতে হয়। রোযার আইনগত বাধ্যবাধকতা, কাদের ওপর রোযা ফরয, চাঁদ দেখা না দেখা, নিয়ত, কিসে রোযা ভাঙ্গে, কিসে ভাঙ্গে না ইত্যাদির বিবরণ দিতে হয়। কিন্তু দাওয়াতকারীকে এক দিকে বলতে হয় যে, রোযা হলো আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার একটা গুপ্তরহস্য। বান্দা শুধুমাত্র আল্লাহর তদারকীর সাহায্যে ও তাঁর প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের আওতায় রোযা সম্পন্ন করে। মনের আবেগ ও অনুভূতিকে জাগ্রত করার ব্যাপারে রোযা অনন্য। আর এই আবেগ ও অনুভূতি তার মানবীয় গুণ-বৈশিষ্টকে উন্নতি ও উৎকর্ষ দান করে। এই উন্নতি ও উৎকর্ষ প্রসারিত হয়ে তার মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী গড়ে তোলে। এই বিশ্বস্ততা এবং ব্যক্তির আচরণ ও কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণে ও সামাজিক বন্ধনগুলোকে দৃঢ়করণে তার প্রভাব ও অবদানই রোযার সার শিক্ষা। কেননা শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জিহ্বা ও হাত সবই আমানত। আর এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটির ওপরই রোযার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পিত। সে দায়িত্ব কি? এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا -

"নিশ্চয় কান, চোখ ও মন—প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে।"
—(সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬)

রোযার উপযোগী বিনয়ী ও আনুগত্যপ্রবণ মানসিকতা সৃষ্টিকারী আয়াত ও হাদীস অনেক রয়েছে। সেগুলো রোযাদারের প্রবৃত্তির পবিত্রতা সাধনকারী এবং তার রুচী ও চিন্তাধারাকে উন্নতকারী তত্ত্ব ও তথ্যের ভাণ্ডার ও খনি স্বরূপ। আমাদের এ উদাহরণ থেকে স্কুলের শিক্ষক ও দাওয়াতী শিক্ষকের অনুসৃত পদ্ধতি ও উভয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্যের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

২-শিক্ষকতার পেশায় পাঠ মাত্রেই একটা 'শীরোনাম' বা বিষয়বস্তুর অধীন। কিন্তু দাওয়াতকারী যে পাঠ দেন, তা সাধারণত কোন আয়াত বা হাদীসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। উপরোক্ত পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে দাওয়াতকারী শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক পেশাগত পদ্ধতি এড়িয়ে চলেন। তাই কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রচলিত ঐতিহ্যগত পদ্ধতির প্রতি তিনি যেমন নজর দেন না, তেমনি সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসে যে বিধি ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, তাও পুরোপুরিভাবে তাঁর ভাষণে স্থান পায় না। বরং আয়াত ও হাদীসের সাধারণ মর্মার্থই প্রধান কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়—যার চারপাশে দাওয়াতকারীর চিন্তাধারা কেন্দ্রীভূত। আর এই মর্মার্থ দিয়েই আপনি আপনার আলোচনা অনায়াসে শুরু করতে পারেন। আপনি যখন একথা স্মরণ রাখবেন যে, আপনি আল্লাহর দিকে দাওয়াতকারী এবং আয়াত বা হাদীসের মর্মার্থ বুঝে আপনার মন গলে যাবে, তখন আপনার মনে হবে, ওহী যোগে প্রাপ্ত বাণীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যেন আপনার সামনে জ্ঞানের সুপেয় শরাব হয়ে বিরাজ করছে। সুতরাং তা দ্বারা আপনার অসম্পূর্ণ বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করুন। আপনার পাঠ হওয়া উচিত নিম্নোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তু নিয়ে ঃ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوٰى

"একমাত্র নিয়ত দ্বারাই আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণিত হয়। প্রত্যেক মানুষের একমাত্র সম্বল হলো সে যা নিয়ত করে।"(হাদীস)

এ হাদীসের সাধারণ অর্থ সুস্পষ্ট। এখানে 'একমাত্র' শব্দ উভয় বাক্যে কি তাৎপর্য বহন করে, সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আর আমলের সাথে নিয়তের যোগসূত্র কতখানি, সে সম্পর্কে আলেমদের যে মতভেদ রয়েছে, তাও বিবেচনায় আনার দরকার নেই। উক্ত হাদীসের মর্মানুসারে আপনার সামনে যে সুস্পষ্ট সীমানা প্রতিভাত হয়, তার আওতার মধ্যে থেকে আপনার পাঠ শুরু করুন। অতপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হউন যে, আমরা দুই প্রান্তে দু'টি জিনিসের সম্মুখীন একটি থাকে মনে এবং তাহলো নিয়ত। অপরটি থাকে আমাদের বাহ্যিক অঙ্গনে এবং তাহলো আমল বা কাজ। দুই প্রান্তের এ দু'টি জিনিসের মধ্যে রয়েছে অটুট সম্পর্ক ও দৃঢ় বন্ধন। আমল হলো ভালো বা মন্দ নিয়তের বাহ্যিক রূপ। আর নিয়ত হলো আমলের অভ্যন্তরে বিরাজিত প্রাণশক্তি।

এখানে এসে আমরা আরো কতকগুলো উচ্চ দার্শনিক তথা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সম্মুখীন হই—যা মানুষের মনুষ্যত্ব ও তার তামাদ্দুনিক সততার সারকথা। কিন্তু আমরা সে ক্ষেত্রে অন্য একটি মত অবলম্বন করি। সে মতটি

www.pathagar.com

হলো এই যে, নিয়ত হলো মনের একটি কাজ বা তৎপরতা। মন যখন প্রবৃত্তির কামনা এবং ইন্দ্রিয়ের সখ ও ভোগ লিপ্সার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন তার নিয়ত প্রবৃত্তির কামনার চরিতার্থতা ও ইন্দ্রিয়ের ভোগ লিপ্সার পরিতৃপ্তি লাভেরই অনুকূল হয়ে থাকে। আর মন যখন আল্লাহর দিকে ঝোঁকে এবং আল্লাহর কাছে যে অতুলনীয় বৈভব রয়েছে তার দিকে আকৃষ্ট হয়, তখন আল্লাহর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য এবং তার অফুরন্ত কল্যাণ ও মঙ্গলের নিগূঢ় সত্য তার মুঠোর মধ্যে চলে আসে। ফলে তার নিয়ত হয়ে দাঁড়ায় ঐ সত্যেরই সমগোত্রীয় ও পূত-পবিত্র।

আর যেহেতু আমল নিয়তেরই বাস্তব রূপ, তাই প্রথমোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রবৃত্তির পূজারীর সকল কাজ তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও ভোগ-লালসারই বাস্তব রূপ হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির আমল হয় আল্লাহর পূত-পবিত্র সত্তা ও তার মহামহিম সূক্ষ্ম জ্ঞানের দিকে তার মনের ঔৎসুক্যের এবং সেই পথে তার চেষ্টা ও তৎপরতার প্রতীক। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط

"যে ব্যক্তিকে সূক্ষ্ম জ্ঞান দেয়া হয়, সে অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়।"
—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৯)

তার আমল হয় আল্লাহর অনুগ্রহের অভিসারী। আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ○

"তোমার প্রভুর অনুগ্রহ তাদের সঞ্চিত পার্থিব সম্পদের চেয়ে উত্তম।"
—(সূরা আয যুখরুফ ঃ ৩২)

তার আমল হয় আল্লাহর অভিভাবকত্ব, তাঁর অজেয় শক্তি ও সাহায্যের রূপকার, বস্তুত আল্লাহর অভিভাবকত্ব, তাঁর অজেয় শক্তি ও সাহায্য এমন সম্পদ যার সমতুল্য আকাশ ও পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আর যেহেতু নিয়ত তার আমলের মধ্যেই বিরাজ করে এবং তার মধ্যে সে এসব উপাদেয় ফল ফলায়, তাই তার আমলই তার জন্য এসব অতুল ঐশ্বর্য নিশ্চিত করার উপকরণ বলে বিবেচিত হয়। এ জন্যই আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে পরম করুণায় সিক্ত করে আল্লাহমুখী পূত-পবিত্র নিয়তের দুর্জেয় রহস্য তথা জ্ঞান দান করে থাকেন এবং তদনুসারে আমল বা কাজ করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন ঃ

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۙ وَأَقِمِ الصَّلَٰوةَ لِذِكْرِي ○

www.pathagar.com

"(হে মূসা,) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। কাজেই তুমি আমারই আনুগত্য কর এবং আমারই স্মরণের উদ্দেশ্যে বা নিয়তে নামায কায়েম কর।" — (সূরা তোয়াহা ঃ ১৪)

তিনি ঈসার (আ) এ উক্তি উদ্বৃত করেন ঃ

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ قف اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا ○ وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ مـ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَیًّا ○ وَّبَرًّا بِوَالِدَتِیْ ز وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ○

"আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন এবং আমি যতদিন বেঁচে থাকি, আমাকে নামায ও যাকাতের পাবন্দী করার উপদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাকে আমার মাতার সাথে সদাচরণকারী বানিয়েছেন।"—(সূরা মরিয়ম ঃ ৩০-৩২)

আর আপন সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ ـ

"তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং তোমার গুনাহ মাফ চাও।"-(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

আর ইবরাহীম (আ) এসবই জানেন। তাই তিনি বলেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِیْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ ○

"হে আমার মনিব ! তুমি আমাকে ফায়সালা করার ক্ষমতা দাও এবং আমাকে নেককার লোকদের সাথে শামিল কর।"-(আশ শুয়ারা ঃ ৮৩)

এরূপ অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে।

এ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহর সঠিক পরিচয়ের ভিত্তিতে যে নিয়ত গড়ে ওঠে, আমল ছাড়া তা মু'মিনের কোন কল্যাণ সাধন করে না। পবিত্র কুরআনে আছে যে, ইউনুসকে (আ) যখন মাছে গিলে ফেললো এবং তাকে গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করলো, তখন তিনি সেই প্রসিদ্ধ দোয়াটি করেন।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ○

"তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি। নিশ্চয় আমি জালেম হয়ে গেছি।" — (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৭)

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন ঃ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ "তখন আমি তাকে বড় ক্লান্ত অবস্থায় খোলা ময়দানে নিক্ষেপ করি।"—(সূরা আস সফ্ফাত ঃ ১৪৫)

এ ঘটনার উপসংহারে আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَوْلَآ اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۝ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

"সে যদি পবিত্রতা ঘোষণা না করতো, তাহলে তাকে কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হতো।"—(সূরা আস সাফ্ফাত ঃ ১৪৩-১৪৪)

অর্থাৎ তিনি যদি আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে আমলকারী না হতেন, তাহলে .....। খিজির (আ) মূসাকে (আ) জানালেন যে, তিনি দু'জন ইয়াতিম বালকের সুবিধার্থে দেয়াল নির্মাণ করে দিয়েছেন, তাদের পিতা ছিল সৎকর্মশীল। বুঝা গেল যে, পিতার অন্তরে যে নিয়ত বা সদুদ্দেশ্য ছিল, মৃত্যুর পরও তার নেক আমল সেই নিয়তকে রক্ষা করে চলেছে। অর্থাৎ তার জীবনের গোপন রহস্যকে এমনভাবে রক্ষা করে চলেছে যে, তা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। একথাই আল্লাহর নিম্নোক্ত উক্তিতে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِىٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط

"পবিত্র কথা পবিত্র বৃক্ষের মত। তার মূল (ভূমিতে) স্থীতিশীল এবং তার ডালপালা আকাশে বিস্তৃত। তার প্রভুর ইচ্ছাক্রমে সে প্রতি মুহূর্তে তার খাদ্য সরবরাহ করতে থাকে।"—(সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৫)

বলা বাহুল্য এ খাদ্য সেই খাদ্য নয় যা দ্বারা প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয় এবং চোখ জুড়ায়। তা হচ্ছে বিনা ধনে ধনী হওয়ার, বিনা আত্মীয়স্বজনে সম্মানিত হওয়ার, বিনা পদমর্যাদায় প্রতিপত্তিশালী হওয়ার এবং বান্দার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর গোপন বাহিনীকে জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে আপন ইচ্ছার অনুগত পাওয়ার উপকরণ। একটি পবিত্র কথায় যখন এমন ফল আহরণ করা যায়, তখন পবিত্র ও নেক আমলের ফল কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষত যতক্ষণ সে আমলের সহযোগিতায় জিহ্বা এবং সেই সাথে চোখ ও অন্য সকল প্রত্যঙ্গ তৎপর থাকে আর মন তাতে আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়ের সমাবেশ ঘটায়—যা আকাশ ও পৃথিবীর অন্তহীন রাজ্যে সকল শক্তি ও নেয়ামতের উৎস। এ আমলে যেহেতু নিয়ত ও আল্লাহর পরিচয়ের চিরস্থায়ী উপাদান নিহিত, তাই তার কল্যাণে এ আমলও চিরস্থায়ী হতে বাধ্য। এ আমলে প্রতিফলিত হয়েছে বান্দার আদর্শ, মূল্যবোধ ও উচ্চাকাংখ্যা। আল্লাহ

www.pathagar.com

তাঁর যে সিদ্ধান্ত দ্বারা তাঁর নবীকে প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান করে থাকেন, সেই সিদ্ধান্ত দ্বারাই এ আমল আল্লাহর ইচ্ছায় কার্যকরী হয়েছে। খিজির (আ) এই আল্লাহর তত্ত্বাবধানের সিদ্ধান্তের প্রতীক ও বাস্তব রূপকার ছিলেন। একথাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে। পুরো আয়াতটি আবার লক্ষ্য করুন ঃ

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ق

"দেয়ালটি ছিল শহরের দু'জন এতিম বালকের এবং ঐ দেয়ালের নীচে ছিল তাদের জন্য গুপ্ত ধন। তাদের পিতা ছিল সৎকর্মশীল। তাই আল্লাহ ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়োপ্রাপ্ত হলে ঐ গুপ্ত ধন যেন বের করতে পারে।"–(সূরা আল কাহাফ ঃ ৮২)

দেখা যাচ্ছে যে, "তাদের পিতা ছিল সৎকর্মশীল" একথাটার মধ্যেই আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের বলবত্ হওয়ার মূল রহস্য নিহিত। অর্থাৎ তাদের পিতা যে নেক আমল রেখে গেছে, তার কল্যাণেই এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই কালজয়ী উপদেশকে স্মরণ করা যেতে পারে—যাতে তিনি নেক আমল ও সৎ চরিত্রের মধ্যে আল্লাহর শক্তি নিহিত থাকার প্রতি ইংগীত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, একবার এক পার্বত্য গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারী তিনটি লোক সেখানে আটকা পড়ে যায়। একটি অতিকায় প্রস্তর খণ্ড গুহার মুখে পড়ায় গুহার মুখ এমনভাবে বন্ধ হয়ে যায় যে, তারা কোনক্রমেই তা সরাতে পারলেন না। অতপর তাদের প্রত্যেকে নিজের এক একটি নেক আমলের উল্লেখ করলেন। কেননা তারা জানতেন যে, নেক আমল আল্লাহর কাছে বিশেষ আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য। প্রত্যেকে নিজের জীবনের একটি করে নেক আমলের বর্ণনা দিয়ে সেই আমলের কল্যাণে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাতে লাগলেন। এভাবে তিনজনের ফরিয়াদ ও আকুতি শেষ হওয়া মাত্রই গুহার মুখ থেকে পাথরটি সরে গেল এবং গুহা রাহুমুক্ত হলো। তারা নিষ্কৃতি পেলেন।

খিজির আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গে তাঁর নৌকা ওয়ালাদের মধ্যে যে, ঘটনা ঘটেছিল তার বর্ণনা দেয়া বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। কেননা এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে এমন কতকগুলো গুণ-বৈশিষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে যার কল্যাণে নেক আমলের তাৎক্ষণিক ও বাহ্যিক সুফলের পাশাপাশি তার কিছু গোপন সুফলও

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয়। আল্লাহর বর্ণনা অনুসারে তারা ছিল কতিপয় মিসকীন যারা সমুদ্রে কাজ করতো।

আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে মিসকীন হওয়া বলতে মানুষের সেই অবস্থাকে বুঝায় যখন সে নিজেকে কোন শক্তি ও সামর্থ অর্থাৎ ধন ও পদ-মর্যাদার অধিকারী মনে করে না—সব ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের মালিক মনে করে শুধু আল্লাহকে। কেননা এসব আসলেই আল্লাহর দান—তার নিজের কোন কৃতিত্ব নয়। মানুষ তখনই আল্লাহকে ও নিজেকে সঠিকভাবে চিনতে পারবে যখন সে এসব উপকরণের কোন কিছুরই স্বয়ং দাবীদার হবে না এবং তার মনে একমাত্র আল্লাহর মুখাপেক্ষিতা ও আল্লাহর দ্বারস্থতার অনুভূতি ছাড়া আর কোন অনুভূতি থাকবে না। নিজের এই রিক্ততাবোধ যখন আল্লাহকে খাঁটিভাবে চেনার ফল এবং ঐ নৌকার মালিকদের মধ্যে আল্লাহ এই রিক্ততাবোধের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন, তখন তারা যে আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনেছেন, তা অবধারিত সত্য। আর এ জন্যই তাদের নেক আমল ও তার ফল চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী হতে পেরেছে।

আল্লাহর এ উক্তি যে 'তারা কাজ করতো'—এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা কর্মজীবি ছিল এবং হালাল জীবিকা উপার্জনে তারা নিরলসভাবে তৎপর ছিল। আর এই নিরলস কর্মতৎপরতা হলো নিয়ত এবং আল্লাহকে ও নিজেকে সঠিকভাবে চেনার বাস্তব রূপ।

আর তারা 'সমুদ্রে কাজ করতো' একথা দ্বারা পানিতে কর্মরতদের উদ্বেগ-জনক অবস্থার প্রতি ইংগীত দেয়া হয়েছে—যা স্থলে কর্মরতদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। কেননা পানিতে যারা কাজ করে, তারা সমুদ্রের মারাত্মক ও ভয়াবহ দুর্যোগাদির ভয়ে সবসময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থী থাকে। তা ছাড়া আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিদদের দৃষ্টিতে সমুদ্র হলো দুনিয়ার জীবনের ফেৎনা ও ধ্বংসাত্মক বিপদাপদের উত্তাল তরঙ্গমালার প্রতীক। আর এ জন্যই যারা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে তটস্থ থাকে, তাদের তিনি প্রশংসা করেছেন এই বলে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ○

"যারা তাদের দানশীলতা অব্যাহত রাখে (অর্থাৎ তাদের যাবতীয় সৎকাজ অব্যাহত রাখে) এবং সেই সাথে আল্লাহর কাছে একদিন যেতে হবে জেনে তাদের মন ভীতসন্ত্রস্ত থাকে।"-(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ৬০)

এখানে তিনটি জিনিস লক্ষণীয়। প্রথমত, আল্লাহকে চেনা ও জানা—যা মিসকীন শব্দটির মর্মার্থ থেকে পরিস্ফুট, দ্বিতীয়ত, আল্লাহকে চেনা ও জানার দাবী অনুসারে যে ধরনের আমল বা কাজ করা অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়,

www.pathagar.com

তা করা এবং তৃতীয়ত, জীবনের দুর্যোগপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া। এই তিনটি হলো জীবনযাপনের সুষ্ঠু পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অবলম্বন মানুষের জন্য সবচেয়ে উপাদেয় ও মূল্যবান আধ্যাত্মিক ও দৈহিক সুফল নিশ্চিত করে এবং খোদায়ী সংরক্ষণ ও তদারকী দিয়ে তাকে এতটা সমৃদ্ধ করে যে, তা তার কল্পনায় আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। নৌকার মালিকদেরকে যে পরিমাণ সংরক্ষণ দিয়ে আল্লাহ রাজার লুণ্ঠন থেকে নিরাপদ করেছিলেন, তারই প্রতীক হয়ে এসেছিলেন খিজির আলাইহিস সালাম। কেননা তাদের সৎকর্মশীলতা আল্লাহর সংরক্ষণ নীতিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে এসেছিল। পুরো আয়াতটি লক্ষ্য করুন ঃ

أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيْبَهَا

وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ○

"আর নৌকাটির (যাকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছি) রহস্য ছিল এই যে, তা ছিল সাগরে কর্মরত কতিপয় অসহায় লোকের। আমি নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কেননা তাদের এলাকায় এক রাজা প্রত্যেক নৌকাকে ছিনিয়ে নিত।"-(সূরা আল কাহাফ ঃ ৭৯)

আমলের সাথে নিয়তের সম্পর্ক যখন এরূপ, তখন নিয়ত সংক্রান্ত হাদীসের বাকী অংশে রসূল (সা) কি বলেছেন লক্ষ্য করুন ঃ "সুতরাং যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, তার হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে। আর যার হিজরতের উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ার কোন স্বার্থ লাভ করা কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করা, তার হিজরত তার উদ্দেশ্য অনুসারেই গৃহীত হবে।"

এর স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ালো এই যে, প্রত্যেককে এই ক্ষমতা অর্জন করা হয়েছে যে, সে নিজের কাংখিত পরিণতি নিজের হাতেই তৈরী করে নিতে পারে। সে যদি নিজের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে সাহায্য, সমর্থন ও সুযোগ-সুবিধা লাভে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তার মনে সে জন্য নিয়ত প্রস্তুত করতে হবে আর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে যে কাজই করবে, তাকে তার নিয়তের মধ্যে শামিল করতে হবে। আর যদি সে হীন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার এবং প্রবৃত্তির ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করতে ইচ্ছুক হয়। আর সেই ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্যই তার প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সেই ইচ্ছাই তার সকল কাজের চালিকা শক্তি ও নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়। তাহলে বুঝতে হবে, সে নিজের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনারই সিদ্ধান্ত ও সংকল্প নিয়েছে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে

www.pathagar.com

যখন তার চোখের পর্দা দূর হয়ে যাবে এবং অদৃশ্য জগত তার কাছে দৃশ্যমান হবে, তখন তার শোচনীয় উদাসীনতা ও অবিমৃষ্যকারিতা তার সামনে বিভৎস ও ভয়াল রূপ নিয়ে দেখা দেবে। ফলে সে তখন বলে উঠবে ঃ "(হে আমার মনিব, আমাকে একটু দুনিয়াতে ফেরত পাঠাও।) হয়তো আমি যে কাজ করে রেখে এসেছি, তাতে কিছু ভালো কাজের সংযোজন করতে পারবো।"-(সূরা আল মু'মিনুন ঃ ১০০) অথচ তখন দুনিয়ায় পুনরাগমনের সুযোগ সুদূর পরাহত।

একথা সত্য যে, উক্ত হাদীসে আরো অনেক তথ্য ও সুগভীর তাৎপর্য নিহিত আছে। কিন্তু আমি তার সবটা বলতে চাইনি। নবীর (সা) বর্ণিত তত্ত্বে যে রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ ঘটেছে, তার প্রভাবে দাওয়াতকারীর মনে সৃষ্ট এক ধরনের প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এ প্রতিক্রিয়ার ফলে তার মনে যে ভাবান্তর ঘটার কথা, তাকে একত্রিত ও সমন্বিত করে উক্ত হাদীসখানির সরল মর্মার্থে কেন্দ্রীভূত মূল শিক্ষণীয় উপকরণটি তৈরী করাই আমার লক্ষ্য। হাদীসের শিক্ষণীয় উপকরণ অনুসন্ধানের এটা একটা অনন্য প্রণালী। ইমাম নবাবী প্রমুখ এ হাদীস বা অন্যান্য হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তা থেকে কৌশলগত শিক্ষা আহরণের যে প্রণালী অনুসরণ করেছেন, তা থেকে এ প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৩-পাঠদানের বেলায় তার মৌলিক উপাদান ও আনুসঙ্গিকভাবে উদ্ভূত উপাদানের সাথে সমাজের অবস্থা ও সমস্যাবলীর সংযোগ যাতে সবসময় রক্ষিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এমনও হতে পারে যে, বালক দু'টির সৎকর্মশীল পিতা সংক্রান্ত কথাবার্তা সেইসব লোকের মনে আপন শিশু সন্তানদের জন্য আল্লাহর রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে যাওয়ার আগ্রহ সঞ্চার করবে, যারা নিজেদের মৃত্যুর পর সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন। উল্লিখিত ব্যক্তি যেমন আল্লাহর রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। শ্রোতারাও তেমনি ব্যবস্থায় অনুপ্রাণিত হতে পারে। আর এ জন্য তাদেরকে বেশী কিছু করতে হবে না। কেবল উক্ত নৌকা ওয়ালাদের মত আল্লাহর যথার্থ পরিচয় জানতে হবে। আবার নৌকা ওয়ালাদের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে সে আলোচনা বিষয়টির প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্প্রসারণের প্রেরণা জোগাতে পারে। আল্লাহর মুখাপেক্ষিতা ও তার সাহায্যের অপরিহার্যতার অনুভূতি যখন শ্রোতার মনে বদ্ধমূল হবে এবং সে নিজের সম্পদ, পদমর্যাদা ও আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার ব্যাপারে নিজের কৃতিত্ববোধ ও গর্ববোধ থেকে মুক্ত হবে, তখন সে এই শিক্ষার আওতায় কৃষক, অভিভাবক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও চাকুরে প্রভৃতি পেশাজীবিকেও টেনে আনবে।

দ্বিতীয়ত, বক্তৃতা ও ভাষণ

১-দাওয়াতী অধ্যাপকের ভাষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের ভাষণ থেকে ভিন্নতর। কেননা দাওয়াতকারীকে মহাশূন্য, চিকিৎসা ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিদ্যা

www.pathagar.com

নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। দাওয়াতী অধ্যাপকের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সাথে একটা বিষয়ে মিল আছে এবং তাহলো এই যে, উভয়ের শিক্ষাদানের বিষয়ের বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলো সংগ্রহ ও একত্রীভূত করার জন্য তাকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের উৎসসমূহের কাছে যেতেই হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেবল খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনে উদগ্রীব থাকে। পক্ষান্তরে দাওয়াতকারীর বক্তব্য বিষয়ের মূল উপাদান আয়ত্বে আসার পর শুধুমাত্র তার মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর কিছু করতে হয় না। এটা তাকে করতে হয় শুধুমাত্র শ্রোতাদের সতর্ক করা ও তাদের তৎপরতাকে অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বশতই। অতপর দাওয়াতী বক্তা তার বক্তব্যকে ইচ্ছা করলে একই বক্তৃতায় সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে তা সম্পন্ন করতে একাধিক ভাষণের আশ্রয় নিতে হয়।

২-দাওয়াতী বক্তাকে নিজের মধ্যে নিছক শহুরেপনার ছাপ ফুটিয়ে তোলা চলবে না। অনুরূপভাবে তাকে কেবল পাণ্ডিত্য জাহির করাও চলবে না। জনগণ তার শহুরে চালচলনের প্রশংসা করা তো দূরের কথা, তা তাদের কাছে অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত বলেই মনে হবে। ফলে সেটা তার আসল কাজ সম্পাদনে ব্যর্থতার পথ প্রশস্ত করবে। কেননা তাকে তো জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। তার চালচলন ও নিয়ম-নীতিতে যখন দাওয়াতের ছাপ থাকবে না, তখন বুঝতে হবে যে, সে দাওয়াতকারীদের দল থেকে বেরিয়ে গেছে। এতে তার পণ্ডিত বা অধ্যাপক বা অন্য কোন দলেও স্থান পাবার সম্ভাবনা থাকবে না। তাই সর্বাবস্থায় দাওয়াতী অধ্যাপককে মনে রাখতে হবে যে, ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ প্রতিরোধই তার দায়িত্ব। যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে সে হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা ও প্রতিনিধি। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই একথা বলেছেন। আর ভালো কাজের আদেশ দান মূলত ইসলামেরই বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণকে পরিচিত করার অপর নাম। আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা হলো সূক্ষ্মতা ও নিপুণতার সাথে সমাজের জীবনযাপন প্রক্রিয়া ও তার ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করার নামান্তর। যথাযথভাবে এ দায়িত্ব পালন দাওয়াতকারীর বক্তৃতা ও ভাষণকে খোদায়ী ছাপ দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম। এ কাজে যতক্ষণ সে কুরআন ও সুন্নাহর পথনির্দেশ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে থাকবে এবং কুরআন ও সুন্নাহর মধ্য থেকে আল্লাহর সুগভীর, পরিপূর্ণ ও অফুরন্ত তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করতে থাকবে, ততক্ষণ তার মধ্যে এই খোদায়ী ছাপ অম্লান থাকবে। তা ছাড়া এতে করে শ্রোতার সার্বক্ষণিক সচেতনতাও নিশ্চিত হবে। কেননা শ্রোতা দাওয়াতকারীর সাথে সাথে উচ্চমানের জ্ঞান আহরণ

www.pathagar.com

থেকে শুরু করে সমাজের জীবনধারা ও তার ক্রটিবিচ্যুতির সমালোচনা পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে আবর্তিত হতে থাকবে। শ্রোতা যখন আপনা-আপনি এবং কারো পীড়াপীড়ি ছাড়াই আল্লাহর বিধানকে নিখুঁত ও নির্ভুল বিধান বলে বুঝে ও মেনে নিতে পারবে, তখন তার উল্লিখিত সকল লক্ষ্যই অর্জিত হবে। বস্তুত এটাই হলো দাওয়াতকারীর চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

৩-দাওয়াতকারীর দাওয়াতী ভাষণ তার শিক্ষকসুলভ পাঠদান থেকে এই দিক দিয়ে পৃথক যে, ভাষণের একটা শিরোনাম থাকে, যা তার বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে। আর পাঠ বা শিক্ষার বিষয়বস্তু সাধারণত একটা আয়াত বা রসূলের একটি হাদীস হয়ে থাকে। চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা যায় যে, ভাষণের রূপরেখা যতটা স্পষ্ট হয়, পাঠ বা শিক্ষার রূপরেখা ততটা স্পষ্ট হয় না। একজন প্রভাষক যখন বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন সম্পন্ন করে, তখন সে উক্ত অধ্যয়ন থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করলো, তাকে সুবিন্যস্ত করা ও সাজানো-গোছানো নিজের কর্তব্য মনে করে। যে সমস্ত মূলনীতি ও সাধারণ সিদ্ধান্ত সে সংগ্রহ করে, তা একত্রিত করে। অতপর শৃংখলার সাথে তা সাজায় এবং যুক্তির সাথে সিদ্ধান্তের সংযোগ ঘটায়। আর সাদৃশ্যপূর্ণ নজিরগুলো দিয়ে একটি সুবিন্যস্ত ও সমন্বিত যুক্তির ডালি সাজায়। তার বিষয়বস্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক হতে পারে। আবার ইবাদত ও আকিদা সংক্রান্তও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সে এই রূপরেখার অনুসরণ করে যার আওতায় আলোচনার বিভিন্ন সূত্র ও উপাদান এবং তার সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহ সূক্ষ্ম যুক্তির মধ্য দিয়ে বিন্যস্ত হয়। আর সেই যুক্তিই বক্তব্য বিষয়কে একক ও সংহত বিষয়ে পরিণত করে। পক্ষান্তরে শিক্ষক হিসেবে যে পাঠ দেয়া হয়, তা আয়াত বা হাদীসের কেন্দ্রীয় বক্তব্যের ওপর শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সেই কেন্দ্রীয় বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সকল আয়াত ও হাদীস অনুসন্ধান করে। আর সেই সাথে সমাজ ও জাতির আচরণ পদ্ধতির সেইসব নমুনার প্রতি ইংগীত দেয় যা ঐ পাঠের মূলকথার সাথে ইতিবাচক বা নেতিবাচক সম্পর্ক রাখে। এদিক থেকে বিচার করলে পাঠ ও ভাষণ—উভয়েরই যেমন একটা বিশেষ মর্যাদা বা অবস্থান আছে, তেমনি উভয়েরই বিশেষ ধরনের ভূমিকা বা অবদানও আছে। এবার আমরা অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত (১) ভাষণ, (২) পাঠ (৩) আলোচনা (৪) প্রবন্ধ ও (৫) সাধারণ কথাবার্তা—এই পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করবো।

১-ভাষণ

(ক) স্বভাবতই ভাষণের বিষয় নির্ণিত হবে সমাজের চলতি জীবনধারার নিগূঢ়তম অবস্থা ও প্রকৃত চেহারার আলোকে। এ জন্য দাওয়াতকারীকে অবশ্যই

www.pathagar.com

সমাজের সাথে নিবীড় সম্পর্ক ও ঘনিষ্ট যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে এবং সমাজে যা কিছু ভাল মন্দ, মিঠে-কড়া ও ন্যায়-অন্যায় চালু রয়েছে, তার দ্বারা তাকে চালিত ও অনুপ্রাণিত হতে হবে। যা কিছু ভালো দেখবে, তাতে খুশী হবে এবং তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করবে। আর যা কিছু খারাপ দেখবে, তা রুখে দাঁড়াবে এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় ও মিষ্ট উপদেশ দ্বারা তার সংশোধন ও পরিবর্তনের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। একথার অর্থ দাঁড়ালো এই যে, দাওয়াতকারী জীবনের যেসব বাস্তব সমস্যার মুখোমুখী হবে, কিংবা জীবনের বাস্তব গতিধারা তাকে যেরূপ প্রেরণা জোগাবে, সেই অনুপাতেই সে তার ভাষণের বিষয় নির্ধারণ করবে। এভাবে যে বিষয়বস্তু নির্ধারিত হবে তা তাকে সমাজের ঘনিষ্টতর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে এবং মানুষের চেতনা ও আবেগ-অনুভূতির ওপর তার নিয়ন্ত্রণকে অধিকতর মজবুত ও শক্তিশালী করবে। কাজেই দাওয়াতকারীর অবস্থা কখনো এমন হওয়া চাই না যে, ঘটনাপ্রবাহের সাথে সংগতিশীল একটা বিষয় তো তার সামনে হাজির হচ্ছে, কিন্তু সে তার মুখোমুখী হতে সাহস না পেয়ে পালাচ্ছে কিংবা তা গ্রহণ করতে না পেরে নিস্ক্রিয় থাকছে। বস্তুত জীবনের ঘটনাস্রোতই দাওয়াতকারীর বক্তব্যের বিষয় নির্বাচন করে এবং এটাই সবচেয়ে নিখুঁত ও নির্ভুল নির্বাচন। কেননা এ নির্বাচন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার প্রেরণায় উজ্জীবিত। এ নির্বাচন আল্লাহর সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি এবং তাঁর মূল গ্রন্থে লিখিত ফায়সালারই অনুলিপি। আর এ জন্যই কুরআন ঘটনাবলীর ও বাস্তব পরিস্থিতির দাবী অনুসারে কিস্তিতে কিস্তিতে নাযিল হয়েছে।

এটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, কৃষকদের অবস্থা যে ধরনের বিষয়বস্তুর দাবী জানায়। নির্যাতিত শ্রমিক শ্রেণীর চাহিদা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়বস্তুর। আর এ উভয় শ্রেণীর দাবী থেকে আলাদা ধরনের দাবী জানায় ছাত্রদের দুঃখ-কষ্ট ও আশা-আকাংখা এবং নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের আর্থিক ও মনস্তাত্বিক সমস্যা—যা গভীর মনোযোগ দিয়ে না শুনলে ও না দেখলে কেউ ভালো করে বুঝতেই পারে না। এছাড়া মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আন্তসাম্প্রদায়িক আচরণ ও লেন-দেন, শ্রেণী ও সম্প্রদায়সমূহের জীবনধারা ও সামষ্টিক আচরণ নীতির ধরন ও প্রকৃতি, যেসব মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মানদণ্ডে সমাজ ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও সাফল্য পরিমাপ ও যাচাই-বাছাই করে তার বিকৃতি ও অবক্ষয়, শিক্ষা, বিচার, অফিস পরিচালনা ও আইন সভা পরিচালনা ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এই জাতীয় অন্যান্য ব্যবস্থা ও কার্যধারা সম্পর্কে বহু বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে। এসবের বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা এগুলো আপনা থেকেই পরিস্ফুট এবং দাওয়াত-কারীর সংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রীতে এগুলো ও এগুলোর ঘটনাপ্রবাহ নিজেই নিজেকে পেশ করে ও ধরা দেয়।

www.pathagar.com

(খ) ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ব্যাপক পড়াশুনা, চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ অপরিহার্য। অতপর তার প্রধান প্রধান উপাদান নির্ণয় ও তার ব্যাপারে ধারাবাহিক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা সন্নিবেশিত করতে হবে, যাতে করে শ্রোতারা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নীত হয় এবং শেষ লক্ষ্যবিন্দুতে গিয়ে তার সফল সমাপ্তি ঘটে, যেখানে পৌঁছার পর আর কিছু না বলাই শোভন হয়। উদাহরণ স্বরূপ আপনি যদি শিক্ষিত যুবক ও তরুণদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে চান এবং সে ভাষণের বিষয়বস্তু হয় "শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্ট" তাহলে এটা অনুধাবন করা আপনার পক্ষে খুবই সহজ যে, এই মানুষের মধ্যে এমন একটা উচ্চাংগের রূহানী উপাদান থাকা জরুরী, যা তাকে আত্মসম্মানবোধ, শ্রেষ্ঠ নৈতিক মূল্যবোধ ও মহৎ নীতিমালায় সজ্জিত করতে পারে। হীন ও তুচ্ছ উপাদানে আমাদের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তারপর এই মানুষের জীবনের এমন একটা চূড়ান্ত লক্ষ্য ও ব্রত থাকা উচিত, যার বাস্তবায়নে সে তৎপর ও সচেষ্ট থাকবে। যে মানুষের জীবনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, কোন স্থির আদর্শ ও নীতি নেই, সে একটা তুচ্ছ জানোয়ার ছাড়া কিছু নয়।

সর্বশেষে, মহত্ব ও জীবন লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়ার পর, তার জন্য যা অপরিহার্য তা হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞানের দ্বারাই সে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও নির্ভুল অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারবে। সুতরাং "শ্রেষ্ঠ মানব" রূপে গড়ে ওঠার উপাদান দাঁড়ালো তিনটি ঃ আত্মসম্ভ্রম, জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত এবং জ্ঞান।[১] এটুকু যখন আপনি স্পষ্ট করে বলতে পারবেন তখন আপনার শ্রোতাকে আপনি যা বুঝাতে চান তা বুঝাতে পারবেন। পক্ষান্তরে বিশৃংখলভাবে ও এলোমেলোভাবে কথা বললে ভালো কথাও ফল দর্শায় না।

---

১. একথা বুঝে নেয়া দরকার যে, এখানে জ্ঞান দ্বারা আমরা মহান আল্লাহ সংক্রান্ত জ্ঞানই বুঝাচ্ছি। আকাশ ও আকাশে বিদ্যমান আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি ও নিদর্শনাবলী। পৃথিবী ও পৃথিবীতে বিরাজমান সৃষ্টি ও নিদর্শনাবলী, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যে মহাজাগতিক দৃশ্যমান বস্তুনিচয় বিদ্যমান। আমাদের দেহে, জীবিকায়, স্বভাবে ও মেজাজে আর মনস্তাত্বিক বৈশিষ্টসমূহে আল্লাহর যে প্রকৃষ্ট নিয়ামতসমূহ পরিস্ফুট এবং অনুরূপ অন্য যেসব জিনিস আমাদের দৃষ্টি ও বিচার-বিবেচনাকে আল্লাহর নিকট পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম—সেইসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মাধ্যমেই আল্লাহ সম্পর্কে এই জ্ঞান আমাদের অর্জিত হতে পারে। এটাই যথার্থ নির্ভুল জ্ঞান—যা অর্জনে মানুষের সকল চেষ্টা ও সাধনা নিয়োজিত হওয়া উচিত। যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না, তা কোন কল্যাণকর জ্ঞান নয়। তাই বলে আমরা একথা বলছিনে যে, আধুনিক শিল্প, কারিগরি ও পদার্থের রকমারি ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করে আমাদের জীবনযাপন ও খাওয়া-দাওয়ার মান উন্নত করবো না। আমি যা বলতে চাইছি তাহলো এই যে, আমরা যা কিছুই জানবো ও শিখবো তার চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হবে আল্লাহ তায়ালাকে জানা ও চেনা।

www.pathagar.com

(গ) উল্লিখিত উপাদান কয়টির প্রত্যেকটির স্বপক্ষে কুরআন, হাদীস, তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের বর্ণনা, সাহাবাদের জীবনী, ইতিহাসের শিক্ষা কিংবা আপনার পড়া, চাক্ষুস দেখা বা শোনা ঘটনাবলী ইত্যাদি থেকে এমন সব উদ্বৃতি উপস্থাপিত করবেন, যা আপনার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে ও বিশ্লেষণ করবে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে দাওয়াত-কারীর উদ্বৃতির উৎস শীর্ষক আলোচনায় আমরা বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেছি।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা যে তিনটে উপাদানের উল্লেখ করেছি তার প্রথমটা হলো আত্মসম্ভ্রম। ব্যাখ্যা অন্বেষণে গেলে উক্ত উপাদানটার প্রকৃতিই আপনাকে বলে দেবে যে, এর অর্থ হলো, মানুষ যেন তার মত অন্য কোন সৃষ্টির সামনে দীনতা ও হীনতা প্রকাশ না করে এবং আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব ও গোলামী না করে। মানুষ এই দীনতা, হীনতা এবং সৃষ্টির গোলামী ও মুখাপেক্ষীতায় আক্রান্ত হয় প্রধানত দু'টো উদ্দেশ্যে ঃ ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ চরিতার্থ করা। অথবা নিজের জীবন ও জীবিকাকে বিড়ম্বিত ও কষ্টসাধ্য করে তোলে এমন আপদ থেকে নিষ্কৃতি লাভ। এটা যখন বুঝবেন, তখন আপনার চারপাশে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উদ্বৃতি ভীড় জমাবে। তার সাহায্য নিয়ে আপনি শ্রোতাকে বুঝাতে পারবেন যে, ইসলাম মানুষের মনে আত্মসম্মানবোধের বীজ বপন করে। এই আত্মসম্মানবোধের মূলনীতিকে সে গভীরতম ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। স্বার্থ উদ্ধার ও জীবিকাভীতির ব্যাপারে যখন সে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন সে জানবে যে, তার জীবিকা তো আকাশে সংরক্ষিত। আর আকাশে যা সংরক্ষিত, তার দিকে কোন দুনিয়াবাসী কিভাবে হাত বাড়াতে পারে ? সে একথাও জানতে পারবে যে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার আগেই তার জীবিকা বন্টনের কাজটা সমাধা করে রেখেছেন। এ প্রশ্নে ভাগ্য লিপিতে নতুন করে কিছু লিখিত হবার অবকাশ নেই। সেখানে যা লিখিত আছে, তার বিরুদ্ধে অতপর আর কোন ঘটনাপ্রবাহ প্রবাহিত হতেই পারে না। এই বিষয়ে কুরআন ও হাদীস আপনার জন্য তৃপ্তিদায়ক তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। স্বভাবতই আপনার অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়—সেইসব লোকের ওপর আঘাত হানা, যারা নিজেদেরকে মানুষের মুখাপেক্ষী বানিয়ে নিজেদের চরিত্র ও সম্ভ্রমকে নিজেরাই ভূলুণ্ঠিত করে। কেননা একেই তারা নিজেদের পরম আকাংখিত স্বার্থ উদ্ধারের নির্ভুল পথ মনে করে। বিশেষত সেইসব লোকের ওপর আঘাত হানা জরুরী, যারা এই প্রবাদবচনের ভক্ত ঃ

"যখন কুকুরের কাছে তোমার কোন প্রয়োজনীয় বস্তু থাকে, তখন তাকে 'মনিব' বলে সম্বোধন করতে দ্বিধা করো না। প্রাণের অনিষ্ট তথা হত্যা, প্রহার, জেল-জুলুম প্রভৃতির আশংকায় দুর্বলতা, হীনতা ও কাপুরুষতার স্বীকার হওয়া

www.pathagar.com

কোন মুসলমানের সাজে না। কেননা তাকে নিম্নোক্ত আয়াতের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে ঃ

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

"পৃথিবী কিংবা তোমাদের জানের ওপর যে কোন বিপদই আসুক, আমি তা সৃষ্টির পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। এ কাজটা আল্লাহর কাছে খুবই সহজ।" —(সূরা আল হাদীদ ঃ ২২)

কোন মুসলমান যখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বীরবিক্রমে এগিয়ে যায়, কাপুরুষরা তাকে তিরস্কার করে এবং দুর্বলচেতা ভীরু লোকেরা তাকে মুহূর্মুহু হুঁশিয়ার করতে থাকে। এ সময়ে আল্লাহ উক্ত মুসলমানদের মুখ দিয়ে এই জবাব দেয়ান ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ط

"একটি মেয়াদবদ্ধ কিতাবে লিখিত আল্লাহর ফায়সালা ও তার ইচ্ছা ব্যতীত কোন প্রাণীর মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া সম্ভব নয়।"

—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৫)

কোন বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় যখন সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হয়, তখন তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে তার আকিদা ও ঈমান স্বোচ্চার হয়ে বলে ওঠে ঃ

اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

"(স্বাভাবিক) মৃত্যু কিংবা নিহত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যদি তোমরা পালাও তাহলে সে পালানো ফলদায়ক হবে না। সে অবস্থায় তোমরা অতি সামান্যই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে।"-(আল আহযাব ঃ ১৬)

এভাবে কুরআন ও রসূলের জীবনের বহু উক্তি আপনার সামনে উপস্থিত হবে। সেসব উক্তি থেকে যতটুকু আপনার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক মনে হবে, ততটুকু সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করুন।

এই নির্বাচন, বিভিন্ন উপাদান ও উদাহরণের বিন্যাস এবং হাদীস পেশ করার ক্ষেত্রে বাস্তব বুদ্ধিমত্তা যেন তার সকল বৈশিষ্ট নিয়ে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে, সেটা নিশ্চিত করা চাই, যাতে বিষয়টা অস্পষ্ট কিংবা অবাস্তব তাত্ত্বিকতার স্তরে থেকে না যায়। বাস্তব বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্টগুলো ইতিপূর্বে দাওয়াতকারীর স্বভাব ও মেজাজ সংক্রান্ত আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

আপনার বক্তব্য বিষয়ের বিভক্তিকরণে কিংবা আপনার উপাদানের চরিত্র বিশ্লেষণে দার্শনিক বিভক্তিকরণ অথবা সূক্ষ্মতর তাত্ত্বিক নিরীক্ষা এড়িয়ে চলুন, যেমন আলোচ্য শ্রেষ্ঠ মানুষের উপাদানসমূহের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আপনার নিকট প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ করিনি। আমি ছাড়া অন্য কেউ হয়তো আমার থেকে ভিন্নতর পন্থা অনুসরণ করবে। আমরা শ্রেষ্ঠ মানুষের উপাদান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক সবকিছুর উল্লেখ করিনি এই জন্য যে, এমন সর্বাত্মক দার্শনিক বর্ণনা দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, যা কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা ও কার্যকারণসমূহের অভ্যন্তরে গভীরতর পর্যবেক্ষণ চালায়। আমরা শুধুমাত্র তিনটে উপাদানকে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি। (আত্মসম্ভ্রম, জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত এবং জ্ঞান) এগুলো আমাদের সামনে মানুষের স্বাভাবিক ও জন্মগত পরিমণ্ডলকে স্পষ্টভাবে ও উজ্জ্বলভাবে দেখিয়ে দেয়। এ তিনটে ছাড়াও প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বৈশিষ্ট যদি সবিস্তারে উল্লেখ করতে চাইতাম, তাহলে অনেক কষ্ট করেও আলোচনা শেষ করতে পারতাম না। যখন আলোচনা শেষ করতাম তখন অনেক পারস্পরিক সংঘর্ষশীল বিরোধ ও বিতর্ক সৃষ্টি করে রেখে আসতাম। আর এমন সব উদ্ভট মতবাদ তুলে ধরতাম, যার বিশুদ্ধতার পক্ষে এখনো পর্যন্ত তার ধারক ও বাহকরা উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাতে পারেনি। ঐ তিনটে উপাদানকে নির্বাচন করার সময় আমাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ছিল এই যে, আমাদেরকে এমন কথাই শুধু বলতে হবে যা শ্রোতার সহজাত মেজাজ ও বিবেক-বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এটুকুই আমরা যথেষ্ট মনে করেছি। সে কথা সর্বাধিক পরিমাণ বিস্তারিত হতে হবে, এমন কোন ধারণা আমাদের ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কার্যত আমরা যা বলেছি, তা যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তারিত। কেননা ইসলামে যা কিছু কল্যাণকর, তা আকারে ও আয়তনে ছোট বা বড় হলেও সবটার মূল স্রোতধারা একই। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যদি কোন শিশুর মধ্যে কোন বিশেষ সদগুণের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টায় তাকে লালন-পালন করতে থাকেন, তাহলে পরিশেষে দেখবেন, আপনার ঐ চেষ্টা তার মধ্যে আরো অনেক সদগুণের সৃষ্টি ও বিকাশে সহায়ক হয়েছে। বস্তুত আল্লাহর বিধানের এ এক দুর্ভেদ্য রহস্য, এক অমোঘ নিয়ম।

(ঘ) ভাষণে এমন কিছু উপাদানও থাকা চাই, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ সংস্কার ও সংশোধনের (নিজ সত্তা ও সমাজ—উভয়ের) লক্ষ্যে যেটুকু চেষ্টা ও সাধনাই করে—চাই তা যে কোন ধরনের নেক আমল হোক, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ স্বীকার করা হোক, মহৎ আদর্শ ও সচ্চরিত্রের ওপর অবিচল থাকা হোক, অথবা বিকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধে কষ্ট সহিষ্ণুতার ও পরিচয় দেয়া হোক—তার সুফল সে শুধু আখেরাতেই নয়, দুনিয়াতেও ভোগ করে। এই সত্যটি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা প্রয়োজন। এর কারণ শুধু এই নয় যে,

www.pathagar.com

এই চেষ্টা ও সাধনা মানুষের হৃদয়কে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে, তার সংকল্পকে ধারালো ও তেজোদ্দীপ্ত করে এবং তার উচ্চাশা ও উচ্চাকাঙক্ষায় নবতর শক্তির উন্মেস ঘটায়। বরং এর কারণ এও যে, এটাই মানুষের প্রাণবন্ত জীবনের স্বপক্ষে একমাত্র অকাট্য যুক্তি এবং সৃষ্টির স্থায়িত্বের একমাত্র অটুট ও অমোঘ বিধান। বস্তুত প্রত্যেক জিনিসেরই মূল্য এবং প্রত্যেক শ্রমেরই পারিশ্রমিক না থেকে পারে না। শারীরিক কিংবা মানসিক চেষ্টা-সাধনা মাত্রেরই ফলাফল দুনিয়া ও আখেরাতে পাওয়া দরকার। আর প্রত্যেক কাজেরই পরিণাম হবে আপনার নিয়ত অনুযায়ী—যে নিয়ত আপনি ঐ কাজ শুরু করার সময় করেছিলেন। এটা আল্লাহর সেই অমোঘ বিধান—যার বিন্দুমাত্র হেরফের হয় না ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতিসমূহের জীবনে। বঞ্চনা হচ্ছে অলসতার, ব্যর্থতা হলো নৈরাজ্য ও বিশৃংখলার এবং বিরোধ-বিতর্ক, অনৈক্য, বিভেদ ও বিফলতা হচ্ছে স্বৈরাচারের অনিবার্য পরিণতি।

(ঙ) উপরোল্লিখিত চেষ্টা-সাধনা দ্বারা দাওয়াতকারীর একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহমুখী আবেগ ও উদ্দীপনার সঞ্চার এবং অন্তরে আল্লাহভীতি ও সৎকর্মের ভাবধারার বিস্তৃতি ঘটানো। বক্তৃতা ও ভাষণের বিষয়বস্তু যা-ই গ্রহণ করা হোক, তা উক্ত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই পরিচালিত হওয়া চাই। অন্য কথায় বলা যায় ঃ ভাষণের ক্ষেত্রে দাওয়াতকারীর দু'টো মৌলিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে। একটি হলো, তার নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর যথাযথ সদ্ব্যবহার। দ্বিতীয়টি মনের উক্ত আবেগ ও উদ্দীপনাকে এমনভাবে উজ্জীতি করা যেন তা মানুষকে আল্লাহমুখী করে তোলে। প্রথম উদ্দেশ্যটা হবে একাধারে মৌলিক উদ্দেশ্য ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের মাধ্যম। আর এজন্য শ্রোতার সামনে এমন বক্তব্য রাখতে হবে, যাতে সে এই চেতনা লাভ করতে পারে যে, সে একজন দায়িত্বশীল মানুষ, তাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং আল্লাহর চোখ চিরজাগ্রত, তিনি তাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখছেন এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন। মানুষ তার অন্তরে বহমান চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বান্দার সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার উপযুক্ত পরিপূর্ণ কল্যাণের আকর বানিয়ে ফেলতে সক্ষম। প্রকৃত সুখী ও সৌভাগ্যশালী বান্দা হলেন তিনি —যিনি নিজের প্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করেছেন। এই কথা-গুলোকে ভাষণের একটা অংশের অন্তর্ভুক্ত করুন যদি পরিস্থিতি ও পরিবেশ তাই দাবী করে। আবার বক্তৃতার সকল অংশে এগুলোকে ছড়িয়েও দিতে পারেন—যদি অবস্থা অনুসারে সেটাই অপরিহার্য মনে হয়। অথবা বক্তৃতার একাংশ বাদে আরেক বা একাধিক অংশে তা বিস্তৃত করতে পারেন। বিষয়বস্তুর চাহিদা এবং নিজের বাস্তব বুদ্ধিমত্তা ও কাণ্ডজ্ঞানের অভিরুচী ও দাবী অনুসারে আপনার এ ক্ষেত্রে করণীয় কি, তা স্থির করুন।

www.pathagar.com

(চ) আপনার ভাষণ শুরু করার আগে নিজের ও শ্রোতাদের মধ্যে একটা আন্তরিক সখ্যতার মনোভাব ব্যক্ত করে নিলে খুবই ভালো হয়। কেননা এটা না করে আলোচ্য বিষয়কে সরাসরি শ্রোতাদের গোচরে আনায় তাদের আবেগ ও অনুভূতি আচমকা এমন একটা ব্যাপারের সম্মুখীন হবে যার জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। মনে রাখবেন, মানুষের আবেগ ও অনুভূতি অর্গলবদ্ধ ঘর স্বরূপ। আর কুরআন তো অন্যের ঘরে সালাম ও পরিচয় না দিয়ে আচমকা ঢুকতে নিষেধ করেছে। তাই আন্তরিক সখ্যতার অভিব্যক্তি ঘটানো ও পরিচিতি প্রদান একান্ত জরুরী। এমন একটা সরল ভূমিকার অবতারণা দ্বারা এ কাজটা সমাধা করা যেতে পারে, যাতে অত্যন্ত সহজবোধ্য বিষয়ের উল্লেখ থাকবে। সে বিষয়টা এমন হওয়া চাই যে, তা বুঝতে সামান্যতম বুদ্ধি খাটানোর প্রয়োজন পড়ে না। যেমন এমন কোন ঘটনা দিয়ে শুরু করা হলো, যার সম্মুখীন হয়েছে বক্তা নিজেই। অথবা বক্তা চলার পথে তা দেখেছে, কিংবা কোন খবর শুনেছে বা দেখেছে অথবা ঐ মজলিসেই কোন মন্তব্য তার গোচরীভূত হয়েছে, কিংবা পূর্ববর্তী বক্তা বলে গেছেন এমন কোন কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য এ জাতীয় সকল ব্যাপারই উক্ত মজলিস বা মাহফিলের সাথে এবং তার দাওয়াতের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্ক যুক্ত হওয়া চাই। অতপর ভূমিকার সেই বক্তব্যের সাথে পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী রসিকতাপূর্ণ চটুল মন্তব্য, কোন অনাগত শুভ ঘটনার আশ্বাস ও সুসংবাদ, অথবা অন্য কোন আবেগ ও অনুভূতিকে নাড়া দেয়ার মত দক্ষ মন্তব্য জুড়ে দিতে হবে। এভাবে যখন শ্রোতাদের মন আপনার দিকে ঝুঁকবে এবং সকলে আপনার জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেবে, তখন বুঝতে হবে, সমগ্র পরিস্থিতি আপনার মুঠোর মধ্যে এসে গেছে এবং পুরো সমাবেশের গতিপ্রবাহ তখন আপনার অনুকূলে। তাই কালবিলম্ব না করে এই অনুকূল প্রবাহকে ধরুন এবং সামাল দিন। নিজের মূল বক্তব্য বিষয়ে এবার এমনভাবে বক্তৃতা দিতে শুরু করুন, যেন শ্রোতাদের সাথে আপনার যে সখ্যতা গড়ে উঠেছে তা যেন নষ্ট না হয়। এর উদাহরণ চাইবেন না। কারণ, এটা শিখানোর মত কোন ব্যাপার নয়। আপনার সুষ্ঠু অভিরুচী এবং সজাগ অনুভূতিই আপনাকে আপনার কি করণীয়, তা শিখিয়ে দেবে। আপনাকে শুধু সচেতন ও সচকিত করে দেয়াই যথেষ্ট।

(ছ) এখানে আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। দাওয়াতকারীর মনে ভাষণ রাতারাতি পরিপক্ক ও বদ্ধমূল হয় না। পরিপক্কতা অর্জনে দীর্ঘ সময় লাগে এবং বেশী বেশী করে বক্তৃতা দেয়ার প্রয়োজন হয়। সুতরাং আপনার উচিত বারবার বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেয়া এবং প্রতিবার বক্তৃতা দেয়ার পর আত্মসমালোচনা করা। প্রতিবার বক্তৃতার আগের ও পরের পরিস্থিতির তুলনা করে দেখুন। এতে

www.pathagar.com

আপনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিপুল ক্ষমতা ও উচ্চমানের স্থায়িত্ব অর্জিত হবে। আর কথা বলাও সহজতর হয়ে আসবে। বারংবার একই বিষয়ে বক্তৃতা দেয়াতে তথ্যাবলীর সংমিশ্রণ ঘটবে। একটি তথ্য থেকে নতুন আরেক তথ্য বেরিয়ে আসবে এবং তার মূল্য ও মান বাড়বে। ভীত হয়ে কখনো এরূপ ভাববেন না যে, একই বক্তৃতা বারবার দেয়াতে অবসাদ ও অক্ষমতা জন্মে। কোন লোক আপনার সফর সঙ্গী হলে এ আশংকায় ভুগবেন না যে, একই বক্তৃতার বারংবার পুনরাবৃত্তি করায় ঐ লোকটি আপনার বিদ্যা কম মনে করতে পারে, এসবই কুপ্ররোচণা ও কুধারণা। সত্যের পুনরাবৃত্তিতে সত্যের মান কমে না, বক্তারও মর্যাদা খাট হয় না। কেবল সত্যের ওপর থাকলেই হয় এবং সত্যের দাওয়াত দিলেই হয়। পুনরাবৃত্তির একটা অন্যতম উপকারিতা এই যে, তাতে দাওয়াতকারীর ঈমান বাড়ে। নীতির দৃঢ়তা জন্মে এবং নিজের বক্তব্যের সাথে নিজের সংহতি ও সংযোগ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে দাওয়াতকারী যখন নিজেকে বহুমুখী রকমারি বক্তৃতা প্রস্তুত করার কষ্টকর কাজে নিয়োজিত করে এবং অন্যদেরকে এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে, সে জ্ঞানের এক কূল-কিনারাহীন সমুদ্র, এক এক শহরে এক এক বিষয়ে বক্তৃতা করে, তখন সেটা হবে দাওয়াতের এক নিষ্ফল প্রক্রিয়া। তাতে জনগণ কোন একটি বিষয়ও ভালো করে বুঝতে ও আয়ত্ব করতে পারবে না। অধিকন্তু তা অহংকার, রিয়াকারী ও খ্যাতিলিপ্সার জন্ম দেবে। এ ক্ষেত্রে একথাটা জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে, রসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় তাঁর রসূল জীবনের এক যুগ অতিবাহিত করেন এবং এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি প্রত্যেক গোত্রের কাছে গিয়ে একই কথা বলতেন, বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করতেন না। তিনি বলতেন ঃ "আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর, আল্লাহ ছাড়া এই যে সকল মূর্তির পূজা করছ, তা বর্জন কর এবং আমি যাতে আল্লাহর দিকে ডাকতে পারি সে জন্য আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর।" কারণ, তিনি একটি প্রকৃত সত্যের প্রচারেই লিপ্ত এবং তার দিকেই দাওয়াত দিতে ব্যস্ত। নিজের প্রতিভা, বিদ্যাবুদ্ধি ও বাগ্মীতার দাপট দেখিয়ে মানুষকে তাক লাগিয়ে দেয়ার কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

২—দারস বা পাঠদান বা শিক্ষাদান

ওয়ায়েজ ও প্রচারকদের এটা একটা ব্যাপক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা কুরআনের একটি আয়াত বা রসূলের একটি হাদীসকেই শিক্ষাদানের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।

আমার মতে শিক্ষাদান বক্তৃতা বা ভাষণ দেয়ার চেয়েও কঠিন। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, বক্তৃতা বা ভাষণের চেয়ে দারস বা শিক্ষাদানের কাজেই দাওয়াতকারীর সূক্ষ্মবুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি শক্তির

www.pathagar.com

প্রয়োজন অধিক। ভাষণদাতা জনগণকে একটি নির্দিষ্ট বিষয় ভালো করে বুঝিয়ে দেয়ার মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখে। কুরআনের আয়াত ও হাদীস তার বক্তব্যকে সপ্রমাণ করার একাধিক সূত্রের মধ্যে একটি সূত্র হিসেবে বিবেচিত। বলা বাহুল্য, সে সূত্রটি তার উদ্দেশ্যের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কিন্তু যিনি দারস দেন, আয়াত ও হাদীস তাকে অধিকতর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দীর্ঘস্থায়ী চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব অর্পণ করে। প্রত্যেক শব্দ এমনকি কখনো কখনো কোন কোন অক্ষর সম্পর্কেও থমকে দাঁড়িয়ে বুঝে নেয়ার তাগিদ দেয়। আর প্রত্যেকবার থমকে দাঁড়িয়ে বুঝে নেয়ার চেষ্টার মধ্যে বহু সূক্ষ্ম ইংগীত, জ্ঞান ও আল্লাহর বিদ্যার সমারোহ ঘটেছে। এসব জ্ঞান, বিদ্যা ও আল্লাহর ইংগীতের জ্যোতি গবেষকের বুকে প্রোজ্জ্বল হয় এবং সেই নূরের কল্যাণেই তার বুক প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সে খুশীতে মাতোয়ারা হয়।

এখানে আমি এ বিষয়ে তাগিদ দিতে চাই যে, দারস বা শিক্ষাদানমূলক বক্তব্যে মন গলানো, বিবেকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও প্রজ্ঞায় চেতনা সঞ্চারকারী কথার সমাবেশ ঘটা উচিত অপেক্ষাকৃত বেশী। আয়াতের শব্দগুলোর মধ্যে যখন বিস্তর প্রশস্ততা লক্ষ্য করবেন এবং তার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা কোন নিগূঢ় মর্মার্থের সন্ধান পাবেন, তখন সে আয়াত থেকে ইপ্সিত তাৎপর্য খুঁজে বের করতে তৎপর হউন। অতপর তাকে সুবিন্যস্ত করুন এবং একটি শব্দের তাৎপর্যের সাথে অপর শব্দের তাৎপর্যের সংযোগ সাধন করুন। এরপর ক্রমান্বয়ে আপনার আলোচনার গন্ডী প্রশস্ত করুন। কুরআনের অন্যান্য যেসব আয়াত, রসূলের যেসব হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের যেসব জীবনী ও বাণী এবং প্রাচীন ও আধুনিক মনীষীদের যেসব বক্তব্যের সাথে একটি বিশেষ আয়াতের তাৎপর্যের যোগসূত্র রয়েছে, সে সবের বর্ণনা দিতে থাকুন। আর এ সবের সাথে আমাদের জীবনের চলতি ঘটনাবলী ও বাস্তব পরিস্থিতির সংযোগ সাধন করুন ও তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ চালান।

এভাবেই দারসে কুরআন সম্পন্ন করুন এবং দারসে হাদীসের বেলায়ও এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন।

আমার দৃষ্টিতে বক্তৃতা ও ভাষণের চেয়ে দারস বা শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াই বেশী উপকারী। দারস যে কোন সময় সহজেই দেয়া যায়। এজন্য নিজের দৈনন্দিন গাল-গল্পের মজলিস বা সামাজিক বৈঠকাদিকেও আপনি ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনার মহল্লার মসজিদে বসেই এটা শুরু করতে পারেন। আল্লাহর যে বান্দারা আসবে, তাদেরকেই শিক্ষা দেবেন। এর চেয়ে বেশী কোন আয়োজন আপনার করতে হবে না। কিন্তু বক্তৃতা ও ভাষণ শোনানোর কাজটা এত সহজে হয়ে ওঠে না।

www.pathagar.com

দারসের ঐ বিশেষ সুবিধাটির কারণ এই যে, সেখানে উপস্থিত শ্রোতার সংখ্যা সচরাচর কম হওয়ার কারণে দারসদাতা তাঁর মন গলানো কথা দিয়ে শ্রোতাদের মনে জোরদার প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং তাদের সাথে নিজের রূহানী বন্ধন ও কার্যকর পরিচিতির সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হন। এজন্য তিনি শ্রোতাদেরকে সাথে নিয়ে তার ইন্সিত ব্যাপারে কৃতকার্য ও বিজয়ী হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে ভাষণদাতার শ্রোতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল শোনার জন্য এবং শোনার মাধ্যমে কিছু সময় কাটানোর জন্য আসে। ভাষণদাতা যখন তার ভাষণ দ্বারা তাদের মনের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং মুগ্ধ করে, তখন তার প্রভাব অধিকাংশের বেলায় ক্ষণস্থায়ী হয়। বক্তৃতা বা ভাষণের এমন শ্রোতা খুব কমই হয়ে থাকে, যে ভাষণদাতার চিন্তাধারার অনুসারী ও তার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

তাই বলে বক্তৃতা ও ভাষণের মর্যাদা আমি খাটো করতে চাইছি না। কেননা আমাদের দাওয়াতের বিস্তৃতি তো মহান মোরশেদে আম রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষণসমূহ দ্বারাই ঘটেছে। আমি শুধু সেই সব লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি যারা বক্তৃতার সুযোগের অপেক্ষায় বিপুল সময় নষ্ট করে থাকেন। তাই বক্তৃতা শোনার জন্য বিরাট জনসমাগম না হলে আর তাঁরা কথাই বলেন না। এমনকি আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীস অধ্যয়ন এবং তার গভীর উপলব্ধির কল্যাণে আপনি যদি যথার্থ জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারীও হন, তথাপি আপনি মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কেননা আপনার শ্রোতারা আবেগ ও অনুভূতি আপনার মত জাগ্রত ও ধারালো নাও হতে পারে। তাই ভাষণের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বক্তব্য পেশ করার আগে শ্রোতাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা আপনার পক্ষে একান্ত জরুরী। আপনার রুচী অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দ্বারা শ্রোতাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার এ কাজটা আপনি অত্যন্ত নিপুণভাবে করতে পারেন। কেননা এ কাজটা আপনার পুরোপুরি আয়ত্বাধীন।

বিশিষ্ট সাহাবী সালমান ফারসী (রা) বলেন ঃ "একবার আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটা গাছের নীচে বসেছিলেন। তিনি গাছ থেকে একটা শুকনো ডাল ভেঙ্গে নিলেন। অতপর ডালখানা নাড়া দিলেন। অমনি তার শুকনো পাতাগুলো ঝরে পড়লো। তখন তিনি বললেন ঃ সালমান ঃ তুমি কি জানতে চাওনা কেন আমি এ কাজটা করছি। আমি বললাম ঃ জ্বি, কেন এ রকম করছেন? তিনি বললেন ঃ মুসলমান যখন যথাযথভাবে ওজু করে অতপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তখন তার সমস্ত গুনাহ এই পাতাগুলোর মত ঝরে যায়।"

www.pathagar.com

অতপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়লেন :

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ

"দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ পর নামায কায়েম কর। নিশ্চয় ভালো কাজগুলো খারাপ কাজগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে। স্মরণকারীদের জন্য এটা যথার্থই স্মরণিকা।"—(সূরা হুদ : ১১৪)

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, রসূল (সা) এ আয়াতটা এবং তার ব্যাখ্যা তুলে ধরার আগে যে রূপ চমকপ্রদ বাস্তব ভূমিকা দিয়ে দিলেন। তাতে এ বক্তব্য মন-মগজের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। বরং অধিকতর প্রাণবন্ত ও আনন্দোদ্দীপক হয়েছে। কেননা আয়াত ও তার মনোমুগ্ধকর ব্যাখ্যার আলোকরশ্মী দিয়ে তিনি শ্রোতার মন-মগজকে আগেভাগেই আলোকিত করে নিয়েছেন। রসূলের (সা) বুদ্ধি ও অনুভূতি যতখানি প্রখর ও জাগ্রত ছিল, এবং কুরআনের প্রাণশক্তির পরশে তাঁর মন যতখানি সজীব ছিল। আমাদের কারো ততটা কস্মিনকালেও হবার কথা নয়। তা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর কিতাবের উপদেশাবলীকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রায়োজন মনে করেছেন। রসূলের (সা) চেয়ে আমাদের পক্ষে আরো বেশী প্রয়োজন এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বনের। আর সেটা সম্ভব একমাত্র প্রজ্ঞাবান বিবেকের পথনির্দেশে এবং বাস্তবমুখী বুদ্ধিবৃত্তির বিচক্ষণতার কল্যাণে। আমরা আগেই বলেছি যে, এ বস্তুটা একজন দাওয়াতকারীর অপরিহার্য সম্বল।

বক্তৃতার আগে এ জাতীয় বহু আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ ভূমিকা পেশ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব। যে ব্যক্তি কোন আয়াত বা হাদীসকে ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করে। তার কিছু কিছু সূক্ষ্ম ইংগীত ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করে এবং তার মধ্য থেকে উদ্ভাবন করতে পারে কোন বিস্ময়োদ্দীপক অভিনব বিজ্ঞানময় তত্ত্ব অথবা কোন চটুল, রসাত্মক ও কৌতুকপ্রদ মন্তব্য যা তার অন্তর্নিহিত তথ্য জানার জন্য স্বভাবতই মনকে কৌতুহলী করে তোলে। এর একটা উদাহরণ নিন। ইতিহাস খ্যাত কোন এক মুসলিম মনীষী একবার তার শিষ্য ও শ্রোতাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : আচ্ছা, এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকাকালেই জান্নাতে যেতে ইচ্ছুক—এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে ? সকলেই সমস্বরে নিজ নিজ প্রবল আগ্রহ ব্যক্ত করলো। কেননা জান্নাত তো আখেরাতে পাওয়ার কথা। দুনিয়ায় বসেই কিভাবে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব ?

মুসলিম মনীষী বললেন : তাহলে তোমরা সর্বসময় ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও আল্লাহর স্মরণমূলক আলোচনার মজলিসগুলোতে যাবে। কেননা এগুলো

www.pathagar.com

জান্নাতের বাগিচা। তিনি নিম্নলিখিত হাদীস উদ্বৃত করে এ বক্তব্যের স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ পেশ করলেন ঃ

"যখন তোমরা জান্নাতের বাগিচাগুলোর কাছ দিয়ে যাবে, তখন সেই বাগিচার ফল ও ফুল আহরণ কর। সাহাবীগণ বললেন ঃ হে রসূল ! জান্নাতের বাগিচাগুলো কি ? তিনি বললেন ঃ দ্বীন সংক্রান্ত আলোচনার মজলিস।

৩—খুতবা বা ক্ষুদ্র বক্তৃতা

ভাষণ ও খুতবার মধ্যকার পারিভাষিক পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

(ক) বক্তৃতা বা ভাষণ তত্ত্ব ও তথ্য প্রধান। আর খুতবা হলো আবেগ প্রধান। প্রবল আবেগের জোয়ার সৃষ্টিকারী ওয়াজ ও নছিহতেরই সমাবেশ ঘটে থাকে খুতবায়।

(খ) ভাষণের উপাদানগুলো মূলনীতি, বিধি ও নির্দেশমালার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। আর খুতবার উপাদানগুলো সাময়িক চিন্তাধারা এবং জরুরী ও স্বল্পস্থায়ী বক্তব্যের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ।

(গ) ভাষণের বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যা ও যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু খুতবার বক্তব্য ঢিলাঢালা ধরনের এবং সহজ-সরল ও স্বাভাবিক প্রকৃতির। উপস্থিতভাবে যেসব তত্ত্ব, তথ্য ও ধ্যান-ধারণা মনে আসে, তাই খুতবার উপজীব্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে, খুতবা মৌখিক ও উপস্থিত বক্তৃতা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু খুতবা কেন, সকল দারস ও ভাষণ মৌখিক ও উপস্থিত হওয়াই ভাল। লিখিত ভাষণ ও লিখিত খুতবা যারা পেশ করেন, তাদের দিয়ে আমাদের বিশেষ কোন ফায়দা নেই। সমাজে জাগরণ ও অভ্যুত্থান আনতে এ জাতীয় বক্তাদের দরকার বা স্বার্থকতা নেই।

অবশ্য স্থান বিশেষে লিখিত বক্তব্য পেশ করার প্রয়োজন হতেও পারে। যেখানে শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকা ও কথার লক্ষ্য স্পষ্ট হওয়া দরকার, সেখানে এটা করা যেতে পারে। যেমন রাজনীতিক, সরকারী কর্মকর্তা, কিংবা সরকারী আলাপ-আলোচনা পরিচালনাকারীদের প্রয়োজন হয়। তাদের ভাষায় ও বক্তব্যে এমন অর্থ ও ইংগীত থাকার প্রয়োজন হয়, যা মৌখিক ও উপস্থিত বক্তব্যে যথাযথভাবে থাকা সম্ভব নয়। এ ধরনের লিখিত বক্তব্যকে আমরা 'বিবৃতি' নামে আখ্যায়িত করতে পারি। কিন্তু কোন বক্তব্যকে যদি খুতবা নাম দিতে হয় তাহলে এসব লিখিত ভাষণ সে নামের যোগ্য নয়। কেননা আমরা যে ধরনের উজ্জীবনী শক্তিসম্পন্ন বক্তব্য চাই, লিখিত ভাষণ সে শ্রেণীভুক্ত নয়। উপস্থিত বক্তৃতা বলতে আমরা শুধু তার শাব্দিক কাঠামোর তাৎক্ষণিক উপস্থাপনাই

www.pathagar.com

বুঝাই—মূল বক্তব্যের ও উপাদানের তাৎক্ষণিক উপস্থাপনা নয়। কেননা একজন দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন বক্তার বক্তব্য কি হবে তা তার আগে থেকেই জানা থাকতে হবে। পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে তার চিন্তাধারাকে বিন্যস্ত করতে হবে এবং সে অনুসারে তার নীতিকে সাজিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হবে। একাধিকবার মনে মনে তা আওড়াতে হবে ও অনুশীলন করতে হবে।

এভাবে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে যে উপস্থিত বক্তৃতা দেয়া হয় তা আসলে বিষয়কেন্দ্রিক ও রচিত বক্তৃতা। তা যুক্তি সমৃদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী। দাওয়াতকারী যখন বক্তব্য পেশ করতে দাঁড়ায় তখন সে নিজের আবেগকে অত্যন্ত সংযত রেখে দৃষ্টিকে শান্ত রেখে এবং নিজের মেজাজ ও বক্তব্য বিষয়কে পুরোপুরি আপন নিয়ন্ত্রণে রেখেই দাঁড়ায় এবং তার নিজের কাছে যা কিছু চিন্তাধারা সঞ্চিত আছে, তার ওপর নির্ভর করেই দাঁড়ায়। বক্তৃতা দিতে দিতে যদি তার সামনে নতুন কোন চিন্তা ও ধারণা আসে, তাহলে সেটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। নচেৎ তার নিজের সঞ্চিত পুঁজি থেকে খরচ করাই তার জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়া আরো এক রকমের উপস্থিত বক্তৃতা আছে। এতে পূর্বপ্রস্তুতির অবকাশ থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বক্তার মনের সাময়িক ভাবান্তরের প্রতিধ্বনি। অথবা কোন আবেগ উদ্দীপক ঘটনা জানা অনুরূপ দৃশ্য দেখা বা অভিনব কিছু শোনার প্রতিক্রিয়া। এরূপ ক্ষেত্রে যতক্ষণ তার মনের গ্রন্থি না খুলবে এবং তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে বলে অনুভব না করবে, ততক্ষণ সে উদ্ভূত পরিস্থিতির দাবীতে ও চলমান ঘটনাবলী দ্বারা চালিত ও উৎসাহিত হয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে বক্তৃতা দিয়ে যাবে। যখন তার উত্তেজনা প্রশমিত হবে ও মনের জট খুলবে কেবল তখনই তার স্বতস্ফূর্ত বক্তৃতা থেমে যাবে।

এ ধরনের উপস্থিত বক্তৃতার লক্ষ্য শুধুমাত্র সাময়িকভাবে শ্রোতাদেরকে উত্তেজিত ও উদ্দীপিত করা, তাদেরকে কোন বিশেষ লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত করা, অথবা সেই মুহূর্তের জন্য প্রয়োজনীয় কোন কাজে উৎসাহিত করা। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তব্যকে কেন্দ্রীভূত করা, কিংবা বক্তব্যকে সুচিন্তিতভাবে রচনা করা বা যুক্তিপ্রমাণ সমৃদ্ধ করা এ জাতীয় বক্তৃতার লক্ষ্য নয়।

আবেগতাড়িত এরূপ উপস্থিত বক্তৃতা দ্বারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা দায়িত্ব সমাধা করা যায় কেবল তখনই—যখন বক্তা কোন মৌলিক যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী হয়, পর্যাপ্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা তার কাছে সঞ্চিত থাকে, সেসব অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা ও তা নিয়ে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করার পর নিজ বক্তব্যে এমনভাবে মনোনিবেশ করে যেন তা তার সুচিন্তিত ও পূর্বপ্রস্তুত বক্তৃতা। এরূপ যোগ্যতা, প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী না হলে তার বক্তৃতা অসংলগ্ন ও অগোছালো হতে বাধ্য। এ ধরনের বক্তৃতা খুব নীচুমানের ও অবিন্যস্ত হওয়ার কারণে শ্রোতাদের কাছে বিরক্তিকর ও একঘেয়ে মনে হতে পারে।

www.pathagar.com

আদৌ প্রস্তুতি না নিয়ে অনর্গল বক্তৃতায় অভ্যস্ত, এমন বেশ কিছু সংখ্যক উপস্থিত বক্তাকে দেখেছি যে, তাদের প্রতিভা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এ ধরনের বক্তা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য দিতে শুরু করে সহসা বিষয়ান্তরে চলে যান এবং তারপর সে বিষয় থেকে আবার অন্য বিষয়ে যান। এভাবে খেই হারানো বক্তৃতা দিতে দিতে অবশেষে যে বিষয় নিয়ে বক্তব্য শুরু করেছেন, তা একেবারেই ভুলে যান। এ ধরনের বক্তৃতা কারোরই ভালো লাগার কথা নয়।

একথা সত্য যে, এ ধরনের বক্তারা অনেক সময় নিজের মতামতকে অধিকাংশ শ্রোতার গোচরের আড়ালে রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু এখানে প্রশ্নটা মতামত গোপন বা প্রকাশ করা নিয়ে নয়। কেননা দাওয়াতকারী কোন সার্কাস বা ম্যাজিক দেখাতে আসেননি যে, মানুষের কাছ থেকে তার ভুলত্রুটি ও মিথ্যাচার লুকাবেন। বরং তিনি এসেছেন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিসারী এক সুমহান ব্রত ও দায়িত্ব নিয়ে। দেখতে হবে, তার সেই লক্ষ্য অর্জিত হলো কিনা। দেখতে হবে, যে বিশেষ কাজ বা দায়িত্ব নিয়ে তার বক্তৃতা কেন্দ্রীভূত, তা কি তিনি সুসম্পন্ন করেছেন, না নিজের মতামত গোপন করা আর চুপ থাকার পথ অবলম্বন করেছেন।

৪—প্রবন্ধ

"দাওয়াত ও দাওয়াতকারী সংক্রান্ত উপলব্ধি" শীর্ষক আলোচনায় আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, ইসলামী আন্দোলনের জন্য কিছু কিছু লিখতে পারা আবশ্যক। আমরা আমাদের সেই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করবো না। এখানে আমরা শুধু একটি কথা বাড়িয়ে বলতে চাই। সেটা এই যে, বই লেখার মাধ্যমে যারা দাওয়াতের কাজ করতে ইচ্ছুক, তারা যেন এটা বুঝে নেন যে, তার লেখার কাজটা সমাজের সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর তথা জ্ঞানী-গুণী, মূর্খ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের জন্য হওয়া চাই। এতে করে তার অবস্থান নেমে আসবে সাধারণ জনগণের স্তরে। নিজের পড়া ও শোনা যাবতীয় কথা বুঝবার ব্যাপারে তার এই স্তরে নেমে আসা যথেষ্ট সহায়ক। তার এ স্তরটা হলো সহজ-সরল ভাষা প্রয়োগ ও পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার স্তর। আর চিন্তাধারা পরিচ্ছন্ন হবে তখনই যখন তা নির্মল মন থেকে জন্ম নেবে। উদাহরণ স্বরূপ, মন যখন দেশ প্রেমের ভাবধারায় কিংবা ধর্মীয় চিন্তায় উজ্জীবিত হবে, কিংবা মনে যখন কোন মানবীয় অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সঞ্চিত হবে, অথবা সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে পরিচালিত গঠনমূলক সমালোচনা পুঞ্জীভূত হবে, তখন লেখনীর মাধ্যমে সেই চিন্তাধারাই সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠবে।

www.pathagar.com

চিন্তাধারা যখন কোন ভাবাবেগে উজ্জীবিত হবে, তখন নিসন্দেহে তা সহজ ও প্রাঞ্জল হতে বাধ্য। তাই বলে চিন্তাধারা প্রাঞ্জল হলেই ভাষা আপনাআপনি প্রাঞ্জল হবে কিংবা তা গণমুখী ভাষা হবে, এমন কোন কথা নেই।

কোন এক দাওয়াতকারী তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার রচিত অমুক বইখানা সম্পর্কে তোমার মত কি ? সে বললো ঃ আপনার বর্ণনাভঙ্গী আপনার বক্তব্যকে ওপর তলায় নিয়ে রেখেছে। তাই রাস্তার লোকেরা তার নাগাল পাচ্ছে না এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। অবশ্য ওপর তলার লোকেরা তার নাগাল পাচ্ছে এবং তার মান ভাল কি মন্দ তা বুঝতে পারছে। আপনি যদি আপনার বক্তব্যকে নীচের তলায় নামিয়ে আনতে পারতেন, তাহলে সকলেই তার নাগাল পেত এবং পথের লোকেরা তা দ্বারা উপকৃত হতো। দাওয়াতকারী এ জবাবে একটু গোস্বা হয়ে বললেন ঃ জনগণকে আমাদের স্তরে উন্নীত করা আমাদের দায়িত্ব জনগণের স্তরে নেমে যাওয়া নয়। বন্ধুটি বললো ঃ আপনি যদি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হতেন তাহলে একথাটা আপনাকে মানাতো। কিন্তু আপনি এমন একটি দাওয়াত ও এমন একটি আদর্শের নিশানবাহী, যা নিয়ে সবার সামনে যাওয়া, সবার সাথে কথা বলা এবং সবাইকে বুঝানো আপনার কর্তব্য। কিন্তু আপনি যখন মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধিমত্তার সাধারণ মান অনুসারে কথা বলেননি, তখন আপনি বৃথাই সময় নষ্ট করেছেন এবং আপনার আদর্শকে আপনি হেয় করেছেন। একজন ব্যবসায়ীকে দেখুন, তার ব্যবসাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া এবং মানুষ যাতে তার পণ্য সম্পর্কে জানে ও তা কিনতে আগ্রহী হয়, সে জন্য সে কত কৌশল অবলম্বন করে।

আপনিও তেমনি মানুষের সামনে একটি দোকান খুলেছেন। কাজেই কিভাবে জনগণকে আপনার পণ্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলবেন ভেবে দেখুন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা একটা কথা জানিয়ে রাখছি যে, বই পড়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ উদারাময় গ্রস্ত শিশুর মত। খাদ্য দেখলেই নাক ছিটকায় ভ্রূকুঞ্চিত করে এবং তার পাকস্থলী সংকুচিত হয়ে আসে। সে জন্য তার মা-বাপ ক্রমাগত আদর আহ্লাদের মাধ্যমে তাকে খেতে সাধাসাধি ও পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, তার খাওয়ার স্পৃহা জাগাতে চেষ্টা করতে থাকেন এবং খাদ্যকে তার কাছে প্রিয় করে তোলার জন্য রকমারি কৌশল অবলম্বন করেন—যাতে সে অন্তত জীবনধারণের মত কিছু খাদ্য মুখে দেয়।

একথা সত্য যে, সাধারণ মানুষের অনেককে আমরা বই-কিতাব পড়তে দেখি। কিন্তু সেসব বই তাদের কোন উপকার সাধন করে না। নিছক সময় কাটানো বা মনোরঞ্জনের উপযোগী সস্তা প্রেম ও অসার আমোদ-প্রমোদমূলক বই ছাড়া আর কিছুই তারা সচরাচর পড়ে না।

www.pathagar.com

দক্ষ সাংবাদিকদের দেখা যায়, এ ব্যাপারটা উপলব্ধি করে এবং তারা গুটি গুটি পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে জনগণের মধ্যে ঢোকে। তাদের জন্য তারা যদি কোন খবর পরিবেশন করতে চায় তবে তা হয় কোন ছোট গল্পের আকারে অথবা কোন চমকপ্রদ ও চটুল টুকিটাকির আকারে। এভাবে তারা অজীর্ণ রোগগ্রস্ত মানুষের হাতে তাদের বিচিত্র শিল্পকলা ও ধ্যান-ধারণা গছিয়ে দেয়ার জন্য কত ফন্দি-ফিকির করে। এর ফলে তাদের পত্রিকা চালু হয়ে বাজার ভরে ফেলে। প্রত্যেক বাড়ীতে, ক্লাবে ও অন্য সকল জায়গায় সে পত্রিকার রাজত্ব কায়েম হয়। নিছক ধোঁকা দিয়ে পাঠকদের মন জয় করে ফেলে।

দাওয়াতকারীর উচিত, এ সত্যটা যথাযথভাবে বুঝা এবং ঝুঁকি নিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের মধ্যে ঢুকে পড়া। এখানে এরূপ যুক্তি দেয়া তার উচিত নয় যে, সাংবাদিকের মত কাজ করা তো তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং দাওয়াতের উচ্চমান, মর্যাদা ও মহত্ত্বকে বাণিজ্যিক পণ্যের মত সর্বস্তরের জনগণকে দেখিয়ে বেড়ানো অত্যন্ত অশোভন কাজ—এ ধরনের যুক্তি দেয়া বাঞ্ছনীয় নয় কোন মতেই। কেননা সে যখন সক্রিয় ও সচেষ্ট হবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে, তখন উত্তম ফল তার হাতছাড়া হবে না, মহাকল্যাণকর ফসল থেকে সে বঞ্চিত হবে না। এ জন্য তাঁকে মর্যাদাহানীকর স্তরে নামতে হবে না। তবে মর্যাদার খুব উচ্চস্তরে থাকা যাবে এমনও কোন কথা নেই। একেবারে দার্শনিকদের মত উচ্চমানের তাত্ত্বিক লেখা লিখবেন অন্যথায় একেবারে গণ্ডমূর্খদের যোগ্য করে লিখেবন—এর কোনটাই জরুরী নয়।

একথা নিসন্দেহে সত্য যে, আপনার কাছে ইসলামের শ্রেষ্ঠ ও নির্ভুল দর্শন রয়েছে। সে দর্শন সৃষ্টির গভীরতম রহস্যে ভরপুর এবং প্রকৃতির সূক্ষ্মতম ও শাশ্বত নিয়মাবলীর সাথে তার সংযোগ বিদ্যমান। কিন্তু এ জাতীয় উপাদান শুধুমাত্র সেইসব গ্রন্থেরই অঙ্গীভূত হওয়ার যোগ্য, যা কেবল বড় বড় জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের জন্য রচিত। এ ধরনের উচ্চমানের পাঠক খুব কমই আছে এবং যারা আছে তাদের আপনার প্রতি বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী থাকা বিচিত্র নয়। পক্ষান্তরে আপনার যেসব প্রবন্ধ সমাজের কাঠামো ও রীতিনীতি নিয়ে বক্তব্য রাখে, তাতে আপনার সেইসব অভিজ্ঞতার নির্যাস থাকা চাই—যা হক ও বাতিলের অনুসরণের পরিণতি থেকে আপনি অর্জন করেছেন। তাহলে পাঠক আপনার প্রবন্ধ পড়তে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

দাওয়াতকারীর দায়িত্ব পালনকে সহজসাধ্য করার একটা উল্লেখযোগ্য পন্থা এই যে, আকিদা-বিশ্বাস গঠন সংক্রান্ত তত্ত্বকথা, আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন অথবা তার রসহ্য উদঘাটনে বিবেকবুদ্ধির ভূমিকা, বিশ্বপ্রকৃতির অদৃশ্য বস্তু বা সত্তাসমূহের সাথে মানুষের যোগাযোগ স্থাপনের উপায় কিংবা

www.pathagar.com

এই জাতীয় অন্য কোন নিরেট তাত্ত্বিক ও কাল্পনিক বিষয় নিয়ে কোন কিছু যেন সাধারণ মানুষের জন্য কখনো না লেখে। যা কিছু লিখবে, তা হতে হবে বাস্তবমুখী এবং দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অবস্থা সংক্রান্ত। আগেই আমরা একথা বলে এসেছি যে, দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অবস্থাই হলো মানবতার চলতি ইতিহাস। এ ইতিহাসই তার ভুল ও নির্ভুল কর্মকাণ্ডের রক্ষণাগার। দাওয়াতকারী যখন সমাজ বা ব্যক্তির জীবনের চলতি ঘটনাবলী ও কর্মকাণ্ডের কোন একটা নতুন উপসর্গ বা ধারাকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবে, তার কোন্‌টা ভুল ও কোন্‌টা ঠিক, তা নিয়ে আলোচনা করবে তার প্রচলিত স্বাভাবিক রূপের নিখুঁত বর্ণনা দেবে, তার সংস্কার ও সংশোধনের পদক্ষেপ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত মানদণ্ডে তার ওজন ও মান নিরূপণ করবে। তখন মেনে নিতে হবে যে, সে তার আমানত রক্ষা এবং দায়িত্ব পালন করেছে। এরূপ ব্যক্তি অচীরেই দেখতে পাবে যে, তার বক্তৃতা সকল দোকানপাট, বাজার, বাড়ীঘর, ক্লাব ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়েছে। অপ্রতিহত গতিতে দেখতে পাবে যে, তার রচনা পাঠকদের সাথেই তাদের নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করছে। বলা বাহুল্য জীবনের বাস্তবতাই তার রচনাকে এতখানি সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর আর এ নিয়ে মাথা ঘামানো হবে না যে, আপনি আপনার রচনায় কোন গণমুখী শব্দ, কোন প্রবাদবাক্য, কিংবা অনুরূপ কোন শ্রুতিমধুর ও স্পষ্ট উক্তি উচ্চারণ করেছেন কিনা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অবিরতভাবে বাজে ও বেহুদা কথা বলা ও অর্থহীন গালগল্প করা সেইসব লোককে রসূল (সা) ভীষণ অপসন্দ করতেন —যারা দুর্বোধ্য ভাষায় মানুষের সাথে কথা বলে। রসূল (সা) বহিরাগত গোত্র প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার সময় তাদের বুঝার সুবিধার্থে পরিবর্তিত স্বরে এবং বিদেশী শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলতেন। এতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে।

৫—সাধারণ কথাবার্তা

দাওয়াতকারী যখন অনুভব করবে যে, জনগণের কাছে তার কিছু প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন পূরণ হওয়া দরকার এবং তা পূরণের জন্য তাদের সাথে বিনম্র ভঙ্গীতে ও সুকৌশলে কথা বলে, তখন বুঝতে হবে সে যথার্থ দাওয়াতকারী। আর এ অনুভূতি যার নেই, সে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ, সে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের অযোগ্য।

যারা কথায় কথায় জনসাধারণের ওপর ক্ষেপে যায় এবং তারা তার কথায় আমল দিচ্ছে না বলে ক্ষুব্ধ হয়, তারা দাওয়াতকারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেকাংশেই সঠিকভাবে বুঝে নাই। আপনাকে বুঝতে হবে যে, জনগণ

www.pathagar.com

আপনার কাছে তাদের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না যে, তা অর্জন করার জন্য আপনার সাথে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করবে। প্রয়োজন তো আপনারই। কাজেই আপনি কিভাবে তা পূরণ করা যায় ভাবুন। নরম কথা ও মিষ্ট ভাষা ছাড়া এ প্রয়োজন পূরণের আর কোন উপায় নেই।

আমাদের এ উক্তি ভাষণে, শিক্ষাদানে, ক্ষুদ্র বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে—সর্বত্রই প্রযোজ্য। তবে তা দৈনন্দিন কথাবার্তায় আরো বেশী প্রযোজ্য। কেননা সেখানে বক্তা ও শ্রোতা থাকে মুখোমুখী এবং সেখানে কথার পিঠে কথা হয়।

মানুষের মধ্যে অনেকে ব্যতিক্রমধর্মী স্বভাবের হয়ে থাকে। কেউ কেউ অহংকারী ও আত্মগর্বিত হয়, কারো কারো মধ্যে আদর্শবাদী লোকদের হেয় করা ও ক্ষতি করার প্রবণতা থাকে, আবার কারো কারো মধ্যে থাকে তর্ক করা ও জিতে যাওয়ার প্রবণতা। এসব প্রবণতাকেই আপনার মনে রাখতে হবে এবং এর সুষ্ঠু চিকিৎসা করতে হবে। এর চিকিৎসার একমাত্র উপায় হলো, এসব বিরক্তিকর ব্যাপারকে উপেক্ষা করা এবং নিজের নম্র ও মিষ্ট কথা বলার নীতি অব্যাহত রাখা।

এখানে আমরা দাওয়াতকারীকে তিনটে উপদেশ দেবো ঃ

এক ঃ যে ব্যক্তি তর্ক করতে আসে, তার ওপর জয় লাভ করার বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। বরং যখনই সে অনুভব করবে যে, আলোচনা একটা ঘোরতর বিতর্কের রূপ নিতে যাচ্ছে, অমনি সে আলোচনা বন্ধ করতে হবে অত্যন্ত ভদ্রতা ও আদবের সাথে, বিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে। পরে যদি কোন সময় শান্তশিষ্ট পরিবেশে পুনরায় মিষ্ট কথা বলার সুযোগ আসে তাহলে তো ভাল কথা। নচেৎ সে আলোচনায় আর ফিরে না যাওয়াই ভাল। এ পন্থায় আমরা বিতর্ক ও তার পরিণতিতে মনের ওপর যে বিদ্বেষ, বিভেদ, ঘৃণা ও তিক্ততার ছাপ পড়ে, শুধু যে তা থেকেই রক্ষা পেতে চাই তা নয়, বরং সেই সাথে আমরা সত্যের দাওয়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ থেকেও উদ্ধার পেতে চাই। আসলে তর্ক আদৌ দাওয়াতের কোন পদ্ধতি নয়। এখানে হার-জিতের কোন ব্যাপার নেই। দাওয়াতের ময়দান কোন জয়-পরাজয় নিরূপণের জায়গা নয়। এ ময়দান কেবল তাকওয়া ও সততার (মত তর্কাতীত ব্যাপারে) পারস্পরিক সহযোগিতাকারীদেরই ময়দান।

সত্য বটে, আপনার বিজয় একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সাবধান, বিজয়লাভের আগ্রহ ও বাসনা যেন অতিমাত্রায় তীব্র হয়ে না ওঠে আপনার মধ্যে। আপনাকে জয় লাভ করতেই হবে, সেটা মানি। কিন্তু মিষ্ট ও নরম ভাষা, শান্ত ও শিষ্ট বচন এবং ঠাণ্ডা ও খোশমেজাজ ছাড়া এ জয় লাভের অস্ত্র যেন অন্য কিছু না হয়। এ অস্ত্রের বলে অনেক দানবীয় শক্তিধর লোককেও পরাভূত করা যায়। যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি তর্ক ও বিদ্বেষের বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় এ অস্ত্র তাকে রক্ষা কবচ দেয়।

দুই ঃ ইসলামী দাওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার আদর্শগত মহিমা নিয়ে কখনো জনসাধারণকে চ্যালেঞ্জ দেয়া ঠিক নয়। ইসলামী আন্দোলনের লোকদের যে বীরত্ব, সাহস ও সততা আছে, তা নিয়েও বিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দেয়া যাবে না। ইসলামী আন্দোলন সাফল্য ও বিজয় লাভ করার পর কি করবে, সে সম্পর্কে আগাম হুঁশিয়ারী বা হুমকি উচিত নয়।

এসব চ্যালেঞ্জ ও হুঁশিয়ারী পরিহার করতে হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, দাওয়াতকারীর একটা প্রয়োজন আছে, যা সে পূরণ করতে চায়। এখন তাকেই ভেবে দেখতে হবে যে, চ্যালেঞ্জ দেয়া দ্বারা এই প্রয়োজন পূরণ হতে পারে কিনা।

আপনি একজন শিকারী। শিকার আপনার সামনে। আপনি তাকে খাঁচায় পুরতে চান। এই শিকারকে কি আপনি উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলবেন ? তা করলে তো সে এমন পালান পালাবে যে, আর কখনো তাকে ধরতে পারবেন না। আপনি কি তাই চান, না তাকে স্বাভাবিক রাখতে চান ? আমরা তো বরং বিপক্ষের চ্যালেঞ্জ বা হুমকির মোকাবিলায়ও মিষ্টভাষা ও নরম ব্যবহার প্রয়োগের পরামর্শ দিয়ে থাকি। আমরা বলি, ওসব হুমকি চ্যালেঞ্জ ভুলে যান। মনে তার কোন প্রভাব নেবেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিকার পালাতে প্রস্তুত। নিজেকে হেয় বা অপমানিত না করে যতটা সম্ভব তার সাথে শিষ্টাচার চালিয়ে যেতে হবে। তাকে প্রশান্ত ভালোবাসা দেখাতে হবে। কৃত্রিম নয় বরং স্বাভাবিক আবেদন তার সামনে রাখতে হবে যেন তার উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং সে যথাস্থানে বহাল থাকে।

মনে রাখবেন, আপনার বিপক্ষীয় যে ব্যক্তি আপনাকে হুমকি ও চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, আপনাকে চ্যালেঞ্জ দেয়া ও রাগানোতে তার কোন স্বার্থ নেই। সুতরাং সে ভিন্ন ধরনের রোগী। তার রোগের চিকিৎসা নম্র ব্যবহার দ্বারা এবং তাকে ফাঁদে আটকানো সহজেই সম্ভব।

আপনি তাকে আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা দেখান। তার ব্যক্তিত্ব, মতামত ও স্বভাবকে আপনার ভারিক্কি চালচলন, প্রশান্ত আভাস ইংগীত দ্বারা গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করুন এবং তাকে বুঝিয়ে দিন যে, আপনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও স্বাভাবিক মেজাজে আছেন, তাকে কোন রকমের চ্যালেঞ্জ করার ইচ্ছা বা তার দিক থেকে চ্যালেঞ্জের কোন আশংকা থেকে আপনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

www.pathagar.com

বলবেন কিভাবে?

আমি বলি ঃ তাকে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরখ করে নিন। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাই আপনাকে ব্যাখ্যা করে সবকিছু বুঝিয়ে দেবে এবং অনেক উদাহরণও দেখাবে।

তিন ঃ সাধারণ্যে নিজের পাণ্ডিত্য ও বাগ্মীতার বড়াই করবেন না। যে ব্যক্তি নিজের প্রচারে ব্যস্ত কিংবা নিজেকে অন্যদের চেয়ে বিশিষ্ট করে জাহির করতে সচেষ্ট, তাকে লোকেরা পসন্দ করে না।

দাওয়াতকারীকে বিনয়াবনত হয়ে থাকতে হবে। নিজের বিজ্ঞতা ও বাগ্মীতার কথা ভুলে যেতে হবে। তাদের সাথে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে, তবে তা যেন কৃত্রিম না হয় এবং সাধারণ মানুষের সাথে নিজের ব্যবধান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে না হয়। কেননা তাকে জনগণের সাথে মেলামেশা অব্যাহত রাখতে হবে।

নিজেকে বিরাট প্রতিভাবান মনে করার পরিণতি খুবই খারাপ হয়ে থাকে। হয়তো কেউ তার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করবে না কিংবা কেউ তাকে কষ্টও হয়তো দেবে না। তবে সে কখনো জনগণের হৃদয়ের কাছে যেতে পারবে না এবং তার দায়িত্ব পালনে সে কখনো সফল হবে না।

একথাগুলো বলছি এই জন্য, যাতে আমরা সবাই আমাদের মনের এই মলিনতাকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করে ফেলি এবং মানুষের সাথে দৈনন্দিন কথাবার্তা বলার সময় এই বাস্তবমুখী পথনির্দেশ যেন মেনে চলি। আমরা যখন কাউকে সম্বোধন করবো, তখন তাকে নিজেরই সমান মনে করবো। যেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য আছে, সেটুকুর কৃতিত্ব আমাদের নয়—আল্লাহর।

সুতরাং মানুষের কাছে যখন আমরা এগিয়ে যাবো তখন আমাদের কৃতিত্ব নিয়ে নয়—আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ নিয়ে যাবো। আল্লাহ আমাদের মন ও বুদ্ধিকে স্বীয় অনুগ্রহে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দিন। তিনি তো অতুলনীয় অনুগ্রাহক।

সেই মহান আল্লাহরই প্রশংসা—যার অপার দান ও অনুগ্রহেই সৎকাজগুলো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহর প্রশংসা প্রথমেও এবং শেষেও। আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের ওপর অফুরন্ত করুণা ও সালাম নাযিল করুন। আমীন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com